ইসলামী আকীদার প্রাচীনতম গ্রন্থ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) রচিত
আল-ফিকহুল আকবার
বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ
www.assunnahtrust.com
www.assunnahpublications.com

شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة (رح) باللغة البنغالية

تأليف: دكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير
دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،
وأستاذ بالجامعة الإسلامية الحكومية، كوشتيا، بنغلاديش.

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) রচিত

আল-ফিকহুল আকবার

বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট ভবন
পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০
মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪, ০১৭১৫৪০০৬৪০

বিক্রয় কেন্দ্র: ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৯৮৬২৯০১৪৭

প্রকাশ কাল : রবিউল আউআল ১৪৩৫ হিজরী আরবী, মাঘ ১৪১৯ হিজরী বাংলা
জানুয়ারি ২০১৪ খৃস্টাব্দ

হাদিয়া: ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

ISBN: 978-984-90053-5-3

AL-FIQHUL AKBAR, by Imam Abu Hanifa (RH), Bangla Translation and Explanation by Professor Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. January 2014. Price TK 350.00 only.

ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর প্রিয়তম মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর।

'এহইয়াউস সুনান' ও 'ইসলামী আকীদা' গ্রন্থদ্বয়ে আকীদা ও সুন্নাত বিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছি যে, আমাদের সমাজের অনেকে তাঁর অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এ সকল বিষয়ে তাঁর মতের সাথে সাংঘর্ষিক মত পোষণ করেন। এ সকল বক্তব্য অনেক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেকে ঈমান, আকীদা, সুন্নাত, বিদআত ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের মত জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: আমরা তো ফিকহী বিষয়ে হানাফী, আকীদায় আশআরী বা মাতুরিদী ও তরীকায় কাদিরী, চিশতী বা নকশবন্দী। আমরা কি ফিকহ, আকীদা ও তরীকা সকল বিষয়ে হানাফী হতে পারি না? ইমাম আবূ হানীফার কি কোনো আকীদা ও তরীকা ছিল না? থাকলে তা কী ছিল?

প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) আকীদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা দেখব যে, তিনি ফিকহ বিষয়ে কোনো গ্রন্থ রচনা না করলেও আকীদা বিষয়ে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, আকীদা বিষয়ক জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ ফিকহ বা 'আল-ফিকহুল আকবার' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং ফিকহী বিষয়ে ইজতিহাদ ও মতভেদের অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু আকীদা বিষয়ে ইজতিহাদ ও মতভেদ নিষেধ করেছেন।

ইমাম আযমের (রাহ) রচনাবলির মধ্যে আকীদা বিষয়ক ৫টি পুস্তিকা প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে 'আল-ফিকহুল আকবার' পুস্তিকাটির দুটি ভাষ্য। একটি 'আল-ফিকহুল আকবার' এবং অন্যটি 'আল-ফিকহুল আবসাত' নামে প্রসিদ্ধ। কোনো কোনো গবেষক দ্বিতীয় পুস্তিকাটি, অর্থাৎ 'আল-ফিকহুল আবসাত' নামে পরিচিত পুস্তিকাটিই মূল 'আল-ফিকহুল আকবার' বলে মত প্রকাশ করেছেন। 'ইমাম আবূ হানীফার রচনাবলি' পরিচ্ছেদে আমরা দেখব যে, সনদ ও মতনে প্রথম পুস্তিকাটিও 'আল-ফিকহুল আকবার' হিসেবে প্রমাণিত। আমরা এ পুস্তিকাটিকেই অনুবাদের জন্য মূল হিসেবে গ্রহণ করেছি। কারণ এ পুস্তিকাটিতে 'আল-ফিকহুল আবসাত' ও তাঁর রচিত সবগুলো পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সার-সংক্ষেপ সহজ ভাষায় আলোচিত। ইসলামী আকীদার বিভিন্ন দিকের সামগ্রিক আলোচনা এ পুস্তিকায় যেভাবে বিদ্যমান তাঁর রচিত অন্যান্য পুস্তিকায় সেভাবে নেই। এজন্য আমি এ পুস্তিকাটি অনুবাদ করার এবং এর ভিত্তিতে ইসলামী আকীদার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পাশাপাশি 'আল-ফিকহুল আবসাত' ও অন্যান্য পুস্তিকা থেকে প্রাসঙ্গিক সকল বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি।

আল-ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যায় আকীদা বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর মত জানতে তাঁর লেখা পুস্তিকাগুলো ছাড়া আরো দুটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছি:

(১) তৃতীয়-চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইবন সালামা তাহাবী (২৩৮-৩২১ হি) রচিত 'আল-আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ'। এ পুস্তিকাটি তিনি ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদ্বয়ের আকীদা বর্ণনায় রচনা করেন।

(২) চতুর্থ-পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবুল আলা সায়িদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমদ নাইসাপূরী (৩৪৩-৪৩২ হি) রচিত আল-ই'তিকাদ। এ গ্রন্থটিতে তিনি ইমাম আবূ হানীফার আকীদা বিষয়ক বক্তব্যগুলো সংকলন করেছেন।

ফিকহুল আকবার গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র। আকীদার পরিচিত আলোচ্য বিষয়গুলো ছাড়াও তারাবীহ, রিয়া, উজব, কিয়ামতের আলামত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তানদের পরিচয় ইত্যাদি অনেক বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ক আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমাদের এ বইটির কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি করেছে।

আল-ফিকহুল আকবারের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে যেয়ে দেখলাম যে, মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্তির উৎস ও বিষয়বস্তু দ্বিতীয় শতকে যা ছিল বর্তমানেও প্রায় তা-ই রয়েছে। খারিজীগণের 'তাকফীর' ও জিহাদ নামের উগ্রতা, জাহমী-মুরজিয়াদের মারিফাত ও ঈমান বিষয়ক প্রান্তিকতা, শীয়াগণের অতিভক্তি ও বাতিনী ইলমের নামে অন্ধত্ব এবং মুতাযিলীগণের বুদ্ধিবৃত্তিকতার নামে ওহীর অবমূল্যায়ন বর্তমান যুগেও একইভাবে উম্মাতের সকল ফিতনার মূল বিষয়। এগুলোর সাথে বর্তমান যুগে যোগ হয়েছে তাওহীদ বিষয়ক অজ্ঞতা ও শিরকের ব্যাপকতা। এ সকল ফিতনার সমাধানে সে যুগে ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমাম যা বলেছেন বর্তমান যুগেও সেগুলোই আমাদের সমাধানের পথ দেখাবে। এ জন্য এ সকল বিষয়ে ফিকহুল আকবারের বক্তব্য ছাড়াও ইমাম আবূ হানীফা ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যান্য ইমামের বক্তব্য বিস্তারিত আলোচনা করেছি। স্বভাবতই এতে ব্যাখ্যার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে।

আল-ফিকহুল আকবারের অন্যতম আলোচ্য মহান আল্লাহর বিশেষণ। এ বিষয়টি আমাদের অনেকের জন্যই সম্পূর্ণ নতুন বা ভিন্ন আঙ্গিকের। আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক আকীদা এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের আকীদার সম্পূর্ণ উল্টো। যেমন, 'মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান'-এ আকীদাকে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্রগণ জাহমী ফিরকার কুফরী আকীদা এবং সর্বেশ্বরবাদেরই ভিন্নরূপ বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে আমাদের সমাজের অনেক মুসলিম এ আকীদা পোষণ করেন। বিষয়টি জটিল হওয়াতে আমি একটু বিস্তারিতভাবে তা পর্যালোচনার চেষ্টা করেছি।

এ বইটিকে আমি দুটি পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্ব তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফার জীবনী ও মূল্যায়ন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফার রচনাবলি ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইলমুল আকীদা ও ইলমুল কালাম বিষয়ে

আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় পর্ব আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। তাবিয়ী যুগের আলিমগণ পরবর্তী যুগের মত অধ্যায় বিন্যস্ত গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যগুলো অনেকটা অবিন্যস্তভাবে সংকলন করেছেন। অথবা তাঁরা মুখে বলেছেন এবং ছাত্ররা তা লিখেছে। এজন্য 'আল-ফিকহুল আকবার' পুস্তিকাটির আলোচ্য বিষয় পরবর্তী যুগের গ্রন্থাদির মত সুবিন্যস্ত নয়। একই বিষয় বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। এজন্য এর আলোচ্য বিষয়কে বিষয়ভিত্তিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা কঠিন। বিন্যাসের সুবিধার জন্য আমি আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে পাঁচটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ইমাম আযমের বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আলোচ্য বিষয় ব্যাখ্যা করেছি।

আকীদা বিষয়ক ও সুন্নাহ নির্ভর সকল আলোচনা ও গ্রন্থ রচনায় আমার প্রেরণার উৎস ছিলেন আমার শ্বশুর ফুরফুরার পীর শাইখ আবুল আনসার সিদ্দিকী (রাহ)। সুন্নাহ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আকীদা গ্রহণে ও প্রচারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। আমাদেরকেও আপোষহীন হতে প্রেরণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁর ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করুন, তাঁর নেক আমলগুলো কবুল করুন, আমাদের ও উম্মাতের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনে আমাদেরকে জান্নাতে একত্রিত করুন।

'আল-ফিকহুল আকবার'-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনায় আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন ভাই শামসুল আরিফিন খালিদ। শুরু থেকেই তিনি উৎসাহ দিয়েছেন এবং বারবার পাণ্ডুলিপি দেখে বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, চার ইমাম ও সালাফ সালিহীনের (রাহিমাহুমুল্লাহ) বক্তব্যের আলোকে বিশুদ্ধ সুন্নাহ নির্ভর আকীদার প্রচার এবং আকীদা বিষয়ক বিতর্ক, হানাহানি ও প্রান্তিকতার অবসানে তাঁর আন্তরিক আবেগ, পরামর্শ ও প্রচেষ্টা মহান আল্লাহ কবুল করুন ও তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা দান করুন।

আমার প্রিয়জনেরা গ্রন্থটির রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। বিশেষত আস-সুন্নাহ ট্রাস্টে আমার সহকর্মীগণ ড. শুআইব আহমদ, মুফতি শহীদুল্লাহ, শাইখ যাকারিয়া, শাইখ মুশাহিদ আলী, ভাই আব্দুর রহমান ও অন্যান্য সকলেই বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। প্রফেসর ড. অলী উল্যাহ, ডা. আব্দুস সালাম সুমন ও মাওলানা ইমদাদুল হক প্রুফ দেখেছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম যারা আমাকে বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সকলকেই উত্তম পুরস্কার দান করুন।

এ বইয়ের মধ্যে অগণিত ইমাম, আলিম ও বুজুর্গের নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকের নামের সাথে প্রত্যেক স্থানে দুআর ইঙ্গিত হিসেবে (রাহ) লেখা সম্ভব হয় নি। পাঠকের প্রতি অনুরোধ, সকল আলিমের নামের সাথে 'রাহিমাহুল্লাহ' বলে তাঁদের জন্য দুআ করবেন। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা দীন পেয়েছি এবং তাঁদের জন্য দুআ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। মহান আল্লাহ এ গ্রন্থে উল্লেখকৃত সকল আলিমকে এবং মুসলিম উম্মাহর সকল আলিমকে অফুরন্ত রহমত দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র প্রদানে পাদটীকায় গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছি। গ্রন্থ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বইয়ের শেষে 'গ্রন্থপঞ্জীর' মধ্যে উল্লেখ করেছি। অনেক ক্ষেত্রে 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলা'-র উপর নির্ভর করেছি।

আল-ফিকহুল আকবার-এর ব্যাখ্যা সাধারণ বাঙালী পাঠকদের জন্য সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছি। এজন্য অনেক বিষয়ে বিস্তারিত বিতর্ক, আলোচনা বা উদ্ধৃতি পরিহার করেছি। ফলে অনেক সময় আলিমগণের নিকট বিষয়টি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে। এছাড়া **বিষয়বস্তুর জটিলতা ও আমার ইলমী সীমাবদ্ধতার কারণে বইয়ের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। সম্মানিত কোনো পাঠক যদি ভুলভ্রান্তিগুলো জানিয়ে দেন তবে তা আমার প্রতি বড় ইহসান হবে। মহান আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করবেন। এছাড়া তথ্যগত ও উপস্থাপনাগত যে কোনো পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব। আমরা পরবর্তী সংস্করণে ভুলগুলো সংশোধন করব, ইনশা আল্লাহ।**

ইসলামী ইলমের সকল শাখার উদ্দেশ্য মুমিনের জীবনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে পরিচালিত করা। ইলমুল ফিকহ-এর উদ্দেশ্য মুমিনের ইবাদত, মুআমালাত ও সকল কর্মকাণ্ড যেন অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের আদলেই পালিত হয়। ইলমুত তাযকিয়া বা তাসাউফের উদ্দেশ্য মুমিনের হৃদয়ের অবস্থা যেন অবিকল তাঁদের পবিত্র হৃদয়গুলোর মত হয়ে যায়। ইলমুল আকীদার উদ্দেশ্য মুমিনের বিশ্বাসের সকল বিষয় যেন হুবহু তাঁদের বিশ্বাসের সাথে মিলে যায়। আমরা বিশ্বাস করি, আকীদা বিষয়ে সুন্নাতে নববীর পুনরুজ্জীবনের জন্যই ইমাম আবূ হানীফা কলম ধরেছিলেন। আমাদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যও একই। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করি, আমাদের এ নগণ্য প্রচেষ্টাকে তাঁর প্রিয়তমের সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠায় কবুল করে নিন। আমাদের সকলের হৃদয়কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুগত করে দিন। ঈমানে, আকীদায়, ফিকহে, তাযকিয়ায় ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নাত জানতে, মানতে, প্রচার করতে ও সুন্নাতের জন্য সুন্নাতের ব্যতিক্রম সকল কিছুকে অকাতরে বিসর্জন দিতে আমাদের হৃদয়গুলোকে শক্তি দান করুন। আমীন।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে আমার এ গ্রন্থটির ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে এটি কবুল করে নেন। একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-পরিজন, শুভাকাঙ্খীগণ ও সকল পাঠকের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন! সালাত ও সালাম আল্লাহর খালীল মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন ও সহচরগণের উপর।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম পর্ব

ইমাম আবূ হানীফা ও আল-ফিকহুল আকবার

Contents

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমাম আবূ হানীফার জীবনী ও মূল্যায়ন

ইমাম আবূ হানীফার জীবনী প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাম্বালী ফকীহ আল্লামা যাহাবী (৭৪৮ হি) প্রসিদ্ধ একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন:

الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الامام. وهذا أمر لا شك فيه.

وليس يصح في الاذهان شئ : إذا احتاج النهار إلى دليل

"ইলমুল ফিকহ ও এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে নেতৃত্বের মর্যাদা এ ইমামের জন্য সংরক্ষিত। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। "যদি দিবসকে প্রমাণ করতে দলিলের প্রয়োজন হয় তবে আর বুদ্ধি-বিবেক বলে কিছুই থাকে না"।[১]

অর্থাৎ দিবসের দিবসত্বে সন্দেহ করা বা দিবসকে দিবস বলে প্রমাণ করতে দলিল দাবি করা যেমন নিশ্চিত পাগলামি, তেমনি ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদার বিষয়ে সন্দেহ করা বা তাঁর মর্যাদা প্রমাণের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করাও জ্ঞান জগতের পাগলামি বলে গণ্য হওয়া উচিত। তারপরও কিছুটা 'পাগলামি' করতে বাধ্য হলাম।

আমার একান্ত প্রিয়ভাজন কয়েকজন আলিম ও সচেতন মানুষ আমাকে অনুরোধ করলেন ইমাম আবূ হানীফার মূল্যায়ন বিষয়টি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে। কারণ 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি ইসলামী আকীদা বিষয়ে লিখিত সর্বপ্রথম মৌলিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু আলোচনার পূর্বে লেখকের মূল্যায়ন বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান যুগেও আরবী, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপিত হচ্ছে। অনেক অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে এ বিষয়ক অস্পষ্টতা বা প্রশ্ন থাকতে পারে। এজন্য তাঁর জীবনী অতি সংক্ষেপে আলোচনা করে তাঁর মূল্যায়ন বিতর্কটি বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করলাম।

১. যুগ পরিচিতি

মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ফকীহের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০ হি) প্রথম। তিনি ছিলেন তাবিয়ী প্রজন্মের। ইমাম মালিক ইবন আনাস (৯৩-১৭৯ হি) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস শাফিয়ী (১৫০-২০৪ হি) উভয়ে তাবি-তাবিয়ী প্রজন্মের। আর ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বাল (১৬৪-২৪১হি) ছিলেন তাবি-তাবিয়ীদের ছাত্র পর্যায়ের। রাহিমাহুমুল্লাহু: মহান আল্লাহ তাঁদেরকে রহমত করুন। বস্তুত তাবিয়ী যুগের ফকীহগণের মধ্যে একমাত্র ইমাম আবূ হানীফাই এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৪১ হিজরী সালে মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফত গ্রহণের মাধ্যমে উমাইয়া যুগের শুরু। ৬০ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইয়াযিদ ইবন মুআবিয়া প্রায় চার বৎসর শাসন করেন (৬০-৬৪ হি)। তার মৃত্যুর পর কয়েক মাস তার পুত্র মুআবিয়া এবং বৎসর খানেক মারওয়ান ইবনুল হাকাম রাজত্ব করেন (৬৪-৬৫ হি)। তার পর তার পুত্র আব্দুল মালিক প্রায় ২১ বৎসর রাজত্ব করেন (৬৫-৮৬ হি)। ১৩২ হিজরী পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় ৪৬ বৎসর আব্দুল মালিকের পুত্র, পৌত্র, ভাতিজাগণ রাজত্ব পরিচালনা করেন। ৯৯ থেকে ১০১ হিজরী সাল: প্রায় তিন বৎসর উমার ইবন আব্দুল আযীয খিলাফত পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনামল "খিলাফাতে রাশেদার" পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য।

৯৯ হিজরী সাল থেকেই "নবী-বংশের রাজত্ব" শ্লোগানে গোপনে আব্বাসী আন্দোলন শুরু হয়। ১২৭ হিজরী থেকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধ শুরু হয়। ১৩২ হিজরীতে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে ও আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠা পায়। প্রথম আব্বাসী খলীফা আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ প্রায় চার বৎসর (১৩২-১৩৬ হি) এরপর আবূ জাফর মানসূর প্রায় ২২ বৎসর (১৩৬-১৫৮ হি) রাজত্ব করেন। রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন, অস্থিরতা ও পরিবর্তনের পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মেও নানা দল-উপদল জন্ম নেয় এ সময়েই। আভ্যন্তরীণ সমস্যাদি সত্ত্বেও মুসলিম রাষ্ট্র তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীন, রাশিয়া ও ভারতের কিছু অংশ থেকে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন পর্যন্ত- তৎকালীন বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি- মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

ইমাম আবূ হানীফার জন্মের পূর্বেই আলী (রা)-এর খিলাফতের সময়ে খারিজী ও শীয়া দুটি রাজনৈতিক-ধর্মীয় ফিরকার জন্ম হয়। উমাইয়া যুগের মাঝামাঝি সময় থেকে কাদারিয়া, মুরজিয়া, জাহমিয়া, মুতাযিলা প্রভৃতি ফিরকার উদ্ভব ঘটে। এ সময়েই উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে ইমাম আবূ হানীফার জন্ম ও আব্বাসী খলীফা মানসূরের সময়ে তাঁর ওফাত।

২. সংক্ষিপ্ত জীবনী

২. ১. বংশ ও জন্ম

ইমাম আবূ হানীফার (রাহ) পূর্ণ নাম 'আবূ হানীফা নু'মান ইবন সাবিত ইবন যূতা। তাঁর পৌত্র ইসমাঈল তাঁর বংশ বর্ণনায় বলেন,

আমি ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ ইবন নুমান ইবন সাবিত ইবন নুমান ইবন মারযুবান। আমরা পারস্য বংশোদ্ভূত এবং কখনো দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হই নি। আমার দাদা ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সাবিত শৈশবকালে আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি তাঁর ও তাঁর বংশের মঙ্গলের জন্য দুআ' করেছিলেন । আমরা আশা করি তাঁর ঐ দুআ নিষ্ফল হয় নি।[২]

তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কেউ ৬০ হি. এবং কেউ ৭০ হি. সাল উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৮০হি. (৬৯৯ খৃ.) সালে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩]

২. ২. শিক্ষাজীবন ও উস্তাদগণ

ইমাম আবূ হানীফা তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরুতে কুরআন কারীম মুখস্থ করেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কুরআন কারীমের প্রসিদ্ধ ৭ কারীর অন্যতম কারী আসিম ইবন আবিন নাজূদ (১২৮ হি)-এর নিকট ইলমুল কিরাআত শিক্ষা করেন।[৪] পরবর্তী সময়ে তিনি ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন।

আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাহাবীদের কেউ কেউ ১১০ হিজরী সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাজেই ইমাম আবূ হানীফার জন্য কোনো কোনো সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করা ও শিক্ষা গ্রহণ করা খুবই সম্ভব ছিল। বাস্তবে কতজন সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। হানাফী জীবনীকারগণ দাবি করেছেন যে, কয়েকজন সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। পক্ষান্তরে দু-একজন বিরোধী দাবি করেছেন যে, কোনো সাহাবীর সাথেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি। এ প্রসঙ্গে সপ্তম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও শাফিয়ী ফকীহ ইবন খাল্লিকান আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম (৬০৮-৬৮১ হি) বলেন:

وأدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة، رضوان الله عليهم وهم: أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة، ولم يلق أحداً منهم ولا أخذ عنه، وأصحابه يقولون: لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل.

"আবূ হানীফা চার জন সাহাবীর (রা) সময় পেয়েছিলেন: (১) (বসরায়) আনাস ইবন মালিক (৯২ হি), (২) কূফায় আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফা (৮৭ হি), (৩) মদীনায় সাহল ইবন সা'দ সায়িদী (৮৮ হি) এবং (৪) মক্কায় আবুত তুফাইল আমির ইবন ওয়াসিলা (১১০ হি)। তাঁদের কারো সাথেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি এবং কারো থেকেই তিনি কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। তাঁর অনুসারীরা বলেন যে, কয়েকজন সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি তাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণের নিকট এ বিষয় প্রমাণিত হয় নি।"[৫]

হানাফী জীবনীকারগণের বর্ণনায় ৭ জন সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল:

(১) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম আনসারী খাযরাজী মাদানী, রাদিয়াল্লাহু আনহু (৭০ হিজরীর পর)

(২) আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস. রাদিয়াল্লাহু আনহু (৮৫ হি বা তাঁর পূর্বে)

(৩) ওয়াসিলা ইবনুল আসকা ইবন কা'ব ইবন আমির লাইসী শামী, রাদিয়াল্লাহু আনহু (৮৫ হি)

(৪) আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফা: আলকামা ইবন খালিদ ইবনুল হারিস আসলামী কূফী, রাদিয়াল্লাহু আনহু (৮৭ হি)

(৫) আবুল হারিস আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবন জুয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মা'দীকারিব যাবীদী মিসরী, রাদিয়াল্লাহু আনহু (৮৮ হি)

(৬) আনাস ইবন মালিক ইবনুন নাদর ইবন দামদাম ইবন যাইদ হারাম আনসারী নাজ্জারী মাদানী, রাদিয়াল্লাহ আনহু (৯২/৯৩ হি)

(৭) আয়েশা বিনত আজরাদ। তাঁর মৃত্যু তারিখ এবং অন্যান্য পরিচয় জানা যায় না। তিনি ইবন আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ও রিজালবিদগণ তাঁকে তাবিয়ী হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে সাহাবী বলে গণ্য করেছেন।[৬]

এ প্রসঙ্গে নবম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও হানাফী ফকীহ আল্লামা মাহমূদ ইবন আহমদ বদরুদ্দীন আইনী (৭৬২-৮৫৫ হি) বলেন: জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাতের বর্ণনাটি বাহ্যতই সঠিক নয়। তবে অন্যান্যদের সাথে তাঁর সাক্ষাতের সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। যেহেতু তাঁর জীবনীকারগণ তা উল্লেখ করেছেন সেহেতু সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া তা অস্বীকার করা অযৌক্তিক পক্ষপাতমূলক আচরণ বলে গণ্য।[৭]

বাস্তবে প্রায় সকল জীবনীকার, রিজালবিদ ও ঐতিহাসিক একমত যে সাহাবী আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আল্লামা আইনী বলেন:

كان أبو حنيفة، رضى الله عنه، من سادات التابعين، رأى أنس بن مالك، ولا يشك فيه إلا جاهل وحاسد. قال ابن كثير فى تاريخه: أبو حنيفة .... أدرك عصر الصحابة، ورأى أنس بن مالك، قيل: وغيره. وذكر الخطيب فى تاريخ بغداد أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك. وذكر المزى فى التهذيب أنه رأى أنس بن مالك، وكذا ذكر الذهبى فى الكاشف، وغيرهم من العلماء،

"আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাবিয়ীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আনাস ইবন মালিককে দেখেছেন। এ বিষয়ে একমাত্র কোনো মুর্খ বা হিংসুক ছাড়া কেউ সন্দেহ করেন নি। ইবন কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন: আবূ হানীফা ... সাহাবীদের যুগ পেয়েছিলেন। তিনি আনাস ইবন মালিককে দেখেছেন। বলা হয় যে তিনি অন্য সাহাবীকেও দেখেছেন। খাতীব বাগদাদী তারীখ বাগদাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ হানীফা আনাস ইবন মালিককে দেখেছেন। মিয্যী তাঁর তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আনাস ইবন মালিককে দেখেছেন। যাহাবী তাঁর 'আল-কাশিফ' গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য আলিমও একই কথা লিখেছেন।"[৮]

এছাড়া আবূ হানীফা (রাহ) তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের, বিশেষত ইরাকের সকল প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিম থেকে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫ হি) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আযমের শিক্ষকদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলির সংকলন "মুসনাদ আবী হানীফা" গ্রন্থের মধ্যে তাঁর তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী উস্তাদগণের সংখ্যা প্রায় ২০০।[৯]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, রিজালবিদ ও শাফিয়ী ফকীহ ইমাম ইউসুফ ইবন আব্দুর রাহমান আবুল হাজ্জাজ মিয্যী (৭৪২ হি) সিহাহ-সিত্তাহ গ্রন্থগুলোর রাবীগণের জীবনীমূলক 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর হাদীসের উসতাদগণের মধ্যে ৭৭ জনের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের সূত্রে বর্ণিত ইমাম আবূ হানীফার হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত। তাঁদের অধিকাংশই তাবিয়ী। কেউ কেউ ইমাম আযমের সমসাময়িক এবং কেউ কেউ তাবি-তাবিয়ী। এদের অধিকাংশই তৎকালীন যুগের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাদীসের ইমাম বলে গণ্য ছিলেন। এদের অধিকাংশের বর্ণিত হাদীস বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থে সংকলিত।[১০]

২. ৩. অধ্যাপনা ও ছাত্রগণ

উস্তাদদের জীবদ্দশাতেই ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত ফিকহে তাঁর প্রধান উস্তাদ প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান (১২০ হি)-এর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং কূফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তী ত্রিশ বৎসর তিনি গবেষণা ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন। ইমাম আবূ হানীফার মূল্যায়ন বিষয়ক পরিচ্ছেদে আমরা দেখব যে, ইমাম আবূ হানীফার ফিকহী মত তাঁর জীবদ্দশাতেই মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাবিয়ী যুগের আর কোনো ফকীহ এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। স্বভাবতই মুসলিম বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতেন। তাঁর ৯৭ জন মুহাদ্দিস ছাত্রের একটি তালিকা পেশ করেছেন ইমাম মিয্যী। তাঁদের অধিকাংশই সে যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত। এছাড়া ইমাম আবূ হানীফার এ সকল ছাত্রের অনেকেই পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ কূফা, বসরা, বাগদাদ, শীরায, ওয়াসিত, রাই, খুরাসানসহ মুসলিম বিশ্বের সকল প্রসিদ্ধ জনপদের বিচারক বা কাযির দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের সকলেই ১৫০ থেকে ২৩০ হিজরীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন।[১১]

আল্লামা আইনী এ সকল ছাত্রের বাইরে আরে ২৬০ জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন যারা ইমাম আযম থেকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা করেছিলেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন প্রসিদ্ধ প্রতিটি শহরের নাম উল্লেখ করে তথাকার কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলিমের নাম উল্লেখ করেছেন যারা ইমাম আবূ হানীফা থেকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা করে এ সকল শহর ও নগরে ইলম প্রচারে রত থেকেছেন। তাঁদের অনেকেই এ সকল শহরের বিচারপতি, ইমাম বা প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। এভাবে দেখা যায় যে, তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি শহরেই ইমাম আবূ হানীফার অনেক প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন।[১২]

২. ৪. আখলাক

ইমাম আবূ হানীফার আখলাক ও ইবাদত সে মুবারক যুগের নেককারদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আরবী ভাষায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য প্রতিভা ও প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী ছিলেন। তাঁর বক্তব্য শ্রোতাকে আকর্ষণ করত। যখন কথা বলতেন তখন মনে হতো সকল মানুষের মধ্যে তিনিই সবেচেয়ে ভাল কথা বলতে পারেন এবং তাঁর কথাই সবচেয়ে সুমিষ্ট। সহজেই তিনি নিজের বক্তব্য শ্রোতাকে বুঝাতে পারতেন। তাঁর দেহের রঙ ছিল সুন্দর এবং কিছুটা বাদামী। মুখমণ্ডল ও অবয়ব ছিল সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তিনি সুন্দর ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করতেন এবং সর্বদা সুগন্ধময় থাকতেন। এমনকি তিনি যখন বাড়ি থেকে বেরোতেন তখন তাঁকে দেখার আগেই তাঁর সুগন্ধির মাধ্যমে তার আগমন বুঝা যেত। তাঁর ছাত্র আবূ ইউসুফ তার বর্ণনা দিয়ে বলেন:

كان أبو حنيفة ربعا من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل، وكان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة، وأنبههم على ما يريد

"আবূ হানীফা ছিলেন মাঝারি আকৃতির মানুষ, বেঁটেও নন এবং বেশি লম্বাও নন। মানুষদের মধ্যে কথাবার্তায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর, তাঁর কথার মাধুর্য্য ছিল সবচেয়ে বেশি এবং তিনি তাঁর মনের উদ্দেশ্য সবার চেয়ে ভাল বুঝাতে পারতেন।"[১৩]

তাঁর বিষয়ে উমার ইবনু হাম্মাদ বলেন:

إن أبا حنيفة كان طوالا، تعلوه سمرة، وكان لبسا، حسن الهيئة، كثير التعطر يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج من منزله قبل أن تراه

"আবূ হানীফা কিছুটা লম্বা ছিলেন। তাঁর গায়ের রঙ ছিল কিছুটা বাদামী। তিনি পরিপাটি পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ও অবয়ব ছিল সুন্দর। তিনি আতর ব্যবহার খুবই পছন্দ করতেন। তিনি যখন কোথাও যেতেন বা বাড়ি থেকে বের হতেন তখন তাঁকে দেখার আগেই সুগন্ধি থেকেই তাঁর আগমন বুঝা যেত।"[১৪]

হাইসামী বলেন: লম্বা হওয়া ও মাঝারি হওয়ার মধ্যে মূলত বৈপরীত্য নেই। এ দুটি বর্ণনার সমন্বয় হলো যে, তিনি বেশি লম্বা ছিলেন না, কাজেই তাকে মাঝারিই বলতে হবে। তবে মাঝারিদের মধ্যে তিনি লম্বা বলে বিবেচিত ছিলেন।[১৫]

তাঁর অন্য ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন:

كان حسن السمت، حسن الوجه، حسن الثوب

"তাঁর বাহ্যিক প্রকাশ ও অবয়ব ছিল সুন্দর, মুখমণ্ডল ছিল সুন্দর এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সুন্দর।"[১৬]

তাঁর অন্য ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ নুআইম ফাদল ইবনু দুকাইন বলেন:

كان أبو حنيفة حسن الوجه، والثوب، والنعل، وكثير البر والمؤاساة لكل من أطاف به

"আবূ হানীফার মুখণ্ডল, পোশাক, জুতা সবই ছিল সুন্দর। তাঁর আশেপাশে যারা থাকতেন তাদের প্রত্যেকের উপকার, কল্যাণ ও সহমর্মিতায় তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।"[১৭]

ইমাম আবূ হানীফা বড় ব্যবসায়ী ও ধনী ছিলেন। আর তাঁর ধনসম্পদ মানুষের জন্য, বিশেষত আলিমদের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদারহস্ত। তিনি নিজের পরিবারের জন্য যেভাবে খরচ করতেন সেভাবেই খরচ করতেন আলিম, তালিবুল ইলম ও ছাত্রদের জন্য।। নিজের জন্য কাপড় কিনলে তাদের জন্যও কিনতেন। ফলমূল বা খাদ্যাদি ক্রয় করলে তিনি আলিম ও ছাত্রদের জন্য আগে ক্রয় করে তারপর নিজের পরিবারের জন্য ক্রয় করতেন। আর হাদীয়া, দান, অনুদান ও পরোপকারের জন্য যখন কিছু ক্রয় করতেন তখন তাঁর সর্বোচ্চ সাধ্যানুসারে তা ক্রয় করতেন। নিজের বা পরিবারের জন্য কিছু নিম্নমানের দ্রব্য ক্রয় করলেও অন্যদের জন্য তা করতেন না। আর ছাত্রদের তিনি নিজেই ভরণপোষণ করতেন। এমনকি অনেক দরিদ্র ছাত্র তার সাহচার্যে এসে সচ্ছল হয়ে যায়। তাঁর প্রিয় ছাত্র আবূ ইউসুফ ও তার পরিবারকে তিনি দশ বৎসর প্রতিপালন করেন।[১৮]

তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও বুজুর্গ ফুদাইল ইবনু ইয়াদ (১৮৭ হি) বলেন:

كان أبو حنيفة معروفا بكثرة الأفعال، وقلة الكلام وإكرام العلم وأهله

"আবূ হানীফা অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি কাজ বেশি করতেন এবং কথা কম বলতেন। তিনি ইলম এবং আলিমগণকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।"[১৯]

তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ ইবাদত, তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল্লাইল।[২০] পাশাপাশি তিনি ছিলেন হক্কের বিষয়ে আপোষহীন। ইমাম আবূ হানীফার প্রকৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন ইমাম আবূ ইউসূফ। খলীফা হারূন রাশীদ (খিলাফাত ১৭০-১৯৩ হি) বিচারপতি আবূ ইউসুফকে বলেন: আবূ হানীফার আখলাক ও প্রকৃতির একটি বিবরণ আমাকে বলনু তো। তখন ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন:

أنه كان شديد الذب عن محارم الله أن تؤتى، شديد الورع أن ينطق في دين الله بما لا يعلم، يحب أن يطاع الله ولا يعصى، مجانبا لأهل الدنيا في زمانهم، لا ينافس في عزها، طويل الصمت، دائم الفكر، على علم واسع، لم يكن مهذارا، ولا ثرثارا، إن سئل عن

مسألة كان عنده فيها علم، نطق وأجاب فيها بما سمع، وإن كان غير ذلك قاس على الحق واتبعه، صائنا نفسه ودينه، بذولا للعلم والمال، مستغنيا بنفسه عن جميع الناس، لا يميل إلى طمع، بعيدا عن الغيبة، لا يذكر أحدا إلا بخير

"আল্লাহর দীন বিরোধী সকল কিছুকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও আল্লাহভীরু ছিলেন। দীনের বিষয়ে না জেনে কিছুই বলতেন না। তিনি চাইতেন যে, আল্লাহর আনুগত্য করা হোক এবং তার অবাধ্যতা না হোক। তিনি তাঁর যুগের দুনিয়ামুখি মানুষদেরকে পরিহার করে চলতেন। জাগতিক সম্মান-মর্যাদা নিয়ে তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন না। গভীর জ্ঞানের অধীকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন এবং চিন্তা-গবেষণায় রত থাকতেন। বেশি কথা বলা বা বাজে কথা বলার কোনো স্বভাব তাঁর ছিল না। কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শ্রুতি বা হাদীসের ভিত্তিতে তার জবাব দিতেন। সে বিষয়ে কোনো শ্রুতি না থাকলে সঠিক কিয়াসের মাধ্যমে উত্তর দিতেন ও তা অনুসরণ করতেন। তিনি তাঁর নিজেকে ও তাঁর দীনকে সংরক্ষণ করতেন। তাঁর জ্ঞান ও সম্পদ তিনি অকাতরে খরচ করতেন। তিনি সকল মানুষের থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী রাখতেন। কোনো লোভ তাকে স্পর্শ করতো না। তিনি গীবত বা পরচর্চা থেকে দূরে থাকতেন। কারো কথা উল্লেখ করলে শুধু ভাল কথাই বলতেন।"[২১]

তাঁর আপোষহীনতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন ছিল রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা গ্রহণে অস্বীকৃতি। শত চাপাচাপি ও নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি এ সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। কারণ তিনি কারো মুখ চেয়ে বিচার করতে বা অন্যায় বিচারের দায়ভার নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে রাযি ছিলেন না। রাবী ইবনু আসিম বলেন, উমাইয়া সরকারের গভর্নর ইয়াযিদ ইবনু উমার ইবনু হুবাইরা (১৩২ হি)-এর নির্দেশে আবি আবূ হানীফাকে তার কার্যালয়ে নিয়ে আসি। তিনি তাকে বাইতুল মালের দায়িত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু আবূ হানীফা তা অস্বীকার করেন। একারণে ইবনু হুবাইরা তাকে ২০ টি বেত্রাঘাত করেন। ইবন হুবাইরা তাঁকে বিচারপতি দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন।[২২]

এ ঘটনা ঘটে ১৩০ হিজরী সালের দিকে, যখন তাঁর বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা মানসূর ১৫০ হিজরীতে ইমাম আবূ হানীফাকে বাগদাদে ডেকে বিচারপতির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। তিনি অস্বীকার করলে ক্রুদ্ধ খলীফা তাকে কারারুদ্ধ করেন এবং কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়।[২৩]

ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হৃদয়ের প্রশস্ততা। তিনি বলতেন:

اللهم من ضاق بنا صدره فان قلوبنا قد اتسعت له

"হে আল্লাহ, আমাদের বিষয়ে যার অন্তর সংকীর্ণ হয়েছে, তার বিষয়ে আমাদের অন্তর প্রশস্ত হয়েছে।"[২৪]

আব্দুস সামাদ ইবনু হাস্সান বলেন:

كان بين سفيان الثوري وأبى حنيفة شئ فكان أبو حنيفة أكفهما لسانا

"সুফইয়ান সাওরী ও আবূ হানীফার মধ্যে বিরোধ-সমস্যা ছিল। এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে আবূ হানীফা অধিক বাকসংযমী ছিলেন।"[২৫]

ইয়াযিদ ইবনু হারূন বলেন:

ما رأيت أحداً أحلم من أبي حنيفة... إن إنساناً استطال على أبي حنيفة وقال له: يا زنديق، فقال أبو حنيفة: غفر الله لك هو يعلم مني خلاف ما تقول

"আমি আবূ হানীফার চেয়ে অধিক স্থিরচিত্ত ও প্রশস্তহৃদয় আর কাউকে দেখিনি। .... একবার এক ব্যক্তি তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং তাঁকে বলে: হে যিন্দীক। তিনি উত্তরে বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তিনি জানেন যে তুমি যা বলেছ আমি তা নই।"[২৬]

২. ৫. মৃত্যু

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ১৫০ হিজরী সালের মধ্য শাবানের রজনীতে বাগদাদের কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। বাগদাদের খাইযুরান কবরস্থানে তাঁর দাফন হয়। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৭০ বৎসর।[২৭]

৩. মর্যাদা ও মূল্যায়ন: গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা

কোনো মানুষের ইমাম বা ওলী-বুজুর্গ হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি নির্ভুল বা মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে। মানবীয় দুর্বলতায় কেউ

কোনো ভুল বা অন্যায় কথা বলেছেন প্রমাণিত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি ওলী বা ইমাম নন, অথবা তাঁর সব কথাই ভুল।

ইসলামী বিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে আর কেউই মাসূম অর্থাৎ নিষ্পাপ বা অভ্রান্ত নন। সকল আলিম, ইমাম ও ওলী মানবীয় দুর্বলতার অধীন ছিলেন। ক্রোধান্বিত হয়ে, ভুল বুঝে একে অপরের বিরুদ্ধে বলেছেন, এমনকি যুদ্ধও করেছেন। কখনো ভুল বুঝতে পারলে বা ক্রোধ দূরীভূত হলে ক্ষমা চেয়েছেন বা ভুল স্বীকার করেছেন। কখনো তিনি ভুল বুঝতে পারেন নি। তাঁরা আল্লাহর দীন, ওহীর ইলম ও সুন্নাতের পালন ও প্রচারে নিজেদের জীবন অকাতরে ব্যয় করেছেন, তাঁদের ইজতিহাদ অনুসারে যা সত্য, সঠিক বা হক্ক বলে বুঝতে পেরেছেন তা রক্ষায় কোনো আপোস করেন নি। পাশাপাশি কখনো কখনো তাঁরা ইজতিহাদে ভুল করেছেন।

মুহাদ্দিসগণ এবং জারহ-তাদীলের ইমামগণ অন্যান্য মুহাদ্দিস ও হাদীসের রাবীদের মূল্যায়নে সর্বাত্মক নিরপেক্ষতার সাথে সচেষ্ট থেকেছেন। একজন মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদীসগুলো অন্যান্য মুহাদ্দিসদের বর্ণনার সাথে তুলনা ও নিরপেক্ষ নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের মূল্যায়ন করেছেন। নিজের পিতা, সন্তান বা উস্তাদের বিরুদ্ধেও তাঁরা মত ব্যক্ত করেছেন। আবার কখনো কখনো মানবীয় দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে কারো অল্প ভুলকে বড় করে দেখেছেন বা কারো অনেক ভুলকে হালকা করে দেখেছেন। পূর্ববর্তী কারো সিদ্ধান্ত ভুল বা পক্ষপাতদুষ্ট হলে তা পরবর্তীগণ উল্লেখ করেছেন। হাদীস, ফিকহ, আকীদা কোনো বিষয়েই মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ পূর্ববর্তী আলিমগণকে নিষ্পাপ বা নির্ভুল বলে গণ্য করেন নি এবং অবমূল্যায়নও করেন নি। তাঁদের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন ও শ্রদ্ধা-সহ তাঁদের কোনো সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রতীয়মান হলে তাঁরা তা উল্লেখ করেছেন। আমার লেখা **"হাদীসের নামে জালিয়াতি"** এবং **"বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস"** পাঠ করলে পাঠক মুহাদ্দিসগণের সমালোচনার মূলনীতি জানতে পারবেন।

অনেক প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে বলেছেন। আমরা তাঁদের বক্তব্য সমর্থন বা খণ্ডন করব। সমর্থন অর্থ অন্ধ সমর্থন নয়। আবার খণ্ডনের অর্থ এ নয় যে, আমরা উক্ত আলিমের ইলম, তাকওয়া বা খিদমতের প্রতি কটাক্ষ করছি। কক্ষনো নয়! আমরা উম্মাতের সকল আলিম, ইমাম ও বুজুর্গকে ভালবাসি। আমরা তাঁদেরকে তাঁদের ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, বরং আল্লাহর জন্য ভালবাসি। আমরা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম বুখারী বা অন্য কাউকে হক্ক-বাতিলের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করছি না। বরং সবাইকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁরা ইসলামের জন্য, কুরআন ও হাদীসের ইলমের জন্য তাঁদের জীবনকে কুরবানি করেছেন। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা দীন পেয়েছি। আল্লাহ তাঁদের সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। তবে তাদের কাউকে আমরা নিষ্পাপ বা নির্ভুল মনে করি না। তাঁদের কোনো সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রমাণিত হলে তা উল্লেখ করায় তাঁদের অবমূল্যায়ন হয় না।

৪. দ্বিতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা

হিজরী দ্বিতীয় শতকে মুসলিম বিশ্ব ছিল তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের বরকতময় যুগ। হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য সকল ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ইমামগণের বিচরণে পরিপূর্ণ ছিল মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, দামিশক, বাগদাদ ও সে যুগের অন্যান্য জনপদ। এ সকল প্রসিদ্ধ আলিমগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদা ও প্রসিদ্ধি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যখন আমরা দেখি যে, উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় সরকার তাঁকে বিচারক পদে পেতে উদগ্রীব ছিল। উমাইয়া খিলাফতের শেষ দিকে, যখন ইমাম আবূ হানীফার বয়স ৫০-এর কোঠায় তখনই তাঁর প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে ইরাকের উমাইয়া গভর্নর ইবন হুবাইরা (১৩২ হি) তাঁকে বিচারক পদ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। আব্বাসী খিলাফাত প্রতিষ্ঠার পর খলীফা মানসূর (রাজত্ব ১৩৬-১৫৮ হি) তাঁর খিলাফাতের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ইমাম আবূ হানীফাকে বিচারপতির দায়িত্ব প্রদানের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে বাধ্য করতে চেষ্টা করেন এবং কারারুদ্ধ করেন।

দ্বিতীয় একটি বিষয় লক্ষণীয়। ইমাম আবূ হানীফার পক্ষের ও বিপক্ষের সকল মতের মুহাদ্দিস, ফকীহ ও গবেষক একমত যে, ইমাম আবূ ইউসূফ (১১৩-১৮২ হি) তৎকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম বিশ্বে "কাযিল কুযাত", অর্থাৎ 'প্রধান বিচারপতি' উপাধি লাভ করেন। তিনজন আব্বাসী খলীফা মাহদী, হাদী ও হারূন রশীদের শাসনামলে প্রায় ২৪ বৎসর তিনি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং দায়িত্বরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। এ যুগশ্রেষ্ঠ আলিম নিজেকে আবু হানীফার ছাত্র হিসেবে গৌরবান্বিত মনে করতেন এবং তাঁর মতের পক্ষে ফিকহী ও উসূলী অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এ থেকেও আমরা ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদা খুব সহজেই অনুভব করতে পারি।

তৃতীয় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। ইমাম আবূ হানীফা কূফার মানুষ ছিলেন। খলীফা মানসূরের ডাকে তিনি বাগদাদের গমন করেন। বিচারপতির দায়িত্ব পালনের বিষয়ে খলীফার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে কারাগারে রাখা হয় এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তৎকালীন পরিবেশে কুফা ও বাগদাদ সম্পূর্ণ পৃথক দুটি দেশের মত। এজন্য কুফায় তাঁর জনপ্রিয়তা থাকলেও বাগদাদে নবাগত ও খলীফা কর্তৃক কারারুদ্ধ এরূপ ব্যক্তির জনপ্রিয়তা থাকার কথা নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সালাতুল জানাযায় এত প্রচণ্ড ভীড় হয় যে, ছয় বার তাঁর জানাযা পড়া হয়। দাফনের পর খলীফা মনসূর নিজে কবরের পাশে জানাযা পড়েন। এরপর প্রায় ২০ দিন মানুষেরা কবরের পাশে সালাতুল জানাযা আদায় করে।[২৮]

ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর নিজ দেশ ছাড়িয়ে কিভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল তা আমরা এ ঘটনা থেকে অনুভব করতে পারছি। এরপরও আমরা তাঁর সম্পর্কে দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ কতিপয়

আলিমের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

(১) মুগীরাহ ইবন মিকসাম দাব্বী কূফী (১৩৬ হি)

ইমাম আবূ হানীফার শিক্ষক পর্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ মুগীরাহ ইবন মিকসাম। তিনি কুফার বাসিন্দা ছিলেন। বুখারী ও মুসলিমসহ সকল মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁর ছাত্র প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বিচারপতি জারীর ইবন আব্দুল হামীদ দাব্বী (১৮৮ হি)। বুখারী, মুসলিম ও সকল মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। সাইমারী, যাহাবী, ইবন হাজার ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁদের সনদে তাঁর থেকে উদ্ধৃত করেছেন:

قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تفقه فإن إبراهيم النخعي لو كان حياً لجالسه. ... والله يحسن أن يتكلم في الحلال والحرام

"আমাকে মুগীরাহ বলেন: তুমি আবূ হানীফার মাজলিসে বসবে, তাহলে ফিকহ শিখতে পারবে। কারণ (কুফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ, মুগীরার উস্তাদ) ইবরাহীম নাখয়ী (৯৫ হি) যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও আবূ হানীফার মাজলিসে বসতেন। ... আল্লাহর কসম! হালাল ও হারামের বিষয়ে সে ভালভাবে কথা বলার যোগ্যতা রাখে।"[২৯]

(২) সুলাইমান ইবন মিহরান আল-আ'মাশ (১৪৮ হি)

কূফার সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তাবিয়ী সুলাইমান ইবন মিহরান আল-আ'মাশ (১৪৮ হি)। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি অনেক সময় ইমাম আবূ হানীফাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি এ মাসআলাটি কোন দলিলের ভিত্তিতে বলেছ? আবূ হানীফা উত্তর করতেন, আপনার বর্ণিত অমুক হাদীসটির ভিত্তিতে। তখন তিনি অবাক হয়ে বলতেন,

يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة

"হে ফকীহগণ! তোমরা ডাক্তার আর আমরা ফার্মাসিস্ট!"[৩০]

আ'মাশ যখন হজ্জে যান তখন তিনি তাঁর ছাত্র আলী ইবন মুসহিরকে বলেন, আবূ হানীফার কাছ থেকে আমাদের জন্য হজ্জের নিয়মকানুন লিখে আন। তাঁকে ফিকহী মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন:

إنما يحسن الجواب فى هذا ومثله النعمان بن ثابت الخزاز وأراه بورك له فى علمه

"এগুলোর উত্তর তো কেবল কাপড় ব্যবসায়ী নুমান ইবন সাবিতই বলতে পারে। আমার ধারণা তার ইলমে বরকত প্রদান করা হয়েছে।"[৩১]

(৩) মিসআর ইবন কিদাম ইবন যাহীর কূফী (১৫৫ হি)

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক কুফার সুপ্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ইমাম মিসআর ইবন কিদাম। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল ইমাম তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে বলেন:

ما أحسد أحدا بالكوفة إلا رجلين أبو حنيفة في فقهه والحسن بن صالح في زهده ... من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه

"কূফার দু ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আমি ঈর্ষার যোগ্য বলে মনে করি না: আবূ হানীফাকে তাঁর ফিকহের জন্য এবং হাসান ইবন সালিহকে তাঁর যুহদের জন্য। ... যদি কোনো ব্যক্তি তার ও আল্লাহর মাঝে আবূ হানীফাকে রাখে- অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের জন্য আবূ হানীফার ফিকহী মতের উপর নির্ভর করে- তাহলে আমি আশা করি যে, তাকে ভয় পেতে হবে না এবং সে আত্মরক্ষার সাবধানতায় অবহেলাকারী বলে গণ্য হবে না।"[৩২]

(৪) শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০ হি)

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস নামে প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় হিজরী শতকের জারহ-তা'দীলের শ্রেষ্ঠতম ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ। তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রশংসায় তিনি কবিতা পাঠ করতেন:

إذا ما الناس يوما قايسونا   بآبدة من الفتوى طريفة

اتيناهم بمقياس صليب   مصيب من طراز أبى حنيفة

"মানুষেরা যখন আমাদেরকে কোনো কঠিন কিয়াসের ফাতওয়া দিয়ে আটকায় আমরা তখন তাদেরকে আবূ হানীফার পদ্ধতির সুদৃঢ় বিশুদ্ধ কিয়াসের শর দিয়ে আঘাত করি।"[৩৩]

ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে শুবা বলেন:

كان والله حسن الفهم جيد الحفظ

“আল্লাহর কসম! তাঁর অনুধাবন সুন্দর এবং তাঁর মুখস্থ শক্তি ভাল ছিল।”[৩৪]

আবূ হানীফার নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে শুবা ইবনুল হাজ্জাজের মতামত ব্যাখ্যা করে ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন (২৩৩ হি) বলেন:

هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث، وشعبة شعبة".

“এই তো শুবা ইবনুল হাজ্জাজ তিনি হাদীস বর্ণনার অনুরোধ করে আবূ হানীফাকে পত্র লিখেছেন। আর শু’বা তো শু’বাই।”[৩৫]

ইমাম আবূ হানীফার ওফাতের খবর পেয়ে শুবা বলেন:

لقد ذهب معه فقه الكوفة تفضل الله علينا وعليه برحمته

“তাঁর সাথে কূফার ফিকহও চলে গেল, আল্লাহ আমাদেরকে ও তাঁকে রহমত করুন।”[৩৬]

(৫) ইসরাঈল ইবন ইউনূস ইবন আবী ইসহাক সাবীয়ী (১৬০ হি)

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক কূফার অন্য একজন প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও সমালোচক ইসরাঈল ইবন ইউনূস। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

كان نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحصه عنه وأعلمه بما فيه من الفقه وكان قد ضبط عن حماد فأحسن الضبط عنه فأكرمه الخلفاء والأمراء والوزراء

“নুমান খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। যে সকল হাদীসের মধ্যে ফিকহ রয়েছে সেগুলি তিনি খুব ভালভাবে ও পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ রাখতেন, সেগুলির বিষয়ে সর্বোচ্চ অনুসন্ধান করতেন এবং সেগুলির মধ্যে বিদ্যমান ফিকহী নির্দেশনাও তিনি সবেচেয়ে ভাল জানতেন। এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতি, অনুসন্ধান ও জ্ঞান ছিল অবাক করার মত। তিনি হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান থেকে ফিকহ সংরক্ষণ করেন এবং খুব ভালভাবেই সংরক্ষণ করেন। ফলে খলীফাগণ, আমীরগণ ও উযীরগণ তাঁকে সম্মান করেছেন।”[৩৭]

(৬) হাসান ইবন সালিহ (১০০-১৬৯ হি)

কূফার অন্য প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী হাসান ইবন সালিহ (১০০-১৬৯ হি)। বুখারী (আদাব গ্রন্থে), মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁর ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবন আদম (২০৩ হি) বলেন, হাসান ইবন সালিহ বলেন:

كان النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتا فى علمه اذا صح عنده الخبر عن رسول الله ﷺ لم يعده إلى غيره

“নুমান ইবন সাবিত বিজ্ঞ আলিম ছিলেন, ইলমের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে সচেতন ছিলেন। কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হলে তিনি তা পরিত্যাগ করে অন্য দিকে যেতেন না।”[৩৮]

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১১৮-১৮১ হি)

দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজাহিদ, যাহিদ ও ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক খুরাসানী (১১৮- ১৮১ হি)। তিনি ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ছিলেন, তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ফিকহী বিষয়ে তাঁর মত অনুসরণ করতেন। ইসমাঈল ইবন দাউদ বলেন:

كان ابن المبارك يذكر عن أبى حنيفة كل خير ويزكيه... ويثنى عليه

ইবনুল মুবারাক আবূ হানীফা সম্পর্কে সবসময়ই ভাল বলতেন, তাঁর বিশ্বস্ততা ও বুজুর্গির কথা বলতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন।”[৩৯]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলতেন:

لا نكذب الله في أنفسنا إمامنا في الفقه أبو حنيفة وفي الحديث سفيان فإذا اتفقا لا أبالي بمن خالفهما. ... لولا أن أغاثني الله بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. ... أبو حنيفة أفقه الناس.

“আমাদের নিজেদের বিষয়ে আল্লাহকে মিথ্যা বলব না! ফিকহের বিষয়ে আমাদের ইমাম আবূ হানীফা এবং হাদীসের বিষয়ে আমাদের ইমাম সুফইয়ান সাওরী। আর যখন দুজন কোনো বিষয়ে একমত হন তখন আমরা তাঁদের বিপরীতে আর কাউকে পরোয়া করি না।”... “আল্লাহ যদি আমাকে আবূ হানীফা এবং সুফইয়ান সাওরী দ্বারা উদ্ধার না করতেন তাহলে আমি সাধারণ মানুষই

থাকতাম।" "আবূ হানীফা মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ।"[৪০]

ইমাম সুফইয়ান (ইবন সাঈদ ইবন মাসরূক) সাওরী (৯৭-১৬১ হি) ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক কূফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ। দুজনের মধ্যে আকীদা ও ফিকহী অনেক বিষয়ে মতভেদ ছিল এবং অনেক ভুল বুঝাবুঝিও ছিল। ইবনুল মুবারক দুজনেরই ছাত্র এবং দুজনের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট তিনি এভাবে তুলে ধরেছেন।

(৮) কাযী আবূ ইউসূফ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (১১৩-১৮২ হি)

আমরা বলেছি যে, আবূ ইউসূফ তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ও ফকীহ ছিলেন বলে সকলেই স্বীকার করেছেন। হাদীস বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা বর্ণনা করে তিনি বলেন:

ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة ... ما خالفت أبا حنيفة في شيء قط فتدبرته إلا رأيت مذهبه الذي ذهب إليه أنجى في الآخرة وكنت ربما ملت إلى الحديث وكان هو أبصر بالحديث الصحيح مني ... إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي ولقد سمعت أبا حنيفة يقول إني لأدعو لحماد مع أبوي.

"হাদীসের ব্যাখ্যায় এবং হাদীসের মধ্যে ফিকহের যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা অনুধাবন করায় আবূ হানীফার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও পারদর্শী আমি কাউকে দেখি নি। .... যে বিষয়েই আমি আবূ হানীফার সাথে বিরোধিতা করেছি সে বিষয়েই আমি পরে চিন্তা করে দেখেছি যে, আবূ হানীফার মতই আখিরাতে নাজাতের অধিক উপযোগী। অনেক সময় আমি হাদীসের দিকে ঝুঁকে পড়েছি, কিন্তু তিনি সহীহ হাদীসের বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক সমঝদার ছিলেন। .... আমি আমার পিতামাতার জন্য দুআ করার আগে আবূ হানীফার জন্য দুআ করি। আর আমি শুনেছি, আবূ হানীফা বলতেন, আমি আমার পিতামাতার সাথে হাম্মাদের জন্য দুআ করি।"[৪১]

(৯) ফুদাইল ইবন ইয়াদ (১৮৭ হি)

তৎকালীন সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, সমালোচক ও বুজুর্গ ইমাম ফুদাইল ইবন ইয়াদ খুরাসানী মাক্কী (১৮৭হি)। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস তাঁর গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন:

كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع المال معروفا بالأفضال على كل من يطيف به صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار حسن الليل كثير الصمت قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال أو حرام فكان يحسن ان يدل على الحق هاربا من مال السلطان ... وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح أتبعه وإن كان عن الصحابة والتابعين وإلا قاس وأحسن القياس.

"আবূ হানীফা সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। তাঁর তাকওয়া ছিল অতি প্রসিদ্ধ। তিনি সম্পদশালী ছিলেন এবং বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাতদিন সার্বক্ষণিক ইলম শিক্ষা দানে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। রাতের ইবাদতে মাশগুল থাকতেন। অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন এবং কম কথা বলতেন। তবে যখন হালাল-হারামের কোনো মাসআলা তাঁর কাছে আসত তখন তিনি কথা বলতেন এবং খুব ভালভাবেই হক্ক প্রমাণ করতে পারতেন। তিনি শাসকদের সম্পদ থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। ... যখন তাঁর কাছে কোনো মাসআলা আসত তখন তিনি সে বিষয়ে সহীহ হাদীস থাকলে তা অনুসরণ করতেন, অথবা সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত। তা না হলে তিনি কিয়াস করতেন এবং তিনি সুন্দর কিয়াস করতেন।"[৪২]

(১০) হাফস ইবন গিয়াস (১৯৫হি)

কূফার অন্য একজন প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাফস ইবন গিয়াস নাখয়ী কূফী (১৯৫হি) তিনি প্রথমে কূফা ও পরে বাগদাদের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل.

"ফিকহের বিষয়ে আবূ হানীফার বক্তব্য চুলের চেয়েও সুক্ষ্ম। জাহিল-মুর্খ ছাড়া কেউ তাঁকে খারাপ বলে না।"[৪৩]

(১১) আবূ মুআবিয়া দারীর মুহাম্মাদ ইবন খাযিম (১১৩-১৯৫ হি)

কূফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবন খাযিম আবূ মুআবিয়া দারীর। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

حب أبي حنيفة من السنة

"সুন্নাতপন্থী হওয়ার একটি বিষয় আবূ হানীফাকে ভালবাসা।"[৪৪]

(১২) ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৭ হি)

শুবা ইবনুল হাজ্জাজের পরে দ্বিতীয় শতকের ইলম হাদীস ও জারহ-তাদীলের অন্যতম দুই দিকপাল: ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ আল-কাত্তান ও ইবন মাহদী। উভয়েই বসরার অধিবাসী ছিলেন। কাত্তান বলেন:

لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأى أبى حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. قال يحيى بن معين: وكان يحيى بن سعيد يذهب في الفتوى إلى مذهب (قول) الكوفيين ويختار قوله من أقوالهم ويتبع رأيه من بين أصحابه.

"আল্লাহকে মিথ্যা বলব না! আবূ হানীফার মতের চেয়ে উত্তম মত আমি শুনি নি। অধিকাংশ বিষয়ে আমরা তাঁর মত অনুসরণ করি। (তাঁর ছাত্র) ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন: ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ ফাতওয়ার বিষয়ে কূফীদের মাযহাব অনুসরণ করতেন, কূফীদের মধ্য থেকে আবূ হানীফার বক্তব্য পছন্দ করতেন এবং তাঁর মত অনুসরণ করতেন।"[৪৫]

(১৩) ওকী ইবনুল জার্রাহ ইবন মালীহ (১৯৭ হি)

কূফার সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ওকী ইবনুল জার্রাহ। ইমাম আহমদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস বলে গণ্য করেছেন। তাঁর ছাত্র ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন:

ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع، وكان يفتي برأي أبي حنيفة، وكان يحفظ حديثه كله، وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا.

আমি ওকী-এর উপরে স্থান দেওয়ার মত কোনো মুহাদ্দিস দেখি নি। তিনি আবূ হানীফার মত অনুসারে ফাতওয়া দিতেন। তিনি তাঁর সব হাদীস মুখস্থ রাখতেন। তিনি আবূ হানীফা থেকে অনেক হাদীস শুনেন।[৪৬]

এ থেকে জানা যায় যে, ইমাম ওকী শুধু ইমাম আবূ হানীফার ফিকহী মতই অনুসরণ করতেন না, উপরন্তু তিনি তাঁকে হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করতেন এবং তাঁর সকল হাদীস মুখস্থ রাখতেন।

(১৪) আব্দুর রাহমান ইবন মাহদী (১৩৫-১৯৮ হি)

এ সময়ের ইলম হাদীস ও জারহ-তাদীলের অন্য দিকপাল ইবন মাহদী। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের পুত্র আব্দুল্লাহ লিখেছেন, আমি আমার পিতার মুখে শুনেছি, তাঁর উস্তাদ ইবন মাহদী বলতেন:

من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة

"একজন মানুষের ইলমের সৌন্দর্য এই যে, সে আবূ হানীফার 'রায়' বা মাযহাব অধ্যয়ন করবে।"[৪৭]

৫. এ সময়ের দুটি অভিযোগ

এ যুগের আরো অনেক ফকীহ, মুহাদ্দিস ও বুজুর্গ থেকে ইমাম আবূ হানীফার প্রশংসা বর্ণিত। আমরা এখানে শুধু প্রসিদ্ধ ফকীহ, মুহাদ্দিস ও জারহ-তাদীলের ইমামগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করলাম। এ থেকে আমরা দেখলাম যে, তাঁর সমসাময়িক, তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন বা জেনেছেন এমন সকল ফকীহ, মুহাদ্দিস, আবিদ ও আলিম তাঁর যোগ্যতা ও মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর ফিকহী মতের অসাধারণত্বের পাশাপাশি হাদীসের বর্ণনায় তাঁর নির্ভরযোগ্যতা ও ফিকহী হাদীসসমূহে তাঁর পাণ্ডিত্য ও হাদীসের ফিকহী নির্দেশনা অনুধাবনে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার সাক্ষ্য তাঁরা দিয়েছেন।

এ সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কেউ দুটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন: (১) ফিকহী বিষয়ে গভীর মনোযোগের কারণে তিনি কম হাদীস বর্ণনা করেন এবং (২) কিছু ফিকহী বিষয়ে তৎকালীন কতিপয় ফকীহের সাথে তাঁর মতভেদ ছিল।

৫. ১. হাদীসের ময়দানে তাঁর পদচারণা কম

উম্মাতের ফকীহগণ হাদীস বর্ণনার চেয়ে হাদীসের আলোকে ফিকহী মাসআলা নির্ধারণের জন্য সদা চিন্তিত ও ব্যস্ত থাকতেন। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের সনদ ও মতনের শব্দ, বাক্য, বর্ণনার পার্থক্য, এগুলির হুবহু বর্ণনা ইত্যাদি নিয়ে সদা চিন্তি ত ও ব্যস্ত থাকতেন। এজন্য ফকীহগণ হাদীস বর্ণনা করতেন কম। মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো এ বিষয়ে ফকীহগণকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করতেন। ইমাম আবূ হানীফা প্রসঙ্গে ইবনুল মুবারাকের নিম্নের কথাটিও এ জাতীয়:

كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث

"আবূ হানীফা হাদীসের বিষয়ে মিসকীন ছিলেন।"[৪৮]

ইবনুল মুবারাকের এ কথাটিকে অনেকেই হাদীস বর্ণনায় আবূ হানীফার দুর্বলতা বা অগ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য মোটেও তা নয়। সুফইয়ান ইবন উয়াইনা (১৯৮ হি) বলেন:

كنا إذا رأينا طالبا للحديث يغشى ثلاثة ضحكنا منه ربيعة ومحمد بن أبي بكر بن حزم وجعفر بن محمد، لانهم كانوا لا يتقنون الحديث ولا يحفظونه.

"আমরা যখন কোনো হাদীসের ছাত্রকে তিন ব্যক্তির কারো কাছে যেতে দেখতাম তখন আমরা হাসতাম: রাবীয়াহ, মুহাম্মাদ

ইবন আবী বাকর ইবন হাযম, জাফর ইবন মুহাম্মাদ; কারণ তারা কেউই হাদীস ভাল পারতেন না এবং মুখস্থও রাখতেন না।"[৪৯]

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক এ তিন ফকীহের পরিচয় দেখুন:

(১) মদীনার সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম রাবীয়াহ ইবন আবী আব্দুর রাহমান ফাররূখ (১৪২ হি)। তিনি "রাবীয়াহ আর-রাই" অর্থাৎ কিয়াসপন্থী রাবীয়াহ বলে প্রসিদ্ধ। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

(২) মদীনার সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ও মদীনার কাযী মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযম (৬০-১৩২ হি)। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন।

(৩) ইমাম জাফর সাদিক ইবন মুহাম্মাদ বাকির (৮০-১৪৮)। নবী-বংশের অন্যতম ইমাম ও মদীনার সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ তিনজনকেই মুহাদ্দিসগণ নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। ইবনুল মুবারাক তো ইমাম আবূ হানীফাকে মিসকীন বলেছেন, সুস্পষ্টভাবে দুর্বল বলেন নি। পক্ষান্তরে সুফইয়ান ইবন উয়াইনা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে, 'এরা তিনজন হাদীস ভাল পারতেন না এবং মুখস্থ রাখতে পারতেন না।' কিন্তু তা সত্ত্বেও মুহাদ্দিসগণ তাঁর কথাকে এঁদের দুর্বলতা বা অগ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলেন না কেন?

কারণ এ কথার অর্থ হলো, এ তিনজন মূলত ফিকহ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মুহাদ্দিসদের তুলনায় তাঁরা কম হাদীস জানতেন। ফিকহী হাদীসগুলি নিয়েই তাঁরা বেশি সময় কাটাতেন। এছাড়া ফিকহী ব্যস্ততার কারণে হাদীসের সনদ ও মতন রাতদিন চর্চা করার সময় তাঁদের হতো না। ফলে মুহাদ্দিসদের তুলনায় তাঁরা এক্ষেত্রে কিছু বেশি ভুল করতেন।

ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের কথার অর্থ হুবহু এক। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ইবনুল মুবারাক বারবার বলেছেন যে, ফিকহে তাঁর ইমাম আবূ হানীফা এবং হাদীসে তাঁর ইমাম সুফইয়ান সাওরী। আর এ অর্থেই তিনি বলেছেন যে, মুহাদ্দিসগণের তুলনায় তিনি হাদীস কম জানতেন বা কম বলতেন। কাজেই ইবনুল মুবারাকের এ বক্তব্যকে যারা ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতার সাক্ষ্য বলে গণ্য করেছেন তারা বিষয়টি ভুল বুঝেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ আমাদেরকে ও উম্মাতের সকল আলিমকে ক্ষমা করুন।

৫. ২. ফিকহ ও আকীদা বিষয়ে তাঁর মতের বিরোধিতা

সে যুগের অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহের সাথে ইমাম আবূ হানীফার ফিকহী মতপার্থক্য ছিল। পাশাপাশি আকীদার খুটিনাটি কয়েকটি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ ছিল। এগুলির অন্যতম ঈমানের সংজ্ঞা। অধিকাংশ মুহাদ্দিস আমলকে ঈমানের অংশ গণ্য করতেন। পক্ষান্তরে কিছু মুহাদ্দিস ও ফকীহ আমলকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক গণ্য করতেন। ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন এদের মধ্যে। অনেক মুহাদ্দিস ও ফকীহ এজন্য তাঁকে 'মুরজিয়া' বলে কটাক্ষ করেছেন।

সমসাময়িক যারা এভাবে তাঁর প্রতি কটাক্ষ করেছেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন (১) কুফার তাবিয়ী মুহাদ্দিস শরীক ইবন আব্দুল্লাহ (১৪০ হি), (২) কুফার তাবি-তাবিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম সুফইয়ান সাওরী (৯৭-১৬১ হি), এবং (৩) সিরিয়ার প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আওযায়ী (১৫৭ হি)। তাঁরা এবং আরো কতিপয় সমসাময়িক ফকীহ ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন যা ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ। এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে ২য় শতকের এ সকল মুহাদ্দিস বা ফকীহের খুব কম বক্তব্যই সহীহ বা নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। সমসাময়িক আলিমদের এরূপ মতবিরোধ বা শত্রুতা খুবই স্বাভাবিক। প্রসিদ্ধ চার ইমাম এবং সকল প্রসিদ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহের বিষয়েই এরূপ কঠিন বিরূপ মন্তব্য করেছেন তৎকালীন কোনো কোনো প্রসিদ্ধ আলিম।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক ও নিকটবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ ফকীহ, মুহাদ্দিস, আবিদ, ও জারহ-তাদীলের সমালোচক ইমামগণ তাঁকে ফিকহের ইমাম, শ্রেষ্ঠতম ফকীহ এবং হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর ফিকহী মত সহীহ হাদীস নির্ভর বলেও তাঁরা বারবার মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি কয়েকজন আলিম তাঁকে মুরজিয়া বলেছেন বা তাঁর ফিকহী মতের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।

এ জাতীয় বিরূপ মন্তব্য সম্ভবত খুবই কম ছিল অথবা তৎকালীন মুসলিমদের মধ্যে তা কোনোরূপ গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। কারণ, বাস্তবে আমরা দেখি যে, ইমাম আবূ হানীফার ফিকহী মত হাদীস ও ফিকহের সে স্বর্ণযুগে দ্রুত প্রসার লাভ করে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ দিক থেকেই হানাফী ফিকহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ফিকহী মতে পরিণত হয়। এ বিষয়ে কূফার সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ সুফইয়ান ইবন উয়াইনা (১০৭-১৯৮ হি) বলেন:

شيئان ما ظننتهما يجاوزان قنطرة الكوفة: قراءة حمزة، وفقه أبي حنيفة، وقد بلغا الآفاق

"দুটি বিষয়ে আমি কল্পনা করি নি যে, তারা কুফার সেতু পার হবে; হামযার কিরাআত ও আবূ হানীফার ফিকহ; অথচ ইতোমধ্যেই এ দুটি বিষয় সকল দিগন্তে পৌঁছে গিয়েছে।"[৫০]

৬. তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশের সমালোচকদের মূল্যায়ন

এ ছিল হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে আলিমগণের অভিমত ও তাঁর ফিকহী মতের প্রসারতা। কিন্তু হিজরী তৃতীয় শতক থেকে চিত্র পরিবর্তন হতে লাগল। এ সময় থেকে অনেক আলিম ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠিন অভিযোগ করেছেন। এ অভিযোগের ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী চলতে থাকে। বস্তুত মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা যত আক্রমণ ও চরিত্র হননের শিকার হয়েছেন তেমন বোধ হয় অন্য কেউ হন নি। এ বিষয়ে তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন (২৩৩ হি) বলেন:

أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه.

আমাদের সাথীরা, অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদের বিষয়ে সীমালজ্ঘন করেন।"[৫১]

কেন এ সীমালজ্ঘন তা পর্যালোচনার আগে ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে তৃতীয় শতকের প্রথমাংশের বা প্রথম দশকের কয়েকজন মুহাদ্দিস, ফকীহ ও সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন আলোচনা করব।

(১) ইমাম শাফিয়ী মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস (১৫০-২০৪ হি)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস শাফিয়ী ইমাম আবূ হানীফার পরের শ্রেষ্ঠতম ফকীহ। দ্বিতীয় হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিভিন্ন উসূলী ও ফিকহী বিষয়ে তিনি ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের মতামত প্রত্যাখ্যান করেন। ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব বিষয়ে তিনি বলেন:

الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.

"ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষেরা আবূ হানীফার উপর নির্ভরশীল।"[৫২]

(২) ইয়াযিদ ইবন হারূন (১১৭-২০৬ হি)

এ সময়ের প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও আবিদ ইয়াযিদ ইবন হারূন ওয়াসিতী। ইমাম আহমদ তাঁকে হাফিযুল হাদীস বলতেন। ইবনুল মাদীনী বলেন, তাঁর চেয়ে বড় হাফিযুল হাদীস আমি দেখি নি। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

كان أبو حنيفة تقيا نقيا زاهدا عالما صدوق اللسان أحفظ أهل زمانه سمعت كل من أدركته من أهل زمانه يقول إنه ما رأى أفقه منه

"আবূ হানীফা আল্লাহ-ভীরু, পবিত্র ও সংসারবিরাগী আলিম ছিলেন। তিনি সত্যপরায়ণ এবং তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। তাঁর যুগের যত মানুষকে আমি পেয়েছি সকলকেই বলতে শুনেছি: তিনি ফিকহের বিষয়ে আবূ হানীফার চেয়ে অধিক পারদর্শী আর কাউকে দেখেন নি।"[৫৩]

(৩) আব্দুল্লাহ ইবন দাউদ আল-খুরাইবী (১২৬-২১৩ হি)

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও আবিদ আবূ আব্দুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবন দাউদ ইবন আমির কূফী। ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

من أراد ان يخرج من ذل العمى والجهل ويجد لذة الفقه فلينظر في كتب أبي حنيفة. ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم لابي حنيفة، لحفظه الفقه والسنن عليهم.

"যদি কেউ অন্ধত্ব ও মুর্খতার লাঞ্ছনা থেকে বের হতে চায় এবং ফিকহের স্বাদ লাভ করতে চায় তবে তাকে আবূ হানীফার বইগুলো পড়তে হবে। হিংসুক অথবা জাহিল এ দুয়ের একজন ছাড়া কেউ আবূ হানীফার বিষয়ে মন্দ বলে না। মানুষদের উচিত তাদের সালাতের মধ্যে আবূ হানীফার জন্য দুআ করা; কারণ তিনিই মানুষদের জন্য ফিকহ এবং সুন্নাহ (হাদীস) সংরক্ষণ করেছেন।"[৫৪]

৭. ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষাপট

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, তৃতীয় শতকে ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে প্রচারণা ব্যাপকতা লাভ করে। বিশেষত মুতাযিলী শাসনের অবসানের পরে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়। বাহ্যত এর কারণগুলি নিম্নরূপ:

৭. ১. প্রসারতা ও ক্ষমতার ঈর্ষা

আমরা আগেই বলেছি যে, তাবিয়ী যুগের অন্য কোনো ফকীহ ইমাম আবূ হানীফার মত প্রসিদ্ধি ও মর্যাদা লাভ করেন নি। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর মত প্রসিদ্ধি লাভ করে। আব্বাসী খলীফা মাহদীর যুগ (১৫৮-১৬৯হি) থেকে হানাফী ফিকহ রাষ্ট্রীয় ফিকহে

পরিণত হয়। এ ফিকহে পারদর্শীগণই বিভিন্ন বিচারিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। পরবর্তী শতাব্দীর পর শতাব্দী এ নেতৃত্বের ও কর্তৃত্বের ধারা অব্যাহত থাকে। হানাফী বিরোধীদের ক্ষোভ এতে বাড়তে থাকে এবং তাঁদের বৈরী প্রচারণাও ব্যাপক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রচারণা হানাফী ফিকহের বিরুদ্ধে না হয়ে ব্যক্তি আবূ হানীফার চরিত্র হননের দিকে ধাবিত হয়।

৭. ২. মুতাযিলী ফিতনা ও সম্পৃক্তি

২০০ হিজরীর দিকে আব্বাসী খলীফা মামুন (রাজত্ব ১৯৮-২১৮ হি) মুতাযিলী ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ (২১৮-২২৭ হি) ও ওয়াসিক বিল্লাহ (২২৮-২৩২ হি) এ মতবাদ অনুসরণ করেন। গ্রীক দর্শন নির্ভর এ মতবাদে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন বিশ্বাস বিদ্যমান। এ সকল বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে "কুরআন সৃষ্ট বা মাখলূক"। এ ছাড়া মুতাযিলীগণ আল্লাহর "বিশেষণগুলো" ব্যাখ্যা করে অস্বীকার করেন। এ মত প্রতিষ্ঠায় এ তিন খলীফা ছিলেন অনমনীয়। এ মত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী আলিমদেরকে গ্রেফতার করে তাঁরা অবর্ণনীয় অত্যাচার করতে থাকেন। পরবর্তী শাসক মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হি) এ অত্যাচারের অবসান ঘটান। সকলেই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও পালনের সুযোগ পান।

প্রায় ত্রিশ বৎসরের মুতাযিলী শাসনের সময়ে স্বভাবতই প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় হানাফী ফকীহগণ ছিলেন। তাঁদের অনেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মুতাযিলীদের সাথে সহযোগিতা করেছেন বা তাদের মত গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন। বিশেষত খলীফা মামুনের মুতাযিলী ফিতনার মূল স্তম্ভ বিশর আল-মারীসী: বিশর ইবন গিয়াস ইবন আবী কারীমা আব্দুর রাহমান (২১৮ হি) এবং বিচারপতি আহমদ ইবন আবী দুওয়াদ (আবী দাউদ) ইবন জারীর (১৬০-২৪০ হি) উভয়েই ফিকহী মতে ইমাম আবূ হানীফার অনুসারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুতাযিলী মতের প্রচার-প্রসার, দেশের সকল আলিমকে খলীফার দরবারে ডেকে মুতাযিলী মত গ্রহণে বাধ্য করা এবং ইমাম আহমদ ও মুতাযিলা মতবিরোধী অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইমামগণের উপর নির্মম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা ছিলেন তাঁরা।[৫৫]

মুতাযিলী অত্যাচারের অবসানের পরেও হানাফী ফকীহগণ বিচারিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এছাড়া মুতাযিলীগণ 'হানাফী' নামের ছত্রছায়ায় তাদের মত প্রচার করতে থাকেন। অপরদিকে হানাফী বিরোধীগণ আহলুস সুন্নাতের নামে, বিদআত বিরোধিতা বা মুতাযিলী বিরোধিতার নামে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকেন। অনেকে এ বিষয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নিতে থাকেন। অনেক সরলপ্রাণ প্রাজ্ঞ আলিমও এরূপ অপপ্রচারে প্রভাবিত হন।

৭. ৩. বিচার ও শাসন বনাম ইলম ও কলম

আমরা দেখেছি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষ দিক থেকেই হানাফী ফিকহ রাষ্ট্রীয় ফিকহে পরিণত হয়। হানাফী ফকীহগণ ফিকহ ও বিচারিক দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তৃতীয় হিজরী শতক থেকে হাদীস চর্চায় হানাফী ফকীহগণের সম্পৃক্তি কমতে থাকে। এছাড়া ফিকহী বিষয়ে অতিরিক্ত মনোসংযোগের কারণে হাদীস বিষয়ে তাদের দুর্বলতা বাড়তে থাকে। এভাবে তাদের সাথে মুহাদ্দিসগণের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে।

৭. ৪. মাযহাবী গোঁড়ামি ও বিদ্বেষ

চতুর্থ হিজরী শতক থেকে মাযহাবী গোঁড়ামি ও বিদ্বেষ ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। এ সময়ে তিনটি মাযহাব প্রসিদ্ধ ছিল: হানাফী, মালিকী ও শাফিয়ী। মালিকী মাযহাব উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে বিস্তার লাভ করে। মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র মিসর, ইরাক ও পারস্যে হানাফী-শাফিয়ী দ্বন্দ্ব ব্যাপক রূপ গ্রহণ করে। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রসারতা ছিল হানাফীদের বেশি। কিন্তু হাদীস চর্চা ও লিখনীতে শাফিয়ীগণ অগ্রগামী ছিলেন। মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শাফিয়ী মাযহাব প্রসার লাভ করে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হানাফীদের 'ঘায়েল' করার জন্য তাদের ইমামকে ছোট করতে চেষ্টা করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সত্য, মিথ্যা, জাল-বানোয়াট সবকিছু সংকলন করেন।

এ প্রচারণার কারণে তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে তাঁর প্রতি কঠোর আপত্তি ও বিদ্বেষের ভাব জন্ম নিতে থাকে। এ সময়ে "আহলুস সুন্নাহ" ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে বিদ্যমান অনুভূতি অনেকটা নিম্নরূপ: যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস অস্বীকার করত!! হাদীসের বিপরীতে নিজের মত দিয়ে দীন তৈরি করত!!! সকল বিদআতী আকীদার প্রচারক ছিল!! সে কিভাবে এত প্রসিদ্ধি লাভ করল? তার মত কেন এত প্রসার লাভ করল? কোনো অজুহাতেই তাকে সহ্য করা যায় না!!!!

হানাফীগণ এ সকল অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। তবে মুহাদ্দিসগণের সাথে দূরত্বের কারণে তাঁদের মধ্যে তা তেমন প্রভাব বিস্তার করে নি। এছাড়া হানাফীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে অনেক সময় ইলমী প্রতিবাদের চেয়ে শক্তির প্রতিবাদ বেশি জোরদার হয়েছে। কখনো বা ইমামের বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করতে যেয়ে প্রতিপক্ষকে ছোট করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কখনো তাঁর মর্যাদা প্রমাণ করার নামে তাঁর নামে প্রচলিত সবকিছু নির্ভুল ও নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য বলে দাবি করা হয়েছে। পক্ষের-বিপক্ষের সকলেই আবেগ ও বাড়াবাড়িতে আক্রান্ত হয়েছেন।

আমরা জানি, ইমাম আবূ হানীফাকে হক্ক বলা আর তাঁর অন্ধ অনুসরণকে হক্ক বলা এক নয়। ইমাম আবূ হানীফাকে হক্ক বলার অর্থ তাঁকে নিষ্পাপ বা নির্ভুল বলা নয়। ইমাম আবূ হানীফাকে ভাল বলতে যেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যারা আপত্তিকর কথা বলেছেন তাদেরকে মন্দ বলাও ঠিক নয়। ইমাম আবূ হানীফাকে হক্ক বাতিলের মাপকাঠি বানিয়ে দেওয়াও ঠিক নয়।

এভাবে অভিযোগ ও প্রতিবাদ প্রক্রিয়া মাযহাবী আক্রোশের গণ্ডি থেকে বের হতে পারে নি। হিজরী ৫ম শতক থেকে অন্য মাযহাবের কতিপয় আলিম এ সব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। এদের অন্যতম প্রসিদ্ধ মালিকী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইউসূফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল বার্র (৩৬৮-৪৬৩ হি)। তিনি "আল-ইন্তিকা ফী ফাদায়িলিল আয়িম্মাতিস সালাসাহ" নামক গ্রন্থে তিন ইমাম: আবূ হানীফা, মালিক ও শাফিয়ীর মর্যাদা ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার জ্ঞানবৃত্তিকভাবে খণ্ডন করেন।

পরবর্তীকালে অন্যান্য মাযহাবের কতিপয় ফকীহ, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও জারহ-তাদীল বিশেষজ্ঞ নিরপেক্ষ বিচার ও পর্যালোচনার চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ও মুজতাহিদ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া আহমদ ইবন আব্দুল হালীম (৬৬১-৭২৮ হি), তাঁর তিন ছাত্র: প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইউসূফ ইবন আব্দুর রাহমান, আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী (৬৫৪-৭৪২ হি), প্রসিদ্ধ শাফিয়ী-হাম্বালী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম যাহাবী: মুহাম্মাদ ইবন আহমদ (৬৭৩-৭৪৮ হি), প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকহী ও মুহাদ্দিস আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমার ইবন কাসীর (৭০১-৭৭৪ হি) এবং অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবন হাজার আসকালানী: আহমদ ইবন আলী (৭৭৩-৮৫২ হি)।

৮. ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ সংকলন

তৃতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমতে থাকে। অনেকেই এ সকল অভিযোগ সংকলন করেছেন। তাঁদের অন্যতম:

৮. ১. আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বাল (২১৩-২৯০ হি)

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের পুত্র আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুমাল্লাহু) তৃতীয় হিজরী শতকের একজন প্রসিদ্ধ আলিম। তিনি 'আস-সুন্নাহ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের বিষয় "আহলুস সুন্নাত" বা "সুন্নী" আকীদা ব্যাখ্যা করা। এ গ্রন্থের প্রথম দিকের একটি অধ্যায়: (ما حفظت عن أبي وغيره من المشايخ في أبي حنيفة): "আবূ হানীফার বিষয়ে আমি আমার পিতা ও অন্যান্য মাশায়িখ থেকে যা মুখস্থ করেছি।" এ অধ্যায়ে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের বিভিন্ন আবিদ, ফকীহ ও মুহাদ্দিস থেকে ইমাম আবূ হানীফার নিন্দায় ১৮২টি বক্তব্য সংকলন করেছেন। এ সকল বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য তাঁর আকীদার বিভ্রান্তি ও তাঁর দীন ও ইলম সম্পর্কে কটাক্ষ।

৮. ২. খতীব বাগদাদী (৩৯২- ৪৬৩ হি)

৫ম হিজরী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও শাফিয়ী ফকীহ আহমদ ইবন আলী খতীব বাগদাদী (রাহ)। ফিকহ, হাদীস, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ এখনো ইলমুল হাদীস, জারহ-তাদীল ও ইতিহাস বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম তথ্যসূত্র। তাঁর রচিত "তারীখ বাগদাদ" গ্রন্থে তিনি বাগদাদের ইতিহাস ছাড়াও বাগদাদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় ৮ হাজার মানুষের জীবনী সংকলন করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় জীবনী ইমাম আবূ হানীফার ১৩১ পৃষ্ঠা ব্যাপী। প্রথমে প্রায় ১২ পৃষ্ঠা তিনি তাঁর জীবনী আলোচনা করেন। এরপর প্রায় ৩৫ পৃষ্ঠা তিনি ইমাম আবূ হানীফার প্রশংসায় পূর্ববর্তী আলিমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। এরপর প্রায় ৮৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী তিনি ইমাম আবূ হানীফার নিন্দায় বর্ণিত পূর্ববর্তী আলিমদের বক্তব্য সংকলন করেন। এ সকল বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য ইমাম আবূ হানীফার আকীদার ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তি, ফিকহী দুর্বলতা এবং ব্যক্তিগত চরিত্র হনন।[৫৬]

আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, খতীব বাগদাদী ও অন্যান্যদের সংকলিত এ সকল অভিযোগ ও নিন্দা সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক) সনদ যাচাই ছাড়া এ বক্তব্যগুলো গ্রহণ করলে একজন মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন যে, ইমাম আবূ হানীফার মত ইসলামের এত বড় শত্রু ও এত বড় বিভ্রান্ত মানুষ বোধহয় কখনোই জন্ম গ্রহণ করেন নি!! শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া বলেন, যারা মুসলিম উম্মাহর কোনো ইমামের বিরুদ্ধে এ সকল কথা বলেন তারা মূলত মুসলিম উম্মাহকেই বিভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে চান। আমরা তাঁর বক্তব্য পরে আলোচনা করব।

(খ) এ সকল বর্ণনার অধিকাংশই সনদ বিচারে জাল, বাতিল বা অত্যন্ত দুর্বল। এমনকি ইমাম ইবন হিব্বান ও খতীব বাগদাদী নিজে যাদেরকে জালিয়াত বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের অনেকের বর্ণনা এক্ষেত্রে সংকলন করেছেন।

(গ) দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের ফকীহ বা মুহাদ্দিসদের যে বক্তব্যগুলো সনদ বিচারে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয় সেগুলোর অধিকাংশ মূলত তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আলিমের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ। যেমন, তিনি কাফির, ইসলামের শত্রু, ইসলাম ধ্বংস করতেন, তিনি অভিশপ্ত, ক্রীতদাস ইত্যাদি। এগুলো মূলত আবূ হানীফা নুমান ইবন সাবিতের মর্যাদাহানী করে নি; বরং যারা এসব কথা বলেছেন তাদের ঈমানী, ইসলামী ও আখলাকী দুর্বলতা প্রকাশ করেছে।

(ঘ) ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো তিনভাগে ভাগ করা যায়: (১) আকীদা বিষয়ক, (২) হাদীস বিষয়ক এবং (১) ফিকহ বিষয়ক।

৯. আকীদা বিষয়ক অভিযোগ

ঈমানের সংজ্ঞা কেন্দ্রিক খুঁটিনাটি কয়েকটি বিষয় ছাড়া ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক আলিমগণ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে আকীদা বিষয়ক কোনো অভিযোগ ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে আকীদাগত কোনো আপত্তি না থাকার বড় প্রমাণ যে, তাঁর সমসাময়িক ও তাঁর ছাত্র

পর্যায়ের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ফকীহ, ইমাম, ও মুহাদ্দিস তাঁর গ্রহণযোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন, অনেকেই তাঁকে নিজেদের ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন, সাধারণ মানুষ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেছে, তাঁর মত ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, উমাইয়া ও আব্বাসী প্রশাসন তাঁকে বিচারক পদে বসানোকে নিজেদের সম্মানের বিষয় বলে গণ্য করেছে। কিন্তু এরপরও তৃতীয় শতক থেকে আকীদা বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর সব অভিযোগ উত্থাপিত হতে লাগল। যেমন, তিনি বিদআতী আকীদার উদ্ভাবক, মুতাযিলী, মুরজিয়া, হাদীস অমান্যকারী..., অস্ত্রধারণে বিশ্বাসী... ইত্যাদি। বস্তুত আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, ইবন হিব্বান, ইবন আদী ও খতীব বাগদাদী ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ সংকলন করেছেন সনদ যাচাই না করে সেগুলো গ্রহণ করলে মনে হবে, ইসলামী আকীদার এমন কোনো খারাপ বিষয় নেই যা ইমাম আবূ হানীফার মধ্যে ছিল না। অভিযোগগুলো পর্যালোচনার আগে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে বর্ণিত এ সকল অভিযোগের অধিকাংশই সনদ বিচারে জাল বা বাতিল। নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা, বিদ্বেষ চরিতার্থ করা বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলের প্রিয়ভাজন হতে অনেক জালিয়াত এ সকল জাল কাহিনী প্রচার করেছে।

(২) সমসাময়িক আলিমদের মধ্যকার মতবিরোধ একটি দুঃখজনক কিন্তু স্বাভাবিক বিষয়। খুঁটিনাটি কয়েকটি আকীদাগত মতভেদের কারণে সমসাময়িক কয়েকজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা তাঁর মতের ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁকে নিন্দা করেছেন। আমরা পরবর্তীতে দেখব যে, এ সকল ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা নীরবতা, ভদ্রতা ও ধৈর্য অবলম্বন করতেন।

(৩) সমকালীন আলিমদের মধ্যকার মতবিরোধ উস্কে দিতে বা অপব্যবহার করতে সচেষ্ট থাকে অনেক বিভ্রান্ত, দুর্বল ঈমান বা চাটুকার। ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে বর্ণিত ঘটনাগুলোতে আমরা এর অনেক উদাহরণ দেখতে পাই। এরূপ অনেক ব্যক্তি নিজের বিভ্রান্তির ছাফাই গাইতে, তার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে বা বিরোধী আলিমের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য তাঁর নামে বিরোধী আলিমের কাছে তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বা সম্পূর্ণ মিথ্যা এমন কথা বলেছে যা কখনোই তিনি বলেন নি। আর এরূপ কথা শুনে উক্ত বিরোধী আলিম ইমাম আবূ হানীফার প্রতি আরো বিক্ষুব্ধ হয়েছেন ও বিরূপ মন্তব্য করেছেন। একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও আকীদা বিশেষজ্ঞ ইমাম শাহরাস্তানী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল কারীম ইবন আহমদ (৪৬৭-৫৪৮ হি) মুরজিয়া ফিরকার "গাস্‌সানিয়া' নামক দলের প্রধান কূফার 'গাস্‌সান' নামক ব্যক্তির বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন:

ومن العجيب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل مذهبه ويعده من المرجئة ولعله كذب كذلك عليه

"আশ্চর্য বিষয় যে, গাস্‌সান প্রচার করত যে, আবূ হানীফা (রাহ)-এর মত তাঁর মতেরই মত এবং সে তাঁকে মুরজিয়া হিসেবে প্রচার করত। সম্ভবত এগুলিও তাঁর নামে এ ব্যক্তির মিথ্যাচার।"[৫৭]

আমরা সামান্য কয়েকটি অভিযোগ পর্যালোচনা করব।

৯. ১. ইমাম বুখারী (২৫৬ হি)

হাদীস বিষয়ক অভিযোগ আলোচনায় আমরা দেখব যে, ইমাম বুখারী (রাহ) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-কে "মুরজিয়া" বলে অভিযুক্ত করেছেন। অন্যত্র তিনি বলেন:

قال لي ضرار بن صرد حدثنا سليم سمع سفيان: قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ أبا حنيفة المشرك أني برئ منه قال: وكان يقول: القرآن مخلوق

"দিরার ইবন সুরাদ আমাকে বলেন, আমাদেরকে সালীম বলেছেন, তিনি সুফইয়ান সাওরীকে বলতে শুনেছেন, আমাকে হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান বলেন, আবূ হানীফা নামক মুশরিককে আমার পক্ষ থেকে জানাও যে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন: আবূ হানীফা বলে: কুরআন সৃষ্ট।"[৫৮]

আমরা দেখব যে, ইমাম আবূ হানীফা "আল-ফিকহুল আকবার" গ্রন্থে কুরআনকে সৃষ্ট বলার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখেছেন। কুরআনকে সৃষ্ট বলার বিরুদ্ধে যিনি কলম ধরেন তাঁর নামে "কুরআন সৃষ্ট" বলার অভিযোগ, তাও তাঁর প্রিয়তম ও নিকটতম উস্তাদের নামে! এ কাহিনীটির একমাত্র বর্ণনাকারী আবূ নুআইম দিরার ইবন সুরাদ। তিনি কুফার একজন বড় আবিদ-বুজুর্গ ছিলেন; কিন্তু তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন। হক্কের পক্ষে বুজুর্গদের মিথ্যাচার সম্পর্কে **"হাদীসের নামে জালিয়াতি"** গ্রন্থে আলোচনা করেছি।[৫৯] ইবন মায়ীন বলেন: কূফায় দুজন মহা-মিথ্যাবাদী আছে: একজন আবূ নুআইম নাখয়ী, অন্যজন আবূ নুআইম দিরার ইবন সুরাদ। ইমাম নাসায়ী বলেন: (**متروك الحديث**) সে পরিত্যক্ত হাদীস বর্ণনাকারী। নাসায়ীর পরিভাষায় পরিত্যক্ত অর্থ মিথ্যাবাদী। অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একই কথা বলেছেন। ইমাম বুখারী নিজেও তাকে মাতরূক অর্থাৎ পরিত্যক্ত বা মিথ্যাবাদী বলেছেন। কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন।[৬০]

সুস্পষ্টতই এটি এ ব্যক্তির বানানো একটি জাল গল্প। তারপরও ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ গল্পটি ও এরূপ অনেক গল্প

উদ্ধৃত করেছেন। তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা আমরা এ থেকে বুঝতে পারছি। ইমাম বুখারী তাঁর 'আত-তারীখ আস-সগীর' গ্রন্থে বলেন:

سمعت إسماعيل بن عرعرة يقول قال أبو حنيفة جاءت امرأة جهم إلينا ههنا فأدبت نساءنا

"আমি ইসমাঈল ইবন আরআরাকে বলতে শুনেছি, আবূ হানীফা বলেন: জাহম (ইবন সাফওয়ান)-এর স্ত্রী আমাদের এখানে এসে আমাদের মহিলাদেরকে শিক্ষা দান করে।"[৬১]

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, জাহম ইবন সাফওয়ান (১২৮ হি) মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন কুফরী-বিদআতী আকীদা প্রচলন করেন। এ কাহিনীতে পরোক্ষভাবে ইমাম আবূ হানীফাকে জাহমের অনুসারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। তাঁকে জাহমী বলে অভিযুক্ত করে আরো অনেক বর্ণনা আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বাল, ইবন হিব্বান, ইবন আদী, খতীব বাগদাদী প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। সনদগতভাবে এ সকল বর্ণনা সবই জাল বা অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত। অর্থগতভাবে অভিযোগগুলো আমরা একটু পরে পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। এ বর্ণনার কথক ইসমাঈল ইবন আরআরা একেবারেই অপরিচিত ব্যক্তি। জারহ-তাদীল বিষয়ক বা অন্য কোনো জীবনী বা ইতিহাস গ্রন্থে তার বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় না। ইমাম বুখারী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি তাঁর থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করেছেন, অথবা তিনি কোনো আলিমের কাছ থেকে কিছু শিখেছেন বলেও কোথাও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাহ্যত তিনি ইমাম আবূ হানীফা থেকে সরাসরি কোনো কথা শুনেন নি। আদৌ তিনি তাঁকে দেখেছেন বলে প্রমাণিত নয়। সমাজে প্রচলিত একটি কথা তিনি ইমাম বুখারীকে শুনিয়েছেন মাত্র।

৯. ২. মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবা (২৯৭ হি)

ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি ফাসিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ বলেছেন। তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শাইবা কূফী (২৯৭ হি)। তিনি লিখেছেন:

سمعت أبي يقول سالت أبا نعيم يا أبا نعيم من هؤلاء الذين تركتهم من أهل الكوفة كانوا يرون السيف والخروج على السلطان فقال على رأسهم أبو حنيفة وكان مرجئا يرى السيف

"আমি আমার পিতা (উসমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শাইবা ১৫৬-২৩৯ হি)-কে বলতে শুনেছি, আমি আবূ নুআইম (ফাদল ইবন দুকাইন: ১৩০-২১৮ হি)-কে প্রশ্ন করলাম, হে আবূ নুআইম, অস্ত্রে বিশ্বাস করে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা সমর্থন করে কুফায় এরূপ কাদেরকে রেখে এসেছেন? তিনি বলেন: এদের প্রধান আবূ হানীফা। তিনি মুরজিয়া ছিলেন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ সমর্থন করতেন।"[৬২]

মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবা (রাহ) কূফার প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তবে তার সততা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। সালিহ জাযরাহ ও মাসলামা ইবন কাসিম বলেন: তিনি গ্রহণযোগ্য। ইবন আদী বলেন: তার বিষয়ে সমস্যা নেই। কুফার সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফিয মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ মুতাইয়ান কুফী (২০২-২৯৭) বলেন: তিনি মিথ্যাবাদী। আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বাল বলেন: তিনি মিথ্যাবাদী। ইবন খিরাশ বলেন: তিনি জালিয়াতি করতেন। বারকানী বলেন: আমি সবসময়ই শুনতাম যে, তিনি অনির্ভরযোগ্য। জাফর তায়ালিসী, আব্দুল্লাহ ইবন ইবরাহীম ইবন কুতাইবা, জাফর ইবন হুযাইল, মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আদাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।[৬৩]

৯. ৩. ইমামুল হারামাইন (৪১৯-৪৭৮ হি)

পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম শাফিয়ী ফকীহ আবুল মাআলী আব্দুল মালিক ইবন আব্দুল্লাহ আল-জুআইনী (রাহ)। সে যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে তাঁকে "ইমামুল হারামাইন" বা মক্কা-মদীনার ইমাম বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ছিলেন "আশআরী" মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবুল হাসান আশআরী: আলী ইবন ইসমাঈল ইবন ইসহাক (২৬০-৩২৪ হি)-এর প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট ছাত্র এবং ইমাম গাযালীর খাস উস্তাদ। তিনি তাঁর "আল-বুরহান" নামক উসূল ফিকহের গ্রন্থে ইমাম শাফিয়ীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম বলে প্রমাণ করতে যেয়ে ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুমাল্লাহ)-এর অনেক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষত ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে তিনি বলেন:

وأما أبو حنيفة فما كان من المجتهدين أصلا لأنه لم يعرف العربية... ولم يعرف الأحاديث حتى رضي بقبول كل سقيم ومخالفة كل صحيح ولم يعرف الأصول حتى قدم الأقيسة على الأحاديث ولعدم فقه نفسه اضطرب مذهبه وتناقض وتهافت..وكان يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة... فإن هذا مذهب المرجئة فكيف يظن وحاله هذا مجتهدا؟!

"আর আবূ হানীফা তো মূলত মুজতাহিদই ছিলেন না। কারণ তিনি আরবী ভাষাই জানতেন না।... তিনি হাদীসও জানতেন না; এজন্য তিনি সকল বাতিল হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং সকল সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। তিনি উসূলুল ফিকহও জানতেন না;

এজন্য তিনি কিয়াসকে হাদীসের উপর স্থান দিয়েছেন। তাঁর মন-মানসিকতায় ফিকহ ছিল না; যে কারণে তাঁর মাযহাবে বৈপরীত্য, স্ববিরোধিতা ও দুর্বলতা বিদ্যমান।... তিনি বলতেন: ঈমান ঠিক থাকলে পাপ করলে কোনো অসুবিধা নেই; যেমন কাফিরের নেক কর্ম তার কাজে লাগবে না।... এ হলো মুরজিয়া মত। আর যে ব্যক্তির অবস্থা এরূপ তিনি কিভাবে মুজতাহিদ হতে পারেন!"[৬৪]

মাযহাবী কোন্দল ও বিদ্বেষ সে যুগে কি নোংরা পর্যায়ে গিয়েছিল তা আমরা বুঝতে পারছি ইমামুল হারামাইনের এ বক্তব্য থেকে। ইমাম আবূ হানীফা নিজে, ইমাম তাহাবী এবং সকল হানাফী ফকীহ তাঁদের আকীদা বিষয়ক গ্রন্থে মুরজিয়াদের উপরোক্ত মতের বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখেছেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমামুল হারামাইন এ কথাগুলি ইমাম আবূ হানীফার নামে বললেন! আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা ও রহমত করুন।

৯. ৪. আব্দুল কাদির জীলানী (৪৭১-৫৬১ হি)

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম বুজুর্গ ও হাম্বলী ফকীহ শাইখ জীলানীর পরিচয় কারোই অজানা নয়। তিনি "গুনিয়াতুত তালিবীন" গ্রন্থে বিভ্রান্ত মুরজিয়া ফিরকার মধ্যে "হানাফিয়া" ফিরকার কথা উল্লেখ করে বলেন:

أما المرجئة ففرقها اثنتا عشرة فرقة الجهمية والصالحية والشمرية واليونسية والثوبانية والنجارية والغيلانية والشبيبية والحنفية والمعاذية والمريسية والكرامية

"মুরজিয়ারা ১২টি ফিরকা: জাহমিয়্যাহ, সালিহিয়্যাহ, শাম্মারিয়্যাহ, ইউনুসিয়্যাহ, সাওবানিয়্যাহ, নাজ্জারিয়্যাহ, গাইলানিয়্যাহ, শাবীবিয়্যাহ, হানাফিয়্যাহ, মুআযিয়্যাহ, মারীসিয়্যাহ ও কার্‌রামিয়্যাহ।"

এরপর হানাফিয়্যাহ ফিরকার বর্ণনায় বলেন:

وأما الحنفية فهم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت زعموا أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبما جاء من عنده جملة على ما ذكره البرهوتي

"হানাফী ফিরকার মানুষেরা আবূ হানীফা নুমান ইবন সাবিতের অনুসারী। তারা মনে করে যে, ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর নিকট থেকে যা কিছু এসেছে তা সামগ্রিকভাবে জানা (হৃদয়ের জ্ঞান) ও মুখে স্বীকার করা (অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারোক্তিই ঈমান, কর্ম ঈমানের অংশ নয়)। বারহূতী তা উল্লেখ করেছেন।"[৬৫]

১০. আকীদা বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনা

দ্বিতীয় পর্বে আমরা আকীদার এসকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে আমরা সংক্ষেপে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করব। আমরা দেখেছি তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মূলত পাঁচটি: (১) মুতাযিলী, (২) জাহমী, (৩) শীয়া, (৪) মুরজিয়া ও (৫) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের বৈধতায় বিশ্বাস।

১০. ১. মুতাযিলী, জাহমী ও শীয়া আকীদা

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী শতাব্দীর অনেক আলিম থেকে বর্ণিত যে, ইমাম আবূ হানীফা মুতাযীলী ও জাহমী আকীদার অনুসারী বা প্রবর্তক ছিলেন। আবার প্রাচীন ও আধুনিক কোনো কোনো আলিম অভিযোগ করেছেন যে, তিনি শীয়া মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এ সকল অভিযোগ সবই সনদগতভাবেই বাতিল। আর যদি কোনো আলিম থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয় যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে মুতাযিলী, জাহমী বা শীয়া মতবাদের অনুসারী বা তাদের প্রতি আকৃষ্ট বলে অভিযোগ করেছেন তবে তা উক্ত অভিযোগকারী আলিমের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে গণ্য হবে। কারণ:

প্রথমত: ইমাম আবূ হানীফার বিরোধীরা যাই বলুন না কেন, ইমাম আবূ হানীফার জীবদ্দশা থেকেই তাঁর আকীদা ও ফিকহ মুসলিম বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। তাঁর শত শত ছাত্র তাঁর মত পালন ও প্রচার করেছেন, তাঁর গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেছেন। বিরোধীদের সকল বিরোধিতা উপেক্ষা করে তাঁরা ইমামের আকীদা ও ফিকহ গ্রহণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রত থেকেছেন। যদি তিনি মুতাযিলী বা জাহমীদের কোনো আকীদা গ্রহণ করতেন তবে তাঁর ছাত্ররা অবশ্যই এগুলো প্রচার করতেন এবং এর পক্ষে কিছু বলতেন। অথচ বাস্তবে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ও অনুসারীগণ এ সকল আকীদার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সোচ্চার থেকেছেন।

দ্বিতীয়ত: ইমাম আবূ হানীফা তাঁর নিজের লেখায় এ সকল আকীদার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে এ সকল অভিযোগ মিথ্যা; অভিযোগকারী বা বর্ণনাকারী না জেনে বা জেনে মিথ্যা বলেছেন।

১০. ২. মুরজিয়া আকীদা

ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অভিযোগ যে তিনি মুরজিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় পর্বে আমরা মুরজিয়া মতের বিরুদ্ধে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, মুরজিয়া অর্থ বিলম্বিতকারী, স্থগিতকারী অথবা আশাপ্রদানকারী দল। খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির এবং অনন্তকাল জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করেন। মুতাযিলী

বিশ্বাসও প্রায় একই। দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে খারিজী ও মুতাযিলীদের বিপরীত অন্য ফিরকার উদ্ভব হয় যারা বলে, ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈমান থেকে আমল বা কর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক। ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের ভক্তি বা বিশ্বাসই যথেষ্ট। ইসলামের কোনো বিধিবিধান পালন না করেও একব্যক্তি ঈমানের পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করতে পারে। আর এরূপ ঈমানদার ব্যক্তির কবীরা গোনাহ তার কোনো ক্ষতি করে না। যত গোনাহই করুক না কেন সে জান্নাতী। এদেরকে মুরজিয়া বলার কারণ: (১) এরা বিশ্বাস করে যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না বা তার শাস্তি স্থগিত রাখবেন এজন্য তাদেরকে মুরজিয়াহ বলা হয়। (২) এরা আমল বা কর্মকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বা স্থগিত করেছে এজন্য এদেরকে মুরজিয়া বলা হয়। (৩) এরা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে জান্নাতের আশা প্রদান করেছে এজন্য তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয়।[৬৬]

এ দু প্রান্তিক ধারার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন মূলধারার আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, পাপ ঈমানের ক্ষতি করে, তবে ঈমানকে ধ্বংস করে না বা শুধু পাপের কারণেই মুমিন ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হন না। বরং তার বিষয়টি আল্লাহর উপর অর্পিত। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন। একারণে মুতাযিলী ও খারিজীগণ আহলুস সুন্নাত-কে মুরজিয়া বলে আখ্যায়িত করত। কারণ তারা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অনন্তকাল জাহান্নামী না বলে তার বিষয়টি বিলম্বিত ও স্থগিত করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতেন। পাশাপাশি তাঁরা আমলকে ঈমান থেকে কিছুটা পিছিয়ে দিতেন বা অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ বলে গণ্য করতেন না। এভাবে আহলুস সুন্নাতের সকলেই মুতাযিলী ও খারিজীদের দৃষ্টিতে "মুরজিয়া"।

অন্য দিকে শীয়াগণও 'আহলুস সুন্নাহ'-কে ঢালাওভাবে মুরজিয়া বলতেন। শীয়া ধর্মমতে আলী (রা)-এর মর্যাদায় বিশ্বাসই ঈমান ও ইসলামের মূল বিষয়। তাঁদের মতে আলী (রা) সাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু আহলুস সুন্নাত তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ না বলে চতুর্থ শ্রেষ্ঠ বলেন, অর্থাৎ তাঁকে আবূ বকর (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর পরে স্থান দেন সেহেতু তারা 'মুরজিয়া', অর্থাৎ আলী (রা)-এর মর্যাদা বিলম্বিতকারী।

ইমাম আবূ হানীফাকে "মুরজিয়া" আখ্যায়িত করার বিষয়ে ইমাম শাহরাস্তানী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল কারীম ইবন আহমদ (৪৬৭-৫৪৮ হি) বলেন:

كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنة وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان والرجل مع تجرده في العمل (تبحره في العلم) كيف يفتي بترك العمل. وله سبب آخر وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئا وكذلك الوعيدية من الخوارج. فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج...

"আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদেরকে সুন্নী মুরজিয়া বলা হতো। অনেক লেখক তাঁকে মূল মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এর কারণ যে, তিনি বলতেন: ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস এবং ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এজন্য তারা ধারণা করেছেন যে, তিনি আমলকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। যে মানুষ এত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এত বেশি আমল করতেন তিনি কিভাবে আমল বর্জনের ফাতওয়া দিতে পারেন!? এর অন্য একটি কারণ রয়েছে। প্রথম যুগে (তাঁর যুগে) প্রকাশিত কাদারিয়া ও মুতাযিলীদের তিনি বিরোধিতা করতেন। আর কাদারিয়া মতের বিষয়ে যারাই মুতাযিলীদের বিরোধিতা করত তাদের সকলকেই মুরজিয়া বলত। খারিজীগণও তাই করত। এজন্য খুবই সম্ভব যে, মুরজিয়া আখ্যাটি ইমাম আবূ হানীফা মুতাযিলী ও খারিজীগণ থেকেই পেয়েছেন।..."[৬৭]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত একমত যে, আমল (কর্ম) ঈমানের (বিশ্বাসের) অবিভাজ্য অংশ নয় এবং শুধু কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে মুমিন কাফির বলে গণ্য হন না। তাহলে ঈমান ও আমলের সাথে সম্পর্ক কী? মূলধারার মুহাদ্দিসগণের মতে আমল ঈমানের অংশ, তবে অবিভাজ্য অংশ নয়, বিভাজ্য অংশ। আমল বা কর্মের ক্রটিতে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে বিনষ্ট হয় না। কর্মের বৃদ্ধি ও পূর্ণতায় ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কারণে ঈমান হ্রাস পায়। তবে কোনোভাবেই কোনো কবীরা গোনাহের কারণেই মুমিন কাফির হন না।

পক্ষান্তরে প্রথম হিজরী শতকের শেষ দিক থেকে অনেক ফকীহ বলেন: আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ নয়, বরং পরিপূরক। আমলের ক্রটিতে ঈমান বিনষ্ট হয় না তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম। আর বিশ্বাসের বিষয় সর্বদা এক। এজন্য এতে কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। কর্মের হ্রাসবৃদ্ধির কারণে মুমিনের দীন, ইসলাম ও ঈমানের গভীরতায় হ্রাসবৃদ্ধি হয় মূল ঈমানের বিষয়বস্তুর হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এ সকল ফকীহকে তাঁদের বিরোধীরা "মুরজিয়া" বলে আখ্যায়িত করতেন। ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন দ্বিতীয় ধারার অনুসারী। এ বিষয়ে তাঁর মত আমরা ফিকহুল আকবার গ্রন্থে দেখব। আমরা আরো দেখব যে, খারিজী ও মুতাযিলীদের প্রান্তিকতা, পাপী মুমিনকে কাফির-কথন প্রতিরোধ এবং জালিম বা ফাসিক রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রতিরোধের জন্য ফকীহগণ এ মত গ্রহণ করেন।

তাহলে আমরা দেখছি যে, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মধ্যে যে মতভেদ তা একান্তই 'পরিভাষাগত'। খারিজী-মুতাযিলী প্রান্তি

কতার প্রতিবাদে তাঁরা একমত যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুমিন কাফির নয়। মুরজিয়া প্রান্তিকতার প্রতিবাদে তাঁরা একমত যে, কবীরা গোনাহ মুমিনের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক। মধ্যবর্তী সমন্বয়ে তারা দুটি বিষয়ে মতভেদ করেছেন: (১) কর্ম (আমল) বিশ্বাসের (ঈমানের) অংশ কি না এবং (২) আমলের কারণে মূল ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, ঈমানের শক্তি ও গভীরতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় একটি বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তা হলো ঈমানের ঘোষণার সাথে 'ইনশা আল্লাহ' বলা। মুহাদ্দিসগণ বলতেন, মুমিন যেহেতু তার নিজের পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানে না, এজন্য তার বলা উচিত: 'ইনশা আল্লাহ আমি মুমিন'। আর ফকীহগণ বলতেন, ইনশা আল্লাহ মূলত সন্দেহ প্রকাশ করে। আর একজন মুমিন যদি নিজের বর্তমান ঈমান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাহলে ঈমানই অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। এজন্য বর্তমান ঈমানের অবস্থা বলতে মুমিন 'ইনশা আল্লাহ' ছাড়াই বলবেন; 'আমি মুমিন'। তবে যদি তিনি তার ঈমানের ভবিষ্যত পরিণতির দিকে লক্ষ্য করে 'ইনশা আল্লাহ আমি মুমিন' বলেন তাহলে অসুবিধা নেই।

এ সামান্য বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে ইমাম আবূ হানীফাকে মুরজিয়া, বিদআতী, কাফির ইত্যাদি বলে অনেক গালিগালাজ করা হয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভুৎ 'ইনশা আল্লাহ'-র বিষয়। এ বিষয়টির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। ঈমানের ঘোষণার সাথে 'ইনশা আল্লাহ' বলতে হবে বা হবে না- এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোনোরূপ নির্দেশনা নেই। বিষয়টি একেবারেই ইজতিহাদী। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অনেক কঠোর কথা বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, ইবন হিব্বান, ইবন আদী, খতীব বাগদাদী প্রমুখের গ্রন্থে পাঠক তা দেখবেন। আমরা আগেই বলেছি, ইমাম আবূ হানীফা এ ধারার অনুসারী ছিলেন, প্রবর্তক ছিলেন না। ইমাম আবূ হানীফার পূর্বেই অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহ এ মত গ্রহণ ও প্রচার করেন। হাদীস বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনায় আমরা হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের অনেক প্রসিদ্ধ মুরজিয়া মুহাদ্দিস ও ফকীহের নাম দেখব। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা যেমন আক্রমণ ও চরিত্র হননের শিকার হয়েছেন তেমন আর কেউ হন নি। বাহ্যত এর কারণ প্রসিদ্ধির ঈর্ষা, মাযহাবী কোন্দল ও প্রতিহিংসা।

১০. ৩. পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বৈধতায় বিশ্বাস করতেন। আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বাল উদ্ধৃত করেছেন:

ابن المبارك يقول سمعت الأوزاعي يقول احتملنا عن أبي حنيفة كذا ... واحتملنا عنه كذا ... واحتملنا عنه كذا ... العيوب حتى جاء السيف على أمة محمد ﷺ فلما جاء السيف على أمة محمد ﷺ لم نقدر أن نحتمله

"ইবনুল মুবারাক বলেন, আমি আওযায়ীকে বলতে শুনেছি: আমরা আবূ হানীফার অমুক অন্যায়-ত্রুটি সহ্য করলাম,... অমুক ত্রুটি সহ্য করলাম, ... অমুক অন্যায়-ত্রুটি সহ্য করলাম... কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর অস্ত্র নিয়ে আসলেন!! যখন তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে অস্ত্র নিয়ে আসলেন তখন আর আমরা তাকে সহ্য করতে পারলাম না।"[৬৮]

এরূপ অনেক কথা আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, ইবন হিব্বান, ইবন আদী, খতীব বাগদাদী প্রমুখের গ্রন্থে পাঠক দেখবেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, তাঁর বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগ যে, তিনি পাপী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদে কখনোই অংশগ্রহণ করেন নি। অর্থাৎ কেউ তাঁকে বিদ্রোহের পক্ষে বলে অভিযুক্ত করছেন। পক্ষান্তরে কেউ তাঁকে বিদ্রোহের বিপক্ষে বলে অভিযুক্ত করছেন। অর্থাৎ যে যেভাবে পারছেন তাঁকে অভিযুক্ত করছেন।[৬৯] এ বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য আমরা ফিকহুল আকবারের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় দেখব। আমরা দেখব যে, ইমাম আবূ হানীফা নিজে ও তাঁর আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী খুব সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ইসলামী আকীদার পরিপন্থী ও অবৈধ। এখানে আমরা শুধু বুঝার চেষ্টা করি যে, তিনি যদি এরূপ বৈধতা দিয়েও থাকেন তাহলে তা কত বড় অপরাধ ছিল? সত্যই কি তিনিই প্রথম উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে অস্ত্র নিয়ে আগমন করেছিলেন?

প্রাচীন কাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে "রাষ্ট্র" ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও মূল আরবের বাসিন্দারা কখনো "রাষ্ট্র" ব্যবস্থার অধীনে বাস করেন নি। তারা রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বুঝতেন না, বুঝতেন গোত্রীয় আনুগত্য। গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্যকে তারা অবমাননাকর মনে করতেন। এছাড়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ তাদেরকে তাদের মতের বাইরে সকল সিদ্ধান্ত অমান্য করতে প্রেরণা দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিচ্ছিন্ন জাতিকে প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আনেন। তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও আনুগত্যের মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। শাসক-প্রশাসক পাপী হলেও তার পাপের প্রতি ঘৃণা, আপত্তি ও প্রতিবাদসহ তার আনুগত্য ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বর্জন করা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে বা রাষ্ট্রহীনভাবে বাস করাকে তিনি জাহিলী জীবন ও এ প্রকারের মৃত্যুকে জাহিলী মৃত্যু বলেছেন। পরবর্তীতে আমরা এগুলো বিস্তারিত দেখব, ইনশা আল্লাহ।

রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বিষয়ক কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনা অনুধাবন ও প্রয়োগ ঘটে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে বসবাসের সাথে সাথে। এ জাতীয় একটি বিষয় "পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য" বনাম "পাপের প্রতিবাদ"। কুরআন ও হাদীসে বারবার ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখতে ও বিদ্রোহ বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উভয় নির্দেশের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রথম যুগের সাহাবী-তাবিয়ীগণের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য ও কর্মপার্থক্য ঘটে। অধিকাংশ সাহাবী-তাবিয়ী সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখা ফরয এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ হারাম বলে গণ্য করেছেন।

পক্ষান্তরে তাঁদের যুগে কিছু ঘটনা ঘটেছে যাতে কেউ কেউ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। ইয়াযিদের সময়ে ইমাম হুসাইনের (রা) ঘটনায়, মদীনার বিদ্রোহে ও ইবন যুবাইরের ঘটনায় কয়েকজন সাহাবী ও অনেক প্রসিদ্ধ তাবিয়ী অস্ত্রধারণ করেন। আব্দুল মালিকের (খিলাফাত ৬৫-৮৬) বিরুদ্ধে আব্দুর রাহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল আস'আসের (৮৫ হি) বিদ্রোহে, উমাইয়া খলীফাদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের পৌত্র যাইদ ইবন আলীর (১২২ হি) যুদ্ধে এবং আব্বাসী খলীফা মানসূরের বিরুদ্ধে আলী (রা)-এর বংশধর, 'নাফস যাকিয়্যাহ' নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (৯২-১৪৭ হি)-এর বিদ্রোহে অনেক প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী ইমাম ও আলিম অংশগ্রহণ করেন বা বৈধতা প্রদান করেন। কেন এবং কোন প্রেক্ষাপটে তাঁরা তা করেছেন তা আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তবে লক্ষণীয় যে, মূলধারার সাহাবী-তাবিয়ীগণ এরূপ বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন, তবে অংশগ্রহণকারী বা বৈধতাদানকারীদেরকে বিভ্রান্ত বলেন নি। বরং তাঁরা ইজতিহাদে ভুল করেছেন বলে গণ্য করেছেন এবং তাঁদের জন্য দুআ করেছেন।

এভাবে হিজরী প্রথম শতাব্দী ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত কোনো কোনো তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ পাপী সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদে অস্ত্রধারণ বৈধ বলে গণ্য করেছেন। একে তারা "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের" অংশ বলে গণ্য করতেন। দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ একমত হয়ে যান যে, জালিম বা পাপী সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ নয়। খারিজী ও মুতাযিলীদের আকীদার মূলনীতি ছিল ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ও জিহাদের নামে পাপী সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। পক্ষান্তরে মূলধারার মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার মধ্যে পাপী সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অবৈধতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তাহলে নুমান ইবন সাবিত প্রথম উম্মাতের মধ্যে অস্ত্র নিয়ে আগমন করেন নি। তাঁর পূর্বে ও সমসাময়িক অনেক সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস পাপী সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের বৈধতায় বিশ্বাস করেছেন। এ বিষয়ক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার আগে, তাঁর যুগের কাউকে এ মত পোষণের জন্য বিভ্রান্ত বলা যায় না। ইবন হাজার আসকালানী বলেন:

وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الامر على ترك ذلك... بمثل هذا الرأى لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والاتقان والورع التام.

"অস্ত্রে বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ জালিম-ফাসিক শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ বলে বিশ্বাস করতেন। প্রাচীন সালফ সালিহীনের মধ্যে এ মতটি বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে এটি বর্জন করার বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।...যার সততা প্রমাণিত এবং হাদীস মুখস্থ রাখা ও পরিপূর্ণ তাকওয়ার বিষয়ে যিনি প্রসিদ্ধ এ মতটি তাঁর ত্রুটি প্রমাণ করে না।"[৭০]

১১. হাদীস বিষয়ক অভিযোগ

ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হাদীস বিষয়ক অভিযোগ দ্বিবিধ: (১) তিনি হাদীসের জ্ঞান ও বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন এবং (২) তিনি হাদীস বিরোধী ফিকহের জনক ছিলেন। ইনশা আল্লাহ, দ্বিতীয় বিষয়টি আমরা ফিকহ বিষয়ক অভিযোগ প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এখানে আমরা প্রথম বিষয়টি আলোচনা করতে চাই।

আমরা বলেছি যে, তৃতীয় শতক থেকে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা বিরোধী প্রচারণা ছিল ব্যাপক। তারপরও আমরা দেখি যে, তৃতীয় শতকের প্রথম দিকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও জারহ-তাদীল বিশেষজ্ঞগণ তাঁর নির্ভরযোগ্যতার কথা বলেছেন। পরবর্তীগণ তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন।

১১. ১. ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন (১৫৮-২৩৩ হি)

ইতোপূর্বে ইবন মায়ীন (রাহ)-এর কথায় আমরা দেখেছি যে, তাঁর যুগেই মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করতেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, তাঁর যুগেই মুতাযিলী বিরোধিতা, মুরজিয়া বিরোধিতা, বিদআতী আকীদা বিরোধিতা ও হাদীস অস্বীকার বিরোধিতার নামে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা তুঙ্গে উঠেছে। ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে ইবন মায়ীনের গ্রন্থে ও তাঁর থেকে বর্ণিত বক্তব্যগুলোতে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো দেখি:

(ক) তিনি পূর্ববর্তী আলিমগণ থেকে ইমাম আবূ হানীফার পক্ষে কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এরূপ একটি বর্ণনা নিম্নরূপ:

يحيى بن ضريس يقول شهدت سفيان وأتاه رجل (رجل له مقدار في العلم والعبادة) فقال ما تنقم على أبي حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه إنصاف وحجة: آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ (والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات) فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة آخذ بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فإذا ما انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن ... فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا قال فسكت سفيان طويلا ثم قال ... نسمع التشديد من الحديث فنخافه ونسمع اللين فنرجوه لا نحاسب الأحياء ولا نقضي على الأموات نسلم ما سمعنا ونكل ما لم نعلم إلى عالمه ونتهم رأينا لرأيهم

"ইয়াহইয়া ইবন দুরাইস বলেন, আমি সুফইয়ান সাওরীর কাছে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় একব্যক্তি তাঁর নিকট আসলেন, যিনি

ইলম ও ইবাদতে বড় মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি কেন আবূ হানীফার প্রতি বিরক্ত? তিনি বলেন: কেন? তাঁর কি হয়েছে? লোকটি বলে: আমি তাঁকে যা বলতে শুনেছি তা ইনসাফ ও দলিলপূর্ণ। তিনি বলেন: "আমি আল্লাহর কিতাবের উপর নির্ভর করি। আল্লাহর কিতাবে যা না পাই সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সুন্নাত ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের সূত্রে নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করি। কিতাব ও সুন্নাতে যা না পাই সে বিষয়ে সাহাবীগণের বক্তব্যের উপর নির্ভর করি। তাঁদের মধ্য থেকে যার মত ইচ্ছা গ্রহণ করি এবং যার মত ইচ্ছা বাদ দেই, তবে তাঁদের মত ছেড়ে অন্য কারো কথার দিকে যাই না। আর যখন বিষয়টি ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, ইবন সীরীন, ... তাবিয়ীদের পর্যায়ে আসে তখন তাঁরা যেমন ইজতিহাদ করেছেন আমিও তেমন ইজতিহাদ করি।" এ কথা শুনে সাওরী দীর্ঘসময় চুপ করে থাকেন। ... এরপর বলেন: আমরা অনেক সময় কঠিন বা খারাপ কথা শুনি, তখন তাতে ভীত হই, কখনো নরম কথা শুনি তখন আশাবাদী হই। আমরা জীবিতদের হিসাব লই না এবং মৃতদের বিচারও করি না। যা শুনি তা মেনে নিই এবং যা না জানি তা যিনি জানেন তার উপর ছেড়ে দিই। তাঁদের মতের বিপরীতে আমাদের মতকেই অভিযুক্ত করি।"[৭১]

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, অনেক সময় মানুষেরা ইমাম সাওরীর কাছে যেয়ে, ইমাম আবূ হানীফার নামে এমন সব কথা বলত যে তিনি তাঁর ঈমানী চেতনায় ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে বিরূপ মন্তব্য করতেন। আবার যখন তিনি ভাল কথা শুনতেন তখন তাঁর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করতেন। ইবন মায়ীন শুধু ভাল বিষয়ই উল্লেখ করেছেন।

(খ) তিনি তাঁর উস্তাদ দ্বিতীয় শতকের জারহ-তাদীলের ইমাম ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ আল-কাত্তান থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি আবূ হানীফার প্রশংসা করতেন এবং ফিকহী মতে তাঁর অনুসরণ করতেন। এ বিষয়ক একটি উদ্ধৃতি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। অন্য বক্তব্যে ইবন মায়ীন বলেন: আমি ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ আল-কাত্তানকে বলতে শুনেছি:

لا نكذب الله ربما رأينا الشيء من رأى أبي حنيفة فاستحسناه فقلنا به

"আমরা আল্লাহকে মিথ্য বলব না, অনেক সময় আমরা আবূ হানীফার মতের কিছু বিষয় দেখি যা আমাদের ভাল লাগে, তখন আমরা সে কথা মতই ফাতওয়া প্রদান করি।"[৭২]

(গ) ইবন মায়ীন নিজেও ইমাম আবূ হানীফার ফিকহের অনুসারী বা ভক্ত ছিলেন। তাঁর ছাত্র আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ আদ-দূরী (১৮৩-২৭১হি) বলেন:

قال يحيى قال ابن وهب عن مالك بن أنس في المرأة يكون وليها ضعيفا أو يكون غائبا أو لا يكون لها ولي فتولي أمرها رجلا فيزوجها قال جائز وقال ابن وهب لا إلا بولي قلت ليحيى هذا يوافق قول أبي حنيفة قال نعم يعنى قول مالك.

ইয়াহইয়া বলেন: (মিসরের প্রসিদ্ধ ফকীহ আব্দুল্লাহ) ইবন ওয়াহব (১৯৭ হি) মালিক ইবন আনাস (১৭৯ হি) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোনো মহিলার অভিভাবক দুর্বল হয় বা অনুপস্থিত থাকে, অথবা তার অভিভাবক না থাকে এবং সে মহিলা অন্য কোনো পুরুষকে দায়িত্ব প্রদান করে এবং সে তার বিবাহ সম্পাদন করে তবে সে বিবাহ বৈধ হবে। আর ইবন ওয়াহাবের নিজের মত হলো, এ বিবাহ বৈধ হবে না, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না। তখন আমি ইয়াহইয়া ইবন মায়ীনকে বললাম, মালিকের এ মত কি আবূ হানীফার মতের সাথে মিলে? তিনি বললেন: হ্যাঁ।"[৭৩]

এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ইবন মায়ীন ইমাম আবূ হানীফার ফিকহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত হতেন, যে কারণে কোনো বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব জানতে তাঁকে প্রশ্ন করা হতো।

(ঘ) ৪র্থ-৫ম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ হুসাইন ইবন আলী সাইমারী (৩৫১-৪৩৬হি) তাঁর সনদে উদ্ধৃত করেন, ইবন মায়ীন বলেন:

القراءة عندي قراءة حمزة والفقه فقه أبي حنيفة على هذا أدركت الناس

"আমার মতে কিরাআত হলো হামযার কিরাআত এবং ফিকহ হলো আবূ হানীফার ফিকহ। আমি মানুষদেরকে এ সিদ্ধান্তের উপরেই পেয়েছি।"[৭৪]

এ উক্তি থেকেও জানা যায় যে, ইবন মায়ীন হানাফী ফিকহকেই অনুকরণীয় বিশুদ্ধ ফিকহ বলে গণ্য করতেন।

(ঙ) ৪র্থ শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আযদী (৩৭৪ হি) ও ৫ম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবন আব্দুল বারর (৩৬৮-৪৬৩ হি) তাঁদের সনদে উদ্ধৃত করেছেন:

قال يحيى: وقد سمعت من أبي يوسف الجامع الصغير

"ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন, আমি আবূ ইউসূফের নিকট থেকে "জামি সাগীর" গ্রন্থটি শুনেছি।"[৭৫]

"জামি সাগীর" হানাফী ফিকহের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ, যাতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী (১৩১-১৮৯ হি) ইমাম

Contents

আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ ও তাঁর নিজের ফিকহী মতামত সংকলন করেন। এ কথাটিও প্রমাণ করে যে, ইবন মায়ীন হানাফী ফিকহের প্রতি আকৃষ্ট ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

(চ) তিনি ইমাম আবূ হানীফার নির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেন। আযদী ও ইবন আব্দুল বারর তাঁদের সনদে উদ্ধৃত করেছেন:

قيل ليحيى بن معين: أيما أحب إليك أبو حنيفة أو الشافعي ...؟ فقال: أما الشافعي فلا أحب حديثه، وأما أبو حنيفة فقد حدث عنه قوم صالحون، وأبو حنيفة لم يكن من أهل الكذب وكان صدوقا، ولكن ليس أرى حديثه يجزئ.

"ইবন মায়ীনকে বলা হয়: আপনার নিকট কে প্রিয়তর? আবূ হানীফা, না শাফিয়ী...? তিনি বলেন: শফিয়ীর বিষয় হলো, তাঁর হাদীস আমি পছন্দ করি না। আর আবূ হানীফার বিষয় হলো, তাঁর থেকে অনেক নেককার মানুষ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হানীফা মিথ্যাবাদী ছিলেন না। তিনি সত্যপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর হাদীস যথেষ্ট নয়।"[৭৬]

এখানে ইবন মায়ীন বলছেন যে, তিনি ইমাম শাফিয়ীর হাদীস পছন্দ করেন না, বরং হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে ইমাম আবূ হানীফা শক্তিশালী ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এরপরও বলছেন যে, তাঁর হাদীস যথেষ্ট নয়। এ বক্তব্যকে ইমাম শাফিয়ীর অগ্রহণযোগ্যতা ও ইমাম আবূ হানীফার গ্রহণযোগ্যতা বা দুর্বলতার দলীল হিসেবে পেশ করা ঠিক নয়। কিয়াসপন্থী রাবীয়াহ, কাযী মুহাম্মাদ ইবন হাযম, ইমাম জাফর সাদিক সম্পর্কে ইবন উয়াইনাহর বক্তব্য এবং ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে ইবনুল মুবারাকের বক্তব্যের অর্থ আর এ বক্তব্যের অর্থ একই বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ ফিকহী বিষয়ে ব্যস্ততার কারণে মুহাদ্দিসদের তুলনায় তাঁদের হাদীসে ভুলভ্রান্তি বেশি হতো অথবা তাঁদের বর্ণিত হাদীসের পরিমাণ কম ছিল। এর মধ্যে ইবন মায়ীনের দৃষ্টিতে ইমাম আবূ হানীফা ইমাম শাফিয়ীর চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

(ছ) ইবন আদী (৩৬৫ হি) ও খতীব বাদগাদী (৪৬৩ হি) আহমদ ইবন সাদ ইবন আবী মরিয়ম (২৫৩ হি) থেকে উদ্ধৃত করেছেন:

سألت يحيى بن معين عن أبى حنيفة قال لا تكتب حديثه

"আমি ইয়াহইয়া ইবন মায়ীনকে আবূ হানীফার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তুমি তাঁর হাদীস লিখ না।"[৭৭]

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, ইবন মায়ীন আবূ হানীফাকে দুর্বল বলে গণ্য করছেন।[৭৮] পক্ষান্তরে শাইখ আব্দুর রাহমান ইবন ইয়াহইয়া মুআল্লিমী (১৩৮৬ হি) বলেন:

(لا تكتب حديثه) ليست بصريحة في الجرح فقد يكون ابن معين ... علم أن أحمد قد استكثر من سماع الحديث ويمكنه أن يشتغل بما هو أنفع له من تتبع أحاديث أبي حنفية

"(তুমি তাঁর হাদীস লিখ না) এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে দুর্বলতা প্রকাশক নয়। হতে পারে যে, ইবন মায়ীন জানতেন যে, ইবন আবী মরিয়ম হাদীস শিক্ষায় অনেক অগ্রবর্তী, কাজেই আবূ হানীফার বর্ণিত হাদীস অনুসন্ধান না করে অন্যান্য উপযোগী বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া তাঁর জন্য সম্ভব।"[৭৯]

অর্থাৎ ফিকহে অত্যধিক ব্যস্ততার কারণে ইমাম আবূ হানীফার বর্ণিত হাদীস তুলনামূলকভাবে কম। কাজেই ইবন মায়ীনের মতে ইবন আবী মরিয়মের জন্য তাঁর হাদীস না লিখলেও চলবে। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফার মুহাদ্দিস ছাত্রদের সংখ্যা এবং তাঁর কিতাবুল আসার ও মুসনাদ গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাঁর বর্ণিত হাদীস তাঁর প্রজন্মের মুহাদ্দিসদের তুলনায় কম ছিল না।

(জ) ইবন মায়ীনের মারিফাতুর রিজাল গ্রন্থের বর্ণনাকারী তাঁর ছাত্র আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন কাসিম ইবন মুহরিয বলেন:

سمعت يحيى بن معين يقول كان أبو حنيفة لا بأس به وكان لا يكذب ... وسمعت يحيى يقول مرة أخرى أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا

"আমি ইয়াহইয়া ইবন মায়ীনকে বলতে শুনেছি, আবূ হানীফার বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। তিনি মিথ্যা বলতেন না। ... আমি ইয়াহইয়াকে অন্য একবার বলতে শুনেছি: আবূ হানীফা আমাদের নিকট সত্যপরায়ণ, তাঁকে মিথ্যায় অভিযুক্ত করা হয় নি। (ইরাকের উমাইয়া গভর্নর) ইবন হুবাইরা (১৩২ হি) তাঁকে বিচারক পদ গ্রহণে বাধ্য করতে প্রহার করেন; তা সত্ত্বেও তিনি বিচারকের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।"[৮০]

এ কথাগুলোও বাহ্যত উপরের অর্থেই, তবে অধিক শক্তিশালী। কারণ মুহাদ্দিসগণ জানেন যে, ইবন মায়ীনের পরিভাষায়

"আপত্তি নেই" অর্থ তিনি 'সিকাহ' বা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।[৮১]

(ঝ) ইবন আব্দুল বার্র (৩৬৮-৪৬৩ হি) তাঁর সনদে ইবন মায়ীনের ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (২৭৬ হি) থেকে উদ্ধৃত করেন:

سئل يحيى بن معين وأنا اسمع عن أبى حنيفة فقال ثقة ما سمعت أحدا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب اليه أن يحدث ويأمره وشعبة شعبة

"আমার উপস্থিতিতে ইয়াইয়া ইবন মায়ীনকে আবূ হানীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, আমি শুনছিলাম, তিনি বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত। কেউ তাঁকে দুর্বল বলেছেন বলে আমি শুনি নি। এ তো শুবা ইবনুল হাজ্জাজ, তিনি আবূ হানীফাকে হাদীস বর্ণনা করতে লিখেন এবং অনুরোধ করেন। আর শুবা তো শুবাই।"[৮২]

এখানে খুব স্পষ্ট করে ইবন মায়ীন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁকে দুর্বল বলেছে এমন একজনকেও তিনি জানেন না। উপরন্তু শুবার মতকে তিনি প্রমাণ হিসেবে পেশ করছেন।

(ঞ) ইমাম মিয্যী (৭৪২হি), ইমাম যাহাবী (৭৪৮ হি), ইবন হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) প্রমুখ রিজালবিদ ইবন মায়ীনের ছাত্র মুহাম্মাদ ইবন সাদ আল-আউফী থেকে উদ্ধৃত করেন, আমি ইবন মায়ীনকে বলতে শুনেছি:

كان أبو حنيفة ثقة في الحديث، كان لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ.

"আবূ হানীফা হাদীসে নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত ছিলেন। যে হাদীস তাঁর মুখস্থ সে হাদীস ছাড়া কোনো হাদীস তিনি বলতেন না। যা তাঁর মুখস্থ নয় তা তিনি বলতেন না।"

এছাড়া তাঁরা ইবন মায়ীনের অন্য ছাত্র সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আসাদী জাযরাহ (২৯৩ হি) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন, ইবন মায়ীন বলেন:

كان أبو حنيفة ثقةً في الحديث

"আবূ হানীফা হাদীসে নির্ভরযোগ্য ছিলেন।"[৮৩]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইবন মায়ীন সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ববর্তী কোনো মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফাকে দুর্বল বলেন নি। অধিকাংশ বক্তব্যে তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। কখনো বা তাঁকে কিছুটা দুর্বল বলেছেন। বাহ্যত এ দুর্বলতা ফিকহী বিষয়ে ব্যস্ততার জন্য হাদীস বর্ণনায় গুরুত্ব কম দেওয়ার কারণে। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম শাফিয়ীর চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে ইবন মায়ীন বলেছেন।

১১. ২. ইবনুল মাদীনী: আলী ইবন আব্দুল্লাহ (১৬১-২৩৪হি)

তৃতীয় শতকের জারহ-তাদীলের অন্য দিকপাল ইমাম ইবনুল মাদীনী (রাহ)। আয্দী ও ইবন আব্দুল বার্র তাঁদের সনদে উদ্ধৃত করেছেন, ইবনুল মাদীনী বলেন:

أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به.

"আবূ হানীফা থেকে সুফইয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, হাম্মাদ ইবন যাইদ, হুশাইম, ওকী ইবনুল জার্রাহ, আব্বাদ ইবনুল আউয়াম, জাফর ইবন আউন প্রমুখ হাদীস শিক্ষা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য, তাঁর বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই।"[৮৪]

এখানে ইবনুল মাদীনী নিজে ইমাম আবূ হানীফাকে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করা ছাড়াও অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন এরা সকলেই দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ও জারহ-তাদীলের ইমাম ছিলেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁদের হাদীস গ্রহণ করেছেন। এরা সকলেই ইমাম আবূ হানীফা থেকে হাদীস শিখেছেন। এর অর্থ দ্বিতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফাকে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস বলে গণ্য করতেন। আমরা দেখেছি যে, ইবন মায়ীনও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন: "আবূ হানীফা থেকে অনেক নেককার মানুষ হাদীস শিক্ষা করেছেন।"

অন্য বর্ণনায় ইবনুল মাদীনী ইমাম আবূ হানীফাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। খতীব বাগদাদী ইবনুল মাদীনীর ছেলে আব্দুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন:

سألته يعني أباه عن أبي حنيفة صاحب الرأي فضعفه جدا وقال ... وروى خمسين حديثا أخطأ فيها

আমি আমার পিতা ইবনুল মাদীনীকে 'রায়' বা 'কিয়াসপন্থী' আবূ হানীফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি তাঁকে খুব দুর্বল বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন: তিনি ৫০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোতে ভুল করেছেন।"[৮৫]

উভয় বক্তব্যের মধ্যে দূরত্ব স্পষ্ট। আমরা জানি না কোন্‌টি তাঁর সর্বশেষ বক্তব্য। তবে বাহ্যত "কিয়াসপন্থী" হওয়া তাঁর প্রতি মুহাদ্দিসদের বিরক্তির অন্যতম কারণ।

১১. ৩. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল (১৬৪-২৪১ হি)

ইমাম আহমদ (রাহ)ও 'কিয়াসপন্থী' হওয়ার কারণে ইমাম আবূ হানীফার উপরে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর পুত্র বলেন: আমার পিতাকে প্রশ্ন করা হয়, এক স্থানে কিয়াসপন্থীরা রয়েছেন এবং কয়েকজন হাদীসপন্থী রয়েছেন যারা হাদীসের সহীহ-যয়ীফ বুঝেন না, সেখানে যদি কেউ দীন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চায় তবে কাকে প্রশ্ন করবে? তিনি বলেন:

يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل اصحاب الرأي الضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة... حديث أبي حنيفة ضعيف ورأيه ضعيف

"মুহাদ্দিসদেরকে প্রশ্ন করবে, কিন্তু কিয়াসপন্থীদেরকে (ফকীহদেরকে) প্রশ্ন করবে না; আবূ হানীফার কিয়াসের চেয়ে যয়ীফ হাদীস উত্তম .... আবূ হানীফার হাদীস যয়ীফ এবং তাঁর রায় (ফিকহী মত)-ও যয়ীফ।"[৮৬]

ইমাম আহমদ অন্যত্র বলেন:

وكنا نلعن أصحاب الرأي ويلعوننا حتى جاء الشافعي، فخرج بيننا.

"আমরা 'রায়'-পন্থী বা কিয়াসপন্থীদেরকে (ফকীহদেরকে) অভিশাপ করতাম এবং তাঁরাও আমাদেরকে অভিশাপ করতেন। এরপর শাফিয়ী আমাদের কাছে আসলেন, তখন তিনি আমাদের মধ্যে যোগসূত্র গড়লেন।"[৮৭]

অর্থাৎ হাদীস ও ফিকহের মধ্যে তথাকথিত যে শত্রুতা ছিল ইমাম আহমদ তাতে প্রভাবিত ছিলেন। ইমাম শাফিয়ীর সাথে সাক্ষাত ও শিক্ষা গ্রহণের পর তাঁর এ ভিত্তিহীন বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফিয়ীও আহল রায় হিসেবে মুহাদ্দিসদের বিরাগভাজন হয়েছেন। ইবন মায়ীনের অভিযোগ আমরা দেখেছি। বুখারী ও মুসলিম তাঁর হাদীস প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন নি। ফিকহী ব্যস্ততার কারণে হাদীস বিষয়ে তাঁর অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যক্ত করে তিনি ইমাম আহমদকে বলেন:

أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه

"সহীহ হাদীসের বিষয়ে আপনারা-মুহাদ্দিসগণ আমাদের-ফকীহগণের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ। যদি কোনো সহীহ হাদীস থাকে তবে আমাকে জানান, যেন আমি তা গ্রহণ করতে পারি।[৮৮]

এখানে অন্য আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের উপর নির্মম অত্যাচারের হোতা মুতাযিলী গুরু, খলীফা মামুন, মু'তাসিম ও ওয়াসিকের প্রধান মন্ত্রণাদাতা বিচারপতি আহমদ ইবন আবী দুওয়াদ ছিলেন প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ। তার উপস্থিতিতে এবং বারবার তারই ইন্ধনে খলীফা মু'তাসিম ইমাম আহমদকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেন। তৎকালীন সময়ের মুতাযিলীগণ সকলেই ফিকহী বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার অনুসরণ করতেন এবং আকীদার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁদের পক্ষে ছিলেন বলে প্রমাণের চেষ্টা করতেন। কাজেই ইমাম আহমদের মনে সামগ্রিকভাবে হানাফী ফকীহগণ, হানাফী ফিকহ ও ইমাম আবূ হানীফার প্রতি বিরক্তি ও ক্ষোভ থাকাই স্বাভাবিক।

১১. ৪. ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি)

ইমাম বুখারী মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ। সহীহ বুখারী ছাড়াও হাদীস বর্ণনাকারী রাবী ও মুহাদ্দিসগণের গ্রহণযোগ্যতা, দুর্বলতা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রাবীগণের সমালোচনায় ইমাম বুখারীর দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়:

প্রথমত: পরিভাষার বিনম্রতা। অন্যান্য মুহাদ্দিস যাকে "মিথ্যাবাদী" বা "জালিয়াত" বলেছেন, তিনি তার বিষয়ে বলেছেন: "তার বিষয়ে আপত্তি আছে", "আপত্তিকর", "পরিত্যক্ত", তাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন", "তার বিষয়ে তারা নীরব থেকেছেন", "মুখ ফিরিয়েছেন" ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: সমালোচনার বিনম্রতা। অন্যান্য মুহাদ্দিস যাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল বা মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করেছেন, তাদের অনেককে তিনি অল্প দুর্বল বা কোনো রকম গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

এ বিনম্র সমালোচক ইমাম আবূ হানীফার ক্ষেত্রে বিনম্রতা রাখতে পারেন নি। তিনি 'আত-তারীখ আস-সগীর' গ্রন্থে তাঁর উস্তাদ নুআইম ইবন হাম্মাদ (২২৮ হি)-এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।[৮৯] একটি বক্তব্য দেখুন:

حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفزاري قال كنت عند سفيان فنعى النعمان فقال الحمد لله كان ينقض الاسلام عروة عروة ما ولد في الاسلام أشأم منه

"আমাদেরকে নুআইম ইবন হাম্মাদ বলেন, আমাদেরকে আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ফাযারী বলেন, আমি

সুফইয়ান সাওরীর কাছে ছিলাম, এমতাবস্থায় নু'মানের মৃত্যু সংবাদ আসল। তখন তিনি বলেন: আল-হামদু লিল্লাহ, সে ইসলামকে ধ্বংস করত, একটি একটি করে রশি ছিন্ন করে!! ইসলামের মধ্যে তার চেয়ে অধিক অশুভ আর কেউ জন্মগ্রহণ করে নি।"[৯০]

এ কাহিনীর বর্ণনাকারী নুআইম ইবন হাম্মাদ সুন্নাতের পক্ষে এবং বিদআতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। হানাফীদেরকে তিনি বিদআতী, মুতাযিলী, মুরজিয়া, এবং হাদীস বিরোধী কিয়াস পন্থী 'আহলুর রায়' বলে প্রচার করতেন। এজন্য জাল-জালিয়াতিও তিনি পরোয়া করতেন না। কিয়াস-পন্থীদেরকে বা হানাফীদেরকে ৭৩ ফিরকার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফিরকা বলে উল্লেখ করে একটি হাদীস তিনি বর্ণনা করেন। মুহাদ্দিসগণ একমত যে হাদীসটি ভিত্তিহীন জাল। তবে অনেক মুহাদ্দিস তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত বলেছেন যে, তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুল করেছেন। অন্য অনেকে বলেছেন এটি তার জালিয়াতি। তাঁর সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেন:

كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات في ثلب أبي حنيفة كلها كذب

"তিনি সুন্নাতকে শক্তিশালী করার জন্য জাল হাদীস তৈরি করতেন এবং আবূ হানীফার নিন্দায় কাহিনী তৈরি করতেন যা সবই মিথ্যা।"[৯১]

নুআইমের এ বর্ণনা সত্য হলে ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতা প্রমাণ হতো না, সুফিয়ান সাওরীর দুর্বলতা প্রমান হতো। আমাদেরকে বলতে হতো, সুফইয়ান সাওরী এ কথা বলে পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন। কারণ কোনো মানুষকে 'অশুভ' বলা হাদীসে নিষিদ্ধ হারাম। কোনো ব্যক্তির কর্মের বা মতের দলিলভিত্তিক সমালোচনা করা যায়। কিন্তু কোনো আলিম তো দূরের কথা একজন সাধারণ পাপী মুসলিমকেও "অশুভ" বলা বা এভাবে ঢালাও অভিযোগ করা বৈধ নয়। তবে বাহ্যত এ কাহিনী সত্য নয় বরং নুআইম ইবন হাম্মাদের বানানো। আল্লাহ আমাদেরকে ও পূর্ববর্তী আলিমদেরকে ক্ষমা করুন এবং দীনের জন্য তাঁদের খিদমাত কবুল করুন।

"আত-তারীখ আল-কাবীর" গ্রন্থে ইমাম বুখারী বলেন:

نعمان بن ثابت أبو حنيفة ... كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه

"নুমান ইবন সাবিত আবূ হানীফা কূফী ... তিনি মুরজিয়া ছিলেন; তাঁরা (মুহাদ্দিসগণ) তাঁর থেকে, তাঁর মত থেকে এবং তাঁর হাদীস থেকে নীরব হয়েছেন।"[৯২]

অন্যত্র কাযি আবূ ইউসূফের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف القاضي ... وصاحبه أبو حنيفة تركوه

"ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম কাযী আবূ ইউসূফ ... তাঁর সাথী আবূ হানীফাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন।"[৯৩]

এখানে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনাযোগ্য:

(১) ইমাম বুখারী বলেছেন যে, মুহাদ্দিসগণ আবূ হানীফা থেকে নীরব হয়েছেন। ইমাম বুখারীর পরিভাষায় "নীরব থাকা"-র অর্থ মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফাকে পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁরা তাঁকে মিথ্যাবাদী পর্যায়ের বলে গণ্য করেছেন।

(২) ইমাম বুখারীর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় ইমাম আবূ হানীফার একমাত্র অপরাধ যে, তিনি মুরজিয়া ছিলেন, যে কারণে মুহাদ্দিসগণ তাঁকে, তাঁর ফিকহী মত এবং 'তাঁর বর্ণিত হাদীস' পরিত্যাগ করেছেন। মুরজিয়া হওয়া ছাড়া অন্য কোনো অপরাধের কথা তিনি উল্লেখ করেন নি।

আবূ হানীফা মুরজিয়া ছিলেন কিনা তা আমরা পরে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তবে মুরজিয়া হওয়ার কারণে কোনো মুহাদ্দিস দুর্বল বা পরিত্যাক্ত হন না। নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সততা ও বর্ণিত হাদীসের নির্ভুলতা প্রমাণ করা মুহাদ্দিসের গ্রণযোগ্যতার মূল ভিত্তি। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে অনেক মুরজিয়া, কাদারিয়া, খারিজী ও অন্যান্য ফিরকার মুহাদ্দিসের হাদীস সংকলন করেছেন। এখানে ইমাম আবূ হানীফার পূর্বের ও সমসাময়িক অল্প কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুরজিয়া মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করছি যাদের বর্ণিত হাদীস বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন।

(১) বসরার তাবিয়ী তাল্ক ইবন হাবীব আল-আনাযী (৯০ হি)।
(২) কুফার তাবি-তাবিয়ী যার্র ইবন আব্দুল্লাহ মুরহাবী (১০০ হি)
(৩) কুফার তাবি-তাবিয়ী কাইস ইবন মুসলিম আল-জাদালী (১২০হি)
(৪) কূফার তাবিয়ী আমর ইবন মুর্রা জামালী (১২৮ হি)
(৪) কুফার তাবিয়ী খালিদ ইবন সালামাহ ইবনুল আস আল-ফা'ফা' (১৩২ হি)।
(৫) হার্রানের তাবি-তাবিয়ী সালিম ইবন আজলান আল-আফতাস (১৩২ হি)
(৬) কুফার তাবিয়ী আসিম ইবন কুলাইব আল-জারমী (১৩৫ হি)।
(৭) কুফার তাবি-তাবিয়ী উমার ইবন যুর্র ইবন আব্দুল্লাহ (১৫৩ হি)

এদের সকলেই মুরজিয়া ছিলেন, কেউ মুরজিয়াদের নেতা ছিলেন, কাউকে সমকালীন কোনো কোনো মুহাদ্দিস পরিত্যাগ করেছেন।

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এদের বর্ণিত হাদীস এবং এদের মত শতশত মুরজিয়া মুহাদ্দিসের হাদীস সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৯৪]

ইমাম মিয্যীর তাহযীবুল কামাল, হাফিয ইবন হাজারের তাহযীবুত তাহযীব ও অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে আমরা এরূপ শতশত রাবীর পরিচয় পাই, যারা মুরজিয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস একারণে তাকে "পরিত্যাগ" করলেও সামগ্রিক বিচারে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে নিশ্চিত করেছেন। ইমাম বুখারীর অনেক উসতাদও মুরজিয়া বলে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

(৩) ইমাম বুখারীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সকল মুহাদ্দিস আবূ হানীফাকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি বলতে পারতেন, অমুক অমুক মুহাদ্দিস তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, তাহলে ইলমের আমানত আদায় হতো। অন্য অনেকের ক্ষেত্রেই তিনি এরূপ বলেছেন। কিন্তু আবূ হানীফার ক্ষেত্রে তা না বলে তিনি বললেন: মুহাদ্দিসগণ তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। আমরা দেখেছি যে, শুবা, ইবনুল মুবারাক, ইসরাঈল ইবন ইউনূস, ইয়াহইয়া ইবন আদাম, হাসান ইবন সালিহ, ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ আল-কাত্তান, ইবন মাহদী, আবূ দাউদ খুরাইবী, প্রমুখ জারহ-তাদীলের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম সুস্পষ্টভাবে তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। এমনকি ইমাম বুখারীর উসতাদ ইবন মায়ীন ও ইবনুল মাদীনী তাকে বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ইবন মায়ীন বলেছেন যে, তিনি একজনকেও আবূ হানীফাকে দুর্বল বলতে শুনেন নি। তাহলে কে তাঁকে পরিত্যাগ করল? আমরা দেখেছি যে, তৃতীয় শতকের কেউ কেউ তাঁকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারীর পূর্বে কেউই তাকে পরিত্যক্ত বলেন নি।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তৃতীয় শতকের 'আবূ হানীফা বিরোধী' যে প্রচারণার কথা আমরা বলেছি, যে প্রচারণার অন্যতম এক দিকপাল ছিলেন ইমাম বুখারীর এক উস্তাদ নুআইম ইবন হাম্মাদ, সে প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে ইমাম আবূ হানীফার প্রতি ইমাম বুখারী অত্যন্ত বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর মন্তব্যে তাঁর মনের এ গভীর বিরক্তি ও আপত্তিই প্রকাশ পেয়েছে। নিরপেক্ষ জ্ঞানবৃত্তিক বিচারে ইমাম বুখারীর কথা মোটেও ঠিক নয়। আবূ হানীফাকে কখনোই সকল মুহাদ্দিস পরিত্যাগ করেন নি। এমনকি একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক মুহাদ্দিসও তাঁকে "পরিত্যক্ত" বলেন নি। মহান আল্লাহ তাঁর দীন ও তাঁর নবীর (ﷺ) সুন্নাতের খিদমাতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম বুখারীর অবদান কবুল করুন, তাঁদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করুন, তাঁদের উভয়কে উম্মাতের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

প্রসিদ্ধ সৌদি আলিম আলী ইবন নাইফ আশ-শাহূদ জারহ-তাদীলের বিভিন্ন পরিভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন:

ولا يعاب استعمالها منهم فيمن قالوها فيه، إلا قول البخاري في (أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الفقيه): "سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه". فهذه حكاية من البخاري عن أهل الحديث، ومن تأمَّل فاحصاً منصفاً متبرئاً من العصبية وجد هذا القول خطأ، وذلك- بإيجاز- من جهتين :

الأولى: دلالة الاستقراء على أن أهل الحديث قد اختلفت عباراتهم في أبي حنيفة، بين معدِّل وجارح، علماً أن الجرح عند من جرح لم يفسر بسبب حديثه، فكيف سكتوا عنه، وفيهم من أثنى عليه وأطراه ورفع من شأنه .

والثانية: أن عبارات الجارحين وقع فيها من المبالغة والتَّهويل، وذلك بسبب الشِّقاق الذي كان بين أهل الرأي وأهل الحديث في تلك الفترة، علماً بأن كثيراً من تلك الأقاويل لا تصح نسبتها إلى من عزيت إليه.

وأبو حنيفة شغله الفقه عن الحديث، ولعله لو اشتغل به اشتغال كثير من أهل زمانه، لم يمكن مما مُكِّن فيه من الفقه، ومع ذلك فإنه قد روى وحدث، نعم، ليس بالكثير على التحقيق؛ للعلة التي ذكرنا، وهي انصرافه إلى فقه النصوص دون روايتها... وفي طبقات الشافعية للتاج السبكي 188/1 : ... الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته ، وكثر مادحوه وندر جارحه ، وكانت هناك قرينة دالّة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه ...

"(**سكتوا عنه**) 'তাঁরা তার থেকে নীরব হয়েছেন'-এ পরিভাষাটি তারা যাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তাদের ব্যবহার আপত্তিকর নয়। শুধু আপত্তিকর ইমাম ফকীহ আবূ হানীফা নুমান ইবন সাবিত-এর বিষয়ে বুখারীর বক্তব্য: 'তাঁরা তাঁর থেকে, ... নীরব হয়েছেন।' এখানে বুখারী মুহাদ্দিসগণের মত উদ্ধৃত করেছেন। যদি কেউ বিদ্বেষ বা পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ইনসাফের সাথে বিবেচনা করেন তবে তিনি নিশ্চিত হবেন যে, এ কথাটি ভুল। সংক্ষেপে দু কারণে এ কথাটি ভুল:

প্রথমত: মুহাদ্দিসগণের মত একত্র করলে দেখা যায় যে, তাঁর বিষয়ে তাঁদের মতভেদ রয়েছে। কেউ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, কেউ তাঁকে দুর্বল বলেছেন। তবে লক্ষণীয় যে, যারা তাঁকে দুর্বল বলেছেন তাঁরা তাঁর হাদীসের ত্রুটি ব্যাখ্যা করে দুর্বল বলেন নি; তাহলে তাঁরা নীরব থাকলেন কিভাবে? অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর প্রশংসা করেছেন, গুণকীর্তন করেছেন এবং তাঁর উচ্চ

মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: যারা তাঁকে দুর্বল বলেছেন তাঁদের বক্তব্যে অনেক বাড়াবাড়ি ও অতিকথন রয়েছে। এর কারণ 'আহলুর রায়' বা ফকীহগণ ও 'আহলুল হাদীস' বা মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সে যুগে বিদ্যমান মতভেদ ও বিভক্তি। সর্বোপরি এ সকল বক্তব্যের অধিকাংশই সনদ বিচারে সহীহ নয়।

আবূ হানীফা হাদীসের চেয়ে ফিকহ বিষয়ে বেশি মাশগুল থেকেছেন। তিনি যদি তাঁর যুগের মুহাদ্দিসদের মত হাদীস নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তাহলে তিনি ফিকহে যে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন তা হয়ত অর্জন করতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি হাদীস সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন। তবে গবেষণা প্রমাণ করে যে, তাঁর বর্ণিত হাদীস বেশি নয়। এর কারণ আমরা যা বলেছি; অর্থাৎ তিনি হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের পরিবর্তে হাদীসের ফিকহী নির্দেশনা অনুধাবন ও শিক্ষাদানে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করেন।..... (সুপ্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস) তাজুদ্দীন সুবকী (৭২৭-৭৭১ হি) তাঁর 'তাবাকাতুশ শাফিয়ীয়্যাহ ১/১৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন: "... সঠিক কথা হলো, যার ইমামত ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে, যার প্রশংসাকারীর সংখ্যা বেশি, কিন্তু খুব কম ব্যক্তিই তাঁকে দুর্বল বলেছেন, পারিপার্শিক অবস্থা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা তাঁকে দুর্বল বলেছেন তাঁরা মাযহাবী বা মতভেদগত পক্ষপাতের কারণে দুর্বল বলেছেন, তাহলে তাঁর দুর্বলতার বিষয়ে কথিত এ সকল বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।...."[৯৫]

১১. ৫. ইমাম নাসায়ী আহমদ ইবন শুআইব (২১৫-৩০৩ হি)

সময়ের আবর্তনে আবূ হানীফা বিরোধী প্রচারণা বাড়তে থাকে। ফলে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে বিরূপ ধারণা প্রসার পেতে থাকে এবং অনেকেই তাঁর বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। ইমাম নাসায়ী (রাহ) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)–এর বিষয়ে বলেন:

نعمان بن ثابت أبو حنيفة ليس بالقوي في الحديث

"নুমান ইবন সাবিত আবূ হানীফা হাদীসে শক্তিশালী নন।"[৯৬]

তৃতীয় শতকে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে বিদ্যমান 'আবূ হানীফা বিরোধী প্রচারণা' পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম নাসায়ীর এ বক্তব্য ইমাম আবূ হানীফার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে তাঁর সিদ্ধান্ত। ইমাম নাসায়ীর পরিভাষার সাথে পরিচিতরা জানেন যে, (শক্তিশালী নন) বলতে তিনি বুঝান যে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাফিযে হাদীস নন, কিছু ভুল হয়। আর দুর্বল বুঝাতে তিনি 'যয়ীফ' বা 'দুর্বল' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এজন্য রিজাল গ্রন্থসমূহে আমরা দেখি যে, শত শত রাবীকে ইমাম নাসায়ী (শক্তিশালী নন) বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ী নিজে ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস তাঁদের হাদীস সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম নাসায়ী ইমাম আবূ হানীফার হাদীস তাঁর সুনান গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। আর তিনি তাঁর সুনান গ্রন্থে রাবীগণের বিষয়ে বুখারী-মুসলিম সমপর্যায়ের বা কাছাকাছি কড়াকড়ি করতেন বলে প্রসিদ্ধ।[৯৭]

১১. ৬. ইমাম ইবন হিব্বান মুহাম্মাদ আল-বুসতী (৩৫৪ হি)

তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে বিদ্যমান 'আবূ হানীফা' বিরোধী প্রচারণা আরো ব্যাপকতা লাভ করে চতুর্থ শতকে। আমরা দেখি যে, এ শতক থেকে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মাযহাবী তাকলীদ প্রসার লাভ করে এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসই শাফিয়ী মাযহাব অনুসরণ করতেন। তৎকালীন পরিবেশে মাযহাবী কোন্দল দ্বারা তাঁরা কমবেশি প্রভাবিত হতে লাগলেন। এর প্রভাব আমরা তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে দেখতে পাই। এর বড় উদাহরণ ইবন হিব্বান (রাহ)। তিনি ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে বলেন:

وكان رجلا جدلا ظاهر الورع لم يكن الحديث صناعته، حدث بمائة وثلاثين حديثا مسانيد ماله حديث في الدنيا غيرها أخطأ منها في مائة وعشرين حديثا. إما أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الاخبار.

"তিনি একজন ঝগড়াটে-তার্কিক লোক ছিলেন, বাহ্যিক পরহেযগার ছিলেন। হাদীস তাঁর বিদ্যার মধ্যে ছিল না। তিনি মোট ১৩০টি সনদসহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। দুনিয়ায় তাঁর বর্ণিত আর কোনো হাদীস নেই। এগুলির মধ্যে ১২০টি হাদীসে তিনি ভুল করেছেন। না জেনে হয় সনদ উল্টে দিয়েছেন অথবা মতন পাল্টে দিয়েছেন। এভাবে নির্ভুল বর্ণনার চেয়ে ভুল বর্ণনার আধিক্যের কারণে তিনি হাদীস বর্ণনায় পরিত্যক্ত বলে গণ্য হন।"[৯৮]

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন হানাফীদের সাথে শাফিয়ী ফকীহ ইমাম ইবন হিব্বানের অত্যন্ত কঠিন শত্রুতা ছিল। হানাফীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াতে তাদের অত্যাচারও বেশি ছিল। ফলে তিনি ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অত্যন্ত নোংরাভাবে বিষোদ্গার করেছেন। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে বড় বড় বই লিখেছেন এবং "মাজরূহীন" গ্রন্থের সবচেয়ে বড় অনুচ্ছেদটি তিনি ইমাম আবূ হানীফার কলঙ্ক বর্ণনার জন্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি নিজে যে সকল রাবীকে জালিয়াত বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে তাদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কোনো মুহাদ্দিস যখন অন্য

মুহাদ্দিসের 'জারহ' বা ত্রুটি বর্ণনা করেন এবং পারিপার্শিক প্রমাণ থেকে বুঝা যায় যে, তা আকীদা বা মাযহাবী ক্ষোভজড়িত, তাহলে সে 'জারহ' বাতিল বলে গণ্য হয়। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ইমাম সুবকীর বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। সর্বোপরি, ইমাম ইবন হিব্বান (রাহ)-এর বিষয়ে ইলমুল হাদীসের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে তাঁর বক্তব্য, সমালোচনা বা "জারহ' সাধারণভাবে কঠিন যাচাই ছাড়া গৃহীত হয় না। ইমাম যাহাবী প্রায়ই ইবন হিব্বানের বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করেছেন। একস্থানে তিনি বলেন:

ابن حبان ربما قَصَبَ (جَرَحَ) الثقةَ حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه

"ইবন হিব্বান প্রায়ই নির্ভরযোগ্যকে দুর্বল বলেন; এমনকি মনে হয়, তাঁর মাথা থেকে কি বের হচ্ছে তা তিনি নিজেই বুঝেন না।"[৯৯]

১১. ৭. ইমাম ইবন আদী (২৭৭-৩৬৫হি)

এ যুগের অন্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ ইমাম আবূ আহমদ আব্দুল্লাহ ইবন আদী (রাহ)। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর বিষয়ে তিনি বলেন:

وأبو حنيفة له أحاديث صالحة، وعامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات في أسانيدها ومتونها، وتصاحيف في الرجال، وعامة ما يرويه كذلك، ولم يصح له في جميع ما يرويه إلا بضعة عشر حديثاً، وقد روى من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حديث من مشاهير وغرائب، وكله على هذه الصورة؛ لأنه ليس هو من أهل الحديث، ولا يحمل على من تكون هذه صورته في الحديث.

"আবূ হানীফা কিছু গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই ভুল, বিকৃতি, সনদ বা মতনে সংযোজন, রাবীর নামের পরিবর্তন। তাঁর অধিকাংশ হাদীসই এরূপ। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ১৫-২০টি হাদীস সহীহভাবে বর্ণিত। সম্ভবত তিনি পরিচিত ও অপরিচিত সব মিলিয়ে সর্বমোট তিনশতের মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। সবগুলোরই এ অবস্থা; কারণ তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন না। আর হাদীস বর্ণনায় যার এ অবস্থা তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।"[১০০]

পাঠক দেখছেন যে, দুজনের প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে বেজায় ফারাক। এখানে উল্লেখ্য যে, ইবন আদী সাধারণভাবে সুবিবেচক বলে গণ্য এবং তাঁর মতের গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কি এখানে সুবিবেচনার সাথে কথা বলেছেন? প্রসিদ্ধ সৌদি মুহাদ্দিস ও জারহ-তাদীল বিশেষজ্ঞ আলী ইবন নাইফ আশ-শাহূদ ইমাম ইবন আদীর মাযহাবী পক্ষপাতদুষ্ট ও মাযহাবী বিদ্বেষমূলক বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

أو ما قاله في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله... وأبو حنيفة له أحاديث صالحة ... أقول: هذا الكلام غير صحيح، قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ ١/١٦٨: أبو حنيفة الإمام الأعظم ، فقيه العراق ... وكان إماماً ورعاً عالماً عاملاً، متعبدا، كبير الشأن، لا يقبل جوائز السلطان قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس، وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ... عن ابن معين قال: لا بأس به ... قال السبكي في طبقات الشافعية ١/١٩٠: قد عرفناك أن الجارح لا يقبل فيه الجرح وإن فسّره في حق من غلبت طاعاته على معصيته، ومادحوه على ذاميّه ومزكوّه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة تشهد بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري في أبي حنيفة، وابن أبي ذئب وغيره في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه ... إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون... وترجمه الحافظ ابن حجر في التهذيب ترجمة مطولة ولم يذكر رواية واحدة تطعن في روايته وعدالته ، بل أثبت عدالته وثقته ... وهذا هو الحق والمذهب الحنفي مملوء بآلاف الأحاديث المستدل بها على الأبواب وهذا يرد على كل من يطعن في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكل جرح لا يستند إلى أسس موضوعية سليمة مرفوض مهما كان قائله إذ لايعصم عن الخطأ إلا الأنبياء.

"ইবন আদীর পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্যের আরেকটি উদাহরণ ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহুর বিষয়ে তাঁর মন্তব্য। তিনি বলেন: "আবূ হানীফা কিছু গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই ভুল... গ্রহণযোগ্য নয়।" আমি বলব যে, এ কথাটি সঠিক নয়। ইমাম যাহাবী তাযকিরাতুল হুফায গ্রন্থের ১/১৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন: আবূ হানীফা ইমাম আযম, ইরাকের ফকীহ... তিনি ছিলেন ইমাম, অত্যন্ত পরহেযগার, আলিম, আমলকারী, আবিদ, বড় মর্যাদার অধিকারী। তিনি শাসকদের কোনো হাদীয়া গ্রহণ করতেন না। ইবনুল মুবারাক বলেন: আবূ হানীফা মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ। শাফিয়ী বলেন: ফিকহের বিষয়ে মানুষ আবূ হানীফার উপর নির্ভরশীল। ... ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন: তাঁর বিষয়ে আপত্তি নেই। সুবকী 'তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ গ্রন্থে ১/১৯০ পৃষ্ঠায় বলেন: আমরা আপনাকে বলেছি যে, জারহ-তাদীল বিশেষজ্ঞ সমালোচক যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও কারণ উল্লেখ করেও কারো ত্রুটি বর্ণনা করেন তাহলেও তার ত্রুটি বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি উক্ত মুহাদ্দিস তাকওয়া ও সততায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তার নিন্দাকারীর চেয়ে

প্রশংসাকারী এবং অবমূল্যায়নকারীর চেয়ে মূল্যায়নকারীর সংখ্যা বেশি হয়, যদি অবস্থার আলোকে বুঝা যায় যে, সমালোচক ত্রুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে মাযহাবী কোন্দল, বা জাগতিক কোনো প্রতিযোগিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আর এজন্যই আবূ হানীফার বিষয়ে সুফইয়ান সাওরীর বক্তব্য, মালিকের বিষয়ে ইবন আবী যিব ও অন্যান্যদের বক্তব্য, শাফিয়ীর বিষয়ে ইবন মায়ীনের বক্তব্য, নাসায়ীর বিষয়ে আহমদ ইবন সালিহের বক্তব্য এবং অনুরূপ সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। ... কারণ এমন কোনো ইমাম বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব নেই যার বিষয়ে অন্য কিছু লোক খারাপ মন্তব্য করেন নি বা ধ্বংসাত্মক কথা বলেন নি।' ... ইবন হাজার তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে তাঁর ত্রুটি বর্ণনামূলক একটি বর্ণনাও সংকলন করেন নি; বরং তাঁর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। ... আর এটিই হলো হক্ক বা সত্য। হানাফী মাযহাব হাজার হাজার হাদীস দ্বারা পূর্ণ যেগুলি দ্বারা তাঁরা তাঁদের ফিকহী অধ্যায়গুলিতে প্রমাণ পেশ করেছেন। যারা ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মাযহাবের নিন্দা-মন্দ বলেন তাদের সকলের বক্তব্যই এ বিষয়টি খণ্ডন ও বাতিল করে দেয়। আর যে সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল নয় সে সমালোচনা প্রত্যাখ্যাত, এরূপ সমালোচক যত বড় মর্যাদার অধিকারীই হোন না কেন। কারণ নবীগণ ছাড়া কেউই ভুল থেকে মাসূম বা সংরক্ষিত নন।"[১০১]

আমি ইবন আদীর এ গ্রন্থটির উপরে একটি আরবী প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা জার্নালের ২০০১ সালের জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমি দেখেছি যে, ইবন আদী সাধারণভাবে নিরপেক্ষ হলেও মাযহাবী কোন্দলে খুবই প্রভাবিত ছিলেন। ইমাম শাফিয়ীর ঘনিষ্ঠতম উস্তাদ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী ইয়াহইয়ার (১৮৪ হি) আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখি যে, তিনি একজন মুতাযিলী, শীয়া, রাফিযী, কাদারী ও জাহমী ছিলেন। সকল মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলেছেন এবং মালিক ইবন আনাস, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ইবন মায়ীন, আলী ইবনুল মাদীনী ও অন্যান্য অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। কিন্তু ইমাম ইবন আদী বিভিন্ন অজুহাতে তাকে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।[১০২]

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, তাঁর বংশধর ও অনুসারীদের বিষয়ে তার আক্রোশ খুবই স্পষ্ট।[১০৩] এখানে শুধু ইমাম আবূ হানীফার প্রসঙ্গটি সামান্য পর্যালোচনা করব।

আমরা বলেছি যে, মুহাদ্দিসের মূল্যায়নে মুহাদ্দিসগণ আদালতের সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাইয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এখানে মূল বিষয় মুহাদ্দিস বর্ণিত হাদীসগুলোর তুলনামূলক নিরীক্ষা। একজন মুহাদ্দিস বর্ণিত হাদীসগুলো অন্যান্য মুহাদ্দিসের বর্ণনার সাথে তুলনা করার মাধ্যমে মুহাদ্দিসের নির্ভুল হাদীস বর্ণনা শক্তি নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি অন্যান্য মুহাদ্দিসের মত ও উক্ত মুহাদ্দিসের ছাত্রগণের মান লক্ষ্য রাখা হয়। প্রত্যেক মুহাদ্দিসই কিছু ভুল করেন। যদি তুলনায় দেখা যায় যে, একজন মুহাদ্দিস অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসদের বর্ণনার ব্যক্তিক্রম করেন তবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। এরূপ দুর্বলতার পরিমাণ, অনুপাত ও গভীরতার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসের গ্রহণযোগ্যতা ও দুর্বলতা নির্ধারিত হয়।

এ মূলনীতির ভিত্তিতেই ইবন আদী তাঁর "আল-কামিল" গ্রন্থে রাবীগণের দুর্বলতা প্রমাণের জন্য প্রত্যেক দুর্বল রাবীর বর্ণিত কিছু দুর্বল হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতা প্রমাণ করতে তিনি তাঁর বর্ণিত ছয়টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইবন আদীর দাবি অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা বর্ণিত ৩০০ হাদীসের মধ্যে ২৮০টি ভুল। বাহ্যত এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও নিশ্চিত ভুল এ ছয়টি হাদীসে বিদ্যমান; এজন্যই তাঁর দুর্বলতা প্রমাণে তিনি এগুলো উল্লেখ করেছেন। আমরা এ ছয়টি হাদীস আলোচনা করব।

(ক) ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত প্রথম হাদীস

عن أبى حنيفة عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال من صلى خلف امام كان قرآنه له قراءة

"আবূ হানীফা থেকে, তিনি মূসা ইবন আবী আয়িশা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ থেকে, তিনি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে, তিনি বলেন: যদি কেউ ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে তাহলে ইমামের কুরআন তিলাওয়াতই তার কিরাআত।

ইবন আদী বলেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এ সনদে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ থেকে "মুরসাল" হিসেবে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তাবিয়ী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন। মাঝে সাহাবী জাবিরের (রা) নাম বলেন নি। শুধু ইমাম আবূ হানীফা সাহাবীর নাম বলেছেন। সকল নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে এভাবে সনদের মধ্যে সাহাবীর নাম বৃদ্ধি করা প্রমাণ করে যে, তিনি হাদীস সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে পারতেন না। উপরন্তু ইবন আদী পরোক্ষভাবে জালিয়াতির অভিযোগ করে বলেন:

زاد أبو حنيفة في إسناده جابر بن عبد الله ليحتج به في إسقاط الحمد عن المأمومين... ووافقه الحسن بن عمارة وهو أضعف منه

আবূ হানীফা সনদের মধ্যে জাবির ইবন আব্দুল্লাহকে সংযোজন করলেন; যেন এদ্বারা তিনি মুক্তাদিদের জন্য ফাতিহা পাঠ বাদ দিতে পারেন। .... (সমসাময়িক আরেক প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ফকীহ, বাগদাদের কাযী ও হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত দুর্বল) হাসান ইবন

উমারাহ (১৫৩ হি) তাঁরই মত জাবিরের (রা) নাম উল্লেখ করেছেন, তিনি তো আরো বেশি দুর্বল।"[১০৪]

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ বাদ দিতে কি ইমাম আবূ হানীফার হাদীসের সনদে বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন ছিল? হাদীস ও ফিকহে যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে তিনি জানেন যে, মুরসাল হাদীস, বিশেষত আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (মৃত্যু ৮০ হি)-এর মত প্রথম যুগের প্রসিদ্ধ তাবিয়ীর মুরসাল হাদীস সকল ফকীহের নিকট দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবূ হানীফার যুগে বিষয়টি প্রসিদ্ধ ও ঐকমত্যের বিষয় ছিল।

(২) ইমাম আবূ হানীফা এবং অন্যান্য ইমাম কখনোই সকল মাসআলা হাদীস থেকে গ্রহণ করেন নি। হাদীসের পাশাপাশি সাহাবী ও তাবিয়ীগণের কর্ম ও ফাতওয়ার উপর তাঁরা নির্ভর করেছেন। মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ না করার বিষয়েও ইমাম আবূ হানীফা পূর্ববর্তী কয়েকজন সাহাবী-তাবিয়ীর মতের উপর নির্ভর করেছেন। কাজেই এজন্য মুরসাল হাদীসকে মুত্তাসিল বানানোর কোনো প্রয়োজন তাঁর ছিল না।

(৩) ইমাম আবূ হানীফার কয়েকজন ছাত্র হাদীসটির সনদে জাবিরের (রা) নাম বলেছেন, পক্ষান্তরে ইবনুল মুবারাক হাদীসটি তাঁর সূত্রেই মুরসাল হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় তিনিও হাদীসটি মুরসাল বর্ণনা করতেন।[১০৫] মুত্তাসিল বর্ণনার দোষটি তাঁকে না দিয়ে তাঁর ছাত্রদের দেওয়া যেত। কিন্তু ইবন আদী তাঁকে দোষারোপ করতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন।

(৪) সর্বোপরি হাদীসটি আরো কয়েকজন মুহাদ্দিস সাহাবীর নাম-সহ বর্ণনা করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যদের উস্তাদ, ৩য় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবন মানী (২৪৪ হি) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বলেন:

أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشَرِيْكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

"আমাদেরকে ইসহাক আল-আযরাক বলেন, আমাদেরকে সুফইয়ান ও শারীক বলেন, তাঁরা মূসা ইবন আবী আয়িশা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ থেকে, তিনি জাবির থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: যদি কারো ইমাম থাকে তবে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।"

ইসহাক ইবন ইউসূফ আল-আযরাক (১৯৫ হি) বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, তিনি হাদীসটি সুফইয়ান ও শারীকের সূত্রে ইমাম জাবিরের (রা) নাম-সহ বর্ণনা করেছেন। তাহলে আবূ হানীফা ছাড়াও সুফইয়ান সাওরী ও শারীক এ বর্ণনায় হাদীসটি মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন। এজন্য ইমাম বূসীরী বলেন, হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ[১০৬]। এছাড়া মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি হাসান ইবন সালিহ থেকে লাইস ইবন আবী সুলাইম ও জাবির আল-জুফী থেকে আবুয যুবাইর থেকে জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবির আল-জুফী খুবই দুর্বল রাবী, তবে লাইস ইবন আবী সুলাইম কিছুটা দুর্বল হলেও তাঁর হাদীস ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন।[১০৭] ইবন আবী শাইবা হাদীসটি সহীহ সনদে জাবির আল-জুফীর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি হাসান ইবন সালিহ থেকে আবুয যুবাইর থেকে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[১০৮]

(খ) ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত দ্বিতীয় হাদীস

عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي كل ركعتين تسليم..، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء"،

আবূ হানীফা থেকে, তিনি আবূ সুফইয়ান থেকে তিনি আবূ নাদরাহ থেকে তিনি আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: 'পবিত্রতা সালাতের চাবি, তাকবীর তার তাহরীম-শুরু, সালাম তার তাহলীল-শেষ, প্রতি দু রাকাতে সালাম, সূরা ফাতিহা ও তার সাথে কিছু (কুরআন তিলাওয়াত) ছাড়া সালাত বৈধ হবে না।"

ইবন আদী বলেন:

زاد أبو حنيفة في هذا المتن: "وفي كل ركعتين تسليم....

'প্রতি দু রাকাতে সালাম' এ কথাটি আবূ হানীফা বাড়িয়েছেন। অর্থাৎ যে সকল নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীসটি এ সনদে বর্ণনা করেছেন তাঁদের বর্ণনায় এ বাক্যটি নেই; শুধু আবূ হানীফা এ কথাটি বাড়িয়েছেন; এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীসের সনদ বা মতন ঠিকমত মুখস্থ রাখতে পারতেন না, অনেক কিছু বেশি কম করে ফেলতেন।[১০৯]

এখানেও ইবন আদী ভুল তথ্য দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা ছাড়াও অন্যান্য রাবী হাদীসটির মধ্যে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ ইয়ালা মাউসিলী আলী ইবন মুসহির থেকে আবূ সুফইয়ান থেকে এ সনদে এ বাক্যসহ হাদীসটি সংকলন

করেছেন।[১১০] আলী ইবন মুসহির বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী।[১১১] এতে প্রমাণ হয় ইমাম আবূ হানীফা হাদীসটি খুব ভালভাবেই মুখস্থ রেখেছিলেন।

ইমাম বাইহাকী বলেন:

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لأَبِى حَنِيفَةَ : مَا يَعْنِى فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ؟ قَالَ : يَعْنِى التَّشَهُّدَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ.

"(ইমাম আবূ হানীফা থেকে হাদীসটির বর্ণনাকারী) আবূ আব্দুর রাহমান বলেন: আমি আবূ হানীফাকে প্রশ্ন করলাম: 'প্রত্যেক দু রাকাতে সালাম'- এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন: তাশাহ্হুদ পাঠ। বাইহাকী বলেন: আলী ইবন মুসহির ও অন্যান্য রাবীও হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।[১১২]

(গ) ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত তৃতীয় হাদীস

عن أبي حنيفة: ثنا أبو حجية، عن ابن بريدة عن أبي الأسود الدئلي عن أبي ذر عن النبي ﷺ: "إن أحسن ما غيرتم به الشعر الحناء والكتم

আবূ হানীফা থেকে, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবূ হুজাইয়াহ বলেন, তিনি ইবন বুরাইদা থেকে, তিনি আবুল আসওয়াদ দুয়িলী থেকে, তিনি আবূ যার গিফারী (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে, তিনি বলেন: তোমাদের চুল (চুলের শুভ্রতা) পরিবর্তনের জন্য যা ব্যবহার কর তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো মেন্দি এবং কাতম।"

ইবন আদী বলেন: "এ হাদীসটি আবূ হানীফা থেকে কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন। মুআফী তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: আবূ হানীফা একব্যক্তি থেকে... তিনি আবূ বুরাইদা থেকে তিনি আবুল আসওয়াদ থেকে...। হাসান ইবন যিয়াদ, মাক্কী ও ইবন বাযী হাদীসটি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন: আবূ হানীফা আবূ হুজ্জিয়া থেকে, তিনি আবুল আসওয়াদ থেকে ..., এ সনদে ইবন বুরাইদার কথা উল্লেখ করেন নি। এভাবে এ সনদটি আবূ হানীফা থেকে বিভিন্নরূপে বর্ণিত।"[১১৩]

এখানে ইবন আদী প্রমাণ করছেন যে, এ হাদীসটির সনদ ইমাম আবূ হানীফা ঠিকমত মুখস্থ রাখতে পারেন নি। যে কারণে এককে ছাত্রকে এককেভাবে বলেছেন।

কোনো হাদীস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা রাবীর দুর্বলতা প্রকাশ করে। তবে এরূপ ভিন্নতার জন্য শিক্ষক বা ছাত্র দায়ী হতে পারে। এছাড়া প্রত্যেক নির্ভরযোগ্য রাবীই এরূপ ব্যতিক্রমের মধ্যে নিপতিত হন। বুখারী সংকলিত একটি হাদীস নিম্নরূপ:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ

"তোমরা কুরআন পাঠ কর যতক্ষণ তোমাদের অন্তরগুলো মিল-মহব্বতে থাকবে। যখন তোমরা মতভেদ করবে তখন উঠে যাবে।"

ইমাম বুখারী এ হাদীসের সনদ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হাদীসটি সকলেই প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য তাবিয়ী মুহাদ্দিস আবূ ইমরান জাওনী আব্দুল মালিক ইবন হাবীব (১২৮ হি) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি কখনো সাহাবী জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস হিসেবে, কখনো জুনদুব (রা)-এর নিজের বক্তব্য হিসেবে এবং কখনো তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনুস সামিতের সূত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেব।[১১৪]

ইমাম বুখারী সংকলিত আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِىٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ ، بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْه

আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করলে বা কাউকে শাসকের দায়িত্ব প্রদান করলে তার দু প্রকারের পরামর্শক থাকে: একদল পরামর্শক তাকে ভাল কাজের আদেশ ও উৎসাহ দেয় এবং একদল তাকে খারাপ কাজের আদেশ ও উৎসাহ দেয়।

ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইমাম ইবন শিহাব যুহরী (১২৫ হি) থেকে তাঁর ছাত্ররা তিনভাবে বর্ণনা করেছেন: (১) ইউনুস ইবন শিহাব থেকে আবূ সালামাহ থেকে আবূ সায়ীদ খুদরী থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হিসেবে, (২) শুআইব যুহরী থেকে আবূ সালামাহ থেকে আবূ সায়ীদ থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে এবং (৩) আওযায়ী ও মুআবিয়া ইবন সাল্লাম যুহরী থেকে আবূ সালামাহ থেকে আবূ হুরাইরা থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী হিসেবে।[১১৫]

(ঘ) ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত চতুর্থ হাদীস

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ (بريدة بن الحصيب) أَنَّه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ.

"আবূ হানীফা আলকামা ইবন মারসাদ থেকে, তিনি সুলাইমান ইবন বুরাইদাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: কল্যাণ কর্মের নির্দেশক তা পালনকারীর মতই (সাওয়াব পাবেন)।"

ইবন আদী বলেন:

هذا حديث لا يجود إسناده غير أبى حنيفة... وتابعه حفص بن سليمان روى عن علقمة أحاديث مناكير لا يرويها غيره ...

"এ হাদীসটি এ সনদে আলকামা থেকে আবূ হানীফা ছাড়া কেউ বর্ণনা করেন নি। ... হাফস ইবন সুলাইমানও তাঁরই মত এটি আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফস আলকামার সূত্রে কয়েকটি আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা অন্য কেউ বর্ণনা করেন না।[১১৬]

এ অর্থের হাদীস অন্যান্য সহীহ সনদে আনাস (রা) ও আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। এ সনদে হাদীসটি অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি। ইমাম আবূ হানীফার সূত্রে হাদীসটি ইমাম আহমদ, আবূ ইয়ালা মাউসিলী, ইমাম তাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। শাইখ শুআইব আরনাউত বলেন:

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الثقة المشهور فقد روى له الترمذي والنسائي

"হাদীসটির সনদ সহীহ, সনদের রাবীগণ বুখারী-মুসলিমের রাবী, শুধু ইমাম আবূ হানীফা ছাড়া। তিনি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত রাবী। তিরমিযী ও নাসায়ী তাঁর বর্ণনা সংকলন করেছেন।"[১১৭]

(ঙ) ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত পঞ্চম হাদীস

أبو حنيفة: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إذا ارتفع النجم ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد

"আবূ হানীফা: আমাদেরকে আতা ইবন আবী রাবাহ বলেছেন, তিনি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে, তিনি বলেন: "যখন সুরাইয়া নক্ষত্রপুঞ্জ (Pleiades) বা সপ্তর্ষিমণ্ডল উর্দ্ধে উঠে তখন সকল জনপদের ফল-ফসলের বিপদ চলে যায়।"

অর্থাৎ গ্রীষ্মের শুরুতে বা মে মাসের মাঝামাঝি যখন আরবে বা হেজাজে সুরাইয়া (Pleiades) নক্ষত্রমণ্ডল (সপ্তর্ষিমণ্ডল) প্রভাতে বা সকালে উদিত হয় তখন গাছের ফল মোটামুটি পরিপক্ক হয়ে যাওয়ায় বড় ধরনের বিপদাপদ কেটে যায়। এখানে মূল শর্ত ফল-ফসলের পরিপক্কতা, নক্ষত্রের উদয় শুধু পরিপক্কতার মৌসূম শুরুর আলামত। এজন্য বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সুরাইয়া নক্ষত্র উদয়ের পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, পরিপক্কতার আগে ফল বিক্রয় করলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ইবন আদী বলেন:

ولا يحفظ عن عطاء إلا من رواية أبى حنيفة عنه وروى عن عسل عن عطاء مسندا وموقوفا وعسل وأبو حنيفة سيان في الضعف على أن عسل مع ضعفه أحسن ضبطا للحديث منه

"এ হাদীসটি আতা-এর সূত্রে পূর্ণ সনদে আবূ হানীফা ছাড়া আর কারো মাধ্যমে জানা যায় না। শুধু (ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক অন্য রাবী) ইসল ইবন সুফইয়ানও হাদীসটি আতা-এর সূত্রে মারফূ এবং মাউকূফ দুভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ হানীফা ও ইসল উভয়ে দুর্বলতায় সমান; তবে ইসল তার দুর্বলতা সত্ত্বেও হাদীস নির্ভুল বর্ণনায় আবূ হানীফার চেয়ে উত্তম।"[১১৮]

এ হাদীসটিকেও ইবন আদী ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করলেন, অথচ তিনিই বলছেন যে, তাঁর চেয়ে শক্তিশালী একজন রাবী হাদীসটি একই সনদে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথা থেকে সুস্পষ্ট যে, এ হাদীসটিকে ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না। কারণ একাধিক মুহাদ্দিস যখন একই সনদ বা মতন বলেন এবং একজন থেকে অন্যজন গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ না পাওয়া যায় তখন প্রমাণ হয় যে, এ সনদ বা মতনের একটি ভিত্তি আছে।

উল্লেখ্য যে, ইসলের সনদে হাদীসটি মুসনাদে আহমাদের সংকলিত। ইসলকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল ও ইবন হিব্বান

নির্ভরযোগ্য বলেছেন। সমকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শাইখ শুআইব আননাঊত হাদীসটিকে "হাসান" বলেছেন।[১১৯] পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফার হাদীসটিকে তিনি সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন:

روى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة...يرفعه "إذا طلع النجم ذا صباح... " وإسناده صحيح.

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান কিতাবুল আসারে আবূ হানীফা থেকে ... রাসূলুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন: যখন সুরাইয়া নক্ষত্র প্রভাতে বা সকালে উদিত হয় ... ফল-ফসলের বিপদ চলে যায়।" এ হাদীসটির সনদ সহীহ।[১২০]

(চ) ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত ষষ্ঠ হাদীস

ইবন আদী বলেন,

ثنا عبدان ثنا زيد بن الحريش ثنا أبو همام الأهوازي عن مروان بن سالم عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي ﷺ أكل ذبيحة امرأة" ... لم يروه موصولاً غير أبي حنيفة، زاد فيه علقمة وعبد الله والنبي ﷺ.. يرويه منصور، ومغيرة عن إبراهيم قوله"

"আমাদেরকে আবদান বলেছেন, আমাদেরকে যাইদ ইবনুল হুরাইশ বলেছেন, আমাদেরকে আবূ হাম্মাম বলেছেন, আমাদেরকে মারওয়ান ইবন সালিম বলেছেন, আবূ হানীফা থেকে, হাম্মাদ থেকে, ইবরাহীম নাখয়ী থেকে, আলকামা থেকে ইবন মাসঊদ থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন মহিলার জবাইকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করেন।"... এ হাদীসটি এভাবে সনদসহ আবূ হানীফা ছাড়া কেউ বলেন নি। তিনি এর সনদে আলকামা, ইবন মাসঊদ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম বৃদ্ধি করেছেন। মানসূর ও মুগীরা এটিকে ইবরাহীমের নিজের কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।"[১২১]

তাহলে এ হাদীসটি অন্যান্য রাবী ইবরাহীম নাখয়ীর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন, পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবন আদীর মতে এতে প্রমাণ হয় যে, তিনি হাদীসের সনদ-মতন মুখস্থ রাখতে পারতেন না; যে কারণে এভাবে সনদের মধ্যে কমবেশি করতেন।

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে, উপরে আমি ইবন আদী থেকে ইমাম আবূ হানীফা পর্যন্ত সনদ উল্লেখ করেছি, যা অন্যান্য হাদীসের ক্ষেত্রে করি নি। এর কারণ ইমাম আবূ হানীফা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন "মারওয়ান ইবন সালিম"। ইবন আদী নিজেই তাঁর এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী।[১২২] তাহলে এ হাদীসের ত্রুটির দায়ভার এ অতি দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবীর উপর না চাপিয়ে ইমাম আবূ হানীফার উপরে চাপানোর কারণ কি? অথচ ইবন আদী নিজে অন্যান্য রাবীর ক্ষেত্রে বারংবার বলেছেন, তাঁর হাদীসের মধ্যে যে ভুলভ্রান্তি পাওয়া যায় তা সম্ভবত তার থেকে যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের কারণে।

ইবন আদীর সমালোচনায় এ বিষয়টি ছাড়াও নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(১) ইবন আদী অন্যান্য মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রে তাঁর ছাত্রদের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। কোনো মুহাদ্দিস থেকে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের হাদীস শিক্ষা তাঁর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বলে গণ্য করেছেন। এমনকি তার হাদীসের ভুলভ্রান্তি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আমরা দেখেছি যে, ইবন মায়ীন ও ইবনুল মাদীনী ইমাম আবূ হানীফার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে এ বিষয়টি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা থেকে শতাধিক মুহাদ্দিস হাদীস শিক্ষা করেছেন যাদের অধিকাংশই ছিলেন সে যুগের তাবি-তাবিয়ী পর্যায়ের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস।[১২৩] কিন্তু ইবন আদী তাঁর ক্ষেত্রে এ বিষয়টির মোটেও গুরুত্ব দেন নি।

(২) ইবন আদীর নিরপেক্ষতা ও সুচিন্তিত মতামতের একটি অতি পরিচিত চিত্র যে, তিনি মুহাদ্দিসগণের ভুলভ্রান্তির ওজর পেশ করেছেন। এমনকি অন্যান্য মুহাদ্দিস যাকে দুর্বল বলেছেন, তিনি তার পক্ষে ওযর পেশ করেছেন। যেমন শারীক ইবন আব্দুল্লাহ নাখয়ী (১৭৮ হি)-কে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। ইবন আদী তাঁদের মত উদ্ধৃত করেন এবং শারীকের ভুলত্রুটির অনেক নমুনাও উল্লেখ করেন। এরপর বলেন:

والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه من سوء حفظه، لا أنه يتعمد في الحديث شيئاً مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف"

"শারীকের বর্ণিত হাদীসের যে ভুলভ্রান্তি তা তাঁর দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে; এমন না যে তিনি ইচ্ছা করে হাদীসের মধ্যে পরিবর্তন করতেন; কাজেই তাঁকে কোনোরূপ দুর্বলতার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না।[১২৪]

বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আফফান ইবন মুসলিম আবূ উসমান (২১৯ হি)। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, তবে কিছু

ভুল তাঁর হতো। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁকে দুর্বল বলেছেন। ইবন আদী বলেন:

وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شيء مما فيه ينسب إلى الضعف.. ولا أعلم لعفان إلا أحاديث....... مراسيل فوصلها، وأحاديث موقوفة فرفعها وهذا مما لا ينتقصه؛ لأن الثقة وإن كان ثقة قد يهم في الشيء بعد الشيء

"আফ্ফান এমন পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ও সত্যপরায়ণ যে তাঁকে কোনোরূপ দুর্বলতায় আখ্যায়িত করা যায় না। আমার জানা মতে আফ্ফানের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কিছু মুরাসাল হাদীস রয়েছে যেগুলি তিনি মুত্তাসিল বানিয়ে দিয়েছেন এবং কিছু মাউকূফ (সাহাবীর বক্তব্য) আছে যেগুলিকে তিনি মারফূ (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বক্তব্য) বানিয়েছেন। এর কারণে তাঁর মর্যাদা কমে না। কারণ নির্ভরযোগ্য রাবীও মাঝে মাঝে কিছু ভুলভ্রান্তি ও ধারণা-অনুমানের মধ্যে নিপতিত হন।..."[১২৫]

আমরা ইবন আদীর সাথে একমত যে, একজন রাবীকে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ঢালাওভাবে দুর্বল বলা যায় না। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস স্বীকৃত শতশত রাবী রয়েছেন যারা নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীতে মুরসাল হাদীসকে মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন, সনদে বা মতনে কিছু পরিবর্তন করেছেন। এগুলোকে তাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হিসেবে বিবেচনা করে তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন ইবন আদীর নিরপেক্ষতা নিয়ে। তিনি বললেন যে, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, অনিচ্ছাকৃত ভুল, মুরসালকে মুত্তাসিল বা মাউকূফকে মারফূ বানানোর কারণে মুহাদ্দিসকে দুর্বল বলা যায় না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে তিনি এ মূলনীতি পুরোপুরিই লঙ্ঘন করে শুধু একারণেই তিনি তাঁকে দুর্বল বলেছেন।

আমরা ওজরখাহি বাদ দিয়ে ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতা যাচাই করি। উপরের ছয়টি হাদীসের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৫ম হাদীস কোনো অবস্থাতেই তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ নয়; বরং তাঁর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। কারণ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবী- ইবন আদীর ভাষায় আবূ হানীফার চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাবী- তাঁর মতই বর্ণনা করেছেন। ৬ষ্ঠ হাদীসটিও কোনোভাবেই তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ নয়; কারণ এ হাদীসটি তাঁর নামে প্রচার করেছে একজন পরিত্যক্ত রাবী। তৃতীয় হাদীসটির সনদ তাঁর ছাত্ররা বিভিন্নভাবে বলেছেন। এর জন্য তিনি বা তাঁর ছাত্ররা দায়ী হতে পারেন। আমরা দেখলাম যে, বুখারী সংকলিত হাদীসেও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো এরূপ করেছেন।

৪র্থ হাদীসটি তাঁর চেয়ে শক্তিশালী কেউ বর্ণনা করেন নি। আর কোনো মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুল বর্ণনা করেন, তাহলে যে হাদীসগুলো তিনি একক বর্ণনা করেন সেগুলোও সহীহ বলে গণ্য হয়। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল গ্রন্থে এরূপ অনেক সহীহ "গরীব" হাদীস বিদ্যমান। এজন্য অন্যান্য হাদীসে তাঁর দুর্বলতা প্রমাণিত না হলে এ হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমরা শাইখ আরনাউতের মন্তব্যে তা দেখেছি।

ইমাম ইবন আদীর দাবি অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা ৩০০ হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে ২৮০টিতে ভুল করেছেন এবং সে ভুল প্রমাণ করতে তিনি তাঁর বর্ণিত সবচেয়ে মারাত্মক ভুলের ছয়টি প্রমাণ পেশ করেছেন। আমরা দেখলাম এগুলোর ৪টিই বাতিল প্রমাণ, বাকি দুটোও নিরেট প্রমাণ নয়। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাকী ২৭৬টি ভুল হাদীসের অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন হবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফাকে যারা দুর্বল বলেছেন তাঁরা মূলত উপরের ছয়টি হাদীসের কয়েকটি বা সবকয়টি উল্লেখ করেছেন। আর এগুলোর অবস্থা আমরা দেখছি। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, তৃতীয় শতক ও পরবর্তী শতকগুলোতে যারা তাঁকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলেছেন তাঁরা ইনসাফ করেন নি।

১১. ৮. পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ

আমরা দেখলাম যে, ৩য় হিজরী শতক থেকে কয়েক শতাব্দী যাবৎ ফিকহ ও আকীদার মতভেদজনিত বিদ্বেষের প্রভাবে ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অনেক মুহাদ্দিস কথা বলেছেন। নিরপেক্ষ বিচারে তাদের বক্তব্য সঠিক বলার কোনো পথ আমরা দেখি না। এজন্য ৮ম হিজরী শতক থেকে মুহাদ্দিসগণ এরূপ বিদ্বেষের উর্ধ্বে উঠার চেষ্টা করেছেন। এদের অন্যতম ইমাম ইবন তাইমিয়া (৭২৮হি) ও তাঁর ছাত্রগণ: ইমাম মিয্যী (৭৪২ হি), ইমাম যাহাবী (৭৪৮হি) ও ইমাম ইবন কাসীর (৭৭৪ হি)। ইমাম যাহাবী দুর্বল রাবীদের বিষয়ে সংকলিত তাঁর গ্রন্থগুলোতে ইনসাফ বা বে-ইনসাফ করে যাদেরকেই কেউ দুর্বল বলেছেন তাদের সকলের নাম একত্রিত করেছেন। এজন্য এ সকল বইয়ে অনেক প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবীর নাম রয়েছে। এগুলোতে ইমাম আবূ হানীফার প্রসঙ্গে তাঁর বিষয়ে কথিত দু-একটি উদ্ধৃতি দেখা যায় । এছাড়া মিয্যী, যাহাবী ও ইবন হাজার রিজাল বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে ইমাম আবূ হানীফার নির্ভরযোগ্যতার পক্ষে বর্ণিত বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন এবং তাঁর নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা তাঁর দুর্বলতায় বর্ণিত বক্তব্যগুলো উদ্ধৃতই করেন নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলোকে সনদ বা মতনের দিক থেকে তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি অথবা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ বিশ্বস্ততার সাক্ষ্যর বিপরীতে পরবর্তীতের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

১১. ৯. বর্তমান যুগের মুহাদ্দিসগণ

বর্তমান যুগেও সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশে অন্যান্য মাযহাব ও মতের অনেক মুহাদ্দিস তাঁকে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে এরূপ দু-একটি বক্তব্য দেখেছি। পাশাপাশি কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফাকে দুর্বল বলে প্রমাণ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এদের অন্যতম বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ

নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহ)। তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। তিনি প্রমাণ হিসেবে ইতোপূর্বে উদ্ধৃত ইবনুল মুবারাক, ইমাম আহমদ, বুখারী, নাসায়ী, ইবন হিব্বান, ইবন আদী প্রমুখের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।[১২৬]

শাইখ আলবানী (রাহ)-এর বক্তব্যে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করি:

(১) তিনি বলেছেন যে, ইমাম আযমের সত্যবাদিতা, ফিকহী মর্যাদা ও তাকওয়া সন্দেহাতীত ও প্রশ্নাতীত, তবে তিনি হাদীস মুখস্থ রাখায় দুর্বল ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মতের পক্ষে যাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন: ইমাম আহমদ, বুখারী, ইবন হিব্বান, ইবন আদী প্রমুখ তাঁকে শুধু হাদীসে দুর্বল বলেন নি, বরং তাঁরা তাঁকে হাদীসে, ফিকহে, আকীদায়, ঈমানে, ইসলামে, তাকওয়ায়, সত্যবাদিতায়- সর্বদিক দিয়ে দুর্বল বলেছেন এবং কেউ কেউ তাঁকে ইসলামের শত্রু বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি না, তিনি তাঁদের কিছু কথা গ্রহণ এবং বাকি মত বাতিল করলেন কেন? ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে তাঁদের এ সকল বক্তব্য যদি বিদ্বেষপ্রসূত বলে তাঁর নিকট প্রমাণিত হয় তাহলে ইলম হাদীসের মূলনীতি অনুসারে তাঁর হাদীসের দুর্বলতার বিষয়েও তাঁদের মত অগ্রহণযোগ্য। আর যদি তিনি মনে করেন যে, তাঁদের মতগুলো ইনসাফভিত্তিক তাহলে তো পুরোটাই গ্রহণ করা জরুরী ছিল।

(২) ইমাম আবূ হানীফার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে শু'বা, কাত্তান, ইবন মাহদী, ইবন মায়ীন ও দ্বিতীয় শতকের অন্যান্য মুহাদ্দিসের বক্তব্য পর্যালোচনা করেন নি।

শাইখ আলবানীর এ মত তাঁর অনেক পাঠক ও ভক্তকে প্রভাবিত করছে।

১২. অভিযোগের ভিত্তিতে মূল্যায়ন

১২. ১. মুহাদ্দিসের মূল্যায়ন-পদ্ধতি ও নমুনা

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, কোনো মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন কিনা তা নির্ণয় করার জন্য তাঁর বর্ণিত হাদীস অন্যান্য মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদীসের সাথে তুলনা ও নিরীক্ষা করা হয়। এরূপ নিরীক্ষায় প্রত্যেক মুহাদ্দিসেরই কম বেশি কিছু ভুল ধরা পড়ে। কারণ শতশত বা হাজারহাজার হাদীস শুনেছেন, লিখেছেন, মুখস্ত করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বলেছেন যে মুহাদ্দিস, তার বর্ণনার মধ্যে মাঝে মধ্যে কিছু ভুল হতেই পারে। এরূপ ভুলের পরিমাণ, তার বর্ণিত মোট হাদীসের মধ্যে ভুলের অনুপাত ও ভুলের গুরুত্ব অনুসারে মুহাদ্দিসের মান নির্ধারণ করেন সমালোচকগণ। আর এক্ষেত্রেই কখনো কখনো মতভেদ হয় তাদের।

মুহাদ্দিসগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) আমানত রক্ষার্থে সর্বোত্তম নিরপেক্ষতার সাথে এরূপ যাচাই বাছাই করেছেন। পাশাপাশি প্রত্যেকেই মানবীয় দুর্বলতায় মাঝে মাঝে ভুল করেছেন। সমালোচনার পদ্ধতি, বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি, ব্যক্তিগত বা আঞ্চলিক বিদ্বেষ, আকীদা বা ফিকহ বিষয়ে মতপার্থক্য ইত্যাদি কারণে কখনো একজন মুহাদ্দিস অন্য মুহাদ্দিসের সামান্য ত্রুটিকে বড় করে ধরেছেন। কখনো বা অনেক বেশি ভুলকে তিনি ছোট করে দেখেছেন।

আগেই বলেছি মুহাদ্দিসদের সমালোচনা কোর্টের বিচারের মতই দলিলভিত্তিক। 'অমুক মুহাদ্দিস অনেক ভুল করেন'- একথা বলার সাথে সাথে উক্ত মুহাদ্দিস বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করে সে ভুল প্রমাণ করতে হয় এবং ভুলের অনুপাতও বলতে হয়। এজন্য কোনো মুহাদ্দিস এভাবে ভুল বা একপেশে কথা বললে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ চেষ্টা করলে তা ধরতে পারেন। কারণ উক্ত মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদীসগুলো হাদীসগ্রন্থগুলোতে সংরক্ষিত। যে কোনো মুহাদ্দিস যে কোনো সময়ে ইচ্ছা করলে এগুলোর নিরীক্ষা করতে পারেন। তবে এরূপ নিরীক্ষা গভীর পাণ্ডিত্য ও ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমেই সম্ভব। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ পূর্ববর্তীগণের মত ও সামগ্রিক অধ্যয়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দশটি নমুনা এখানে উল্লেখ করছি।

(১) হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান (১২০ হি)

ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে অভিযোগগুলো অনুধাবনের জন্য তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমানকে বুঝতে হবে। ছাত্রের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ সবই উসতাদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে, কিন্তু ছাত্র যত আক্রমণ ও চরিত্র হননের শিকার হয়েছেন উস্তাদ তত হন নি। কারণ সম্ভবত একটিই: ছাত্রের প্রসিদ্ধির প্রতি বিরোধীদের ঈর্ষা।

তাঁর বিষয়ে ইবন মায়ীন বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। শুবা বলেন: তিনি সত্যপরায়ণ। অন্য বর্ণনায় শুবা বলেন: তিনি হাদীস মুখস্থ রাখতে পারেন না। ফিকহ নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকেন ফলে হাদীস মুখস্থ করার তাওফীক হয় নি। ইজলী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। নাসায়ী বলে: তিনি নির্ভরযোগ্য তবে তিনি মুরজিয়া। ইবন আদী বলেন: তিনি হাদীস বর্ণনায় মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। আবূ হাতিম রাযী বলেন: তিনি সত্যপরায়ণ, তবে তাঁর হাদীস প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ফিকহে সুদৃঢ়, তবে হাদীস বলতে গুলিয়ে ফেলেন। আবূ বকর ইবন আইয়াশ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবন সাদ বলেন: তিনি হাদীসে দুর্বল ছিলেন। তিনি মুরজিয়া ছিলেন। যখন ফিকহী মাসআলা বলতেন তখন সঠিক বলতেন আর যখন হাদীস বলতেন তখন ভুল করতেন। যুহলী বলেন: তিনি খুব বেশি ভুল করেন।

এখানে আমরা দেখছি যে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, তিনি ফিকহের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু ফিকহী বিষয়ে অত্যধিক ব্যস্ত থাকার কারণে হাদীস বর্ণনায় কিছু দুর্বলতা ছিল। কিন্তু সে দুর্বলতার মান নির্ধারণে তাঁরা মতভেদ করছেন। কেউ বলছেন তাঁর হাদীস মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ বলছেন তা গ্রহণযোগ্য। সামগ্রিক বিচারে ইমাম যাহাবী বলছেন: (**ثقة إمام مجتهد**): তিনি নির্ভরযোগ্য এবং মুজতাহিদ ইমাম। ইবন হাজার বলেন: (**فقيه صدوق له أوهام و رمى بالإرجاء**): তিনি ফকীহ সত্যপরায়ণ, তাঁর

ভুলভ্রান্তি আছে, তিনি মুরজিয়া হিসেবে অভিযুক্ত।

বুখারীর আদাব গ্রন্থে, মুসলিমের সহীহ গ্রন্থে ও সুনান গ্রন্থসমূহে তাঁর হাদীস সংকলিত। অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ তাঁর হাদীস সহীহ ও হাসান বলে গণ্য করেছেন।[১২৭]

(২) শারীক ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবী নামির (১৪০ হি)

তিনি কূফার বাসিন্দা ছিলেন, পরে মদীনায় বসবাস করেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার বিরোধী ছিলেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে গ্রহণযোগ্য এবং কেউ তাঁকে দুবল বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ আল-কাত্তান তাঁকে পরিত্যাগ করেন। ইবন মায়ীন বলেন: (**لا بأس به**) 'তাঁর বিষয়ে অসুবিধা নেই'। নাসায়ী বলেন: (**ليس بالقوى**) তিনি শক্তিশালী নন। আবূ দাউদ বলেন: (**ثقة**) তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনুল জারূদ বলেন: (**ليس به بأس و ليس بالقوى**) তাঁর বিষয়ে অসুবিধা নেই, তবে তিনি শক্তিশালী নন। সাজী বলেন: তিনি কাদারিয়া আকীদার অনুসারী ছিলেন। সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন: (**صدوق يخطىء**) সত্যপরায়ণ ভুল করেন। বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ বলে গণ্য।

(৩) শারীক ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবী শারীক নাখয়ী (১৭৮ হি)

তিনি কূফার কাযি ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ একমত যে তাঁর হাদীসে ভুলভ্রান্তি খুবই বেশি। তাঁর সমসাময়িক জারহ-তাদীলের প্রসিদ্ধতম ইমাম কাত্তান ও ইবন মাহদী তাঁকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন। কাত্তান বলেন: আমি তাঁর পাণ্ডুলিপিতে গোঁজামিল ও গোলমাল দেখেছি। তিনি বলেন: শারীক কিছুই নয়, অর্থাৎ একেবারেই পরিত্যক্ত। পক্ষান্তরে ইবন মায়ীন বলেন: শারীক নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি হাদীস ভাল পারেন না এবং ভুল করেন। ইয়াকূব ইবন শাইবা বলেন: তিনি সত্যপরায়ণ তবে মুখস্থশক্তি খুবই দুর্বল। আয্দী ও জূযজানী বলেন: শারীকের মুখস্থ শক্তি খারাপ, তাঁর হাদীস এলোমেলো এবং সে নিজে বিপথগামী। আবূ যুরআ বলেন: শারীক খুবই ভুল করেন। নাসাঈ একস্থানে বলেন: তাঁর বিষয়ে ক্ষতি নেই। অন্যত্র বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। দারাকুতনী বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। জাওহারী বলেন: তিনি ৪০০ হাদীসের বর্ণনায় ভুল করেছেন। আহমদ ইবন হাম্বাল বলেন: শরীক হাদীস বলার ক্ষেত্রে যা খুশি তাই বলেন, তবে তিনি বিদআতীদের বিরুদ্ধে খুব কঠোর ছিলেন। সামগ্রিক মূল্যায়নে ইবন হাজার বলেন: (**صدوق يخطىء كثيرا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة**): সত্যপরায়ণ, খুব বেশি ভুল করেন, কুফার কাযির দায়িত্ব গ্রহণের পর তার স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়।"

এখানে আমরা দেখছি যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে দুর্বল বলেছেন এবং সকলেই বলেছেন যে, হাদীস নির্ভুলভাবে বলার ক্ষেত্রে তাঁর ভুলভ্রান্তি খুবই বেশি। আর সামগ্রিক মুল্যায়নে তিনি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারীও তালীকের জন্য তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ বা হাসান বলে গণ্য করেছেন।[১২৮]

(৪) উসামা ইবন যাইদ লাইসী (১৫৩ হি)

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক মদীনার একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস উসামা ইবন যাইদ লাইসী (১৫৩ হি)। ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ কাত্তান তাঁকে দুর্বল বলেন এবং শেষ দিকে পরিত্যাগ করেন। অর্থাৎ তাঁর বিচারে তিনি (**متروك**); পরিত্যক্ত। আহমদ বলেন: (**ليس بشئ**): একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এক বর্ণনায় ইবন মায়ীন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। দারিমী বলেন: (**ليس به بأس**): তাঁর বিষয়ে অসুবিধা নেই। নাসায়ী বলেন: (**ليس بالقوي**): শক্তিশালী নন। ইজলী বলেন: (**ثقة**): নির্ভরযোগ্য। সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন: (**صدوق يهم**): সত্যপরায়ণ, ভুল করেন। বুখারী (তালীকে), মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন।[১২৯]

(৫) হাস্‌সান ইবন ইবরাহীম ইবন আব্দুল্লাহ কিরমানী (৮৬-১৮৬হি)

তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাস্‌সান ইবন ইবরাহীম কিরমান প্রদেশের কাযী ছিলেন। আহমদ তাঁকে সত্যপরায়ণ বলেছেন এবং তাঁর কিছু হাদীস মুনকার বলেছেন। ইবন মায়ীন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। নাসায়ী বলেছেন: "(**ليس بالقوي**): তিনি শক্তিশালী নন"। ইবন আদী বলেন: তিনি সত্যপরায়ণ, তবে তিনি ভুল করতেন, ইচ্ছা করে নয়।" উকাইলী, ইবন হিব্বান ও অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন: '(**صدوق يخطىء**): সত্যপরায়ণ ভুল করতেন।' বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত হাদীস 'সহীহ' হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১৩০]

(৬) ইবরাহীম ইবন মুহাজির ইবন জাবির আল-বাজলী

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক কূফার অন্য প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবন মুহাজির ইবন জাবির। তাঁর বিষয়ে কাত্তান বলেন: (**ضعيف**): দুর্বল। আহমদ বলেন: (**لا بأس به**): অসুবিধা নেই। ইজলী বলেন: (**جائز الحديث**) তাঁর হাদীস গ্রহণ করা জায়েয। নাসায়ী বলেন: (**ليس بالقوي في الحديث**): তিনি হাদীসে শক্তিশালী নন। সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার আসকালানী বলেন: (**صدوق لين الحفظ**): সত্যপরায়ণ, মুখস্থে দুর্বল। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন।[১৩১]

(৭) কাসীর ইবন শিনযীর মাযিনী, আবূ কুর্রা

সমসাময়িক বসরার অন্য তাবি-তাবিয়ী কাসীর ইবন শিনযীর। কাত্তান তাঁকে অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করতেন। ইবন মাহদী তাঁর হাদীস বর্ণনা করতেন। ইবন মায়ীন বলেন (ليس بشئ): একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। আহমদ ইবন হাম্বাল বলেন: চলনসই... রাবীগণ তাঁকে মেনে নিয়েছেন। আবূ যুরআ বলেন (لين): দুর্বল। নাসায়ী বলেন: (ليس بالقوي): শক্তিশালী নন। সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন (صدوق يخطىء): সত্যপারয়ণ ভুল করেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বর্ণিত হাদীস 'সহীহ' বলে গণ্য করেছেন তাঁরা।[১৩২]

(৮) ইবরাহীম ইবন ইউসূফ ইবন ইসহাক (১৯৮ হি)

ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র পর্যায়ের কুফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবন ইউসূফ ইবন ইসহাক (১৯৮ হি)। তাঁর বিষয়ে ইবন মায়ীন বলেন: (ليس بشئ) কিছুই নয়, একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। নাসায়ী বলেন: (ليس بالقوي): শক্তিশালী নয়। জূযজানী বলেন: (ضعيف الحديث): হাদীসে দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন: (حسن الحديث) তিনি গ্রহণযোগ্য বা হাসান হাদীস বর্ণনাকারী। ইবন আদী তাঁকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবূ দাউদ তাঁকে দুর্বল বলেছেন। সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন: (صدوق يهم): সত্যপরায়ণ, ভুল করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। অর্থৎ তাঁর বর্ণিত হাদীসকে তাঁরা সহীহ হিসেবে গণ্য করেছেন।[১৩৩]

(৯) উবাই ইবন আব্বাস ইবন সাহল

মদীনার একজন প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস উবাই ইবন আব্বাস ইবন সাহল ইবন সা'দ আনসারী। তাঁর বিষয়ে দূলাবী বলেন: (ليس بالقوى): শক্তিশালী নন। ইবন মায়ীন বলেন: (ضعيف): দুর্বল। আহমদ ইবন হাম্বাল বলেন: (منكر الحديث): আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। নাসায়ী বলেন: (ليس بالقوى) শক্তিশালী নয়। বুখারীও বলেছেন: (ليس بالقوي): শক্তিশালী নয়। সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন: (فيه ضعف): তাঁর মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান। ইমাম বুখারী তাঁর একটি হাদীস গ্রহণ করেছেন।[১৩৪]

(১০) আসবাত ইবন নাসর, আবূ ইউসূফ হামদানী

ইমাম আবূ হানীফার পরের যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আসবাত ইবন নাসর। তাঁর বিষয়ে ইমাম আহমদ বলেন: দুর্বল। আবূ নুআইম ফাদল ইবন দুকাইন বলেন: তাঁর হাদীসগুলি অগ্রহণযোগ্য, সনদগুলি উল্টানো। নাসায়ী বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। ইবন মায়ীন বলেন: একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। অন্য একবার নির্ভরযোগ্য বলেন। বুখারী বলেন: সত্যপরায়ণ। সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন: (صدوق كثير الخطأ يغرب): সত্যপরায়ণ, খুব বেশি ভুল করেন, উদ্ভট হাদীস বলেন। ইমাম বুখারী তালীক হিসেবে তাঁর একটি হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন।[১৩৫]

১২. ২. ইমাম আবূ হানীফার মূল্যায়ন

এভাবে আমরা নিশ্চিত হই যে, মুহাদ্দিস বা রাবীর বিচার দু-একজন বা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মন্তব্যের ভিত্তিতে হয় না; বরং সামগ্রিক বিচারের মাধ্যমে হয়। আমরা যদি ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে শুবা ইবনুল হাজ্জাজ, ইয়াহইয়া কাত্তান, ইবন মাহদী, ইবন মায়ীন, ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, নাসায়ী, ইবন হিব্বান, ইবন আদী, উকাইলী সকলের মত সমানভাবে গ্রহণ করি তবে তাঁর বিষয়ে বলতে হবে (صدوق رمي بالإرجاء) সত্যপরায়ণ, মুরজিয়া বলে অভিযুক্ত, অথবা (صدوق له أوهام): সত্যপরায়ণ, তাঁর কিছু ভুল আছে। এক্ষেত্রে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ বা হাসান বলে গণ্য হবে।

তবে মুহাদ্দিসগণের নীতিমালার দাবি যে, সমসাময়িক সমালোচকগণের স্বীকৃতি প্রসিদ্ধ হওয়ার পরে কোনো মুহাদ্দিসকে কেউ অনির্ভরযোগ্য বললে তা গ্রহণযোগ্য হয় না, বিশেষত যদি প্রমাণ হয় যে, তা আকীদা বা মাযহাবী বিরোধিতার কারণে। এজন্য দ্বিতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের মতের বিপরীতে ইমাম আহমদ, বুখারী, নাসাঈ, উকাইলী, ইবন হিব্বান, ইবন আদী প্রমুখের মত গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় শতকের জারহ-তাদীলের ইমামগণের বক্তব্যের আলোকে ইমাম আবূ হানীফাকে 'সিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য বলা ছাড়া উপাই নেই। বাহ্যত এজন্যই ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, মিযযী, সুবকী, ইবন হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফাকে প্রসিদ্ধ ফকীহ, ইমাম, হাদীসের ইমাম বা মুসলিমদের ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩৬]

কোনো অবস্থাতেই তাঁকে এবং তাঁর বর্ণিত হাদীস "দুর্বল" বলে গণ্য করা জারহ-তাদীলের মূলনীতি অনুসারে সঠিক নয়। শুবা, ইসরাঈল, ইবনুল মুবারাক, আবূ ইউসূফ, কাত্তান, ইবন মাহদী, ইবন মায়ীন ও দ্বিতীয় শতকের প্রসিদ্ধ ইমামগণের মূল্যায়ন বিচার না করে তৃতীয় বা পরবর্তী শতকগুলোর মুহাদ্দিসদের কয়েক ডজন বক্তব্য একত্র করে ইমাম আবূ হানীফাকে দুর্বল বলা কখনোই ইলমুল হাদীসের মূলনীতি সমর্থিত নয়। এরূপ বিচার করলে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস কর্তৃক "নির্ভরযোগ্য" বলে স্বীকৃত অনেক রাবীকেই দুর্বল বলতে হবে এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অনেক হাদীসকেই দুর্বল বলতে হবে।

১৩. ফিকহ বিষয়ক অভিযোগ

আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফাকে ফিকহের ইমাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর ফিকহ সহীহ হাদীস নির্ভর বলেও তাঁরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় শতকের শুরু থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ফিকহী অযোগ্যতার বহুমুখি অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। বলা হতে থাকে যে, ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি অনভিজ্ঞ, অসমর্থ ও অযোগ্য ছিলেন। তিনি আরবী ভাষা জানতেন না। তিনি কোনো হাদীস জানতেন না তাই মনগড়াভাবে হাদীস বিরোধী মাসআলা দিতেন। তিনি সহীহ হাদীস অস্বীকার ও অমান্য করে নিজের কিয়াস মত ফাতওয়া দিতেন। তিনি দীনকে ধ্বংস করেছেন!!! .... ইত্যাদি। আমরা এখানে প্রথম এবং শেষদিক থেকে দুজন অভিযোগকারীর বক্তব্য উল্লেখ করছি।

১৩. ১. ইবন আবী শাইবা (১৫৯-২৩৫ হি)

তৃতীয় হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শাইবা কূফী (রাহ)। হাদীসে নববী এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত ও কর্মের সংকলনে তাঁর "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ। তিনি এ গ্রন্থের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার মত খণ্ডনের জন্য "কিতাবুর রাদ্দি আলা আবী হানীফাহ" (আবূ হানীফার মত খণ্ডনের অধ্যায়) নামে একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন। এ অধ্যায়ে ১২৫টি পরিচ্ছেদে তিনি ইমাম আবূ হানীফার ১২৫টি ফিকহী মত হাদীস বিরোধী বলে খণ্ডন করতে ৪৮৫টি হাদীস বা সাহাবী-তাবিয়ীর মত উল্লেখ করেছেন।[১৩৭]

১৩. ২. ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি)

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধতম শাফিয়ী ফকীহ, উসূলবিদ, সূফী ও দার্শনিক ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ গাযালী (রাহ), যার পরিচয় কারোই অজানা নয়। ফিকহ ও উসূল ফিকহ বিষয়ে তাঁর লেখা বই শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম পাঠ্য ও তথ্য গ্রন্থ। তিনি তাঁর "আল-মানখূল" নামক উসূলুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছেন। এখানে কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি:

ولا اكتراث بمخالفة أبي حنيفة فيها فإني أقطع بخطئه في تسعة أعشار مذهبه...وأما مالك فكان من المجتهدين نعم له زلل .. وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا لأنه كان لا يعرف اللغة ... وكان لا يعرف الأحاديث ولهذا رضي بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها ولم يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محله... فكثر خبطه لذلك ... ولذلك استكنف كان أبو يوسف ومحمد من اتباعه في ثلثي مذهبه لما رأوا فيه من كثرة الخبط والتخليط والتورط في المناقضات... وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير نظامها.. ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من سلف الأئمة فيه إذ اتهموه برومه خرم الشرع.. ولعل الناظر .. يظننا نتعصب للشافعي...على ابي حنيفة.. وهيهات فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين عن مقتصرين على اليسير من الكثير

"আবূ হানীফার বিরোধিতাকে আমি মোটেও পরোয়া করি না। কারণ আমি সুনিশ্চিত যে, তাঁর মাযহাবের দশভাগের নয় ভাগই ভুল, ... মালিক মুজতাহিদ ছিলেন। হ্যাঁ, তাঁর কিছু ভুল ছিল। ... আর আবূ হানীফা মূলতই মুজতাহিদ ছিলেন না। কারণ তিনি আরবী ভাষা জানতেন না।... এবং তিনি হাদীস জানতেন না; এজন্য তিনি যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করতে রাযী হন এবং সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করেন। ফিকহী মানসিকতাই তাঁর ছিল না; এজন্য তিনি এমন স্থানে কিয়াস করতেন যেখানে কিয়াস করা হয় না....। এজন্য তাঁর ভুলভ্রান্তি ব্যাপক হয়। একারণে আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ তাঁর মাযহাবের দুইতৃতীয়াংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন; কারণ তাঁরা এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি, গোঁজামিল ও স্ববিরোধিতার ব্যাপকতা দেখতে পান। ... আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ শরীয়তকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন, উপরকে নিচে ও নিচেকে উপরে করেছেন, শরীয়তের ধারা কলুষিত করেছেন এবং এর পদ্ধতি পরিবর্তন করেছেন।... এজন্যই উম্মতের সালফে সালেহীন তাঁর বিষয়ে কঠিন আপত্তি ও নিন্দা করেছেন। তাঁরা তাঁকে শরীয়ত নষ্ট করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।... হয়ত পাঠক ধারণা করবেন যে, আমরা শাফিয়ীর পক্ষে মাযহাবী গোঁড়ামি বশত আবূ হানীফার বিরুদ্ধে এরূপ বলছি। .... কখনোই নয়। এ সকল কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা একান্তই ইনসাফ অবলম্বন করে কথাগুলো বলেছি, মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছি এবং এ বিষয়ে অনেক কথা বলা যেত তবে আমরা অল্প কথা বলে শেষ করছি।"[১৩৮]

১৪. ফিকহ বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনা

ফিকহী অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে নিম্নের কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) ইমাম আবূ হানীফা তাঁর সকল মতই কোনো না কোনো তাবিয়ী বা সাহাবী থেকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল বলেন:

إنما كان أبو حنيفة تابعة ما اخترع قولا ولا أنشر خلافه لان أهل الكوفة إبراهيم التيمى والشعبي والحكم وغيرهم

"আবূ হানীফা তো একান্তই অনুসারী ছিলেন, তিনি কোনো মত উদ্ভাবন করেন নি এবং কোনো মতভেদও সৃষ্টি করেন নি।

কারণ ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, হাকাম ও কূফার অন্যান্য আলিমের তিনি অনুসারী ছিলেন।"[১৩৯]

যে মত ইবরাহীম নাখয়ী, আলকামা, হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান প্রমুখ তাবিয়ী আবূ হানীফার পূর্বেই গ্রহণ করেছেন, অথবা রাবীয়াহ, সুফইয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক প্রমুখ ফকীহ গ্রহণ করেছেন সে মতের জন্য আবূ হানীফা নিন্দিত হলেন, কিন্তু অন্যরা হলেন না![১৪০]

(২) ইমাম আবূ হানীফার বিরোধীগণ তাঁর নামে এমন কিছু মত উল্লেখ করেছেন যা তিনি কখনোই বলেন নি। তাঁর মত ভুল বুঝে বা ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁর নামে এ সকল মত প্রচার করা হয়েছে।

(৩) ইমাম আবূ হানীফার যে সকল মত হাদীস বিরোধী বলে প্রচার করা হয়েছে এগুলির অধিকাংশের ক্ষেত্রে তাঁর মতের পক্ষে সহীহ হাদীস বিদ্যমান। কিছু মতের পক্ষে হাদীস না থাকলেও কোনো সাহাবী বা তাবিয়ীর মত বা কর্ম বিদ্যমান। প্রসিদ্ধ চার ইমাম ও অন্য সকল ফকীহের মাযহাব বা মতের মধ্যেই আমরা এরূপ কিছু মত দেখতে পাই, যার পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস নেই বা তার বিরুদ্ধে সহীহ হাদীস রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে ফকীহ মূলত সাহাবী বা তাবিয়ীগণের মতের উপর নির্ভর করেছেন।

(৪) ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আওযায়ী ও অন্য সকল ফকীহের ক্ষেত্রে অনেক সহীহ হাদীস পাওয়া যায় যেগুলি তাঁরা গ্রহণ করেন নি। বিভিন্ন অজুহাতে, যুক্তিতে বা কারণে তাঁরা তা বর্জন করেছেন। শুধু হাদীসগুলো উল্লেখ করে উক্ত ইমাম হাদীসটির বিরোধিতা করেছেন বলে লিখলে তা অজ্ঞতা বা বিদ্বেষের প্রকাশ বলে গণ্য হবে।

(৫) প্রসিদ্ধ মালিকী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবন আব্দুল বার্র (৪৬৩ হি) বলেন:

أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك والسبب والموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما... وكان رده لما رد من أخبار الآحاد بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره، وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف.. وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ... عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي ﷺ مما قال مالك فيها برأيه.. ليس لأحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن النبي ﷺ ثم يرده دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه إثم الفسق.

মুহাদ্দিসগণ আবূ হানীফার নিন্দায় বাড়াবাড়ি করেছেন এবং এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছেন। এর কারণ মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে তিনি কিয়াস ও ইজতিহাদকে হাদীসের মধ্যে ঢুকিয়েছিলেন এবং এদুটিকে গ্রহণ করেছিলেন। ... তিনি যে সকল হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন তা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই করেছেন। তাঁর এ সকল মতের (যেগুলিকে হাদীস বিরোধী বলে প্রচার করা হয়) অধিকাংশই তাঁর পূর্বে অনেক আলিম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর পরেও যারা কিয়াস ও ফিকহ নিয়ে কথা বলেছেন তাদের অনেকেই এ সকল মত গ্রহণ করেছেন। তাঁর মাযহাবে হাদীস বিরোধী বলে কথিত যা কিছু রয়েছে তার প্রায় সবগুলিতেই তিনি ইবরাহীম নাখয়ী, আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদের ছাত্রগণ বা তাঁর দেশের (কূফার) অনুরূপ আলিমদের অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি ও তাঁর সাথীরা এ সকল মতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে সাম্ভাব্য ঘটনা ও শাখাপ্রশাখা বের করে সাম্ভাব্য সমস্যার সমাধান বলার গভীরে প্রবেশ করেছেন ও বেশি পরিমাণে করেছেন।... আমার জানা মতে প্রত্যেক আলিমেরই কুরআনের কোনো আয়াত বা কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে নিজস্ব মাযহাব বা মত রয়েছে যার ভিত্তিতে তিনি অন্য একটি হাদীস গ্রহণযোগ্য একটি ব্যাখ্য করে বা নাসখ দাবী করে প্রত্যাখ্যান করেন। ... (মিসরের প্রসিদ্ধ ফকীহ) লাইস ইবন সাদ বলেন: আমি মালিক ইবন আনাসের ৭০টি মাসআলা বাছাই করেছি, যেগুলিতে তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে নিজের মত অনুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন। .... উম্মাতের কোনো আলিমই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে একটি হাদীস তাঁর নিকট প্রমাণিত হওয়ার পরে তা কোনো কারণ ছাড়া প্রত্যাখ্যান করেন না। তিনি অন্য একটি হাদীসের কারণে এ হাদীস রহিত হয়েছে বলে দাবি করেন, অথবা ইজমার দাবিতে হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেন, অথবা এমন একটি কর্মের কারণে হাদীসটি পরিত্যাগ করেন, যে কর্মকে গ্রহণ করা তাঁর মূলনীতি অনুসারে জরুরী, অথবা তিনি হাদীসটির সনদ ত্রুটিযুক্ত বলে দাবি করেন। যদি কেউ কোনো কারণ ছাড়া কোনো সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে সে পাপী বলে গণ্য হবে। তার ন্যূনতম দীনদারীই বিনষ্ট হয়ে যাবে, ইমাম হিসেবে স্বীকৃত হওয়া তো অনেক দূরের কথা।"[১৪১]

প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ইবন তাইমিয়া (৭২৮ হি) বলেন:

وَمَنْ ظَنَّ بِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ مُخَالَفَةَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِقِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ عَلَيْهِمْ وَتَكَلَّمَ إمَّا بِظَنٍّ وَإِمَّا بِهَوًى

"যদি কেউ ধারণা করে যে, আবূ হানীফা অথবা মুসলিমদের অন্য কোনো ইমাম কিয়াস বা অন্য কোনো অজুহাতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন তবে তার ধারণাটি অন্যায় ও ভুল বলে গণ্য। ঐ ব্যক্তি হয় আন্দাজে, অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় এরূপ কথা বলেছে।"[১৪২]

প্রসিদ্ধ সৌদি মুহাদ্দিস শাইখ আলী ইবন নাইফ আশ-শাহ্হূদ বলেন:

ما اشتهر من أن أهل الرأي بضاعتهم في الحديث مزجاة كلام غير صحيح، ولا يدعمه الدليل ... فاتهامهم بأنهم أصحابُ رأي، وأنَّ بضاعتهم في الحديث مزجاةٌ فيه شططٌ كبيرٌ، وعصبيةٌ مقيتة. ... مثال ذلك : كان الإمام أبو بكر بن أبي شيبة من المخالفين لأهل الرأي، شديد التمسك بالأثر، ومن ثم فقد أحصى المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة، رحمه الله السنَّة فبلغت- على حدِّ زعمه- مئة وأربعاً وعشرين مسألة لا غير... ومعنى هذا أن الإمام أبا حنيفة ... قد وافق السنَّة فيما سوى هذه المسائل القليلة وهي بعشرات الآلاف. ولو نظرنا في هذه المسائل التي ذكرها ابن أبي شيبة في ردِّه على الإمام أبي حنيفة رحمه الله لوجدنا ما يلي : أ - معظمها أمور مختلف فيها منذ عهد الصحابة لم ينفرد فيها الإمام أبو حنيفة . ب- أو أمور وجد ما هو أقوى منها فلم يعمل بها .

"একটি কথা প্রসিদ্ধ যে, 'আহলুর রায়' (কিয়াসপন্থী বা হানাফীগণ) হাদীস কম জানেন। কথাটি সঠিক নয়। দলীল এ কথা সমর্থন করে না।... তাঁদেরকে কিয়াসপন্থী বলে অভিযোগ করা, হাদীস বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান কম বলে দাবি করা বড় অন্যায়, সীমালঙ্ঘন ও ঘৃণ্য মাযহাবী কোন্দলের প্রকাশ। একটি উদাহরণ দেখুন। ইমাম আবূ বকর ইবন আবী শাইবা আহলুর রায় বা কিয়াসপন্থীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন, হাদীস পালন করার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ যে বিষয়গুলিতে হাদীসের বিরোধিতা করেছেন সে বিষয়গুলি তিনি গণনাকরে একত্রিত করেছেন। ইবন আবী শাইবার মতানুসারে আবূ হানীফা শুধুমাত্র ১২৪টি মাসআলাতে হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। ... এর অর্থ ইমাম আবূ হানীফা মাত্র সামান্য এই কটি মাসআলা ছাড়া বাকি সকল মাসআলায়, হাজার হাজার মাসআলায় হাদীস অনুসরণ করেছেন। ইবন আবী শাইবা উল্লেখকৃত এ মাসআলাগুলি, যেগুলিতে তিনি ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহর মত খণ্ডন করেছেন সেগুলি যাচাই করলে আমরা দেখি (১) এগুলির অধিকাংশই সাহাবীগণের যুগ থেকে মতভেদীয় মাসআলা, কোনোটিই ইমাম আবূ হানীফার একক মত নয়। অথবা (২) এগুলির মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলিতে ইমাম আবূ হানীফা ইবন আবী শাইবার উল্লেখ করা হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী অন্য দলিল পেয়েছেন, যে কারণে তিনি এ হাদীস গ্রহণ করেন নি।"

এরপর শাইখ শাহ্হূদ কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন, যেগুলিতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম ইবন আবী শাইবা যে মাসআলার জন্য ইমাম আবূ হানীফাকে অভিযুক্ত করেছেন, তিনি নিজেই মুসান্নাফ গ্রন্থের অন্যত্র এ মত অনেক সাহাবী-তাবিয়ী থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং এ সকল মতের পক্ষে অন্য হাদীস রয়েছে।[১৪৩]

১৫. ফিকহ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা

আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, ইবন হিব্বান, খতীব বাগদাদী প্রমুখ মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফা থেকে হাদীসের বিরুদ্ধে ও কিয়াসের পক্ষে এমন কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যা কোনো তাবিয়ী ফকীহ তো দূরের কথা কোনো ফাসিক মুমিনও বলতে পারেন না। সনদ বিচারে এগুলো জাল। তবে এগুলির সনদ বিচার জরুরী নয়। যদি কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা এরূপ কথা বলেছেন, তবে তা উক্ত নির্ভরযোগ্য রাবীর নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট করবে এবং তার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে গণ্য হবে। কারণ আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অগণিত তাবি-তাবিয়ী আলিম তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তাঁর মত প্রচার করেন। তাঁর ছাত্র ও অনুসারীরা তাঁর সকল মত সংরক্ষণ ও প্রচারে আপোষহীন ছিলেন। তাঁরা তাঁর থেকে যে সকল বক্তব্য বর্ণনা করেছেন সেগুলোর বিপরীত উদ্ভট বর্ণনাগুলো ভিত্তিহীন বলে গণ্য। এখানে তাঁর ছাত্র ও অনুসারীদের সূত্রে বর্ণিত ফিকহ, হাদীস, মাযহাব, তাকলীদ ইত্যাদি বিষয়ক তাঁর কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

১৫. ১. হাদীস ও কিয়াসের ক্ষেত্র

তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে আমরা দেখি যে, সহীহ হাদীসকেই তিনি তাঁর মাযহাবের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এমনকি তাঁর মত বা মাযহাবের বিপরীতে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে তা অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি কিয়াস অপছন্দ করতেন। যেখানে কোনো আয়াত, হাদীস বা সাহাবীর মত নেই সেখানেই শুধু কিয়াস করতেন। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে তাঁর কিছু বক্তব্য আমরা দেখেছি। এ প্রসঙ্গে তাঁর আরো অনেক বক্তব্য তাঁর ছাত্র ও অনুসারীরা উদ্ধৃত করেছেন। কয়েকটি বক্তব্য দেখুন:

إذا صح الحديث فهو مذهبي

১. "কোনো হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে সেটিই আমার মাযহাব।"[১৪৪]

البول في المسجد أحسن من بعض القياس

২. "অনেক কিয়াস আছে যার চেয়ে মসজিদে পেশাব করা উত্তম।"[১৪৫]

إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي عليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل... لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن ... لم تزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا

৩. "খবরদার! আল্লাহর দীনের বিষয়ে যুক্তি-কিয়াস বা নিজস্ব মত দিয়ে কথা বলবে না। তোমরা অবশ্যই সুন্নাতের অনুসরণ করবে। যে ব্যক্তি সুন্নাতের বাইরে যাবে সে বিভ্রান্ত হবে। ... সুন্নাত না হলে আমাদের মধ্যে কেউই কুরআন বুঝতো না। .... যতদিন পর্যন্ত মানুষদের মধ্যে হাদীস শিক্ষাকারী বিদ্যমান থাকবে ততদিন তারা ভাল থাকবে। যখন তারা হাদীস বাদ দিয়ে ইলম চর্চা করবে তখন তারা নষ্ট হয়ে যাবে।"[১৪৬]

كذب والله وافترى علينا من يقول: إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس! أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة ، فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به.

৪. "যারা বলেন যে, আমরা কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের উপর কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি- আল্লাহর কসম! তারা আমাদের নামে মিথ্যা বলেন এবং অপবাদ প্রদান করেন। কুরআন হাদীসের বক্তব্য বা নস্স থাকলে কি কিয়াসের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে?! আমরা মাসআলার দলীল দেখি আল্লাহর কিতাব বা সুন্নাতের মধ্যে অথবা সাহাবীগণের ফয়সালার মধ্যে। যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো দলীল না পাই তখন কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত কোনো বিধানের উপর সংশ্লিষ্ট বিষয়কে কিয়াস করি।"[১৪৭]

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ মুরতাযা যাবীদী (১২০৬হি) বলেন:

نسب إلى إمامنا أنه يقدم القياس على النص... هذه النسبة إليه غير صحيحة فإن الصحيح المنقول في مذهبه تقديم النص على القياس.

"আমাদের ইমামের নামে বলা হয়েছে যে, তিনি কিয়াসকে 'নস' (কুরআন-হাদীসের বক্তব্য বা ওহীর কথা)-এর উপরে স্থান দেন। এ কথাটি সঠিক নয়। কারণ তাঁর মাযহাবে সহীহভাবে বর্ণিত মত হলো 'নস'-কে অর্থাৎ কুরআন বা হাদীসের বক্তব্যকে 'কিয়াস'-এর চেয়ে অগ্রগণ্য করা।"[১৪৮]

মোল্লা আলী কারী বলেন:

وسموا الحنفية أصحاب الرأي على ظن أنهم ما يعملون بالحديث بل ولا يعلمون الرواية والتحديث لا في القديم ولا في الحديث مع أن مذهبهم القوي تقديم الحديث الضعيف على القياس المجرد الذي يحتمل التزييف

"বিরোধীরা হানাফীদেরকে 'রায়পন্থী' (কিয়াসপন্থী) বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ তাঁদের ধারণা যে, হানাফীগণ হাদীস পালন করেন না; বরং তারা হাদীস জানেন না; অতীতেও না বর্তমানেও না; অথচ হানাফীগণের শক্তিশালী মাযহাব হলো যয়ীফ হাদীসকে কিয়াসের বিপরীতে অগ্রগণ্য ও গ্রহণ করা কারণ কিয়াসে বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার সম্ভাবনা বিদ্যমান।"[১৪৯]

আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি) ইমাম শারানী (৯৭৩হি)-এর সূত্রে বলেন:

قد أطال الإمام أبو جعفر الكلام في تبرئة أبي حنيفة من القياس بغير ضرورة ورد على من نسب إلى الإمام تقديم القياس على النص وقال : إنما الرواية الصحيحة عنه تقديم الحديث ثم الآثار ثم يقيس بعد ذلك ولا خصوصية للإمام في القياس بشرطه المذكور بل جميع العلماء يقيسون في مذائق الأحوال إذا لم يجدوا في المسئلة نصا انتهى وفيه أيضا : اعتقادنا واعتقاد كل منصف في أبي حنيفة أنه لو عاش حتى دونت أحاديث الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره لكن لما كانت أدلة الشريعة متفرقة في عصره مع التابعين وتبع التابعين في المدائن والقرى كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها

"ইমাম আবূ হানীফা প্রয়োজন ছাড়া কিয়াস করেছেন বা কিয়াসকে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের উপরে স্থান দিয়েছেন বলে যে

অভিযোগ করা হয় ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী বিস্তারিতভাবে তা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন: তাঁর থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, হাদীসকে সর্বপ্রথম এবং এরপর সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত অগ্রগণ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এরপর তিনি কিয়াস করতেন। আর এরূপ কিয়াস করা ইমাম আবূ হানীফার একক বৈশিষ্ট্য নয়; বরং সকল আলিমই এরূপ অবস্থায় কিয়াস করেন; যখন তাঁরা সংশ্লিষ্ট মাসআলায় কুরআন-হাদীসের বক্তব্য পান না। ... আবূ হানীফার বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস এবং সকল নিরপেক্ষ মানুষের বিশ্বাস যে, তিনি যদি শরীয়তের হাদীসগুলো সংকলিত ও গ্রন্থায়িত হওয়া পর্যন্ত এবং মুহাদ্দিসগণ মুসলিম বিশ্বের সকল দেশ থেকে হাদীস সংগ্রহ করার পরেও বেঁচে থাকতেন এবং সেগুলো তাঁর হস্তগত হতো তবে তিনি যত কিয়াস করেছিলেন সকল কিয়াস পরিত্যাগ করতেন এবং অন্যান্য ইমামের মাযহাবের মতই তাঁর মাযহাবে কিয়াস কমে যেত। কিন্তু তাঁর যুগে শরীয়তের দলীলগুলো বিভিন্ন দেশে ও শহরে বিদ্যমান তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের নিকট বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এজন্য তাঁর মাযহাবে অন্যান্য মাযহাবের চেয়ে কিয়াস-এর পরিমাণ বেশি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মাসাইলে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য না পাওয়ার কারণেই তাঁকে বাধ্য হয়ে কিয়াস করতে হয়েছে।"[১৫০]

আল্লামা সাখাবী (৮৩১-৯০২ হি) বলেন:

المرسل يحتج به إذا لم يوجد دلالة سواه .... جميع الحنفيه على أن مذهب إمامهم أيضا ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس ... قول ابن منده على أنه أريد بالضعيف هذا الحديث الحسن

"অন্য দলীল না থাকলে মুরসাল হাদীস প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে (অর্থাৎ মুরসাল হাদীস একটু দুর্বল হলেও কিয়াস বা যুক্তির চেয়ে উত্তম) ... হানাফী ফকীহগণ সকলেই বলেছেন, তাঁদের ইমামের মত হলো কিয়াসে চেয়ে দুর্বল হাদীস উত্তম। ... ইবন মান্দহ বলেছেন: এক্ষেত্রে 'যায়ীফ' (দুর্বল) হাদীস বলতে 'হাসান' (সামান্য দুর্বল গ্রহণযোগ্য) হাদীস বুঝানো হয়।"[১৫১]

১৫. ২. হাদীসের সনদ যাচাই

ইবন মান্দাহ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করেছেন। যয়ীফ হাদীসকে কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য করা থেকে কেউ হয়ত বুঝেন যে, ইমাম আবূ হানীফা হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে ঢিলেমি করতেন। বিষয়টি ঠিক উল্টো। তিনি হাদীসের সনদ যাচাইয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। যে বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই সে বিষয়ে সামান্য দুর্বল "হাসান" বা "মুরসাল" হাদীস তিনি এবং সে যুগের সকল ফকীহই গ্রহণ করতেন। যে হাদীস "সহীহ" হাদীসের ৫টি শর্তই পূরণ করে, কিন্তু বর্ণনাকারীর স্মৃতি ও নির্ভুল বর্ণনা শক্তির কিছু দুর্বলতা ছিল, এরূপ হাদীসকে "হাসান" বলা হয়। তৃতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত "হাসান" পরিভাষাটি ব্যবহৃত হতো না। সহীহ হাদীসের শর্ত পূরণ করে না এরূপ সকল হাদীসকেই "যয়ীফ" বলা হতো। এজন্য "হাসান"-ও যয়ীফের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতো।

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ মুরতাযা যাবীদী বলেন:

يروى عنه أنه كان يقول: ضعيف الحديث أحب إلي من آراء الرجال، وكأن المراد منه الضعيف الذي من قبل سوء حفظ راويه...

"ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, 'মানুষের ইজতিহাদী মতের চেয়ে যয়ীফ (দুর্বল) হাদীস আমার নিকট অধিক প্রিয়।' এখানে যয়ীফ বলতে সে হাদীস বুঝানো হয়েছে যার দুর্বলতা শুধু রাবীর মুখস্থ শক্তির কারণে।"[১৫২]

হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষার বিষয়ে তাঁর কঠোরতার কারণে তিনি হাদীস শ্রবণের সময় থেকে বর্ণনার সময় পর্যন্ত পুরোপুরি মুখস্থ রাখাকে হাদীস বর্ণনার বৈধতার শর্ত বলে গণ্য করতেন। তিনি বলেন:

لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُحَدِّثَ مِنْ الْحَدِيثِ إلا بِمَا يَحْفَظُهُ يَوْمَ سَمِعَهُ إِلَى يَوْمِ يُحَدِّثُ بِهِ

"যে হাদীস শ্রবণের দিন থেকে বর্ণনার দিন পর্যন্ত মুখস্থ আছে সে হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস বর্ণনা করা কোনো মানুষের জন্য সঠিক নয়।"[১৫৩]

শুধুই সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসের উপর নির্ভর করার বিষয়ে তিনি বলেন:

إذا جاء الحديث الصحيح الاسناد عن النبي ﷺ عن الثقات أخذنا به فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم

"যখন নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো হাদীস সহীহ সনদে আমাদের কাছে আসে তখন আমরা তা গ্রহণ করি। যখন এরূপ কথা সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয় তখন আমরা তাঁদের কথার বাইরে যাই না। আর যখন তাবিয়ীগণের কথা বর্ণিত হয় তখন আমরা তাঁদের সাথে ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করি।"[১৫৪]

তিনি দুর্বল মুহাদ্দিস বা রাবীদের শুধু বর্জনই করতেন না, উপরন্তু তাদের মিথ্যাচার বা দুর্বলতা প্রকাশ করে হাদীসের বিশুদ্ধতা

রক্ষায় সবাইকে সচেতন করতেন। কয়েকজন দুর্বল রাবী সম্পর্কে তিনি বলেন:

ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء وما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ما أتيته قط بشئ من رأي الا جاءني فيه بحديث وزعم ان عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله ﷺ لم يظهرها...

"আমি যাদেরকে দেখেছি তাদের মধ্যে আতা ইবন আবী রাবাহের চেয়ে উত্তম কাউকে দেখি নি এবং জাবির জুফীর চেয়ে অধিক মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখি নি। আমি যে কোনো কিয়াসী মাসআলা তাকে বললেই সে তার পক্ষে একটি হাদীস বলে দিত। সে দাবী করত যে, তার কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এত হাজার হাদীস রয়েছে, যা সে এখনো প্রকাশ করে নি।"[১৫৫]

সাইমারী (৪৬৩হি) তাঁর সনদে ইবনুল মুবারাক থেকে উদ্ধৃত করেছেন:

قدم محمد بن واسع إلى خراسان ... فاجتمع عليه قوم فسألوه عن أشياء من الفقه فقال إن الفقه صناعة لشاب بالكوفة يكنى أبا حنيفة فقالوا له إنه ليس يعرف الحديث فقال ابن المبارك كيف تقولون له لا يعرف لقد سئل عن الرطب بالتمر قال لا بأس به فقالوا حديث سعد فقال ذاك حديث شاذ لا يؤخذ برواية زيد أبي عياش (مداره على زيد بن عياش وهو مجهول).. فمن تكلم بهذا لم يكن يعرف الحديث

"(ইরাকের প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস) মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি (১২৩ হি) খুরাসানে আগমন করেন। তখন কিছু মানুষ তাঁর নিকট সমবেত হয়ে ফিকহের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন: ফিকহের বিষয়ে পারদর্শী কূফার আবূ হানীফা নামক এক যুবক। তারা বলেন: তিনি তো হাদীস জানেন না। তখন ইবনুল মুবারাক বলেন: আপনারা কিভাবে বলছেন তিনি হাদীস জানেন না? খুরমা খেজুরের বিনিময়ে গাছ পাকা খেজুর ক্রয় করার বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: এতে অসুবিধা নেই। তখন তাঁকে বলা হয়, সা'দ (রা)-এর হাদীসে এর আপত্তি রয়েছে? তিনি বলেন: এ হাদীসটি শায (দুর্বল); যাইদ আবী আইয়াশের বর্ণনা গ্রহণ করা যায় না।'- এ হাদীসের একমাত্র রাবী যাইদ ইবন আইয়াশ, তিনি অজ্ঞাতপরিচয়।- ইবনুল মুবারাক বলেন: যে ব্যক্তি এভাবে সনদ যাচাই করতে পারে তাঁর বিষয়ে কিভাবে বলা যায় যে, তিনি হাদীস জানতেন না?"[১৫৬]

উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ক হাদীসটি ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন মাজাহ ও তিরমিযী সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য, শুধু তাবিয়ী যাইদ ইবন আইয়াশ আবূ আইয়াশ কিছুটা অপরিচিত। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা ছাড়াও প্রসিদ্ধ যাহিরী ফকীহ ইবন হাযম তাঁকে অজ্ঞাত পরিচয় বলেছেন এবং হাদীসটিকে যয়ীফ বলে গণ্য করেছেন। আর শুধু এ রাবীর কারণেই বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি গ্রহণ করেন নি। এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসের সনদ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার শর্ত অনেকক্ষেত্রে বুখারী ও মুসলিমের শর্তের মতই।

আরো লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধতম দু ছাত্র আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ এ হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন এবং টাটকা গাছপাকা খেজুরের বিনিময়ে খুরমা খেজুর ক্রয়বিক্রয় নিষেধ করেছেন।[১৫৭] এ জাতীয় হাদীসের মান-নির্ধারণে হাদীসতাত্ত্বিকভাবে এরূপ মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক।

১৫. ৩. মাযহাব ও তাকলীদ

আলিম-গবেষকদের জন্য ইজতিহাদী মাসাইলে ইমামের সব কথা নির্বিচারে গ্রহণ করা বা 'নির্বিচার তাকলীদ' করার ব্যাপারে ঘোর আপত্তি করতেন ইমাম আবূ হানীফা। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন (১৫৮-২৩৩ হি) তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে তাঁর উস্তাদ আবূ নুআইম ফাদল ইবন দুকাইন (১৩০-২১৮ হি)-এর নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন:

زفر ثقة... وسمعت زفر يقول كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن فكنا نكتب عنه... فقال يوما أبو حنيفة لأبي يوسف ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد

"যুফার নির্ভরযোগ্য।... আমি যুফারকে বলতে শুনেছি, আমরা আবূ হানীফার নিকট যাতায়াত করতাম, আমাদের সাথে আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানও থাকতেন। তখন আমরা তাঁর বলা মাস্‌আলাগুলো লিখতাম। একদিন তিনি আবূ ইউসূফকে বললেন: ইয়াকূব, তোমার কপাল পুড়ুক! আমার থেকে যা কিছু শোনো সব লিখো না। কারণ আমি আজ একটি বিষয় সঠিক মনে করি কিন্তু আগামীকাল তা পরিত্যাগ করি। আবার আগামীকাল যে মত গ্রহণ করব পরশু তা পরিত্যাগ করব।"[১৫৮]

তাঁর মত গ্রহণ বা তাকলীদ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলতেন:

هذا رأي النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب

"এ হলো নুমান ইবন সাবিতের (অর্থাৎ তাঁর নিজের) মত। আমাদের ক্ষমতা ও সাধ্যের মধ্যে আমরা এ মতটিই সবচেয়ে ভাল বলে মনে করেছি। কেউ যদি এর চেয়ে ভাল মত দিতে পারেন তবে সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য ও সঠিক বলে গণ্য হবে।"[১৫৯]

ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্রগণ বলেছেন যে, মুফতী বা আলিমের জন্য কোনো ফাতওয়া বা মাসআলার জন্য কুরআন, হাদীস বা ইজতিহাদের দলীলটি না জেনে শুধু ফাতওয়ার বই থেকে ফাতওয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। ইমাম আবূ হানীফা বলেন:

لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي

"যে ব্যক্তি আমার দলীল জানে নি তার জন্য আমার বক্তব্য বা মাযহাব অনুসারে ফাতওয়া দেওয়া সঠিক নয়।"[১৬০]

ইমাম যুফার বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি:

لا يحل لمن يفتى من كتبي أن يفتي حتى يعلم من اين قلت

"আমি কোন্ দলীলের ভিত্তিতে আমার মত গ্রহণ করেছি তা না জানা পর্যন্ত আমার বই থেকে ফাতওয়া দেওয়া কারো জন্য হালাল নয়।"[১৬১]

এজন্য তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে বলতেন:

إِنْ تَوَجَّهَ لَكُمْ دَلِيلٌ فَقُولُوا بِهِ

"যদি তোমরা কোনো দলীলকে গ্রহণযোগ্য বলে দেখতে পাও তবে সে দলীলের ভিত্তিতেই মত প্রদান করবে।"[১৬২]

সাধারণ মানুষের জন্যও হাদীস শুনে তা পালনের বিষয়ে ইমাম আযম তাঁর অনেক ছাত্রের চেয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন। আল্লামা ইবন নুজাইম (৯৭০ হি) বলেন:

لَوْ احْتَجَمَ .. فَظَنَّ أَنَّهُ يُفَطِّرُهُ ثُمَّ أَكَلَ .. وَإِنْ لَمْ يَسْتَفْتِ وَلَكِنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ.. أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ... وَلَمْ يَعْرِفْ النَّسْخَ وَلا تَأْوِيلَهُ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا؛ لأَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَاجِبُ الْعَمَلِ بِهِ خِلافًا لأَبِي يُوسُفَ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ... وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هذا أَنَّ مَذْهَبَ الْعَامِّيِّ فَتْوَى مُفْتِيهِ من غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَذْهَبٍ

"যদি এরূপ সাধারণ মানুষ রোযা-অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করে ... তবে সে যদি কারো কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা না করে, কিন্তু "রক্তমোক্ষণকারী ও রক্তমোক্ষণকৃতের রোযা ভেঙ্গে যাবে"- এ হাদীসটি সে শুনে এবং এ হাদীসের ভিত্তিতে তার রোযা ভেঙ্গে গিয়েছে ভেবে সে পানাহার করে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতানুসারে তাকে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে না। কারণ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে যা জানা যায় তদানুসারে আমল করা ওয়াজিব। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে; কারণ একজন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের জন্য হাদীস অনুসারে আমল করার বিধান নয়; কারণ সে একাধিক হাদীসের মধ্যে কোন্টি দ্বারা কোনটি রহিত তা জানে না।... এ থেকে জানা যায় যে, সাধারণ মানুষের মাযহাব হলো তার মুফতীর ফাতওয়া, এক্ষেত্রে কোনো একটি মাযহাব নির্ধারণ প্রয়োজনীয় নয়।"[১৬৩]

উল্লেখ্য যে, এটি সুনানগ্রন্থগুলোতে সংকলিত সহীহ হাদীস। এর বিপরীতে বুখারী সংকলিত হাদীসে ইবন আব্বাস (রা) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিয়াম অবস্থার রক্তমোক্ষণ করেন।"[১৬৪] অর্থাৎ সিয়াম অবস্থায় রক্তমোক্ষণে সিয়াম ভাঙ্গবে না।

লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফা এ ব্যক্তির অপরাধ গৌণ বলে গণ্য করেছেন। তবে মূলত এটি অপরাধ। হাদীসটি সহীহ কি না এবং এর বিপরীতে সহীহ হাদীস আছে কিনা তা গবেষণা না করে একটি হাদীসকে সহীহ শুনেই গ্রহণ করা মুমিনকে বিভ্রান্ত করতে পারে। ফিকহী মাসআলার ন্যায় হাদীসের মান নির্ধারণে অন্ধ তাকলীদও নিন্দনীয়।

১৫. ৪. পরবর্তী যুগের হানাফী ফকীহগণ

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবূ হানীফা তাঁর ছাত্র ও অনুসারীদেরকে নির্বিচার তাকলীদ থেকে মুক্ত হয়ে দলীলভিত্তিক তাকলীদ, দলীল অনুসন্ধান ও দলীল অনুসরণের জন্য তাকীদ দিয়েছেন। বাস্তবে আমরা দেখি যে, ইমামের মতের বিপরীতে ভিন্নমত পোষণ করার প্রবণতা হানাফী মাযহাবের মধ্যে যেভাবে আছে অন্য কোনো মাযহাবে সেরূপ নেই। মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বালী মাযহাবে ইমামের মতের বিপরীত কোনো মত মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত নেই। ইমামের একাধিক মতের মধ্যে একটি গ্রহণের বিষয়ে এবং যে বিষয়ে ইমামের মত নেই সে বিষয়ে এ সকল মাযহাবের আলিমগণ ইজতিহাদ করেছেন। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের প্রথম কয়েক প্রজন্মের আলিমগণ ইমামের মতের বিপরীতে মত প্রকাশ করেছেন এবং এরূপ ভিন্নমতকে মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ ইমাম নিজেই তাঁদেরকে এরূপ স্বাধীন ইজতিহাদ ও দলীল নির্ভরতা শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁরা দলিলভিত্তিক তাকলীদ সমর্থন করেছেন, দলীল

না জেনে ইমামের মতানুসারে ফাতওয়া প্রদান অবৈধ বলেছেন এবং সহীহ হাদীসের কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করাও তাকলীদের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম যুফার ও অন্যান্য ফকীহের প্রসিদ্ধ ছাত্র, হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম ইসাম ইবন ইউসূফ ইবন মাইমূন বালখী (২১৫ হি)। তিনি বলেন:

كنت فى مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه زفر وأبو يوسف وعافية وآخر فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا

"আমি একটি জমায়েতে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে ইমাম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চার সাথী উপস্থিত ছিলেন: যুফার, আবূ ইউসূফ, আফিয়া ও অন্য একজন, তাঁরা সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন যে, আমরা আমাদের বক্তব্য কোন্ দলিল থেকে গ্রহণ করেছি সে দলিল না জানা পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য অনুসারে ফাতওয়া দেওয়া কারো জন্য হালাল নয়।"[১৬৫]

ইমামের মতের বিপরীতে দলীল পাওয়া গেলে তা অনুসরণ করার বিষয়ে ইমাম আযমের নির্দেশ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন আবিদীন বলেন:

وَكَانَ كَذَلِكَ، فَحَصَلَ الْمُخَالَفَةُ مِنْ الصَّاحِبَيْنِ فِي نَحْوِ ثُلُثِ الْمَذْهَبِ

"ইমামের এ কথার ভিত্তিতে তাঁর ছাত্রগণ এভাবেই চলতেন, একারণে ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ মাযহাবের প্রায় তিনভাগের একভাগ মাসআলাতে ইমাম আযমের বিরোধিতা করেছেন।"[১৬৬]

ইমাম ইসাম ইবন ইউসুফের সূত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ, যুফার ও অন্যদের বক্তব্য উপরে উদ্ধৃত করেছি। ইমাম ইসাম অনেক মাসআলাতে ইমাম আবূ হানীফার মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন। তাঁকে এ বিষয়ে আপত্তি করা হলে তিনি বলেন:

لأن أبا حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤت ، فأدرك بفهمه ما لم ندركه، ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم

"ইমাম আবূ হানীফার সাথে আমাদের মতপার্থক্য হওয়ার কারণ আবূ হানীফা এমন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যা আমরা অর্জন করতে পরি নি। তিনি তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দিয়ে যা বুঝতেন আমরা তা বুঝতে পারি না। আর না বুঝে তাঁর মতানুসারে ফাতওয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। (যে বিষয়ে ইমামের দলীল বুঝতে পারি না সে বিষয়ে তাঁর মতের বিরুদ্ধে ফাতওয়া প্রদান করি।)"[১৬৭]

আল্লামা ইবন নুজাইম হানাফী (৯২৬-৯৭০ হি) বলেন:

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ جَازَ لِلْمَشَايِخِ الإِفْتَاءُ بِغَيْرِ قَوْلِ الإِمَامِ الأَعْظَمِ مَعَ أَنَّهُمْ مُقَلِّدُونَ؟ قُلْتُ: قَدْ أَشْكَلَ عَلَيَّ ذَلِكَ مُدَّةً طَوِيلَةً وَلَمْ أَرَ فِيهِ جَوَابًا إلا مَا فَهِمْته الآنَ مِنْ كَلامِهِمْ، وَهُوَ أَنَّهُمْ نَقَلُوا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِقَوْلِنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا حَتَّى نُقِلَ فِي السِّرَاجِيَّةِ أَنَّ هَذَا سَبَبُ مُخَالَفَةِ عِصَامٍ لِلإِمَامِ، وَكَانَ يُفْتِي بِخِلافِ قَوْلِهِ كَثِيرًا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ الدَّلِيلَ، وَكَانَ يَظْهَرُ لَهُ دَلِيلٌ غَيْرُهُ فَيُفْتِيَ بِهِ

"যদি প্রশ্ন করেন, মাযহাবের পূর্ববর্তী ফকীহগণ মুকাল্লিদ ছিলেন, তাঁদের জন্য ইমাম আযমের মত বাদ দিয়ে বিপরীত ফাতওয়া দেওয়া কিভাবে বৈধ হলো? এর উত্তরে আমি বলব: অনেক দিন যাবৎ বিষয়টি আমার মনে খটকা সৃষ্টি করে রেখেছিল। আমি এর কোনো উত্তর পাচ্ছিলাম না। এখন আমি তাঁদের কথা থেকে যা বুঝলাম তার মধ্যে এর উত্তর রয়েছে। তাহলো, তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের সাথীরা (অর্থাৎ ইমামগণ) বলেছেন: "আমরা আমাদের মত কোন্ দলিল থেকে গ্রহণ করেছি সে দলিল না জানা পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য অনুসারে ফাতওয়া দেওয়া কারো জন্য হালাল নয়।" সিরাজিয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ কারণেই ইমাম ইসাম (ইবন ইউসুফ) ইমাম আযমের বিরোধিতা করতেন। তিনি অনেক বিষয়ে ইমাম আযমের মতের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিতেন। কারণ তিনি ইমাম আযমের দলীল জানতে পারেন নি এবং তাঁর কাছে অন্য দলীল জোরালো বলে প্রমাণিত হয়েছে, তখন তিনি উক্ত দলীল অনুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন।"[১৬৮]

ইমাম ইসাম এবং তাঁর ভাই ইবরাহীম (২২৯ হি) হানাফী মাযহাবের তৃতীয় প্রজন্মের প্রসিদ্ধতম ইমাম ও ফকীহ। তঁদের বিষয়ে হানাফী ফকীহগণ লিখেছেন:

كان إبراهيم بن يوسف شيخاً جليلاً فقيهاً، من أصحاب أبي حنيفة... محمد بن داود الفرعي يقول: حلفت أن لا أكتب إلا عن من يقول: الإيمان قول وعمل. فأتيت إبراهيم بن يوسف، فقال: اكتب عني فإني أقول: الإيمان قول وعمل. وكان عصام بن يوسف، أخو إبراهيم هذا يرفع يديه عند الركوع، وعند الرفع، وكان إبراهيم لا يرفع. وكانا شيخين فى زمانهما غير مدافع

ইবরাহীম ইবন ইউসূফ ইমাম আবূ হানীফার অনুসারী অত্যন্ত বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ ও শাইখ ছিলেন ... মুহাম্মাদ ইবন দাউদ

ফারয়ী বলেন, আমি কসম করেছিলাম যে, যে ব্যক্তি ঈমান বলতে মুখের স্বীকৃতি ও কর্ম উভয়কেই বুঝায় শুধু তার থেকেই হাদীস শিক্ষা করব। আমি যখন ইবরাহীম ইবন ইউসুফের নিকট আগমন করলাম তখন তিনি বললেন, তুমি আমার থেকে হাদীস শিখতে পার; কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি ও কর্ম। ইবরাহীম ইবন ইউসুফের ভাই ইসাম ইবন ইউসুফ। ইসাম রুকুতে গমনের সময় এবং রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় হস্তদ্বয় উঠাতেন (রাফউল ইয়াদাইন করতেন), কিন্তু তাঁর ভাই ইবরাহীম তা করতেন না। তাঁরা দুজন তাঁদের যুগের অবিসংবাদিত শাইখ (হানাফী ফকীহ) ছিলেন।"[১৬৯]

প্রথম চার বরকতময় যুগের পরে, বিশেষত ক্রুসেড ও তাতার যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজগুলোতে মাযহাব বিষয়ে অনেক গোঁড়ামি জন্ম নেয়। কিন্তু তারপরও অনেক হানাফী ফকীহ ইমাম আযম ও তাঁর ছাত্রদের এ মত অনুসরণ করতে থাকেন এবং সহীহ হাদীসের সাথে ফিকহের সমন্বয়কে গুরুত্ব দিতে থাকেন। ত্রয়োদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবন আবিদীন শামী (১২৫২ হি) বলেন: ।

صَحَّ عَنْ الإِمَامِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَنَظِيرُ هَذَا مَا نَقَلَهُ ... عَنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ لابْنِ الشِّحْنَةِ، وَنَصُّهُ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَكَانَ عَلَى خِلافِ الْمَذْهَبِ عُمِلَ بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَلا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي.

ইমাম আযম থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন: যখন কোনো হাদীস সহীহ প্রমাণিত হয় তখন সেটিই আমার মাযহাব। এর নমুনা নিম্নরূপ: ... (হিজরী নবম শতকের সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইমাম মুহিব্বুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ ইবন গাযী হালাবী) ইবন শিহনাহ (৮০৪-৮৯০ হি) হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যায় (নিহায়াতুন নিহায়াহ নামক গ্রন্থে) বলেন: "যদি কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয় এবং তা মাযহাবের বিপরীত হয় তবে হাদীস অনুসারে কর্ম করতে হবে এবং তা-ই ইমামের মাযহাব বলে গণ্য হবে। সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মাযহাবের বিপরীতে কর্ম করার কারণে মুকাল্লিদের তাকলীদ নষ্ট হবে না এবং তার হানাফী হওয়াও নষ্ট হবে না। কারণ ইমাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: যখন কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হবে তখন সেটিই আমার মাযহাব বলে গণ্য হবে।"[১৭০]

মুকাল্লিদের জন্য হাদীসের ভিত্তিতে ভিন্নমত অনুসরণ প্রসঙ্গে আল্লামা শামী বলেন:

وَلا بُعْدَ فِيهِ عِنْدَنَا لأَنَّ مَا صَحَّ فِيهِ الْخَبَرُ بِلا مُعَارِضٍ فَهُوَ مَذْهَبٌ لِلْمُجْتَهِدِ وَإِنْ لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ عَنْ الْحَافِظِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْعَارِفِ الشَّعْرَانِيِّ عَنْ كُلٍّ مِنْ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

"এরূপ করা আমাদের নিকটও স্বীকৃত। কারণ যদি কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয় এবং তার বিপরীতে কেনো সহীহ হাদীস না থাকে তবে সে হাদীসটিই মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব বলে গণ্য, যদিও ইমাম এ বিষয়ে কোনো কিছু না বলে থাকেন। কারণ আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, চার মাযহাবের চার ইমামই বলেছেন: "কোনো হাদীস যখন সহীহ বলে প্রমাণিত হয় তখন সেটিই আমার মাযহাব।" হাফিয ইবন আব্দুল বার্র এবং শাইখ সূফী শা'রানী এ বক্তব্য প্রত্যেক ইমাম থেকে উদ্ধৃত করেছেন।"[১৭১]

অর্থাৎ কোনো মুকাল্লিদ যদি একটি হাদীসকে নিজের অধ্যয়নে সহীহ বলে এবং বিপরীতে সহীহ হাদীস নেই বলে নিশ্চিত হন তবে তিনি উক্ত বিশেষ মাসআলায় সহীহ হাদীস নির্ভর মতটি গ্রহণ করতে পারেন। এরূপ করা তাকলীদের পরিপন্থীন নয়।

যেখানে হাদীস নেই, বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করেছেন সেখানেও সাধারণ মানুষের জন্য যে কোনো মত গ্রহণের অবকাশ রয়েছে বলে কোনো কোনো হানাফী ফকীহ উল্লেখ করেছেন। কাযা সালাত আদায় প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন নুজাইম হানাফী (৯৭০ হি) বলেন:

وَإِنْ كَانَ عَامِّيًّا لَيْسَ لَهُ مَذْهَبٌ مُعَيَّنٌ فَمَذْهَبُهُ فَتْوَى مُفْتِيهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَإِنْ أَفْتَاهُ حَنَفِيٌّ أَعَادَ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَإِنْ أَفْتَاهُ شَافِعِيٌّ فَلا يُعِيدُهُمَا وَلا عِبْرَةَ بِرَأْيِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَفْتِ أَحَدًا وَصَادَفَ الصِّحَّةَ عَلَى مَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ أَجْزَأَهُ وَلا إعَادَةَ عَلَيْهِ

"সাধারণ মানুষ, যার কোনো মাযহাব নেই, যে মুফতীকে সে প্রশ্ন করেছে তার মতই তার মাযহাব। হানাফী ফকীহগণ এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই যদি কোনো হানাফী ফকীহ তাকে ফাতওয়া দেন তবে তাকে যোহর ও আসরের সালাত পুনরায় পড়তে হবে। আর যদি কোনো শাফিয়ী ফকীহ তাকে ফাতওয়া দেন তবে তাকে তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। এখানে তার নিজের মতের কোনো মূল্য নেই। আর যদি সে কোনো ফকীহের কাছে জিজ্ঞাসা না করে আমল করে এবং তার আমল কোনো একটি মাযহাব অনুসারে সঠিক বলে গণ্য হয় তাহলেও চলবে, তাকে কোনো সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।"[১৭২]

মাযহাব ও হাদীসের সমন্বয়ের বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের নির্দেশিত এ ধারা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন প্রসিদ্ধ ভারতীয় সংস্কারক, মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (১১৭৬ হি/১৭৬২খৃ)। তাঁর বক্তব্য আমরা পরবর্তী

অনুচ্ছেদে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তাঁর পুত্র শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবীর (১২৩৯হি) শিষ্য ও খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সূফী সংস্কারক সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (১২৪৬হি) এ প্রসঙ্গে বলেন:

"আমলের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রচলিত চার মাযহাবের অনুসরণ করা খুবই ভাল। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলমকে এক ব্যক্তির ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না জানা উচিত। বরং তাঁর ইলম সমস্ত জগতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সময়ের অনুপাতে প্রত্যেকের নিকট ইলম পৌঁছেছে। যে সময় কিতাবাদি লেখা হয়েছে তখন এ ইলমের সংকলন প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং যে মাসআলার ব্যাপারে সহীহ, সুস্পষ্ট ও গাইর মানসূখ (অ-রহিত) হাদীস পাওয়া যাবে সে মাসআলায় কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করবে না। আহলে হাদীস (মুহাদ্দিসগণ)-কে নিজের নেতা জেনে অন্তর থেকে তাঁদের মহব্বত করবে। তাঁদের সম্মান করাকে নিজের জন্য জরুরী মনে করবে। কেননা এমন ব্যক্তি পয়গম্বর (ﷺ)-এর ইলম বহনকারী। এভাবে সে তাঁর সাহচর্য লাভ করে তাঁর নিকট মকবুল হয়ে গিয়েছে। আর মুকাল্লিদগণ তো মুজতাহিদের সম্মান ও মর্যাদা ভালরূপেই জানে। তাদের সাবধান করবার প্রয়োজন হয় না।"[১৭৩]

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর ছাত্র বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারক ও হানাফী ফকহী মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২৮৯হি/ ১৮৭২খৃ) বলেন: "মুর্শিদে বরহক হযরত সায়্যেদ আহমদ (কু. রু)-এর জামানায় দুই প্রকারের লোক ছিল। এক প্রকার যাহারা এলমে হাদীসের শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করাকে অনর্থক মনে করিত এবং উহার কোন মূল্য বুঝিত না। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক ছিল যাহারা ফেকাহর উপর আমল করা এবং নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির অনুসরণ করাকে অস্বীকার করিত এবং এই চার মাযহাবকে বেদআত বলিত। কাজেই উভয় দলকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এমন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হইয়াছে যাহাতে উভয় দল মন্দ না বলে এবং নিজেদের বাহুল্য কথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকিদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী নিজেদের আকিদাকে ঠিক করিয়া নেয়। এই কথার সমর্থনে আমি (সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী রচিত) 'সেরাতুল মোস্তাকিম' কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম হেদায়েতের তৃতীয় ভুমিকার বর্ণনা লিখিয়া দিতেছি, মন দিয়া শোন। 'শরীয়তের হুকুম আহকাম আমল করিবার মধ্যে চার মাযহাবের অনুকরণ করা সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন আছে। কিন্তু ঈমানের মধ্যে তাকলীদ (অন্যের অনুসরণ) জায়েয নয় বরং সৃষ্টিকর্তাকে নিজে বুঝিয়া সুঝিয়া বিশ্বাস করা ঈমানের শর্ত। যে নিজে মোজতাহেদ নয় এমন ব্যক্তির আমলের মধ্যে কোন এক মোজতাহেদের কিম্বা নির্দিষ্ট চার মাযহাবের এক মাযহাবের অনুসারী হওয়া জায়েয আছে। তাহারা নিজ নিজ ইমামের মাযহাবের তাকলীদ করিতেছে এবং অন্য ইমামের মাযহাবের তাকলীদকে অস্বীকার করে না এবং এই চার মাযহাব ব্যতীত পঞ্চম মাযহাবকে হক বা সত্য বলিয়া জানে না এবং পঞ্চম মাযহাবের তাকলীদকে জায়েয মনে করে না। মোট কথা, যে মোজতাহেদ নয় তাহার জন্য এইরূপ তাকলীদ ভাল। তাকলীদ আসলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাবেদারী, কিন্তু যাহার এজতেহাদ (প্রচেষ্টা) করার ক্ষমতা আছে সে পয়গম্বর (ﷺ)-এর মোজতাহেদগণের মধ্যে শুধু একজনের এলেমের উপর নিজকে সীমাবদ্ধ রাখিবে না; কেননা ইহাতে অন্য মাযহাব বাতেল হওয়া বুঝা যায়, যেহেতু এলমে নববী সমস্ত আলেমদের মধ্যেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। সময়ের চাহিদার অনুপাতে প্রত্যেকের নিকট এলেম পৌঁছিয়াছে। যে সময় হুজুর (ﷺ) 'রফাইয়াদাইন' করিতেন ঐ সময়ের হাদীস ইমাম শাফী (রহ)-এর নিকট পৌঁছিয়াছে। পরবর্তী সময়ে হাদীসের কিতাবাদি লেখা হইয়াছে এবং উহাতে সমস্ত এলেম একত্রীকরণ করা হইয়াছে। সুতরাং যে মাসআলার ব্যাপারে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় এবং যাহার অর্থ পরিস্কার বুঝা যায় এবং উহা বিলুপ্তকৃত নয় এবং অন্যের নিকট শোনার প্রয়োজন হয় না, বরং সে নিজেই সহীহ, গায়ের মানসুখ (বিলুপ্তকৃত নয়) ইত্যাদি বুঝিতে পারে, তাহার জন্য সেই মাসআলার ব্যাপারে কাহারো অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা সেই মাসআলার মধ্যে সে নিজেই মোজতাহেদ। আর মোজতাহেদের জন্য অন্যের অনুকরণ করা জায়েয নয়। এই জামানায় এমন অনেক ব্যক্তি আছে যে আহলে হাদীসকে নিজের নেতা বা পরিচালক বলিয়া মানে এবং মনে প্রাণে তাহার প্রতি মহব্বত রাখে এবং তাহার সম্মান করাকে জরুরী মনে করে। কেননা এমন ব্যক্তি পয়গম্বর (ﷺ)-এর এলেমের আমলকারী এবং কোন প্রকারে পয়গাম্বর (ﷺ)-এর বন্ধুত্ব লাভ করিয়া জনাবে রসূলুল্লাহর (ﷺ) নৈকট্য হাছেল করিতে চায়। আর মোকাল্লেদগণ মোজতাহেদের সম্মান ও মর্যাদা ভালরূপেই জানে। তাহাদের সাবধান করিবার প্রয়োজন হয় না।"[১৭৪]

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি) সহীহ হাদীসের কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করাকেই প্রকৃত তাকলীদ আখ্যায়িত করে বলেন:

طائفة قد تعصبوا في الحنفية تعصبا شديدا والتزموا بما في الفتاوى التزاما سديدا وإن وجدوا حديثا صحيحا أو أثرا صريحا على خلافه وزعموا أنه لو كان هذا الحديث صحيحا لأخذ به صاحب المذهب ولم يحكم بخلافه وهذا جهل منهم بما روته الثقات عن أبي حنيفة من تقديم الأحاديث والآثار على أقواله الشريفة فترك ما خالف الحديث الصحيح رأي سديد وهو عين تقليد الإمام لا ترك التقليد

"একদল মানুষ হানাফী হওয়ার বিষয়ে প্রচণ্ড গোঁড়ামি করেছেন। সহীহ কোনো হাদীস বা সাহাবী-তাবিয়ীর মত পেলেও তার বিপরীতে ফাতওয়া-মাসাইলে যা পেয়েছেন তা হুবহু অনুসরণ করেছেন। তারা ধারণা করেন যে, এ হাদীস যদি সহীহ হতো তবে মাযহাবের ইমাম তা গ্রহণ করতেন এবং এর বিপরীতে মত দিতেন না। এটি তাদের অজ্ঞতার কারণে। ইমামের কথার উপরে হাদীসকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে ইমামের নিজের বক্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তারা এরূপ করেছেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ ইমাম আবূ হানীফা থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সহীহ হাদীস ও আসারকে তাঁর বক্তব্যের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য সহীহ হাদীসের বিপরীত সবকিছু পরিত্যাগ করা সঠিক মত। আর হাদীসের কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করলে তাকলীদ পরিত্যাগ করা হয় না; বরং

এরূপ করাই ইমামের প্রকৃত তাকলীদ।"[১৭৫]

আব্দুল হাই লাখনবী আরো বলেন:

واعلم أنه قد كثر النقل عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه بل وعن جميع الأئمة في الاهتداء إلى ترك آرائهم إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لأقوالهم. وقال علي القاري... : قال إمامنا الأعظم: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسئلة. وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين على أتباعه الكرام– فضلا عن العوام– أن يعملوا بما صح عن رسول الله ﷺ. وكذا لو صح عن الإمام نفي الإشارة وصح إثباتها عن صاحب البشارة فلا شك في ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله ﷺ ... فبناء على هذا أمكن لنا أن نورد تقسيما آخر للمسائل فنقول : الفروع المذكورة في الكتب على طبقات: الأولى: المسائل الموافقة للأصول الشرعية المنصوصة في الآيات أو السنن النبوية أو الموافقة لإجماع الأمة أو قياسات أئمة الملة من غير أن يظهر على خلافها نص شرعي جلي أو خفي.

والثانية: المسائل التي دخلت في أصول شرعية ودلت عليها بعض آيات أوأحاديث نبوية مع ورود بعض آيات دالة على عكسه وأحاديث ناصة على نقضه لكن دخولها في الأصول من طريق أصح وأقوى وما يخالفها وروده من سبيل أضعف وأخفى وحكم هذين القسمين هو القبول كما دل عليه المعقول والمنقول. والثالثة: التي دخلت في أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة قوية والحكم فيه لمن أوتي العلم والحكمة اختيار الأرجح بعد وسعة النظر ودقة الفكرة ومن لم يتيسر له ذلك فهو مجاز في ما هنالك. والرابعة: التي لم يستخرج إلا من القياس وخالفه دليل فوقه غير قابل للاندراس وحكمه ترك الأدنى واختيار الأعلى وهو عين التقليد في صورة ترك التقليد.

والخامسة: التي لم يدل عليها دليل شرعي لا كتاب ولا حديث ولا إجماع ولا قياس مجتهد جلي أو خفي لا بالصراحة ولا بالدلالة بل هي من مخترعات المتأخرين الذين يقلدون طرق آبائهم ومشايخهم المتقدمين وحكمه الطرح والجرح فاحفظ هذا التفصيل فإنه قل من اطلع عليه وبإهماله ضل كثير عن سواء السبيل

"জেনে রাখ! ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের থেকে, বরং সকল ইমাম থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোনো সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস তাঁদের মতের বিপরীতে পাওয়া যায় তবে তাঁদের মত বাদ দিতে হবে। মোল্লা আলী কারী বলেন: 'আমাদের ইমাম আযম বলেছেন: 'কারো জন্য আমাদের মত গ্রহণ করা বৈধ নয়; যতক্ষণ না সে উক্ত মাসআলাতে আমাদের মতের দলীল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা সুস্পষ্ট কিয়াস থেকে জানতে পারবে।' ইমাম আযমের এ কথার ভিত্তিতে তোমাকে বুঝতে হবে যে, কোনো বিষয়ে যদি ইমামের কোনো মত বর্ণিত না থাকে তবে ইমামের অনুসারী মুকাল্লিদ আলিম ও সাধারণ মানুষ সকলের সুনিশ্চিত দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস অনুসারে কর্ম করা। আর যদি ইমাম থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি (তাশাহহুদের সময়) ইশারা করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি ইশারা করেছেন, তবে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত মতটিই অগ্রাধিকার লাভ করবে।'... লাখনবী বলেন, উপরের এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আমরা মাযহাবের মাসাআলাগুলোকে নিম্নরূপ বিন্যাস করতে পারি। মাযহাবের ফিকহী গ্রন্থগুলিতে সংকলিত মাস্আলাগুলো কয়েকটি পর্যায়ের:

প্রথমত: শরীয়তের মূলভিত্তি কুরআনের আয়াত বা হাদীসে নববীর বক্তব্যের সাথে, অথবা উম্মাতের ইজমা বা ইমামগণের কিয়াসের সাথে সুসমঞ্জস মাসআলা, যার বিপরীতে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট হাদীস বা 'নস' নেই।

দ্বিতীয়ত: শরীয়তের মূলভিত্তির অন্তর্ভুক্ত মাসাইল, যেগুলোর পক্ষে কুরআনের আয়াত বা হাদীসে নববীর প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু এগুলোর বিপরীতেও কিছু আয়াত বা হাদীস রয়েছে। তবে এ সকল মাসাইলের পক্ষের আয়াত বা হাদীসের নির্দেশনা অধিক সহীহ ও অধিক শক্তিশালী, পক্ষান্তরে এগুলোর বিপরীত আয়াত বা হাদীসের নির্দেশনা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অস্পষ্ট। উপরের দু পর্যায়ের মাযহাবী মাসাইলের বিধান হলো, এগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ ও বুদ্ধি-বিবেক সবই তা নির্দেশ করে।

তৃতীয়ত: শরীয়তের মূলভিত্তির অন্তর্ভুক্ত মাসাইল। কিন্তু এগুলির বিপরীত দলীলও সহীহ ও শক্তিশালী সনদে বর্ণিত। এরূপ মাসাইলের বিধান হলো, যার ইলম ও প্রজ্ঞা আছে তিনি বিস্তারিতভাবে এবং গভীরভাবে এগুলি অধ্যয়ন করবেন এবং অধিকতর শক্তিশালী মতটি গ্রহণ করবেন। আর যে ব্যক্তি এরূপ গবেষণায় অক্ষম তার জন্য এরূপ বিষয়ে মাযহাবের মতটি গ্রহণের অনুমোদন রয়েছে।

চতুর্থত: যে সকল মাসাইল শুধু কিয়াসের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলির বিপরীতে কিয়াসের ঊর্ধ্বের চিরন্তন কোনো দলীল (আয়াত বা হাদীস) বিদ্যমান। এ সকল মাসাইলের বিধান হলো, নিম্নমানের (কিয়াস ভিত্তিক) মত পরিত্যাগ করে উচ্চমানের (হাদীস ভিত্তিক) মত গ্রহণ করা। বিষয়টি বাহ্যত তাকলীদ পরিত্যাগ করা বলে মনে হলেও, তা তাকলীদ পরিত্যাগ নয়, বরং এটিই হলো প্রকৃত তাকলীদ।

পঞ্চমত: এমন কিছু মাসাইল মাযহাবের মধ্যে রয়েছে যেগুলোর পক্ষে কুরআন, হাদীস, ইজমা, বা কোনো মুজতাহিদের সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো কিয়াস বিদ্যমান নেই, সুস্পষ্টভাবে বা প্রাসঙ্গিভাবে কোনোভাবেই তা শরীয়তের এ সকল দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এগুলো পরবর্তী যুগের মানুষদের আবিষ্কার মাত্র, যারা তাদের পিতা-পিতামহ ও শাইখ-মাশাইখদের অন্ধ অনুসরণ করেন। এ সকল

মাসাইলের বিধান হলো এগুলি পরিত্যাগ করতে হবে এবং এগুলির ত্রুটি বর্ণনা করতে হবে।

লাখনবী বলেন, এ বিশ্লেষণটি ভালকরে আয়ত্ব করুন। কারণ খুব কম মানুষই এটি বুঝেন এবং এটি না বুঝার কারণে অনেকেই বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছেন।"[১৭৬]

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রশস্ততা অবলম্বন করেছেন। তাকলীদের পাশাপাশি হাদীস অনুসরণ বা মতভেদীয় মাসআলায় ভিন্ন মাযহাব অনুসরণের বৈধতা দিয়েছেন তাঁরা। প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম নববী (৬৭৬ হি) "আল-মাজমূ" নামক শাফিয়ী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন:

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو: فَمَنْ وَجَدَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ نَظَرَ إنْ كَمُلَتْ آلاتُ الاجْتِهَادِ فِيهِ مُطْلَقًا أَوْ فِي ذَلِكَ الْبَابِ أَوْ الْمَسْأَلَةِ كَانَ لَهُ الاسْتِقْلَالُ بِالْعَمَلِ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ وَشَقَّ عَلَيْهِ مُخَالَفَةُ الْحَدِيثِ بَعْدَ أَنْ بَحَثَ فَلَمْ يَجِدْ لِمُخَالَفَتِهِ عَنهُ جَوَابًا شَافِيًا فَلَهُ الْعَمَلُ بِهِ إنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ إمَامٌ مُسْتَقِلٌّ غَيْرَ الشَّافِعِيِّ وَيَكُونُ هَذَا عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ مَذْهَبِ إمَامِهِ هُنَا. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

"শাইখ আবূ আমর ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি) বলেন: যদি কোনো শাফিয়ী মুকাল্লিদ একটি হাদীসের সন্ধান পান যা তার মাযহাবের বিরোধী তাহলে দেখতে হবে, যদি তিনি পূর্ণভাবে অথবা শুধু একটি বিশেষ অধ্যায়ে বা শুধু একটি বিশেষ মাসআলাতে ইজতিহাদ করতে সক্ষম হন তবে তিনি এ হাদীসটি গ্রহণ ও পালন করবেন। আর যদি তার কোনোরূপ ইজতিহাদ-গবেষণা করার ক্ষমতা না থকে, কিন্তু হাদীসটির বিরোধিতা করা তার জন্য কষ্টকর হয় তবে সেক্ষেত্রেও তিনি মাযহাব বর্জন করে হাদীসটি পালন করবেন, যদি (দুটি শর্ত পূরণ হয়): (১) হাদীসটি বর্জন করার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো উত্তর তিনি খুঁজে না পান এবং (২) ইমাম শাফিয়ী হাদীসটি গ্রহণ না করলেও অন্য কোনো মুজতাহিদ ইমাম উক্ত হাদীসটি গ্রহণ করে থাকেন। এ মাসআলায় ইমামের মাযহাবের বাইরে যাওয়ার জন্য হাদীসটি তার ওজর হিসেবে গণ্য হবে।' ইমাম নববী বলেন: এ কথাটি সুন্দর ও এটিই একমাত্র নিশ্চিত বিষয়।"[১৭৭]

১৫. ৫. ক্রুসেড-তাতার যুদ্ধোত্তর যুগের অবস্থা

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা কিয়াস, হাদীস, মাযহাব ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা, তাঁর ছাত্রগণ ও প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহগণের বক্তব্য জানতে পারলাম। এগুলি নিশ্চিত করে যে, তাঁদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ভিত্তিহীন। তবে হিজরী পঞ্চম-সপ্তম শতকে ক্রুসেড যুদ্ধে বিধ্বস্ত এবং এরপর ৭ম হিজরী শতাব্দীতে তাতার আক্রমণে বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন[১৭৮] মুসলিম দেশগুলোতে ইলম চর্চা স্থবির হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা ও সামাজিক সমর্থন খুবই কমে যায়। এ সময়ে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানচর্চায় স্থবিরতা আসে। এ সকল যুগেও অনেক প্রাজ্ঞ আলিম ছিলেন। তবে অধিকাংশ আলিমই জ্ঞানগত দৈন্যে নিপতিত হন। এ সময়ে অনেক হানাফী ফকীহ এমন সব মন্তব্য করেছেন যা হানাফী মাযহাবের এ মৌলিক বিষয়টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে এবং বিরোধীদের অপপ্রচারকে শক্তিশালী করে। সকল মাযহাবেরই একই অবস্থা হয়ে যায়।

এ যুগের ফকীহগণ ইমামগণের কথা ও শতশত বৎসর পরের ফকীহদের কথা সবই "ইমামের মাযহাব" বলে চালাতে থাকেন। বরং ইমামদের কথার চেয়ে পরবর্তী ফকীহদের কথাই বেশি গ্রহণযোগ্য হতে থাকে। এছাড়া মুসতাহাব পর্যায়ের মতভেদকে তারা হালাল-হারাম বানিয়ে ফেলেন। আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্রগণ বলেছেন যে, মুফতীর জন্য ইমামের মতের দলীল না জেনে ফাতওয়া দেওয়া হারাম। কয়েক শত বৎসর পরে কোনো কোনো আলিম বললেন, দলীল না জানলেও ফাতওয়া দেওয়া জায়েয হতে পারে। আরো কয়েক শত বৎসর পরে কেউ কেউ বলতে লাগলেন: মুকাল্লিদ বা মাযহাব অনুসারীর জন্য দলীল জানাই হারাম!! এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ তুর্কি হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ পীর আলী বারকাবী (৯৮১ হি)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ মুসতাফা হুসাইনী খাদমী হানাফী (১১৭৬ হি) বলেন:

دليل المقلد قول المجتهد لا النصوص... إذا تعارض النص وقول الفقهاء يؤخذ بقول الفقهاء إذ يحتمل كون النص اجتهاديا وله معارض قوي وتأويل وتخصيص وناسخ وغيرها مما يختص بمعرفته المجتهد

"কুরআন-হাদীস মুকাল্লিদের দলীল নয়, মুকাল্লিদের দলীল হলো মুজতাহিদের কথা! ... যদি কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট কথা ফকীহদের কথার বিপরীত হয় তবে ফকীহদের কথা গ্রহণ করতে হবে!!! কারণ হতে পারে যে, কুরআন-হাদীসের কথাটি ইজতিহাদী! এর বিপরীতে কোনো শক্তিশালী দলীল বা ব্যাখ্যা আছে যা হয়ত মুজতাহিদ জানতেন!!!"[১৭৯]

কী দুর্ভাগ্যজনক কথা! নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকতে তারা এ সকল সম্ভাবনা দিয়ে হাদীসের নির্দেশনা বাতিল করছেন, অথচ অনুরূপ কিছু সম্ভাবনা দিয়ে ইমামের কথা বাতিল করতে রাজি নন! এ তো সাধারণ মুর্খ মানুষদের কথা। আলিম বা মুফতীর জন্য তো ফরয দায়িত্ব এ সম্ভাবনাগুলো নিশ্চিত করা। তিনি তাঁর ইমামের দলীল জানবেন, বুঝবেন ও প্রমাণ করবেন। বিভিন্ন সম্ভাবনা

দিয়ে হাদীস বাতিল করার চেয়ে বিভিন্ন সম্ভাবনা দিয়ে ফকীহের কথা বাতিল করা কি সহজতর নয়? হয়ত ফকীহ হাদীসটি জানতেন না, হয়ত তাঁর ইজতিহাদী ভুল হয়েছিল... ।

ইমাম আযম বলছেন, আমার মতের দলীল না জানলে তুমি তা অনুসরণ করবে না, বরং তুমি যে দলীলটি জেনেছ তা অনুসরণ করবে। আমার মতের বিপরীতে দলীল প্রমাণিত হলে তা অনুসরণ করবে। আর এরা বলছেন যে, ইমামের মতের দলীল জানাও তোমার জন্য নিষিদ্ধ! হাদীস মানাও তোমার জন্য নিষিদ্ধ!! আমরাও তোমাকে তাঁর মতের দলীলটি খুঁজে দিতে প্রস্তুত নই। বরং আমরা 'ইমামের মত' বলে যে কথাটি তোমাকে জানাচ্ছি তা অন্ধভাবে অনুসরণ করা তোমাদের জন্য ফরয!!!

এ সকল যুগের অবস্থা সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১১৭৬হি) বলেন:

فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف لا يميزون الحق من الباطل ولا الجدل عن الاستنباط ... ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدا وأشد انتزاعا للامانة من صدور الرجال حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين وبأن - يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم متقدون - وإلى الله المشتكى وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان.

"তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো ঢালাও অন্ধ তাকলীদের উপরে লালিত হতে লাগল। তারা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে এবং বিতর্ক ও ইলমী গবেষণার মধ্যে পার্থক্য বুঝতো না। ...প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্ম তার পূর্বের প্রজন্ম থেকে অধিকতর ফিতনাগ্রস্ত এবং তাকলীদে আক্রান্ত হতে লাগল। এভাবে মানুষের হৃদয় থেকে তারা আমানত ছিনিয়ে নিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা দীনের বিষয়ে গবেষণা ছেড়ে দিল এবং (কুরআনের ভাষায় প্রাচীন কাফিরদের মত) এ কথা বলেই পরিতৃপ্ত হতে লাগল যে, আমরা আমাদের পিতা-পিতামহ-পূর্বপুরুষদের থেকে এ ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।"[১৮০] একমাত্র আল্লাহর কাছেই এ বেদনা জানানো যায়, তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী, তাঁরই উপর নির্ভরতা।"[১৮১]

এ সকল যুগের ফকীহদের ভুলভ্রান্তি কিভাবে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি তৈরি করে সে প্রসঙ্গে আব্দুল হাই লাখনবী বলেন:

وكذلك مسألة الإشارة في التشهد فإن كثيرا من كتب الفتاوى متواردة على منعها وكراهتها فيظن الناظرون فيها أنه مذهب أبي حنيفة وصاحبيه فيشكل عليهم الأمر بورود أحاديث متعددة قولية وفعلية تدل على جوازها وسنيتها قال علي القاري المكي في رسالته تزيين العبارة لتحسين الإشارة بعدما ذكر الأخبار الدالة على الإشارة: لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في هذه المسألة ولا في جواز الإشارة بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه وكذا مالك والشافعي وأحمد وسائر علماء الأمصار والأعصار ... فلا اعتداد لما ترك هذه السنة الأكثرون من سكان ما وراء النهر وأهل خراسان والعراق وبلاد الهند ممن غلب عليهم التقليد وفاتهم التحقيق... وقد أغرب الكيداني حيث قال: والعاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة: كأهل الحديث أي مثل إشارة جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله ﷺ وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم ... ولو لا حسن الظن به وتأويل كلامه بسبب لكان كفره صحيحا وارتداده صريحا فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت عن رسول الله ﷺ ما كاد أن يكون متواترا في نقله؟ .... فظهر منه أن قول النهي المذكور في الفتاوى إنما هو من مخرجات المشايخ لا من مذهب صاحب المذهب وقس عليه أمثاله وهي كثيرة... وإذا عرفت هذا فحينئذ يسهل الأمر في دفع طعن المعاندين على الإمام أبى حنيفة وصاحبيه فإنهم طعنوا في كثير من المسائل المدرجة في فتاوى الحنفية أنها مخالفة للأحاديث الصحيحة أو أنها ليست متأصلة على أصل شرعي ونحو ذلك وجعلوا ذلك ذريعة إلى طعن الأئمة الثلاثة ظنا منهم أنها مسائلهم ومذاهبهم وليس كذلك بل هي من تفريعات المشايخ استنبطوها من الأصول المنقولة عن الأئمة فوقعت مخالفة للأحاديث الصحيحة فلا طعن بها على الأئمة الثلاثة بل ولا على المشايخ أيضا فإنهم لم يقرروها مع علمهم بكونها مخالفة للأحاديث إذ لم يكونوا متلاعبين في الدين بل من كبراء المسلمين بهم وصل ما وصل إلينا من فروع الدين بل لم يبلغهم تلك الأحاديث ولو بلغتهم لم يقرروا على خلافها فهم في ذلك معذورون ومأجورون.

"এখানে একটি উদাহরণ সালাতের মধ্যে তাশাহ্হুদের সময় ইশারা করা। হানাফী ফিকহের অনেক ফাতওয়ার গ্রন্থেই ইশারা করতে নিষেধ করা হয়েছে বা মাকরূহ বলা হয়েছে। পাঠকগণ মনে করবেন যে, এটিই ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর দু ছাত্রের মত। তখন বিষয়টি তার কাছে সমস্যা মনে হয়; কারণ অনেকগুলো হাদীস দ্বারা এরূপ ইশারা করা সুন্নাত বলে প্রমাণিত। মোল্লা আলী কারী 'তাযয়ীনুল ইবারাতি লিতাহসীনিল ইশারাতি' পুস্তিকায় এ বিষয়ক হাদীসগুলো উল্লেখ করে বলেন: সাহাবীদের মধ্যে এবং পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে তাশাহ্হুদের সময় ইশারা করার বৈধতার বিষয়ে কোনো মতভেদ ছিল না। আমাদের ইমাম আ'যম, তাঁর দু সঙ্গী (আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ), ইমাম মালিক, শাফিয়ী, আহমদ এবং সকল দেশের ও সকল যুগের আলিমগণ এ মত পোষণ করেছেন। পরবর্তী যুগে পারস্য, মধ্য এশিয়া ও ভারতের অধিকাংশ হানাফী আলিম এ সুন্নাতটি বর্জন করেছেন। তাকলীদের প্রাধান্য ও গবেষণার অনুপস্থিতির কারণেই তারা এরূপ করেছেন। তাদের কর্ম ও মত গুরুত্বহীন ও অগ্রহণযোগ্য। ....

(নবম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা লুৎফুল্লাহ নাসাফী ফাযিল) কীদানী (৯০০ হি) অবাক ও উদ্ভট কথা

বলেছেন। তিনি বলেছেন: 'সালাতের মধ্যে হারাম কর্মগুলোর দশম কর্ম শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করা, যেভাবে আহলে হাদীসরা করে।' (আলী কারী বলেন:) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বিষয়ক জ্ঞান যাদেরকে একত্রিত করেছে তারা যেভাবে ইশারা করেন সেভাবে ইশারা করা হারাম। এটি তাঁর একটি ভয়ঙ্কর ভুল ও কঠিন অপরাধ। তাঁর বিষয়ে সুধারণা না থাকলে এবং তাঁর কথার ব্যাখ্যা না করলে তার এ কথাটি সন্দেহাতীত কুফর এবং সুস্পষ্ট ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হতো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে হারাম বলা কোনো মুমিনের জন্য কি বৈধ হতে পারে? বিশেষত যে বিষয়টি প্রায় মুতাওয়াতির?..."

লাখনবী বলেন, এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ফাতওয়ার গ্রন্থসমূহে এরূপ ইশারা করতে নিষেধ করে যে মত উল্লেখ করা হয়েছে তা পরবর্তী যুগের ফকীহগণের মত মাত্র; তা ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব নয়। আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যা অবিকল এরূপ।... ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের বিষয়ে বিরোধীরা যে অভিযোগ করেন তার স্বরূপ বুঝা এখন সহজ হয়ে গেল। হানাফী ফাতওয়া বা ফিকহের গ্রন্থে অনেক মাসাইল রয়েছে যেগুলো সহীহ হাদীসের বিপরীত বা কোনো প্রসিদ্ধ শরয়ী মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। বিরোধীরা এ সকল মাসআলাকে ইমাম ত্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁরা ধারণা করেন যে, এগুলো বোধ হয় ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের মত। প্রকৃতপক্ষে এগুলো তাঁদের মত নয়। এগুলো পরবর্তী যুগের হানাফী ফকীহগণের মত। তাঁরা ইমামগণ থেকে বর্ণিত মূলনীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে এ সকল মত প্রকাশ করেছেন। এগুলোর জন্য ইমামত্রয়কে অভিযুক্ত করা যায় না। এমনকি পরবর্তী ফকীহগণকেও এজন্য অভিযুক্ত করা যায় না। কারণ তাঁরাও জেনেশুনে হাদীস বিরোধী ফাতওয়া দেন নি। তাঁরা দীন নিয়ে তামাশা করতেন না; বরং তাঁরা মুসলিমগণের নেতৃপর্যায়ের আলিম ছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমেই আমরা দীনের মাস্‌আলাগুলো জানতে পেরেছি। মূলত পরবর্তী এ সকল ফকীহ এ বিষয়ক হাদীসগুলো জানতেন না। যদি তাঁরা এ সকল মাসআলায় হাদীস জানতেন তবে হাদীসের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিতেন না। কাজেই তাঁরা মাযুর ছিলেন এবং ভুল ইজতিহাদের জন্য সাওয়াব পাবেন।..."[১৮২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবূ হানীফা হাদীস বিরোধী কিয়াসের প্রবর্তক ছিলেন না। সহীহ হাদীসের উপর নির্ভরতার পাশাপাশি তিনি ফকীহের মত যাচাই করে গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহগণ এবং অন্যান্য মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণও একই নির্দেশনা দিয়েছেন। তাকলীদ ও দলীল নির্ভরতার এ সমন্বয়ই সাহাবীগণের সুন্নাত। একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

মদীনার কিছু মানুষ ইবন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করেন: ফরয তাওয়াফের পরে যদি কোনো মহিলার হায়েয (ঋতুস্রাব) শুরু হয় তবে কী হবে? তিনি বলেন: উক্ত মহিলা (বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই) দেশে ফিরে যাবে। তখন তাঁরা বলেন: যাইদ ইবন সাবিত (রা)-এর মতে উক্ত মহিলা হায়েয শেষ হওয়ার পর বিদায়ী তাওয়াফ করে দেশে যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: মক্কা ত্যাগের আগে হাজীকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। আমরা যাইদ (রা)-এর মত বাদ দিয়ে আপনার মত গ্রহণ করব না। তখন ইবন আব্বাস (রা) বলেন: আপনার যখন মদীনায় পৌছাবেন তখন আমার মতের হাদীসটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। তাঁরা মদীনায় পৌঁছে উম্মু সুলাইম (রা) ও অন্যান্য সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা হাদীসটি বলেন। ঘটনাটি হলো, বিদায় হজ্জে ফরয তাওয়াফের পর সাফিয়্যাহ (রা)-এর হায়েয শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই মক্কা ত্যাগের অনুমতি দেন। তখন মদীনাবাসীগণ ইবন আব্বাস (রা)-এর মত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে জানান যে, হাদীসটি তাঁর বর্ণনা মতই তাঁরা পেয়েছেন।[১৮৩]

সাহাবীগণের যুগের এ ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানছি:

(১) মুসলিমদের দায়িত্ব প্রাজ্ঞ আলিমদের থেকে দীন জেনে নেওয়া। এক্ষেত্রে একজন আলিমের প্রতি অধিক আস্থা থাকা খুবই স্বাভাবিক। যাইদ (রা)−এর প্রতি অবিচল আস্থার কারণে ইবন আব্বাস (রা)-এর মুখে হাদীসটি শুনে তাঁরা মেনে নেন নি।

(২) মদীনাবাসীদের কথার প্রতিবাদে ইবন আব্বাস (রা) তাদেরকে হাদীস বিরোধী বলে অভিযুক্ত করেন নি। তাঁর বর্ণনা মেনে নিতেও তাদেরকে চাপাচাপি করেন নি। তিনি তাঁদেরকে হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে উৎসাহ দিয়েছেন।

(৩) মদীনাবাসীগণ যাইদ (রা)-এর উপর আস্থার কারণে ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসটি বিভিন্ন অজুহাতে বাতিল বলে থেমে থাকেন নি। তাঁরা হাদীসটির বিষয়ে অনুসন্ধান করে ইবন আব্বাসের (রা) বর্ণনার নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন।

এটিই তাকলীদ ও দলীল অনুসন্ধানের মাসনূন আদর্শ। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে সাধারণ মুমিন ফকীহগণ থেকে দীন জানবেন। এক্ষেত্রে কোনো একজন ফকীহের উপর অধিক আস্থাশীল হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, সকল ফকীহ বা মুহাদ্দিসের মত সমানভাবে গ্রহণ করলে বা ইচ্ছামত গ্রহণ করলে সাধারণ মুমিনকে বিভ্রান্ত হতে হবে। তবে এরূপ আস্থা বা তাকলীদ অর্থ নির্বিচার বা অন্ধ অনুসরণ নয়। মুমিনের দায়িত্ব বিপরীত কোনো হাদীস জানা গেলে তার নির্ভুলতার বিষয়ে অনুসন্ধান করা। অনুসন্ধানের মাধ্যমে যদি প্রমাণ হয় যে, তিনি যে ফকীহের অনুসরণ করেন তার মতের বিপরীত হাদীসটি বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও ব্যাখ্যাতীত তখন তিনি তা গ্রহণ করবেন।

"যখন কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণ হয়" বলতে ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমাম বাহ্যত এ অবস্থা-ই বুঝিয়েছেন। কোনো একটি হাদীসকে কোনো নির্দিষ্ট আলিম সহীহ বলেছেন বলে জানা এবং নিজে অনুসন্ধানের মাধ্যমে হাদীসটি সহীহ, ব্যাখ্যাতীত ও নিজের পালনীয় মতের দলীলের চেয়ে শক্তিশালী বলে নিশ্চিত হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। কোনো আলিমের উপর নির্ভর করে কোনো হাদীসকে সহীহ বলে গ্রহণ করা ফিকহী তাকলীদের মতই তাকলীদ। এটি নিন্দনীয় নয়। তবে এরূপ তাকলীদের উপর নির্ভর করে অন্য তাকলীদ খণ্ডন বা বর্জন করা যায় না। বুখারী, মুসলিম, ইবন হাজার, সুয়ূতী, আলবানী বা অন্য কোনো মুহাদ্দিস (রাহিমাহুমুল্লাহ) একটি হাদীসকে

সহীহ বলেছেন বলে উক্ত হাদীসের বিপরীত কর্মকে বাতিল বলে মনে করা বিভ্রান্তিকর। আবার আবূ হানীফা, শাফিয়ী, আহমদ, মালিক, আওযায়ী, তাহাবী বা অন্য কোনো ফকীহ (রাহিমাহুল্লাহ) একটি কর্মকে সঠিক বলেছেন বলে উক্ত মতের বিপরীত হাদীসকে রহিত, বাতিল, দুর্বল ইত্যাদি বলে উড়িয়ে দেওয়াও একইরূপ বিভ্রান্তিকর।

বিশেষত মুফতী ও আলিমের দায়িত্ব তাঁর ফাতওয়ার দলীলটি ভালভাবে জানা। একজন ফকীহ বা মুহাদ্দিসের উপর আস্থার কারণে ফিকহ বা হাদীস বিষয়ে তাঁর মতের উপর নির্ভর করা সাধারণ মুসলিমদের জন্য স্বাভাবিক। তবে অন্য কাউকে এ বিষয়ে ফাতওয়া বা সিদ্ধান্ত দিতে হলে বিষয়টি অধ্যয়ন করতে হবে। এরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস, সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত, একাধিক হাদীস থাকলে একটিকে গ্রহণ করার কারণ ভালভাবে জানতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্রগণ এ বিষয়টির প্রতি সর্বোচ্চ তাকিদ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ ইমাম আবূ হানীফা এবং উম্মাতের সকল ফকীহকে রহমত করুন এবং সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদান করুন।

১৬. ইবন তাইমিয়ার মন্তব্য

ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর আলোচনা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার বক্তব্য দিয়ে শেষ করব। আমরা আগেই বলেছি, ইমাম আবূ হানীফাকে কলঙ্কিত করতে জালিয়াতগণ অনেক জালিয়াতি করেছে। এমনকি তাঁর নামে 'কিতাবুল হিয়াল' নামে একটি জাল পুস্তক রচনা করে প্রচার করেছে। এ পুস্তকে জঘন্য দীন বিরোধী কথা ইমামের নামে লেখা হয়েছে। ৪র্থ-৫ম হিজরী শতক পর্যন্ত কেউ উল্লেখ করেন নি যে, ইমাম আবূ হানীফা কিতাবুল হিয়াল নামে কোনো বই লিখেছেন। সম্ভবত ৪র্থ-৫ম শতকের কোনো জালিয়াত তা রচনা করে। এরপর তারা এ পুস্তকের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের অনেক প্রসিদ্ধ আলিমের বক্তব্য জাল করেছে। এ পুস্তক প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া বলেন:

إِنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ الَّتِي هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي نَفْسِهَا لا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى إِمَامٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْحٌ فِي إِمَامَتِهِ وَذَلِكَ قَدْحٌ فِي الأُمَّةِ حَيْثُ ائْتَمُّوا بِمَنْ لا يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ

"এ সকল হারাম হীলা উম্মাতের একজন ইমামের বক্তব্য হতে পারে না। তিনি কখনোই এরূপ হীলা-বাহানার নির্দেশ দিতে পারেন না। তাহলে তো তিনি ইমাম হওয়ার অযোগ্য বলে প্রমাণিত হবেন। আর সেক্ষেত্রে উম্মাতে মুহাম্মাদী অযোগ্য উম্মাত বলে প্রমাণিত হবে; কারণ তারা অযোগ্য একজনকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছে।"[১৮৪]

বস্তুত ইবন তাইমিয়ার অধ্যয়ন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এ কারণে হানাফী ফিকহ তিনি যেভাবে বুঝেছেন, অন্য মাযহাবের অন্য কোনো আলিম সেভাবে বুঝেন নি। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করেন। উপরন্তু অনেক ফিকহী ও উসূলী বিষয়ে তিনি হাম্বালী মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী মত গ্রহণ করেন। তাঁর বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যারা ইমাম আবূ হানীফাকে কলঙ্কিত করতে চেষ্টা করেছেন বা করছেন তাঁরা জেনে অথবা না জেনে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কলঙ্কিত করছেন।

৭/৮ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত প্রায় মুতাওয়াতির হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরের তিন প্রজন্মের প্রামাণ্যতা ও বরকতের সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১৮৫] সে বরকতময় দ্বিতীয় হিজরী শতকে যাকে আলিমগণ, সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্র প্রশাসন মুসলিমদের অন্যতম একজন ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন পরবর্তী যুগে এসে তাঁকে অযোগ্য প্রমাণ করার অর্থ উম্মাতে মুহাম্মাদীকে অযোগ্য প্রমাণ করা। আর দ্বিতীয় শতকের উম্মাতকে অযোগ্য প্রমাণ করার অর্থ কী হতে পারে তা আমরা বুঝতে পারছি।

বস্তুত সামান্য কিছু মতভেদ নিয়ে যে দুঃখজনক বাড়াবাড়ি পূর্ববর্তী কয়েক শতকে ঘটেছে দীনের স্বার্থে ও উম্মাতের স্বার্থেই আমাদেরকে তাঁর ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। মহান আল্লাহ ইমাম আবূ হানীফাকে এবং তাঁর বিরুদ্ধে উম্মাতের যে সকল প্রাজ্ঞ আলিম ও বুজুর্গ কথা বলেছেন তাঁদের সকলকেই ক্ষমা করুন, রহমত করুন এবং দীনের জন্য তাঁদের অবদান কবুল করে তাঁদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। আমীন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইমাম আবূ হানীফার রচনাবলি

১. ইমাম আবূ হানীফার কিতাবুল আসার ও মুসনাদ

ইমাম আবূ হানীফার যুগের আলিমগণ সাধারণত প্রচলিত পরিভাষায় গ্রন্থ রচনা করতেন না, বরং তাঁরা যা বলতেন তা ছাত্ররা লিখতেন। এজন্য তাবিয়ী যুগে বা ১৫০ হিজরী সালের মধ্যে মৃত্যুবরণকারী আলিমদের লেখা বা সংকলিত পৃথক গ্রন্থাদির সংখ্যা খুবই কম। তাঁদের ছাত্রগণের লেখায় তাঁদের বক্তব্য সংকলিত। কখনো কোনো ছাত্র তাঁদের বক্তব্য একক পুস্তিকায় সংকলন করতেন। কখনো তাঁরা নিজেরাই কিছু তথ্য সংকলন করতেন। ইমাম আবূ হানীফার লেখা বলতে কখনো তাঁর নিজের সংকলন এবং কখনো তাঁর কোনো ছাত্র কর্তৃক তাঁর বক্তব্য বা তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলন বুঝানো হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই তা 'ইমাম আবূ হানীফা'-র নামে প্রচারিত হতে পারে। এ মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা রচিত ও সংকলিত প্রধান গ্রন্থ 'কিতাবুল আসার'।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'আসার' বলতে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের বক্তব্য বা কর্ম বুঝানো হয়। সাধারণভাবে 'আসার' এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় হিজরী শতকে মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের সাথে সাহাবীগণের বক্তব্যও সংকলন করতেন এবং ফিকহী পদ্ধতিতে বিন্যাস করতেন। এরূপ গ্রন্থগুলো 'মুআত্তা', 'মুসান্নাফ' বা 'কিতাবুল আসার' নামে পরিচিত।

ইমাম আবূ হানীফা সংকলিত 'কিতাবুল আসার' তাঁর কয়েকজন ছাত্র বর্ণনা করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: যুফার ইবন হুযাইল (১৫৮ হি), আবূ ইউসুফ (১৮২ হি), মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (১৮৯ হি), হাসান ইবন যিয়াদ লুলুয়ী (২০৪ হি)। তন্মধ্যে আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ বর্ণিত 'কিতাবুল আসার' দুটো পৃথক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত। এ গ্রন্থদুটোতে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবূ হানীফা বর্ণিত হাদীসে নববী এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্য সংকলন করেছেন। উল্লেখ্য যে, উভয় গ্রন্থের অধিকাংশ 'আসার' বা হাদীস একই। মূলত গ্রন্থদুটো ইমাম আবূ হানীফা সংকলিত কিতাবুল আসারের পৃথক বর্ণনা মাত্র। ইমাম মালিকের মুআত্তা গ্রন্থটি যেমন বিভিন্ন ছাত্র বিভিন্ন সময়ে শ্রবণ ও বর্ণনা করার কারণে অনেকগুলো মুআত্তার সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফা সংকলিত কিতাবুল আসার ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ পৃথকভাবে বর্ণনা করার কারণে উভয়ের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয়েছে।

'কিতাবুল আসার' ছাড়াও ইমাম আবূ হানীফা সংকলিত হাদীসগুলো 'মুসনাদ আবী হানীফা' নামে বর্ণিত ও গ্রন্থায়িত। তাঁর কয়েকজন ছাত্র তাঁর মুসনাদ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

(১) ইমাম আবূ হানীফার পুত্র হাম্মাদ ইবন আবূ হানীফা (১৮০ হি)
(২) মুহাম্মাদ ইবন খালিদ ওয়াহবী (২০০ হি)
(৩) আবূ আলী হাসান ইবন যিয়াদ লু'লুয়ী (২০৪ হি)

চতুর্থ হিজরী শতক থেকে ষষ্ঠ হিজরী শতক পর্যন্ত সময়ে কয়েকজন মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফার সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো তাঁদের সনদে সংগ্রহ করে 'মুসনাদ আবী হানীফা' নামে সংকলন করেন। তাঁদের অন্যতম:

(১) উমার ইবনুল হাসান ইবনুল আশনানী বাগদাদী (৩৩৯ হি)
(২) আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকূব ইবনুল হারিস আল-হারিসী আল-বুখারী আল-উসতাদ (৩৪০ হি)
(৩) আবূ আহমদ আব্দুল্লাহ ইবন আদী জুরজানী (৩৬৫ হি)
(৪) আবুল কাসিম তালহা ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার মুআদ্দিল শাহিদ বাগদাদী (৩৮০ হি)

(৫) আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনুল মুযাফ্ফার ইবন মূসা ইবন ঈসা ইবন মুহাম্মাদ বাগদাদী (৩৭৯ হি)

(৬) আবূ নুআইম ইসপাহানী আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (৪৩০ হি)

(৭) আবূ বকর আহমদ ইবন মুহাম্মাদ কালায়ী কুরতুবী (৪৩২ হি)

(৮) আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল বাকী ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আনসারী খাযরাজী (৫৩৫ হি)

(৯) আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন খসরু বালখী বাগদাদী (৫২৬ হি)

(১০) আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবিল আওয়াম সা'দী।

তিনি মিসরের বিচারপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। তবে তিনি ইমাম নাসায়ীর (৩০৩ হি) ছাত্র ছিলেন।[১৮৬] এছাড়া তাঁর পৌত্র মিসরের বিচারপতি আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবিল আওয়াম হিজরী ৩৪৯ সালে জন্মগ্রহণ এবং ৪১৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১৮৭] এ হিসেবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি চতুর্থ হিজরী শতকের প্রথমার্ধে ৩৩০-৩৪০ হিজরী সালের দিকে মৃত্যুবরণ করেন।

এগুলোর মধ্যে আবূ মুহাম্মাদ হারিসী সংকলিত মুসনাদ এবং আবূ নুআইম ইসপাহানী সংকলিত মুসনাদ গ্রন্থ দুটি মুদ্রিত।

সপ্তম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম আবুল মুআইয়িদ মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ খাওয়ারিযমী (৬৬৫ হি) 'জামিউল মাসানীদ' বা 'মুসনাদগুলোর সংকলন' নামক একটি গ্রন্থে 'মুসনাদ আবী হানীফা' নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান হাদীসগুলো একত্রে সংকলন করেন।

২. ইমাম আবূ হানীফার রচনাবলি বিষয়ক বিতর্ক

কোনো কোনো আলিম ও গবেষক দাবি করতেন যে, ইমাম আযম কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। হিজরী ষষ্ঠ শতকে প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও দার্শনিক ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (৫৪৪-৬০৬হি) তাঁর রচিত মানাকিবুশ-শাফিয়িয়্যা গ্রন্থে এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর রচিত কোন গ্রন্থই বিদ্যমান নেই।[১৮৮] পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক আলিম তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, প্রাচীন যুগের অন্যান্য প্রসিদ্ধ আলিমগণের ন্যায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর নামেও অনেক জাল গল্প, কাহিনী, মত, বক্তব্য ও গ্রন্থ পরবর্তী যুগে প্রচারিত হয়েছে। বিশেষত ইমাম আবূ হানীফার পক্ষে ও বিপক্ষে বাড়াবাড়ি ও জালিয়াতির প্রবণতা ছিল খুবই বেশি, যার নমুনা আমরা দেখেছি। এক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য আলিমগণ কয়েকটি বিষয় বিচার করেছেন: (১) জীবনীকারদের বক্তব্য, (২) সনদ যাচাই ও (৩) গ্রন্থের বিষয় ও ভাষা বিচার করা।

কোনো মনীষী কোনো গ্রন্থ রচনা করেছেন কিনা সে বিষয়ে জানতে তাঁর সমসাময়িক বা নিকটবর্তী লেখকদের বক্তব্য দেখতে হয়। তাঁর সমসাময়িক বা কাছাকাছি যুগের গবেষক বা জীবনীকারগণ যদি তাঁর রচিত কোনো গ্রন্থের উল্লেখ করেন তবে জানা যায় যে, উক্ত লেখকের নামে উক্ত গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর আগে বা পরেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

মুসলিম উম্মাহর অনন্য বৈশিষ্ট্য সনদ সংরক্ষণ। শুধু হাদীসের ক্ষেত্রেই নয়, লিখিত গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রেও তাঁরা সনদ সংরক্ষণ করেছেন। তাবিয়ীদের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী শতশত বৎসর যাবৎ যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে সকল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির শুরুতে পাঠক দেখবেন যে, গ্রন্থটির লেখক থেকে শুরু করে পাণ্ডুলিপির মালিক বা বর্ণনাকারী পর্যন্ত সনদ উক্ত পাণ্ডুলিপির উপর লেখা রয়েছে। এ সকল সনদ অধ্যয়ন করে খুব সহজেই গ্রন্থটি প্রকৃতই উক্ত আলিমের লেখা কিনা তা নিশ্চিত করা যায়।

যে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ নেই বা তার কোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নেই এবং পূর্ববর্তী লেখকগণ যে গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নি তা জাল বলে বুঝা যায়।

৩. ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণের বক্তব্য

চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী নাসর ইবন মুহাম্মাদ (৩৭৩ হি) 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন।[১৮৯] উপরন্তু গ্রন্থটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।[১৯০] এতে প্রমাণ হয় যে, ইমাম আযমের ওফাতের পরের শতকেই তাঁর এ গ্রন্থটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

৪র্থ-৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবন নাদীম মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (৪৩৮ হি) ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে বলেন:

وله من الكتب كتاب الفقه الأكبر، كتاب رسالته الى البتي، كتاب العالم والمتعلم رواه عنه مقاتل، كتاب الرد على القدرية

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) আল ফিকহুল আকবার, (২) উসমান আল-বাত্তীকে লেখা চিঠি, (৩) আল-আলিম ওয়াল-মুতায়াল্লিম, গ্রন্থটি মুকাতিল তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, (৪) আর-রাদ্দ আ'লাল-কাদারিয়াহ।"[১৯১]

পঞ্চম হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও আকীদাবিদ ইমাম বাযদাবী আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন হুসাইন (৪০০-৪৮২ হি) বলেন:

العلم نوعان علم التوحيد والصفات وعلم الشرايع والأحكام والأصل في النوع الأول هو التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة الهوى والبدعة ولزوم طريق السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون ... وكان على ذلك سلفنا أعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد أو عامة أصحابهم رحمهم الله وقد صنف أبو حنيفة رضي الله عنه في ذلك كتاب الفقه الأكبر وذكر فيه إثبات الصفات وإثبات تقدير الخير والشر من الله وأن ذلك كله بمشيئته ... وصنف كتاب العالم والمتعلم وكتاب الرسالة... وكان في علم الأصول إماما صادقا ... ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط وغير المبسوط على أنهم لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء

"ইলম দু প্রকার: (১) আল্লাহর একত্ব ও বিশেষণের ইলম এবং (২) শরীয়ত ও আহকামের ইলম। প্রথম প্রকারের ইলমের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো কুরআন ও সুন্নাত সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকতে হবে, যুক্তি-মর্জি নির্ভর মত ও বিদআত বর্জন করতে হবে এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতের উপরে, যে মতের উপরে সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সে মতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। .... আমাদের পূর্ববর্তীগণ, অর্থাৎ আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ও তাঁদের অধিকাংশ ছাত্রই এ মতের উপরেই ছিলেন (রাহিমাহুমুল্লাহ)। আবূ হানীফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ বিষয়ে "আল-ফিকহুল আকবার" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি বিশেষণগুলো প্রমাণ ও স্বীকার করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং ভালমন্দ তাকদীর আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে প্রমাণ ও স্বীকার করার কথা লিখেছেন। এগুলো সবই মহান আল্লাহর ইচ্ছায়...। এবং তিনি "আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম" গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং তিনি (বাত্তীকে পাঠানো) চিঠি লিখেছেন ....। তিনি দীনের মূলনীতির (আকীদার) বিষয়ে সত্যপরায়ণ ইমাম ছিলেন।... আমাদের সাথীগণ থেকে বর্ণিত বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত সকল তথ্য প্রমাণ করে যে, তাঁরা মুতাযিলী মত বা অন্য কোনো বিদআতী মতের দিকে কোনোরূপ আকৃষ্ট হন নি।"[১৯২]

পঞ্চম হিজরী শতকের শাফিয়ী ফকীহ আল্লামা আবুল মুযাফ্ফার তাহির ইবন মুহাম্মাদ ইসফিরাঈনী শাহফূর (৪৭১ হি) লিখেছেন:

ومن أراد أن يتحقق أن لا خلاف بين الفريقين في هذه الجملة فلينظر فيما صنفه أبو حنيفة رحمه الله في الكلام وهو كتاب العلم ... وكتاب الفقه الأكبر الذي أخبرنا به الثقة بطريق معتمد وإسناد صحيح عن نصير بن يحيى عن أبي مطيع عن أبي حنيفة وما جمعه أبو حنيفة في الوصية التي كتبها إلى أبي عمرو عثمان البتي ...

"(আকীদা বিষয়ে) হানাফী-শাফিয়ী মতভেদ না থাকার বিষয়টি যদি কেউ নিশ্চিত হতে চায় তবে সে যেন আবূ হানীফা (রাহ) রচিত ইলমুল কালাম বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে। তা হলো 'কিতাবুল ইলম' (কিতাবুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম)। এবং 'আল-ফিকহুল আকবার' নামক গ্রন্থও অধ্যয়ন করুক, যে গ্রন্থটি আমাকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য সূত্রে ও সহীহ সনদে নাসীর ইবন ইয়াহইয়া থেকে আবূ মুতী থেকে আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। এছাড়া আবূ হানীফা আবূ আমর উসমান আল-বাত্তীকে (১৪৩হি) পাঠানো পত্রে যা লিখেছেন তাও অধ্যয়ন করুক।"[১৯৩]

শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি) বলেন:

فإن أبا حنيفة ... كلامه في الرد على القدرية معروف في الفقه الأكبر وقد بسط الحجج في الرد عليهم بما لم يبسطه على غيرهم في هذا الكتاب

"কাদারিয়া মতের বিরুদ্ধে 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে আবূ হানীফার বক্তব্য সুপরিচিত। এ গ্রন্থে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অন্য কোনো ফিরকার বিরুদ্ধে তত আলোচনা করেন নি।"[১৯৪]

প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন জামাআহ (৩৩হি) বলেন:

فإن أبا حنيفة له كتاب في الرد على القدرية سماه الفقه الأكبر

"আবূ হানীফা কাদারিয়া মতবাদ খণ্ডনে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম দিয়েছিলেন: 'আল-ফিকহুল আকবার'।"[১৯৫]

এভাবে আমরা দেখলাম যে, হিজরী ৪র্থ শতক থেকে আলিমগণ ইমাম আবূ হানীফা রচিত তিনটি বা চারটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগগুলোতে কয়েকজন আলিম ইমাম আবূ হানীফার লেখা আরো কয়েকটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন। অষ্টম হিজরী শতকে আল্লামা আব্দুল কাদির ইবন আবিল ওয়াফা (৭৭৫ হি) ইমাম আযমের রচনাবলি প্রসঙ্গে বলেন:

ومن تصانيفه وصاياه لأصحابه

"তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে রয়েছে 'তাঁর সাথীদের জন্য তাঁর ওসিয়্যাত'।"[১৯৬]

এ শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ বাবরতী (৭৮৬ হি) "শারহু ওয়াসিয়্যাতিল ইমাম আবী হানীফাহ' নামে এ পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা লিখেন।[১৯৭] কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, এ পুস্তিকাটি তাঁর পুত্র হাম্মাদ-এর রচিত।[১৯৮]

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আহমদ ইবন হাসান আল-বায়াদী (১০৯৮ হি), মুহাম্মাদ মুরতাদা যাবীদী (১২০৫ হি), আল্লামা মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারী (১৩৭১/১৯৫২) ও অন্যান্য আলিম ইমাম আযমের রচনাবলির মধ্যে "আল-ফিকহুল আবসাত" নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[১৯৯]

ত্রয়োদশ হিজরী শতকে (উনবিংশ খৃস্টীয় শতকে) তুরস্ক ও ভারতে ইমাম আবূ হানীফার নামে "আল-কাসীদাহ আন-নুমানিয়্যাহ' বা 'আল-কাসীদাহ আল-কাফিয়্যাহ' নামে আরেকটি কাব্য-পুস্তিকা প্রকাশ পায়। তুরস্ক ও ভারতে কোনো কোনো আলিম এর অনুবাদও করেন। এদের মধ্যে প্রাচীনতম যাকে জানা যায় তিনি তুরস্কের শাইখ ইবরাহীম খালীল ইবন আহমদ রূমী হানাফী (১২৭০ হি/১৮৫৪খৃ)।[২০০] বিগত শতকে "আল-মাকসূদ ফিস সারফ" নামে আরবী শব্দতত্ত্ব বিষয়ক একটি পুস্তিকা ইমাম আযমের লিখিত বলে প্রচারিত হয়েছে।

৪. আপত্তির প্রেক্ষাপট

এভাবে আমরা দেখছি যে, চতুর্থ শতক থেকে আলিমগণ ইমাম আবূ হানীফা রচিত 'আল-ফিকহুল আকবার' ও কয়েকটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু তাঁরা বারবার বলেছেন যে, তাঁরা এগুলো সহীহ সনদের বর্ণনার মাধ্যমে গ্রহণ ও অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু তারপরও এগুলো নিয়ে আপত্তি বা সন্দেহের কারণ কী?

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর শুরু থেকে মুতাযিলী শাসনের প্রেক্ষাপটে অনেক হানাফী ফকীহ মুতাযিলী মত গ্রহণ করেন বা মুতাযিলীদের সাথে মিলে মিশে চলতে থাকেন। তৃতীয় হিজরী শতক থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইরাক, ইরান ও মধ্য এশিয়ার অনেকে ফিকহী বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার মত অনুসরণ করলেও আকীদার বিষয়ে মুতাযিলী-কাদারিয়া মত অনুসরণ করতেন। আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (৫৩৮ হি)-র কথা আমরা অনেকেই জানি। তিনি মুতাযিলী মতবাদের একজন গোঁড়া অনুসারী ও প্রচারক ছিলেন। কিন্তু ফিকহী বিষয়ে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং হানাফী ফিকহ বিষয়ে তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এসকল মুতাযিলী-কাদারী হানাফীগণ ইমাম আবূ হানীফাকেও মুতাযিলী-কাদারিয়া মতাবলম্বী বলে মনে করতেন বা চিত্রিত করার চেষ্টা করতেন। তাদের মতের পক্ষে অনেক বক্তব্য ও গল্প তারা ইমাম আবূ হানীফার নামে প্রচার করতেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলো সবই আকীদা বিষয়ক এবং মুতাযিলী-কাদারিয়া আকীদার বিরোধী। এজন্য এ গ্রন্থগুলোকে তারা বিভিন্নভাবে চোখের আড়াল রাখতে চেষ্টা করতেন। এগুলো ইমামের রচিত নয় বলে প্রচার করতেন। কখনো বা ব্যাখ্যার নামে এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বক্তব্য ঢুকিয়েছেন। যে কারণে গ্রন্থগুলোর ব্যাপক প্রচার ব্যাহত হয়েছে এবং এ বিষয়ে নানা বিতর্ক ও সন্দেহ প্রচারিত হয়েছে।

আমরা দেখেছি, ইমাম বাযদাবী এরূপ প্রচারণা খণ্ডন করে বলেছেন যে, ইমাম আযম মুতাযিলী বা কাদারী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা আব্দুল কাদির ইবন আবিল ওয়াফা কুরাশী (৬৯৬-৭৭৫ হি) বলেন:

قال الكردري: فإن قلت ليس لأبي حنيفة كتاب مصنف قلت هذا كلام المعتزلة... وغرضهم بذلك نفي أن يكون الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم له لأنه صرح فيه بأكثر قواعد أهل السنة والجماعة ودعواهم أنه كان من المعتزلة وذلك الكتاب لأبي حنيفة البخاري وهذا غلط صريح فإني رأيت بخط العلامة مولانا شمس الملة والدين الكردري البزانقني العمادي هذين الكتابين وكتب فيهما أنهما لأبي حنيفة وقال تواطأ على ذلك جماعة كثير من المشائخ ...

কারদারী[২০১] বলেন: "আপনি যদি বলেন যে, 'আবূ হানীফা কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি', তবে আমি বলব যে, এ মু'তাযিলীদের কথা। ... তাদের উদ্দেশ্য হলো, আল-ফিকহুল আকবার এবং আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম গ্রন্থদ্বয় তাঁর রচিত নয় বলে দাবি করা। কারণ ইমাম এ দুটো গ্রন্থে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অধিকাংশ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। মুতাযিলীরা দাবি করে যে, ইমাম আবূ হানিফা মুতাযিলী ছিলেন। তারা বলে, 'আল-ফিকহুল আকবার' আবূ হানীফা আল-বুখারী নামক একব্যক্তির লেখা। এ কথাটি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি। কারণ মাওলানা শামসুল মিল্লাতি ওয়াদ্দীন কারদারী বাযাতিকনী ইমাদীর নিজের হাতে অনুলিপি করা এ দুটো গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়েছে এবং তিনি এদুটো গ্রন্থেই লিখে রেখেছেন যে, গ্রন্থদ্বয় ইমামের রচিত। তিনি বলেছেন: বহুসংখ্যক মাশাইখ (প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ) এ বিষয়ে একমত।"[২০২]

এরূপ অপপ্রচারের কারণে ইমাম আযম রচিত গ্রন্থগুলো তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও তেমন প্রচার লাভ করে নি। 'আল-ফিকহুল আকবার' ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও খুবই কম পাওয়া যেত। আল্লামা আব্দুল কাদির ইবন আবিল ওয়াফা কুরাশী ইমাম

আযমের রচনাবলি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

وقد شرحت الفقه الأكبر وضمنته وصاياه بحمد الله ولعلي إذا ظفرت بالعلم والمتعلم أشرحه بعون الله وتوفيقه

"আল-হামদু লিল্লাহ, আমি 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটির ব্যাখ্যা রচনা করেছি। এর মধ্যে ইমামের ওসিয়্যাতগুলোও সংযুক্ত করেছি। যদি 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' গ্রন্থটির সন্ধান পাই তাহলে আশা রাখি যে, আমি আল্লাহর সাহায্যে ও তাওফীকে এ গ্রন্থটিরও ব্যাখ্যা লিখব।"[২০৩]

এ থেকে আমরা বুঝি যে, সপ্তম শতকেও ইমাম আযমের কোনো কোনো গ্রন্থ এতই দুস্প্রাপ্য ছিল যে, এরূপ একজন প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক অধ্যয়ন নির্ভর হানাফী আলিমের জন্যও এ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ সম্ভব হয় নি।

৫. বিদ্যমান গ্রন্থগুলোর সনদ পর্যালোচনা

আমরা দেখলাম যে, উপরের ৭টি পুস্তিকা ইমাম আবূ হানীফার রচিত বলে প্রচারিত। এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ পুস্তিকা দুটোর কোনো সনদ পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী কোনো গবেষক, ঐতিহাসিক বা জীবনীকারও এগুলোর কোনোরূপ উল্লেখ করেন নি। এগুলোর প্রাচীন কোনো পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। এজন্য এ পুস্তিকাদ্বয় বিগত কয়েক শতকের মধ্যে কেউ রচনা করে ইমাম আযমের নামে জালিয়াতি করে প্রচার করেছেন বলে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়। এছাড়া পুস্তিকা দুটোর বিষয়বস্তু, ভাষা ও পরিভাষাও জালিয়াতি নিশ্চিত করে।[২০৪] অবশিষ্ট ৫টি পুস্তিকার সনদ আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

(১) আল-ফিকহুল আকবার (শ্রেষ্ঠ ফিকহ)

মদীনা মুনাওয়ারার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থাগার ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণাগার 'শাইখুল ইসলাম আরিফ হিকমাত-এর লাইব্রেরি'তে বিদ্যমান এ গ্রন্থটির প্রাচীন পাণ্ডুলিপির (নং ২৩৪) সনদ নিম্নরূপ: পুস্তিকাটি শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ নাসীর ইবন ইয়াহইয়া বালখী (২৬৮ হি) প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবন মুকাতিল রাযী (২৪৮ হি) থেকে, তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ ইসাম ইবন ইউসূফ বালখী (২১৫ হি) থেকে, তিনি ইমাম আবূ হানীফার পুত্র প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা (১৭৬ হি) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে।[২০৫]

(২) আল-ফিকহুল আবসাত (বিস্তারিত ফিকহ)

এ গ্রন্থটি মূলত 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাষ্য। গ্রন্থটির সংকলক ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম আবূ মুতী বালখী হাকাম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম খুরাসানী (১৯৯ হি)। তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে আকীদা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেন। এ সকল প্রশ্ন ও উত্তরের সংকলন এ গ্রন্থটি। অনেকেই এ পুস্তিকাটিকে "আল-ফিকহুল আকবার" নামে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করব।

ইমাম আবূ মুতী বালখী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন বিচারক বা কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধে তিনি আপোষহীন ছিলেন। ইমাম যাহাবী ও ইবন হাজার উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর ইলমের প্রশস্ততা এবং তাঁর অতুলনীয় দীনদারীর কারণে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তি করতেন। তবে তিনি মুতাযিলী ও মুরজিয়া মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন বলে ইমাম আহমদ, বুখারী, আবূ দাউদ, আবূ হাতিম রাযী, নাসাঈ, ইবন হিব্বান, ইবন আদী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।[২০৬]

মিসরের প্রাচীন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার "দারুল কুতুব"-এ বিদ্যমান এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির (নং ২১৫-৬৪) সনদ নিম্নরূপ। গ্রন্থটি বর্ণনা করেছেন হানাফী ফিকহের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বাদাইউস সানাই-এর প্রণেতা শাইখ আবূ বকর আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭হি), তিনি তাঁর শ্বশুর সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমদ সামারকান্দী থেকে, তিনি আবুল মুয়ীন মাইমূন ইবন মুহাম্মাদ নাসাফী (৫০৮ হি) থেকে, তিনি প্রসিদ্ধ ওয়ায়িয ও মুহাদ্দিস আবূ আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবন আলী ফাদল (৪৮৪ হি) থেকে, তিনি আবূ মালিক নুসরান ইবন নাসর খাতালী থেকে, তিনি আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ ফারিস থেকে, তিনি নাসীর ইবন ইয়াহইয়া (২৬৮ হি) থেকে, তিনি আবূ মুতী বালখী থেকে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা থেকে।[২০৭]

(৩) আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (জ্ঞানী ও শিক্ষার্থী)

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রশ্ন ও উত্তর। এ গ্রন্থে ইমাম আবূ মুকাতিল হাফস ইবন সালম সামারকান্দী (২০৮ হি) তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফাকে আকীদা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আবূ মুকাতিল নিজের ভাষায় এ সকল প্রশ্ন ও উত্তর সংকলন করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, গ্রন্থটি ইমাম আবূ হানীফার রচনা নয়, বরং আবূ মুকাতিলের রচনা, যাতে তিনি ইমাম আবূ হানীফার মতামত সংকলন করেছেন, যেমন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী তাঁর আল-মাবসূত গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফার মতামত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে সংকলন করেছেন। তবে যেহেতু এ গ্রন্থে শুধু তাঁর মত ও কথাই সংকলিত এজন্য গ্রন্থটি তাঁর রচিত বলে উল্লেখ করেছেন

অনেক আলিম। অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, এ গ্রন্থটির রচয়িতা ইমাম আবূ মুকাতিল।[২০৮]

এ গ্রন্থের সংকলক আবূ মুকাতিল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ আবিদ, যাহিদ ও দরবেশ ছিলেন। তবে হাদীস, ফিকহ ও ইলমের বর্ণনায় মুহাদ্দিসগণ তাঁকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ আবিদ ও যাহিদই অতিরিক্ত ইবাদতের কারণে ইলমী বিষয়ে তত মনোযোগ ও সতর্কতা রাখতে পারতেন না। ওকী ইবনুল জার্রাহ, আব্দুর রাহমান ইবন মাহদী, কুতাইবা ইবন সাঈদ, জূযজানী, হাকিম নাইসাপূরী, আবূ নুআইম ইসপাহানী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁকে বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ ইয়ালা আল-খালীলী তাঁকে সত্যপরায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন।[২০৯] ইমাম আবূ হানীফার অন্য ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন:

خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم

"তোমরা আবূ মুকাতিল থেকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগি গ্রহণ করবে এবং তা-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।"[২১০]

এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী বলেন:

أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَ سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِىِّ فَجَعَلَ يَرْوِى عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى شَدَّادٍ الأَحَادِيثَ الطِّوَالَ الَّتِى كَانَ يَرْوِى فِى وَصِيَّةِ لُقْمَانَ وَقَتْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَخِى أَبِى مُقَاتِلٍ يَا عَمِّ لاَ تَقُلْ حَدَّثَنَا عَوْنٌ فَإِنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ هَذِهِ الأَشْيَاءَ. قَالَ يَا بُنَىَّ هُوَ كَلاَمٌ حَسَنٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِى قَوْمٍ مِنْ جِلَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَضَعَّفُوهُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِمْ وَوَثَّقَهُمْ آخَرُونَ مِنَ الأَئِمَّةِ بِجَلاَلَتِهِمْ وَصِدْقِهِمْ وَإِنْ كَانُوا قَدْ وَهِمُوا فِى بَعْضِ مَا رَوَوْا

"আমাদেরকে মূসা ইবন হিযাম (২৫০ হি) বলেছেন, আমি সালিহ ইবন আব্দুল্লাহ (২৩১ হি)-কে বলতে শুনেছি, আমরা আবূ মুকাতিল সামারকান্দীর নিকট ছিলাম। তিনি আওন ইবন আবী শাদ্দাদ থেকে বড় বড় হাদীস বর্ণনা করছিলেন, যে সকল হাদীসে লুকমান হাকীমের ওসীয়ত, সাঈদ ইবন জুবাইরের নিহত হওয়ার ঘটনা ও অনুরূপ বিষয়াদি ছিল। তখন আবূ মুকাতিলের ভাতিজা বলেন: চাচা, আপনি বলেন না যে, আওন আমাদেরকে এ হাদীস বলেছেন; কারণ আপনি তো এ সকল হাদীস তাঁর থেকে শুনেন নি। তখন আবূ মুকাতিল বলেন: বেটা, 'এ কথাগুলিতো সুন্দর!' তিরমিযী বলেন, অনেক সুপ্রসিদ্ধ মহান আলিমের বিষয়ে অনেক মুহাদ্দিস আপত্তি প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বল বলেছেন তাঁদের স্মৃতিশক্তি ও হাদীস নির্ভুল মুখস্থ রাখার দুর্বলতার কারণে। আবার অনেকে তাঁদেরকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন তাঁদের মর্যাদা ও সত্যবাদিতার কারণে, যদিও তাঁরা তাঁদের বর্ণিত কিছু হাদীসে অসাবধানতা জনিত ভুলভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছেন।"[২১১]

ইমাম তিরমিযী সংকলিত এ ঘটনার সনদ সহীহ। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইমাম আবূ মুকাতিল বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসতর্ক ছিলেন। অন্যান্য অনেক দরবেশের মতই মনে করতেন, কথা যদি ভাল হয় তবে তা কোনো ভাল মানুষের নামে বললে দোষ নেই!! পাশাপাশি ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি যে, ইবন মুকাতিল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও মর্যাদাসম্পন্ন আলিম ছিলেন, যারা তাঁর বিষয়ে আপত্তি করেছেন তাঁরা শুধু নির্ভুল বর্ণনায় তাঁর দুর্বলতার কারণেই তা করেছেন। আবার যারা তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন তারাও তাঁর এ দুর্বলতার বিষয়ে সচেতন। তবে তাঁর মর্যাদা ও মূল সত্যপরায়ণতার কারণে তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থটির একাধিক সনদ পাওয়া যায়। মিসরের দারুল কুতুবে বিদ্যমান পাণ্ডুলিপির (নং ৩৪১৪৭) সনদ নিম্নরূপ: পুস্তিকাটি বর্ণনা করেছেন শাইখ আবুল হাসান আলী ইবন খলীল দিমাশকী (৬৫১ হি), তিনি আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন আলী ইবনুল হাসান বালখী (৫৪৮ হি) থেকে, তিনি আবুল মুয়ীন মাইমূন ইবন মুহাম্মাদ নাসাফী (৫০৮ হি) থেকে, তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মাদ নাসাফী থেকে, তিনি আব্দুল কারীম ইবন মূসা বাযদাবী নাসাফী (৩৯০ হি) থেকে, তিনি (মাতুরিদী মতের প্রতিষ্ঠাতা) ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী (৩৩৩ হি) থেকে, তিনি আবূ বকর আহমদ ইবন ইসহাক জূযজানী থেকে, তিনি ইমাম আবূ ইউসূফের ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আবূ সুলাইমান মূসা ইবন সুলাইমান জূযজানী থেকে এবং প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবন মুকাতিল রাযী (২৪৮ হি) থেকে, তারা উভয়ে আবূ মূতী হাকাম ইবন আব্দুল্লাহ বালখী (১৯৯ হি) ও আবূ ইসমাহ ইসাম ইবন ইউসুফ বালখী (২১৫ হি) থেকে তাঁরা উভয়ে আবূ মুকাতিল সামারকান্দী থেকে, ইমাম আবূ হানীফা থেকে।[২১২]

(৪) আর-রিসালাহ বা উসমান বাত্তীকে লেখা পত্র

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক বসরার সুপ্রসিদ্ধ কাপড় ব্যবসায়ী, মুহাদ্দিস, কিয়াসপন্থী ফকীহ ও বিচারক ছিলেন আবূ আমর উসমান ইবন মুসলিম আল-বাত্তী (১৪৩ হি)। তিনি মূলত কূফার অধিবাসী ছিলেন, পরে বসরায় বসবাস করেন। বাত্তী শুনেন যে, ইমাম আবূ হানীফা মুরজিয়া মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে জানতে চেয়ে ইমাম আবূ হানীফাকে পত্র লিখেন। এ পত্রের উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা তাঁর মত ব্যাখ্যা করে ও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করে এ পত্রটি তাকে লিখে পাঠান।

মদীনা মুনাওয়ারার "আরিফ হিকমাত লাইব্রেরি"-তে সংরক্ষিত এ পুস্তিকার পাণ্ডুলিপির (নং ২৩৪) সনদ নিম্নরূপ: পত্রটি বর্ণনা করেছেন হুসামুদ্দীন হুসাইন ইবন আলী সিগনাকী (৭১০ হি), তিনি হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাসর বুখারী (৬৯৩ হি) থেকে, তিনি শামসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুস সাত্তার কারদারী (৬৪২ হি) থেকে, তিনি (হেদায়ার প্রণেতা) আল্লামা বুরহানুদ্দীন

আলী ইবন আবী বাকর মারগীনানী (৫৯৩ হি) থেকে, তিনি যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইয়ারসূখী (৫৪৫ হি) থেকে, তিনি আলাউদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমদ সামারকান্দী (৫৩৯ হি) থেকে, তিনি আবুল মুয়ীন মাইমূন ইবন মুহাম্মাদ নাসাফী (৫০৮ হি) থেকে, তিনি আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন মুতরিফ বালখী থেকে, তিনি আবূ সালিহ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন সামারকান্দী থেকে, তিনি আবূ সাঈদ সা'দান ইবন মুহাম্মাদ ইবন বাকর বুসতী থেকে, তিনি আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ ফারিস থেকে, তিনি নাসীর ইবন ইয়াহইয়া (২৬৮ হি) থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন সামাআহ তামীমী (২৩৩ হি) থেকে তিনি ইমাম আবূ ইউসূফ (১৮২ হি) থেকে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা থেকে।"[২১৩]

(৫) ওসিয়্যাহ

এ পুস্তিকাটিতে ঈমান-আকীদা বিষয়ে ইমাম আযমের কিছু 'ওসিয়ত' সংকলিত। মদীনা মুনাওয়ারার "শাইখুল ইসলাম আরিফ হিকমাত লাইব্রেরি"-তে সংরক্ষিত এ পুস্তিকার পাণ্ডুলিপির (নং ২৩৪) সনদ নিম্নরূপ:

ওসিয়্যাতটি বর্ণনা করেছেন হুসামুদ্দীন হুসাইন ইবন আলী সিগনাকী (৭১০ হি), তিনি হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাসর বুখারী (৬৯৩ হি), তিনি শামসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুস সাত্তার কারদারী (৬৪২ হি) থেকে, তিনি হেদায়ার প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবী বাকর মারগীনানী (৫৯৩ হি) থেকে, তিনি যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন নূসূখী (৫৪৫ হি) থেকে, তিনি আলাউদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমদ সামারকান্দী (৫৩৯ হি), তিনি আবুল মুয়ীন মাইমূন ইবন মুহাম্মাদ নাসাফী (৫০৮ হি) থেকে, তিনি ইমাম আবূ তাহির মুহাম্মাদ ইবনুল মাহদী হুসাইনী থেকে, তিনি ইসহাক ইবন মানসূর আল-মিসইয়ারী থেকে, তিনি আহমদ ইবন আলী সুলাইমানী থেকে তিনি হাতিম ইবন আকীল জাওহারী থেকে, তিনি আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সামাআহ তামীমী (২৩৩ হি) থেকে, তিনি ইমাম আবূ ইউসূফ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (১৮২ হি) থেকে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা থেকে।"[২১৪]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবূ হানীফা রচিত তিনটি পুস্তকের কথা তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে "আল-ফিকহুল আকবার" গ্রন্থটির কথা অনেক প্রাচীন আলিম উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির সনদ বিদ্যমান এবং বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গ্রন্থটির অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান।

৬. আল-ফিকহুল আকবার ও আবসাত

আমরা দেখছি যে, 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটির দুটি ভাষ্য বিদ্যমান: একটি তাঁর পুত্র হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত এবং অন্যটি তাঁর ছাত্র আবূ মুতী বালখীর সূত্রে বর্ণিত এবং 'আল-ফিকহুল আবসাত' নামে প্রসিদ্ধ। পুস্তিকা দুটির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(১) আল-ফিকহুল আবসাত পুস্তিকাটি আকারে আল-ফিকহুল আকবার-এর প্রায় তিনগুণ। আল্লামা মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আল-ফিকহুল আবসাত'-এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮ এবং 'আল-ফিকহুল আকবারের' পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬।

(২) আল-ফিকহুল আবসাতে মূলত দুটি বিষয় অতি বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে: (১) ঈমানের পরিচয়, সংজ্ঞা, ঈমান ও আমালের সম্পর্ক, খারিজী-মুরজিয়া প্রান্তিকতা, তাকফির বা মুমিনকে কাফির বলা এবং (২) তাকদীর প্রসঙ্গ। এর মধ্যে আকীদার আরো কিছু বিষয়, যেমন: সাহাবীগণের ভালবাসা, জালিম সরকারের আনুগত্য, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, উম্মাতের বিভক্তি, বিদআত, মহান আল্লাহর আরশে অধিষ্ঠান ও ঊর্ধ্বত্ব, মহান আল্লাহর বিশেষণ ইত্যাদি বিষয় প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিপরীতে আল-ফিকহুল আকবারে উপরের বিষয়গুলো ছাড়াও তাওহীদ, শিরক, আরকানুল ঈমান, নবীগণের নিষ্পাপত্ব, পাপীর ইমামত্ব, নেক আমল কবুলের শর্ত ও বিনষ্টের কারণাদি, মুজিযা-কারামত, মিরাজ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- আত্মীয়-স্বজন, কবরের অবস্থা, কিয়ামতের আলামত, আখিরাতে আল্লাহর দর্শন, শাফাআত, মীযান, হাউয ইত্যাদি আরো অনেক বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। ফিকহুল আবসাতের মূল বিষয়দুটো তুলনামূলক সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহর বিশেষণ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) 'আল-ফিকহুল আকবার'-এ আকীদার বিষয়গুলো সংক্ষেপে সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 'আল-ফিকহুল আবসাত'-এ ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে দীর্ঘ ও জটিল যুক্তিতর্ক পেশ করা হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, পুস্তিকা দুটোর বিষয়বস্তু মূলত এক। এখন প্রশ্ন হলো কোন্‌টি মূল 'ফিকহুল আকবার'? কোনো কোনো গবেষক মত প্রকাশ করেছেন যে, 'আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থটিই মূল 'আল-ফিকহুল আকবার'। তাঁদের যুক্তি নিম্নরূপ:

(ক) চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবুল লাইস সামারকান্দী নাসর ইবন মুহাম্মাদ (৩৭৩ হি) 'আল-ফিকহুল আকবার' বলতে আবূ মুতীর সূত্রে বর্ণিত পুস্তিকাটি বুঝিয়েছেন এবং পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা রচনা করেন।[২১৫]

(খ) আমরা দেখেছি পঞ্চম হিজরী শতকে আল্লামা আবুল মুযাফ্‌ফার শাহফূর (৪৭১ হি) উল্লেখ করেছেন যে, আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি আবূ মুতীর সূত্রে বর্ণিত। অষ্টম শতকে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (৭২৮ হি) ও অন্যান্য আলিম 'আল-ফিকহুল আকবার' বলতে আবূ মুতীর সূত্রে বর্ণিত পুস্তিকাটিই বুঝিয়েছেন।[২১৬]

আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, 'আল-ফিকহুল আকবার' নামে প্রসিদ্ধ পুস্তিকাটিও পূর্ববর্তীদের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) রচিত আল-ফিকহুল আকবার

নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক) ইমাম তাহাবী (২৩৮-৩২১ হি) রচিত 'আকীদাহ তাহাবিয়্যাহ' পুস্তিকার বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও উপস্থাপনার সাথে ইমাম হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত 'আল-ফিকহুল আকবার' নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির অনেক মিল রয়েছে। ইমাম তাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদ্বয়ের আকীদা বর্ণনায় তিনি পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা রচিত আকীদা বিষয়ক পুস্তিকাগুলোর মধ্য থেকে হাম্মাদ বর্ণিত 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর সাথেই তাহাবীর পুস্তিকাটির বিষয় ও উপস্থাপনার সর্বোচ্চ মিল রয়েছে। এছাড়া ইমাম তাহাবী আকীদা বিষয়ক এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন যা ইমাম হাম্মাদ বর্ণিত পুস্তিকা ছাড়া ইমাম আযমের অন্য কোনো পুস্তিকায় নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম তাহাবী এ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেছিলেন।

(খ) আমরা দেখেছি যে, ইমাম বাযদাবী (৪০০-৪৮২ হি) বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা তাঁর আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থে 'মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো প্রমাণ করেছেন'। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হাম্মাদ ইবন আবী হানীফার সূত্রে বর্ণিত 'আল-ফিকহুল আকবার' নামে প্রসিদ্ধ পুস্তিকাটিই বুঝাচ্ছেন। এ পুস্তিকাতেই ইমাম আযম বিশেষণ প্রসঙ্গ ও তাকদীর প্রসঙ্গ সমান গুরুত্ব দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে আল-ফিকহুল আবসাত পুস্তিকায় তাকদীর ও ঈমান প্রসঙ্গ অতি বিশদভাবে আলোচনা করলেও বিশেষণ বিষয়ে অতি-সংক্ষেপ কিছু কথা বলেছেন।

(গ) অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও আকীদাবিদ ইবন আবিল ইজ্জ হানাফী (৭৯২ হি) "শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ" গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে 'ইমাম আবূ হানীফা রচিত আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এ উদ্ধৃতিগুলো হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে হুবহু বিদ্যমান।[২১৭]

(ঘ) দশম-একাদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ শাইখ আহমদ ইবন মুহাম্মাদ মাগনীসাবী (১০০০ হি) এবং মোল্লা আলী ইবন সুলতান কারী হানাফী (১০১৪ হি) হাম্মাদ-এর সূত্রে বর্ণিত 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। গ্রন্থদুটো মুদ্রিত।

(ঙ) আমরা দেখছি যে, গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিগুলোর সনদ বিদ্যমান। বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি যে, ইমাম আবূ হানীফা রচিত আকীদা বিষয়ক অন্য চারটি পুস্তিকার সকল বিষয় এ পুস্তিকায় সন্নিবেশিত। এজন্য সনদ ও মতনের দিক থেকে পুস্তিকাটি ইমাম আবূ হানীফা রচিত বলে জানা যায়।

বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, দুটো পুস্তিকা-ই 'আল-ফিকহুল আকবার'। পুস্তিকাদুটো একই গ্রন্থের দুটি ভাষ্য (version)। আমরা দেখেছি, সে সময়ের প্রসিদ্ধ আলিমগণ তাঁদের সংকলিত বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদেরকে পড়ে শুনাতেন বা লেখাতেন। এতে বিষয়বস্তু এবং বিন্যাসের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম হতো। এজন্য ইমাম মালিকের 'মুআত্তা'-র কয়েক ডজন ভাষ্য এবং ইমাম আবূ হানীফার 'কিতাবুল আসার'-এর কয়েকটি ভাষ্যের ন্যায় 'আল-ফিকহুল আকবার'-এরও দুটি ভাষ্য রয়েছে।

ইমাম হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত ও 'আল-ফিকহুল আকবার' নামে পরিচিত গ্রন্থটিতে সহজ সরল ভাষায় আকীদার মূল বিষয়গুলি সংকলিত। বাহ্যত তা ইমামের নিজের লেখা বা তাঁর মুখের বক্তব্যের সংকলন। আর দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে ইমাম আবূ মুতী ইমাম আবূ হানীফার মত ও বক্তব্য নিজের পদ্ধতিতে সংকলন করেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় গ্রন্থটির লেখক ও সংকলক ইমাম আবূ মুতী, তবে এর বিষয়বস্তু ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য। সম্ভবত এজন্য ইমাম যাহাবী, আব্দুল হাই লাখনবী প্রমুখ আলিম ইমাম আবূ মুতী বালখীকেই 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা আল-ফিকহুল আকবারের দ্বিতীয় ভাষ্য বা 'আল-ফিকহুল আবসাত' বুঝিয়েছেন।[২১৮]

উপরে আমরা আল-ফিকহুল আকবারের কয়েকজন ব্যাখ্যাকারের নাম উল্লেখ করেছি। আরো অনেকেই পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

(১) আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ বাবরতী (৭৮৬ হি)[২১৯]

(২) শাইখ ইলইয়াস ইবন ইবরাহীম সীনূবী তুর্কী (৮৯১ হি)[২২০]

(৩) মুহাম্মাদ ইবন বাহাউদ্দীন যাদাহ রাহমাবী (৯৫২ হি)[২২১]

(৪) শাইখ মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন লুৎফুল্লাহ বীরামী (৯৫৬ হি)[২২২]

(৫) শাইখ নূরুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ শারওয়ানী (১০৬৫ হি)[২২৩]

বিগত কয়েক শতকে মধ্যপ্রাচ্যে অনেক আলিম গ্রন্থটির ব্যাখ্যা রচনা করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ
আল-ফিকহুল আকবার ও ইসলামী আকীদা

১. ঈমান, আকীদা ও অন্যান্য পরিভাষা

আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাস। বিশ্বাস বুঝাতে কুরআন-হাদীসে 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহৃত। তাবিয়ীগণের যুগ থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলোর অন্যতমঃ

(১) আল-ফিকহুল আকবারঃ শ্রেষ্ঠতম ফিকহ। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) আকীদা বিষয়ে রচিত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'আল-ফিকহুল আকবার'। সম্ভবত 'আকীদা' বুঝাতে এটিই প্রাচীনতম পরিভাষা।

(২) ইলমুত তাওহীদঃ একত্ববাদের জ্ঞান বা তাওহীদ শাস্ত্র। 'তাওহীদ' অর্থ একত্ব বা মহান আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস। ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসকে 'তাওহীদ' বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ বিষয়ক জ্ঞানকে 'ইলমুত তাওহীদ' বা তাওহীদের জ্ঞান বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থে 'ইলমুল আকীদা'-কে 'ইলমুত তাওহীদ' নামে অভিহিত করেছেন। এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিত লাভ করে।

(৩) আস-সুন্নাহ। 'সুন্নাত' বা 'সুন্নাহ' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি '**এহইয়াউস সুনান**' গ্রন্থে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, 'সুন্নাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থঃ মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।[২২৪] আমরা দেখব যে, ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসে বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে বিশ্বাসের বিষয়ে সুন্নাত বর্জন করে যুক্তির উপর নির্ভর করার কারণে। এজন্য বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক আলিম 'আস-সুন্নাহ' নামে 'আকীদা' বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল (২৪১ হি)। তাঁর পর অনেক প্রসিদ্ধ আলিম 'আস-সুন্নাহ' নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

(৪) আশ-শারী'আহ। 'শারীয়াত' বা 'শারী'আহ' অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানি পানের স্থান, পথ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'শারী'আহ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি অর্থ "ধর্ম বিশ্বাস" বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতিসমূহ।[২২৫] তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ইমাম "আশ-শারী'আহ" নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

(৫) উসূলুদ্দীন বা উসূলুদ্দিয়ানাহঃ দীনের ভিত্তিসমূহ। চতুর্থ শতক থেকে কোনো কোনো আলিম আকীদা বুঝাতে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

(৬) আকীদা। ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা 'আকীদা'। আকীদা ও ই'তিকাদ শব্দদ্বয় আরবী 'আক্দ (عقد) শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। ভাষাবিদ ইবন ফারিস এ শব্দের অর্থ বর্ণনা করে বলেনঃ "শব্দটির মূল অর্থ একটিইঃ দৃঢ় করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নির্ভর করা। শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত।[২২৬]

'বিশ্বাস' বা ধর্মবিশ্বাস অর্থে 'আকীদা' ও 'ই'তিকাদ' শব্দের ব্যবহার কুরআন ও হাদীসে দেখা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে বা তাঁর পূর্বের যুগে আরবী ভাষায় 'বিশ্বাস' অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে 'আকীদা' শব্দের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায় না। তবে 'দৃঢ় হওয়া' বা 'জমাট হওয়া' অর্থে 'ই'তিকাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শক্ত বিশ্বাস বা ধর্ম-বিশ্বাস বুঝাতে আকীদা শব্দের ব্যবহার পরবর্তী যুগগুলিতে ব্যাপক হলেও প্রাচীন আরবী ভাষায় এ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। 'আকীদা' শব্দটিই কুরআন, হাদীস ও প্রাচীন আরবী অভিধানে পাওয়া যায় না। হিজরী চতুর্থ শতকের আগে এ শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না। চতুর্থ হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে। পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয়।

(৭) ইলমুল কালামঃ কথাশাস্ত্র। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় 'ইলমুল কালাম' বলা হয়। ইলমুল আকীদা ও ইলমুল কালাম- এর পার্থক্য বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।[২২৭]

২. ইলমুল আকীদার গুরুত্ব

জাগতিক সাফল্য ও আখিরাতের মুক্তির মূল ভিত্তি বিশুদ্ধ বিশ্বাস। মানুষের মন ও বিশ্বাস-ই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে এবং মানবতার পূর্ণতায় উপনীত হতে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের অপরিহার্যতা আমরা সহজেই অনুধাবন

করতে পারি। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা থেকে সুস্পষ্ট যে, বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার উপরেই মানুষের মুক্তির মূল ভিত্তি। আর এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা ইলমুল আকীদার নামকরণ করেছেন: 'আল-ফিকহুল আকবার' বা শ্রেষ্ঠতম ফিকহ। বিশ্বাস-জ্ঞানকে "শ্রেষ্ঠতম ফিকহ" নামকরণের মাধ্যমে ইমাম আযম বুঝিয়েছেন যে, ফিকহ বা ধর্মীয় জ্ঞানের যত শাখা রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা ও দীনী ইলমের শ্রেষ্ঠতম বিষয় ঈমান বিষয়ক জ্ঞান। তিনি নিজেই এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। "আল-ফিকহুল আবসাত" পুস্তিকাটির শুরুতে আবূ মুতী বালখী (১৯৯ হি) বলেন:

سَأَلْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ النُّعْمَانَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْفِقْهِ الأَكْبَرِ، فَقَالَ: أَنْ لاَ تُكَفِّرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، وَلاَ تَنْفِيْ أَحَداً مِنَ الإِيْمَانِ، وَأَنْ تَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ، وَلاَ تَتَبَرَّأَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلاَ تُوَالِيْ أَحَداً دُوْنَ أَحَدٍ، وَأَنْ تَرُدَّ أَمْرَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

"আমি আবূ হানীফা নুমান ইবন সাবিতকে "আল-ফিকহুল আকবার" (শ্রেষ্ঠতম ফিকহ) সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন: তা এই যে, তুমি কোনো আহল কিবলাকে পাপের কারণে কাফির বলবে না, কোনো ঈমানের দাবিদারের ঈমানের দাবি অস্বীকার করবে না, তুমি ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের নিষেধ করবে, তুমি জানবে যে, তোমার উপর যা নিপতিত হয়েছে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো পথ ছিল না এবং তুমি যা পাও নি তা পাওয়ার ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো সাহাবীর প্রতি অবজ্ঞা-অভক্তি প্রকাশ করবে না, তাঁদের কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে ভালবাসবে না, এবং উসমান (রা) ও আলী (রা)-এর বিষয় আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করবে।"[২২৮]

'ফিক্‌হ' শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী বিধিবিধানের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে 'ফিকহ' বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, শরীয়তের আহকাম বা বিধিবিধান বিষয়ক ফিকহ শিক্ষা করার চেয়ে দীনের বিশ্বাস বিষয়ক ফিকহ অর্জন করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন:

الْفِقْهُ فِيْ الدِّيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِقْهِ فِيْ الأَحْكَامِ ... قُلْتُ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَفْضَلِ الْفِقْهِ. قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ الإِيْمَانَ بِاللهِ تَعَالَى وَالشَّرَائِعَ وَالسُّنَنَ وَالْحُدُوْدَ وَاخْتِلاَفَ الأُمَّةِ وَاتِّفَاقَهَا...

"দীন বিষয়ে জ্ঞানার্জন আহকাম বিষয়ে জ্ঞানার্জনের চেয়ে উত্তম। .... আমি বললাম: তাহলে আপনি আমাকে ফিকহের উত্তম বিষয় সম্পর্কে বলুন। আবূ হানীফা বলেন: শ্রেষ্ঠ ফিকহ এই যে, মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান শিক্ষা করবে, শরীয়তের বিধিবিধান, সুন্নাত, সীমারেখা এবং উম্মাতের মতভেদ ও ঐকমত্য শিক্ষা করবে।"[২২৯]

এখানে ইমাম আযম দীন ও আহকামের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। দীন হলো বিশ্বাস ও তাওহীদের নাম, পক্ষান্তরে আহকাম ও শরীয়াহ কর্ম বিষয়ক বিধানাবলির নাম। বিভিন্ন নবী ও রাসূলকে আল্লাহ বিভিন্ন শরীয়াহ দিয়েছেন, তবে সকলের দীন এক ও অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে 'আল-আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম' গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা বলেন:

أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ رُسُلَ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ لَمْ يَكُوْنُوا عَلَى أَدْيَانٍ مُخْتَلِفَةٍ، لَمْ يَكُنْ كُلُّ رَسُوْلٍ مِنْهُمْ يَأْمُرُ قَوْمَهُ بِتَرْكِ دِيْنِ الرَّسُوْلِ الَّذِيْ كَانَ قَبْلَهُ؛ لأَنَّ دِيْنَهُمْ كَانَ وَاحِداً، وَكَانَ كُلُّ رَسُوْلٍ يَدْعُوْ إِلَى شَرِيْعَةِ نَفْسِهِ، وَيَنْهَى عَنْ شَرِيْعَةِ الرَّسُوْلِ الَّذِيْ قَبْلَهُ؛ لأَنَّ شَرَائِعَهُمْ كَثِيْرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلِذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً)، وَأَوْصَاهُمْ جَمِيْعاً بِإِقَامَةِ الدِّيْنِ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ، وَأَنْ لاَ يَتَفَرَّقُوا؛ لأَنَّهُ جَعَلَ دِيْنَهُمْ وَاحِداً فَقَالَ: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) وَقَالَ سُبْحَانَهُ: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ). وَقَالَ جَلَّ وَعَلاَ: (لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)، أَيْ: لاَ تَبْدِيْلَ لِدِيْنِهِ، فَالدِّيْنُ لَمْ يُبَدَّلْ وَلَمْ يُحَوَّلْ وَلَمْ يُغَيَّرْ، وَالشَّرَائِعُ قَدْ غُيِّرَتْ وَبُدِّلَتْ..

"তুমি কি জান না যে, আল্লাহর রাসূলগণ (আ) ভিন্ন ভিন্ন দীনের অনুসারী ছিলেন না, প্রত্যেক রাসূল তাঁর জাতিকে পূর্ববর্তী রাসূলের দীন বর্জন করতে নির্দেশ দিতেন না; কারণ তাঁদের দীন ছিল এক। প্রত্যেক রাসূল তাঁর নিজ শরীয়ত পালনের দাওয়াত দিতেন এবং পূর্ববর্তী রাসূলের শরীয়ত পালন করতে নিষেধ করতেন; কারণ তাঁদের শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেককে শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ প্রদান করেছি, ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন"[২৩০]। আর তিনি তাঁদের সবাইকে দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন, আর দীন হচ্ছে "তাওহীদ"। আর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন দীন, অর্থাৎ তাওহীদের বিষয়ে পরস্পর দলাদলি না করতে; কারণ তিনি তো তাদের একই দীন প্রদান করেছেন। এজন্য তিনি বলেছেন: "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম

ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না।"[২৩১] আল্লাহ আরো বলেছেন: "আমি তোমার পূর্বে কোনো রাসূলই প্রেরণ করি নি এ ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"[২৩২] মহান আল্লাহ আরো বলেন: "আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই; এটিই প্রতিষ্ঠিত দীন"[২৩৩]; অর্থাৎ তাঁর দীনের কোনো পরিবর্তন নেই। অতএব দীন কোনোভাবে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত বা স্থানান্তরিত হয় নি; তবে শরীয়ত বা বিধি-বিধানসমূহ পরিবর্তিত হয়েছে।"[২৩৪]

৩. ইলমুল আকীদার আলোচ্য ও উদ্দেশ্য

স্বভাবতই ইলমুল আকীদার আলোচনা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা মৌলিক চারটি বিষয় দেখি:

প্রথমত: 'আল-উলূহিয়্যাহ' (الألوهية: godhead, godhood, divinity) অর্থাৎ মহান আল্লাহর সত্তা, বিশেষণ, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়।

দ্বিতীয়ত: 'আন-নুবুওয়াত' (النبوة: prophecy, prophethood)। অর্থাৎ নবীগণের পরিচয়, মর্যাদা, দায়িত্ব, তাঁদের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: 'আল-ইমামাহ' (الإمامة: leadership of Muslim society and state)। অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের যোগ্যতা, মর্যাদা, দায়িত্ব ইত্যাদি।

চতুর্থত: 'আল-আখিরাহ' (الآخرة: the hereafter, the life after death)। অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জীবন, কবর, পুনরুত্থান, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

আকীদা বিষয়ক সকল আলোচনাই মূলত এগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আর সকল আলোচনার উদ্দেশ্য সুন্নাতে নববীর অনুসরণ।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর পদ্ধতিতে ও অনুকরণে আল্লাহর ইবাদতই ইসলাম। ইসলামী ইলমের সকল শাখার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন: মুমিনের জীবনকে হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে পরিচালিত করা। ইলমুল ফিকহ-এর উদ্দেশ্য মুমিনের ইবাদত, মুআমালাত ও সকল কর্মকাণ্ড যেন অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের আদলেই পালিত হয়। ইলমুত তাযকিয়া বা তাসাউফের উদ্দেশ্য মুমিনের হৃদয়ের অবস্থা যেন অবিকল তাঁদের পবিত্র হৃদয়গুলোর মত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ইলমুল আকীদা বা আল-ফিকহুল আকবারের উদ্দেশ্য মুমিনের বিশ্বাস যেন হুবহু তাঁদের বিশ্বাসের সাথে মিলে যায়।

৪. ইলমুল আকীদা বনাম ইলমুল কালাম

আকীদা-শাস্ত্রের আরেকটি প্রসিদ্ধ নাম 'ইলমুল কালাম'। ইলমুল কালাম বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক আলোচনা বুঝানো হয়। 'আল-কালাম' (الكلام) শব্দের অর্থ কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (word, speech, conversation, debate) ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন যে কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম (كلام الله) থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটির উদ্ভব। কারণ ইলমুল কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে জোরালো মত হল, গ্রীক 'লগস' (logos) শব্দ থেকে 'কালাম' শব্দটি গৃহীত হয়েছে। লগস (logos) শব্দটির অর্থ বাক্য, যুক্তিবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি, পরিকল্পনা (word, reason, plan) ইত্যাদি। লগস শব্দ থেকে লজিক (logic) শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা।

সম্ভবত মূল অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজরী দ্বিতীয় শতকের আরব পণ্ডিতগণ 'লজিক' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হিসেবে 'ইলমুল কালাম' (কথা-শাস্ত্র) পরিভাষা ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে এ অর্থে 'ইলমুল মানতিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থও 'কথা-শাস্ত্র'। সর্বাবস্থায় ইলমুল কালাম বলতে দর্শন বা যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা বা গবেষণা (speculative theology, scholastic theology) বুঝানো হয়।

প্রাচীন যুগ থেকে দার্শনিকগণ মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান বা দর্শনের মাধ্যমে মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত বিষয় সমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন। স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রকৃতি, স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি তর্ক দিয়ে তাঁরা অনেক কথা বলেছেন। এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক মানুষকে অত্যন্ত আকর্ষিত করলেও তা কোনো সত্যে পৌঁছাতে পারে না। কারণ মানুষ যুক্তি বা জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে বা নিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছাতে পারে না। এজন্য কখনোই দার্শনিকগণ এ সকল বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। তাদের গবেষণা ও বিতর্ক অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) রচিত আল-ফিকহুল আকবার

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গ্রীক, ভারতীয় ও পারসিক দর্শন প্রচার লাভ করে। মূলধারার তাবিয়ীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ বিশ্বাস বা গাইবী বিষয়ে দার্শনিক বিতর্ক কঠিনভাবে অপছন্দ করতেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, গাইবী বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করা এবং ওহীর নির্দেশনাকে মেনে নেওয়াই মুমিনের মুক্তির পথ।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তাঁর সহচরগণ 'ইলমুল কালামৎ শিক্ষা করতে ঘোর আপত্তি করেছেন। ইলমুল কালামের প্রসার ঘটে মূলত দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমাংশে, বিশেষত ১৩২ হিজরী (৭৫০ খৃ) সালে আব্বাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠার পর। ইমাম আবূ হানীফা শিক্ষা জীবনে বা তাঁর জীবনের প্রথম ৩০ বৎসরে (৮০-১১০ হি) দর্শনভিত্তিক ইলমুল কালাম সমাজে তেমন পরিচয় লাভ করে নি। তবে দর্শনভিত্তিক বিভ্রান্ত মতবাদগুলো তখন কুফা, বসরা ইত্যাদি এলাকায় প্রচার হতে শুরু করেছে। গ্রীক-পারসিক দর্শন নির্ভর কাদারিয়া, জাবারিয়া, জাহমিয়া ইত্যাদি মতবাদ দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকেই জন্ম লাভ করে। এ সকল মতবাদ খণ্ডন করতে মূলধারার কোনো কোনো আলিম দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিতে থাকেন।

কোনো কোনো জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) প্রথম জীবনে এরূপ দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর বিতর্ক বা ইলমুল কালামের চর্চা করেন। পরবর্তীতে তিনি তা বর্জন করেন এবং তা বর্জন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। ইলমুল কালামের প্রাথমিক অবস্থাতেই তিনি এর ক্ষতি ও ভয়াবহতা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

كنت أعطيت جدلا فى الكلام ... فلما مضى مدة عمري تفكرت وقلت السلف كانوا أعلم بالحقائق ولم ينتصبوا مجادلين بل أمسكوا عنه وخاضوا فى علم الشرائع ورغبوا فيه وتعلموا وعلموا وتناظروا عليه فتركت الكلام واشتغلت بالفقه ورأيت المشتغلين بالكلام ليس سيماهم سيماء الصالحين قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم لا يبالون بمخالفة الكتاب والسنة ولو كان خيرا لاشتغل به السلف الصالحون

"কালাম বা দর্শনভিত্তিক বিতর্কে আমার পারদর্শিতা ছিল ... আমার জীবনের কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমি চিন্তা করলাম যে, পূর্ববর্তীগণ (সাহাবীগণ ও প্রথম যুগের তাবিয়ীগণ) দীন-ঈমানের প্রকৃত সত্য বিষয়ে অধিক অবগত ছিলেন। তাঁরা এ সকল বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন নি। বরং ঈমান-আকীদা বিষয়ক বিতর্ক তাঁরা পরিহার করতেন। তাঁরা শরীয়ত বা আহকাম বিষয়ে আলোচনা ও অধ্যয়নে লিপ্ত হতেন, এগুলোতে উৎসাহ দিতেন, শিক্ষা করতেন, শিক্ষা দিতেন এবং এ বিষয়ে বিতর্ক- আলোচনা করতেন। এজন্য আমি কালাম পরিত্যাগ করে ফিকহ চর্চায় মনোনিবেশ করি। আমি দেখলাম যে, কালাম বা দর্শনভিত্তিক আকীদা চর্চায় লিপ্ত মানুষগুলোর প্রকৃতি ও প্রকাশ নেককার মানুষদের মত নয়। তাদের হৃদয়গুলো কঠিন, মন ও প্রকৃতি কর্কশ এবং তারা কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধিতা করার বিষয়ে বেপরোয়া। কালাম চর্চা যদি কল্যাণকর হতো তাহলে অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ (সাহাবী-তাবিয়ীগণ) এর চর্চার করতেন।"[২৩৫]

ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফার শিক্ষা জীবনে 'ইলমুল কালাম'-এর অস্তিত্বই ছিল না।[২৩৬] অর্থাৎ এ সময়ে দর্শন ভিত্তিক আকীদা চর্চা কোনো পৃথক 'ইলম' বা জ্ঞানে পরিণত হয় নি। কারণ ইমাম আবূ হানীফা ১০০ হিজরীর আগেই ফিকহ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন:

فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة،

"কূফার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ আলী (রা) এবং ইবন মাসঊদ (রা)। তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আলকামা। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইবরাহীম নাখয়ী (৯৬ হি)। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান (১২০ হি)। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আবূ হানীফা।"[২৩৭]

উল্লেখ্য যে, ১২০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদের ওফাতের পর ইমাম আবূ হানীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হন। এতে প্রমাণ হয় যে, এ সময়ের অনেক পূর্বেই ইমাম আবূ হানীফা কুফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ বলে গণ্য হয়েছেন। এতে সুস্পষ্ট যে, ১০০ হিজরীর পূর্ব থেকেই তিনি ফিকহ শিক্ষা ও চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর ১০০ হিজরীর পূর্বে মুসলিম বিশ্বে দর্শনভিত্তিক আকীদা চর্চা কোনো 'ইলম' বা শাস্ত্র হিসেবে প্রকাশ ও প্রসার লাভ করে নি। তাঁর পরিণত বয়সে (১১০-১৫০ হি) সমাজে ইলমুল কালাম চর্চা প্রসার লাভ করে এবং তিনি ইলমুল কালামের চর্চা থেকে তাঁর অনুসারীদেরকে নিষেধ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র হাম্মাদ বলেন:

أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه بيدي يوم الجمعة، فأدخلني المسجد، .... مَرَّ بقوم يتنازعون في الدين، فقال: يا بنيَّ! إذا مهر في هذا الأمر، قيل: زنديق ، وأُخرِج من حَدِّ الإسلام، فيصير بحال لا ينتفع به. .... قال حماد بن أبي حنيفة: وكنتُ معجَبا بالمنازعة، فتركتُ المنازعةَ بعد قول الشيخ ﷺ

এক শুক্রবারে আবূ হানীফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমার হাত ধরে মসজিদে প্রবেশ করেন। .... তিনি দীন (আকীদা) বিষয়ে

বিতর্কে (কালাম চর্চায়) লিপ্ত একদল মানুষদের নিকট দিয়ে গমন করেন এবং আমাকে বলেন: বেটা, যে ব্যক্তি এ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করবে সে যিনদীক (ধর্মত্যাগী ও ধর্ম অবমাননাকারী) বলে আখ্যায়িত হবে এবং ইসলামের পরিমণ্ডল থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। এভাবে সে এমন অবস্থায় পৌঁছাবে যে, তার দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হবে না। .... হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা বলেন: আমি এরূপ বিতর্কের বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলাম। শাইখ (রা)-এর এ কথার পরে আমি এ জাতীয় বিতর্ক পরিত্যাগ করি।"[২৩৮]

ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র নূহ ইবন আবী মরিয়ম বলেন:

قلت لأبي حنيفة رحمه الله ما تقول فيما أحدث الناس من كلام في الأعراض والأجسام فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة.

"আমি আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহকে বললাম: মানুষেরা ইলমুল কালামে (স্রষ্টার অস্তিত্ব, অনাদিত্ব ও বিশেষণ প্রমাণে) 'আরায' (অমৌল-পরনির্ভর: nonessential), 'জিসম' (দেহ: body) ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা উদ্ভাবন করেছে। এগুলোর বিষয়ে আপনার মত কী? তিনি বলেন: এগুলো দার্শনিকদের কথাবার্তা। তোমার দায়িত্ব হাদীসের উপর নির্ভর করা এবং পূর্ববতীদের (সাহাবী-তাবিয়ীদের) তরীকা অনুসরণ করা। সাবধান! সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করবে; কারণ তা বিদআত।"[২৩৯]

ইমাম আযমের ছাত্রগণও এভাবে ইলমুল কালাম চর্চা নিষেধ করতে থাকেন। ইমাম আবূ ইউসূফ রাহ. (১৮৯ হি) তাঁর ছাত্র ইলমুল কালামের বিশেষজ্ঞ ও মু'তাযিলী পণ্ডিত বিশ্‌র আল-মারীসী (২১৮ হি)- কে বলেন:

اَلْعِلْمُ بِالْكَلاَمِ هُوَ الْجَهْلُ وَالْجَهْلُ بِالْكَلاَمِ هُوَ الْعِلْمُ، وَإِذَا صَارَ الرَّجُلُ رَأْساً فِيْ الْكَلاَمِ قِيْلَ: زِنْدِيْقٌ.

"কালামের জ্ঞানই হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। ইলমুল কালামে সুখ্যাতির অর্থ তাকে যীনদীক বা অবিশ্বাসী-ধর্মত্যাগী বলা হবে।"[২৪০]

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ) আরো বলেন:

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِالْكَلاَمِ تَزَنْدَقَ

"যে ব্যক্তি ইলমু কালাম শিক্ষা করবে সে যিনদীকে পরিণত হবে।"[২৪১]

ইমাম শাফিয়ী রাহ. (২০৪ হি) বলেন,

حُكْمِيْ فِيْ أَهْلِ الْكَلاَمِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَيُطَافُ بِهِمْ فِيْ الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ وَيُقَالُ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلاَمِ.

"যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তার বিষয়ে আমার বিধান এই যে, তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে, এভাবে মহল্লায় মহল্লায় ও কবীলাসমূহের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে হবে: যারা কিতাব ও সুন্নাত ছেড়ে ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি।"[২৪২]

এভাবে প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ইমাম এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের সকল প্রসিদ্ধ আলিম, ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামের নিন্দা করেছেন।[২৪৩]

পরবর্তী যুগে ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমামের অনুসারী অনেক আলিম আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য ইলমুল কালাম চর্চা করেছেন। বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের বিভ্রান্তির উত্তর প্রদানের প্রয়োজনেই তাঁরা ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁরা ইলমুল কালামের দার্শনিক ছায়া থেকে বের হতে পারেন নি। তাদের আলোচনায় সর্বদা কুরআন, হাদীস বা ওহীর বক্তব্যর চেয়ে যুক্তি, তর্ক ও দর্শন প্রাধান্য পেয়েছে।[২৪৪]

ইলমুল কালামের বিরুদ্ধে ইমাম আযম ও অন্যান্য ইমামের বক্তব্যকে তাঁরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে, ইমামগণ মূলত ইলমুল কালাম ভিত্তিক মুতাযিলী ও অন্যান্য মতবাদের নিন্দা করেছেন, ইলমুল কালম ভিত্তিক আকীদা চর্চার নিন্দা তাঁরা করেন নি। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি যে, চার ইমাম ও দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অন্যান্য ইমাম মূলত ইলমুল কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চার নিন্দা করেছেন। তাঁরা সকলেই আকীদা বিষয় আলোচনা করেছেন এবং অনেকে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তাঁরা কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন। এর বিপরীতে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর আকীদা চর্চা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। সঠিক আকীদা প্রমাণের জন্যও দর্শন নির্ভর বিতর্ক তাঁরা নিষেধ করেছেন। কারণ সালফ সালিহীনের আকীদা চর্চা ও ইলমুল কালামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ওহী ও আকল-এর অবস্থান।

ইমামগণ বা সালফ সালিহীনের আকীদা চর্চা ওহী নির্ভর, বিশেষত হাদীস ও 'আসার' বা সাহাবীগণের বক্তব্য নির্ভর। পক্ষান্তরে

ইলমুল কালাম 'আকল' অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বোধশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও দর্শন নির্ভর। ইমামগণের বক্তব্য সর্বদা নিম্নরূপ: তোমার বিশ্বাস এরূপ হতে হবে; কারণ কুরআনে, হাদীসে বা সাহাবীগণের বক্তব্যে এরূপ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইলমুল কালামের বক্তব্য নিম্নরূপ: তোমাকে এরূপ বিশ্বাস করতে হবে; কারণ জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তি এটিই প্রমাণ করে। আমরা ওহী ও আকলের অবস্থান সম্পর্কে ইমামগণের মত আকীদার উৎস বিষয়ক অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ। এখানে সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক) আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র নূহ ইবন আবী মরিয়ম যখন তাকে ইলমুল কালামের আরায (অমৌল), জিসম (দেহ) ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখন তিনি বলেন: "এগুলো দার্শনিকদের কথাবার্তা। তোমার দায়িত্ব হাদীসের উপর নির্ভর করা এবং পূর্ববর্তীদের (সাহাবী-তাবিয়ীদের) তরীকা অনুসরণ করা। সাবধান! সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করবে; কারণ তা বিদআত।"

ইলমুল কালাম চর্চা করতে গেলে এ সকল পরিভাষার উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপাই নেই। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, বিশেষণ ইত্যাদি প্রমাণের জন্য আরায, জিসম, জাওহার ইত্যাদি পরিভাষাগুলোই কালামবিদগণের একমাত্র ভিত্তি। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, ইমামগণ মূলত সাহাবী তাবিয়ীদের পদ্ধতিতে ওহী-নির্ভর আকীদা চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং দার্শনিকদের পরিভাষা এবং দার্শনিক যুক্তিতর্ক নির্ভর ইলমুল কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চা নিষেধ করেছেন।

(খ) ইমামগণ ফিকহ ও কালাম উভয় ক্ষেত্রেই কুরআন, হাদীস ও আসার বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যের উপর সমানভাবে নির্ভর করেছেন। ফিকহের ন্যায় আকীদার ক্ষেত্রেও তাঁরা 'খাবারুল ওয়াহিদ' বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করেছেন। আর এজন্যই ইমাম আযম আকীদাকেও 'ফিকহ' বলেছেন এবং আল-ফিকহুল আকবার বা আল-ফিকহু ফিদ্দীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে কালামবিদগণ ফিকহ ও আকীদার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা দাবি করেছেন যে, ফিকহ বা কর্মের ক্ষেত্রে হাদীস, খাবারুল ওয়াহিদ বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যায়, কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে আকলের বিরুদ্ধে কারো বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না বা কারো 'তাকলীদ' করা যায় না।

(গ) ইমামগণের দৃষ্টিতে ওহী বা কুরআন-হাদীসের বক্তব্য মানুষকে সত্যের নির্দেশনা প্রদানের জন্য। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধারণ-অসাধারণ সকল মানুষ যেন বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত বিষয়গুলোতে সহজ দিক নির্দেশনা লাভ ও সত্য অনুসরণ করতে পারে সেজন্যই মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে ওহী ও কিতাব প্রদান করেন। এজন্য দীন ও শরীয়তে বা বিশ্বাস ও কর্মে সকল ক্ষেত্রে ওহীর বক্তব্যকে সর্বদা সরল ও প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং এর রূপকার্থ ও দূরবর্তী ব্যাখ্যা বর্জন করতে হবে। ওহীকে রূপকার্থে ব্যবহার করা বা ওহীর দূরবর্তী ব্যাখ্যা করার অর্থ ওহীকে অকার্যকর করা। এজন্য তাঁরা যেভাবে সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি কর্ম বিষয়ক নির্দেশনার রূপক অর্থ গ্রহণ ও ব্যাখ্যা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, তেমনি মহান আল্লাহর বিশেষণ, আখিরাত, কিয়ামতের আলামত, কবর, হাশর ও অন্যান্য বিশ্বাসীয় বিষয়েও ওহীর বক্তব্যের রূপক অর্থ গ্রহণ ও ব্যাখ্যা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে ইলমুল কালামের দৃষ্টিতে ওহীর নির্দেশনা অস্পষ্ট ও এতে রূপকের সম্ভাবনা ব্যাপক। এজন্য বিশ্বাসের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আকলের উপর নির্ভর করতে হবে। ওহীর কোনো বক্তব্য আকলের ব্যতিক্রম হলে তা রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে।

(ঘ) ইমামগণের দৃষ্টিতে বিশ্বাস ও কর্মে সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণই পূর্ণতম আদর্শ। তাঁদের মত হওয়া বা হুবহু তাঁদের অনুসরণ করাই মুমিনের লক্ষ্য। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আকীদা চর্চারও উদ্দেশ্য আকীদা বিষয়ে সুন্নাতের প্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের আকীদার সাথে মুমিনের আকীদার হুবহু মিল প্রতিষ্ঠাই এখানে উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য আকল, বুদ্ধি ও বিবেক খাটিয়ে বিশ্বাস বিষয়ক সত্যে উপনীত হওয়া। কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের সাথে মিল ও অমিল এখানে গৌণ। মিল হলে ভাল কথা, নইলে কোনোরূপ ব্যাখ্যা করলেই হলো।

(ঙ) ইমামগণের আকীদা চর্চার ক্ষেত্রে মতভেদের সুযোগ খুবই সীমিত। কারণ সকলেই ওহীর উপর নির্ভর করেছেন এবং ওহীর ব্যাখ্যা বর্জন করেছেন। আর ওহীর মধ্যে ভিন্নতার অবকাশ খুবই কম। পক্ষান্তরে ইলমুল কালাম চর্চায় সকলেই জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেকের উপর নির্ভর করেছেন এবং ওহীকে নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেক অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তির কোনো নির্ধারিত মানদণ্ড নেই। কেউ দেবতার জন্য নরবলিকেও আকল-নির্দেশিত বা জ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণের চেষ্টা করছেন। আবার কেউ জীবন ধারণের জন্য মাংস ভক্ষণকে অযৌক্তিক বা বিবেক বিরুদ্ধ বলে দাবি করছেন। এজন্য কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চায় মতভেদ খুবই বেশি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
মহান আল্লাহর বিশেষণ, তাকদীর ইত্যাদি

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু'মান ইবন সাবিত (রাহ) বলেন:

لاَ يُشْبِهُ شَيْئاً مِنَ الأَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ، وَلاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ. لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ. أَمَّا الذَّاتِيَّةُ فَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلاَمُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالإِرَادَةُ، وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيْقُ وَالتَّرْزِيْقُ وَالإِنْشَاءُ وَالإِبْدَاعُ وَالصُّنْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ صِفَاتِ الْفِعْلِ. لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَحْدُثْ لَهُ اسْمٌ وَلاَ صِفَةٌ. لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِعِلْمِهِ وَالْعِلْمُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ، وَقَادِراً بِقُدْرَتِهِ وَالْقُدْرَةُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ، وَمُتَكَلِّماً بِكَلاَمِهِ وَالْكَلاَمُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ، وَخَالِقاً بِتَخْلِيْقِهِ وَالتَّخْلِيْقُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ، وَفَاعِلاً بِفِعْلِهِ وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ، وَالْفَاعِلُ هُوَ اللهُ تَعَالَي وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ، وَالْمَفْعُوْلُ مَخْلُوْقٌ وَفِعْلُ اللهِ تَعَالَي غَيْرُ مَخْلُوْقٍ. وَصِفَاتُهُ فِيْ الأَزَلِ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ وَلاَ مَخْلُوْقَةٍ. وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ أَوْ مُحْدَثَةٌ أَوْ وَقَفَ أَوْ شَكَّ فِيْهِمَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ تَعَالَي.

وَالْقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَي فِيْ الْمَصَاحِفِ مَكْتُوْبٌ، وَفِيْ الْقُلُوْبِ مَحْفُوْظٌ، وَعَلَي الأَلْسُنِ مَقْرُوْءٌ، وَعَلَي النَّبِيِّ ﷺ مُنَزَّلٌ، وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوْقَةٌ وَقِرَاءَتُنَا لَهُ مَخْلُوْقَةٌ وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ. وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ الْقُرْآنِ حِكَايَةً عِنْ مُوْسَي وَغَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيْسَ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَي إِخْبَاراً عَنْهُمْ، وَكَلاَمُ اللهِ تَعَالَي غَيْرُ مَخْلُوْقٍ، وَكَلاَمُ مُوْسَي وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ مَخْلُوْقٌ، وَالْقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَي فَهُوَ قَدِيْمٌ، لاَ كَلاَمُهُمْ. وَسَمِعَ مُوْسَي عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلاَمَ اللهِ تَعَالَي كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَي: "وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَيَ تَكْلِيْمًا". وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَي مُتَكَلِّماً وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوْسَي عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَي خَالِقاً فِيْ الأَزَلِ وَلَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ. فَلَمَّا كَلَّمَ اللهُ مُوْسَي كَلَّمَهُ بِكَلاَمِهِ الَّذِيْ هُوَ لَهُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ.

وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا بِخِلاَفِ صِفَاتِ الْمَخْلُوْقِيْنَ. يَعْلَمُ لاَ كَعِلْمِنَا، وَيَقْدِرُ لاَ كَقُدْرَتِنَا، وَيَرَي لاَ كَرُؤْيَتِنَا، وَيَسْمَعُ لاَ كَسَمْعِنَا وَيَتَكَلَّمُ لاَ كَكَلاَمِنَا، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالآلاتِ وَالْحُرُوْفِ وَاللهُ تَعَالَي يَتَكَلَّمُ بِلاَ آلَةٍ وَلاَ حُرُوْفٍ، وَالْحُرُوْفُ مَخْلُوْقَةٌ، وَكَلاَمُ اللهِ تَعَالَي غَيْرُ مَخْلُوْقٍ.

وَهُوَ شَيْءٌ لاَ كَالأَشْيَاءِ وَمَعْنَي الشَّيْءِ إِثْبَاتُهُ بِلاَ جِسْمٍ وَلاَ جَوْهَرٍ وَلاَ عَرْضٍ وَلاَ حَدَّ لَهُ وَلاَ ضِدَّ لَهُ وَلاَ نِدَّ لَهُ "فَلاَ تَجْعَلُوْا للهِ أَنْدَاداً" وَلاَ مِثْلَ لَهُ. وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ فَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلاَ كَيْفٍ. وَلاَ يُقَالُ: إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ؛ لأَنَّ فِيْهِ إِبْطَالَ الصِّفَةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدَرِ وَالاِعْتِزَالِ، وَلَكِنَّ يَدَهُ صِفَتُهُ بِلاَ كَيْفٍ، وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى بِلاَ كَيْفٍ.

خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الأَشْيَاءَ لاَ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ اللهُ تَعَالَى عَالِماً فِيْ الأَزَلِ بِالأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا، وَهُوَ الَّذِيْ قَدَّرَ الأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا، أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَلاَ يَكُوْنُ فِيْ الدُّنْيَا وَلاَ فِيْ الآخِرَةِ شَيْءٌ إِلاَّ بِمَشِيْئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَكَتْبِهِ فِيْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ، وَلَكِنَّ كَتْبَهُ بِالْوَصْفِ لاَ بِالْحُكْمِ. وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ وَالْمَشِيْئَةُ صِفَاتُهُ فِيْ الأَزَلِ بِلاَ كَيْفٍ. يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى الْمَعْدُوْمَ فِيْ حَالِ عَدَمِهِ مَعْدُوْماً، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُوْنُ إِذَا أَوْجَدَهُ، وَيَعْلَمُ اللهُ الْمَوْجُوْدَ فِيْ

حَالِ وُجُوْدِهِ مَوْجُوْداً، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُوْنُ فَنَاؤُهُ. وَيَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى الْقَائِمَ فِيْ حَالِ قِيَامِهِ قَائِماً، وَإِذَا قَعَدَ قَاعِداً فِيْ حَالِ قُعُوْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ أَوْ يَحْدُثَ لَهُ عِلْمٌ وَلَكِنَّ التَّغَيُّرَ اخْتِلاَفُ الأَحْوَالِ يَحْدُثُ فِيْ الْمَخْلُوْقِيْنَ.

خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْخَلْقَ سَلِيْماً مِنَ الْكُفْرِ وَالإِيْمَانِ، ثُمَّ خَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ، فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَجُحُوْدِهِ الْحَقَّ بِخُذْلاَنِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ، وَآمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِهِ وَإِقْرَارِهِ وَتَصْدِيْقِهِ، بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ وَنُصْرَتِهِ لَهُ. أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِهِ عَلَى صُوَرِ الذَّرِّ، فَجَعَلَهُمْ عُقَلاَءَ فَخَاطَبَهُمْ "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوْا بَلَى" وَأَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ فَأَقَرُّوا لَهُ بِالرُّبُوْبِيَّةِ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَاناً فَهُمْ يُوْلَدُوْنَ عَلَى تِلْكَ الْفِطْرَةِ "إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوْراً" وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ، وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ فَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَدَاوَمَ. وَلَمْ يُجْبِرْ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَلاَ عَلَى الإِيْمَانِ، وَلاَ خَلَقَهُمْ مُؤْمِناً وَلاَ كَافِراً، وَلَكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصاً، وَالإِيْمَانُ وَالْكُفْرُ مِنْ فِعْلِ الْعِبَادِ. وَيَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَكْفُرُ فِيْ حَالِ كُفْرِهِ كَافِراً، فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِناً فِيْ حَالِ إِيْمَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ وَصِفَتُهُ.

وَجَمِيْعُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُوْنِ كَسْبُهُمْ عَلَى الْحَقِيْقَةِ، وَاللهُ تَعَالَى خَالِقُهَا، وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيْئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَبِمَحَبَّتِهِ وَبِرِضَاهُ وَعِلْمِهِ وَمَشِيْئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ. وَالْمَعَاصِيْ كُلُّهَا بِعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ وَمَشِيْئَتِهِ، لاَ بِمَحَبَّتِهِ وَلاَ بِرِضَاهُ وَلاَ بِأَمْرِهِ.

বঙ্গানুবাদ

তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর মত নন। তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান, তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর যাতী (সত্তীয়) ও ফি'লী (কর্মীয়) সিফাত (বিশেষণ)সমূহসহ। তাঁর সত্তীয় বিশেষণসমূহ: হায়াত (জীবন), কুদরাত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সাম' (শ্রবণ), বাসার (দর্শন) ও ইরাদা (ইচ্ছা)। আর তাঁর ফি'লী সিফাতসমূহের মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টি করা, রিয্ক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত বা বিশেষণ। তিনি তাঁর গুণাবলি এবং নামসমূহ-সহ অনাদিরূপে বিদ্যমান। তাঁর নাম ও বিশেষণের মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা পরিবর্তন ঘটে নি। তিনি অনাদিকাল থেকেই তাঁর জ্ঞানে জ্ঞানী এবং জ্ঞান অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতা অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই তাঁর কথায় কথা বলেন এবং কথা অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি করা অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই তাঁর কর্মে কর্মী, কর্ম অনাদিকাল থেকে তাঁর বিশেষণ। আল্লাহ তাঁর কর্ম দিয়ে যা সৃষ্টি করেন তা সৃষ্ট, তবে আল্লাহর কর্ম সৃষ্ট নয়। তাঁর সিফাত বা বিশেষণাবলি অনাদি। কোনো বিশেষণই নতুন বা সৃষ্ট নয়। যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহর কোনো সিফাত বা বিশেষণ সৃষ্ট অথবা নতুন, অথবা এ বিষয়ে সে কিছু বলতে অস্বীকার করে, অথবা এ বিষয়ে সে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান-বিহীন কাফির।

কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম, মুসহাফগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ, হৃদয়গুলোর মধ্যে সংরক্ষিত, জিহ্বাসমূহ দ্বারা পঠিত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরে অবতীর্ণ। কুরআন পাঠে আমাদের জিহ্বার উচ্চারণ সৃষ্ট, কুরআনের জন্য আমাদের লিখনি সৃষ্ট, আমাদের পাঠ সৃষ্ট, কিন্তু কুরআন সৃষ্ট নয়। মহান আল্লাহ কুরআনের মধ্যে মূসা (আ) ও অন্যান্য নবী (আ) থেকে এবং ফিরাউন এবং ইবলীস থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তা সবই আল্লাহর কালাম (কথা), তাদের বিষয়ে সংবাদ হিসেবে। আল্লাহর কথা সৃষ্ট নয়, মূসা (আ) ও অন্য সকল মাখলূকের কথা সৃষ্ট। কুরআন আল্লাহর কথা কাজেই তা অনাদি, মাখলূকগণের কথা সেরূপ নয়। মূসা (আ) আল্লাহর কথা শুনেছিলেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "মূসার সাথে আল্লাহ প্রকৃত বাক্যালাপ করেছিলেন"[২৪৫] মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলার আগেই- অনাদিকাল থেকেই- মহান আল্লাহ তাঁর কালাম বা কথার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন, যেমন সৃষ্টজগত সৃষ্টি করার পূর্বেই- অনাদিকাল থেকেই- তিনি সৃষ্টিকর্তার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন। "কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[২৪৬] যখন তিনি মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেন তখন তিনি তাঁর সেই অনাদি বিশেষণ কথার বিশেষণ দ্বারা কথা বলেন।

তাঁর সকল বিশেষণই মাখলূকদের বা সৃষ্টপ্রাণীদের বিশেষণের ব্যতিক্রম। তিনি জানেন, তবে তাঁর জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে তাঁর ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। তিনি দেখেন, তবে তাঁর দেখা আমাদের দেখার মত নয়। তিনি কথা বলেন, তবে তাঁর কথা বলা আমাদের কথা বলার মত নয়। তিনি শুনেন, তবে তাঁর শোনা আমাদের শোনার মত নয়। আমরা বাগযন্ত্র ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলি, আর মহান আল্লাহ বাগযন্ত্র এবং অক্ষর ছাড়াই কথা বলেন। অক্ষরগুলি সৃষ্ট।

আর আল্লাহর কথা (কালাম) সৃষ্ট নয়।

তিনি 'শাইউন': 'বস্তু' বা 'বিদ্যমান অস্তিত্ব', তবে অন্য কোনো সৃষ্ট 'বস্তু' বা 'বিদ্যমান বিষয়ের' মত তিনি নন। তাঁর 'শাইউন'- 'বস্তু' হওয়ার অর্থ তিনি বিদ্যমান অস্তিত্ব, কোনো দেহ, কোনো জাওহার (মৌল উপাদান) এবং কোনো 'আরায' (অমৌল উপাদান) ব্যতিরেকেই। তাঁর কোনো সীমা নেই, বিপরীত নেই, সমকক্ষ নেই, তুলনা নেই। "অতএব তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।"[২৪৭] তাঁর ইয়াদ (হস্ত) আছে, ওয়াজহ (মুখমণ্ডল) আছে, নফস (সত্তা) আছে, কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলো উল্লেখ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ যা কিছু উল্লেখ করেছেন, যেমন মুখমণ্ডল, হাত, নফস ইত্যাদি সবই তাঁর বিশেষণ, কোনো 'স্বরূপ' বা প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর ক্ষমতা অথবা তাঁর নিয়ামত। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর বিশেষণ বাতিল করা। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের রীতি। বরং তাঁর হাত তাঁর বিশেষণ, কোনো স্বরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে। তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর দুটি বিশেষণ, আল্লাহর অন্যান্য বিশেষণের মতই, কোনো 'কাইফ' বা 'কিভাবে' প্রশ্ন করা ছাড়াই।

মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। সকল কিছুর সৃষ্টির আগেই অনাদিকাল থেকে তিনি এগুলোর বিষয়ে অবগত ছিলেন। সকল কিছুই তিনি নির্ধারণ করেছেন এবং বিধান দিয়েছেন। দুনিয়ায় ও আখিরাতে কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান, বিধান, নির্ধারণ ও লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ-করণ ছাড়া ঘটে না। তাঁর লিখনি বর্ণনামূলক, নির্দেশমূলক নয়। বিধান প্রদান, নির্ধারণ ও ইচ্ছা তাঁর অনাদি বিশেষণ, কোনো স্বরূপ, কিরূপ বা কিভাবে অনুসন্ধান ছাড়া। সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ ও ইচ্ছা তাঁর অনাদি-অনন্ত বিশেষণ, কোনো স্বরূপ জিজ্ঞাসা ছাড়া। মহান আল্লাহ অস্তিত্বহীন বিষয়কে অস্তিত্বহীন অবস্থায় অস্তিত্বহীন হিসেবে জানেন, এবং তিনি জানেন যে, তিনি তাকে অস্তিত্ব দিলে তা কিরূপ হবে। আল্লাহ অস্তিত্বশীল বিষয়কে তার অস্তিত্বশীল অবস্থায় জানেন এবং তিনি জানেন যে, তা কিভাবে বিলোপ লাভ করবে। আল্লাহ দণ্ডায়মানকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দণ্ডায়মান রূপে জানেন। এবং যখন সে উপবিষ্ট হয় তখন তিনি তাঁকে উপবিষ্ট অবস্থায় উপবিষ্ট জানেন। এরূপ জানায় তাঁর জ্ঞানের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না বা তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে কোনো নতুনত্ব সংযোজিত হয় না। পরিবর্তন ও নতুনত্ব সবই সৃষ্টজীবদের অবস্থার মধ্যে।

মহান আল্লাহ সৃষ্টজগত সৃষ্টি করেছেন ঈমান ও কুফর থেকে বিমুক্ত অবস্থায়। অতঃপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি কুফ্‌রী করেছে সে নিজের কর্ম দ্বারা, অস্বীকার করে, সত্যকে অমান্য করে এবং আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফ্‌রী করেছে। আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে তার কর্ম দ্বারা, স্বীকৃতি দ্বারা, সত্য বলে ঘোষণা করে এবং আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য লাভের মাধ্যমে ঈমান এনেছে।

তিনি আদমের পিঠ থেকে তাঁর বংশধরদেরকে পরমাণুর আকৃতিতে বের করে তাদেরকে বোধশক্তি প্রদান করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করেন "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলেঃ হ্যাঁ"[২৪৮]। তিনি তাদেরকে ঈমানের নির্দেশ দেন এবং কুফ্‌র থেকে নিষেধ করেন। তারা তাঁর রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ছিল তাদের পক্ষ থেকে ঈমান। আদম সন্তানগণ এই ফিতরাতের উপরেই জন্মলাভ করে। এরপর যে কুফ্‌রী করে সে নিজেকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে। আর যে ঈমান আনে এবং সত্যতার ঘোষণা দেয় সে তার সহজাত ঈমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তিনি তাঁর সৃষ্টির কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করেন নি এবং ঈমান আনতেও বাধ্য করেন নি। তিনি কাউকে মুমিনরূপে বা কাফিররূপে সৃষ্টি করেন নি। তিনি তাদেরকে ব্যক্তিরূপে সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফ্‌র বান্দাদের কর্ম। কাফিরকে আল্লাহ তার কুফরী অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন। যখন সে এরপর ঈমান আনয়ন করে তখন আল্লাহ তাকে তার ঈমানের অবস্থায় মুমিন হিসেবে জানেন এবং ভালবাসেন। আর এতে আল্লাহর জ্ঞান ও বিশেষণে কোনো পরিবর্তন হয় না।

বান্দাদের সকল কর্ম ও নিষ্কর্মতা- অবস্থান ও সঞ্চলন সবই প্রকৃত অর্থেই তাদের উপার্জন, আল্লাহ তা'আলা সে সবের স্রষ্টা। এ সবই তাঁর ইচ্ছায়, জ্ঞানে, ফয়সালায় ও নির্ধারণে। আল্লাহর আনুগত্যের সকল কর্ম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জরুরী এবং তা আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও নির্ধারণ অনুসারে। সকল পাপকর্ম আল্লাহর জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘটিত, তবে তা আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সংঘটিত নয়।

ব্যাখ্যা ও টীকা

১. 'আল-ফিকহুল আকবার' রচনার প্রেক্ষাপট

তাওহীদ ও শিরকের মূলনীতি উল্লেখ করার পর ইমাম আবূ হানীফা আকীদা বিষয়ক বিভ্রান্তিগুলো খণ্ডন শুরু করলেন। বস্তুত বিভ্রান্তি দূর করে বিশুদ্ধ আকীদা প্রচারই 'আল-ফিকহুল আকবার' রচনার মূল উদ্দেশ্য। আমরা দেখেছি যে, ঈমানের ক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা সহজ-সরল অর্থে বিশ্বাস করা ও সাহাবীগণের অনুসরণ করা। ঈমান-আকীদার বিষয়বস্তু যেহেতু অপরিবর্তনীয় সেহেতু এ বিষয়ে ইজতিহাদ বা যুক্তি-কিয়াসের সুযোগ নেই। তবে উম্মাতের মধ্যে আকীদা বিষয়ক নতুন কোনো মত বা বিশ্বাসের উন্মেষ ঘটলে কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণের বিশ্বাস ও বক্তব্যের আলোকে সেগুলির পর্যালোচনা করা ও সঠিক বিশ্বাসের দিক নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব ইমাম, ফকীহ ও আলিমগণের উপর বর্তায়।

এ দায়িত্ব পালনের জন্যই কলম ধরেন ইমাম আযম আবূ হানীফা। তিনি ছিলেন উম্মাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ। তিনি তাঁর ফিকহী মাযহাব নিজে সংকলন করেন নি, কিন্তু আকীদার বিষয়ে তাঁর মাযহাব নিজের হাতে সংকলন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাওহীদ ও শিরক-এর মৌলিক বিষয়ে তেমন কোনো বিভ্রান্তি ইমাম আবূ হানীফার যুগে প্রকাশ পায় নি। এজন্য এ বিষয়টি তিনি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। এরপর তাঁর যুগে প্রকাশিত বিভ্রান্তিগুলোর ক্ষেত্রে সঠিক আকীদা বর্ণনা শুরু করলেন।

ইমাম আবূ হানীফার যুগে, অর্থাৎ হিজরী প্রথম শতকের শেষ ভাগ থেকে দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ে মুসলিম সমাজে ইসলামী আকীদা বিষয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে। এ সময়ে বিদ্যমান আকীদা ভিত্তিক দল-উপদলের মধ্যে অন্যতম ছিল: (১) খারিজী, (২) শীয়া, (৩) জাহমিয়া, (৪) জাবারিয়া, (৫) কাদারিয়া, (৬) মুতাযিলা, (৬) মুশাব্বিহা ও (৭) মুরজিয়া ফিরকা। ইসলামী বিশ্বাস বিষয়ক প্রথম বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে আলী (রা)-এর সময়ে (৩৫-৪০ হি)। এ সময়ে খারিজী ও শীয়া দুটি দলের উৎপত্তি ঘটে। এ দুটি ফিরকা ছিল মূলত রাজনৈতিক। এরপর প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ ও দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমাংশে অবশিষ্ট বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর জন্ম হয়। এদের বিভ্রান্তি মূলত দার্শনিক মতবাদ নির্ভর এবং আল্লাহর বিশেষণাদি (attribute) কেন্দ্রিক। রাজনৈতিক ও দার্শনিক সকল ফিরকার বিভ্রান্তির মূল কারণ "আকীদার উৎস" নির্ধারণে বিভ্রান্তি। এজন্য এ সকল ফিরকার বিভ্রান্তি অপনোদনে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বশর্ত হিসেবে আমরা ইসলামী আকীদার ভিত্তি ও উৎস বিষয়টি পর্যালোচনা করতে চাই।

২. আকীদার উৎস

২. ১. আকীদার উৎস ওহী

বস্তুত আকীদা বিষয়ক সকল বিভক্তি ও বিভ্রান্তির মূল কারণ "আকীদা" বা "বিশ্বাস"-এর উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তি, অস্পষ্টতা বা মতভেদ। এজন্য মোল্লা আলী কারী "আল-ফিকহুল আকবার" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় আকীদা বা তাওহীদ-জ্ঞানের উৎস প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, যা আমরা একটু পরে উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

সাহাবীগণ, তাঁদের অনুসারী তাবিয়ীগণ, চার ইমাম ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আকীদার একমাত্র উৎস ওহী। কারণ আকীদা বা বিশ্বাস অদৃশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর অদৃশ্য বিষয়ে চূড়ান্ত ও সঠিক সত্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমেই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দু প্রকারের ওহী প্রেরিত হয়েছে এবং দু ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে: কিতাব বা কুরআন ও হিকমাহ বা হাদীস।[২৪৯]

২. ১. ১. কুরআন মাজীদ

কুরআন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে আক্ষরিকভাবে সেভাবেই তিনি ও সাহাবীগণ মুখস্থ করেছেন, প্রতিদিন সালাতে পাঠ করেছেন, রাতের সালাতে এবং নিয়মিত তিলাওয়াতে খতম করেছেন। এভাবে সাহাবীগণের যুগ থেকে অগণিত অসংখ্য মুসলিম কুরআন মুখস্থ ও তিলাওয়াতের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন। কুরআনই ঈমান, বিশ্বাস বা আকীদার মূল ভিত্তি।

আমরা পরবর্তীতে দেখব যে, কুরআনের বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ী ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি দুটি: (১) কুরআনের বক্তব্য সরল ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা। কোনোরূপ ঘোরপ্যাঁচ বা তাফসীর-ব্যাখ্যার নামে আক্ষরিক ও সরল অর্থ পরিত্যাগ না করা। (২) কুরআনের সকল বক্তব্য সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। একটি বক্তব্যের অজুহাতে অন্য বক্তব্যকে ব্যাখ্যার নামে অর্থহীন না করা। বরং দুটি বক্তব্যই যথাসম্ভব সরল ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা। শীয়া, খারিজী, মুতাযিলী ও অন্যান্য সম্প্রদায় এক্ষেত্রে তাফসীরের নামে সরল অর্থ ত্যাগ করেছে এবং একটি বক্তব্যের অজুহাতে অন্য বক্তব্য বাতিল করেছে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্য মূলনীতি কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে সাহাবীগণের অনুসরণ করা। তাঁরা যা বলেন নি তা আকীদার মধ্যে সংযোজন না করা।

২. ১. ২. সহীহ হাদীস

দ্বিতীয় প্রকারের ওহী "আল-হিকমাহ" বা প্রজ্ঞা। কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে যে শিক্ষা, তথ্য ও জ্ঞান প্রদান করেন তিনি তা নিজের ভাষায় সাহাবীগণকে শিক্ষা দেন। তাঁর এ শিক্ষা "হাদীস" নামে সংকলিত হয়েছে। হাদীসই ইসলামী আকীদার দ্বিতীয় ভিত্তি ও উৎস।

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে কথা বা হাদীস শুনতেন তা অন্যদেরকে শোনাতেন। কেউ তা লিখে রাখতেন এবং কেউ মনে রাখতেন এবং প্রয়োজনে বলতেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমগণ সাহাবীগণ থেকে হাদীস শিখতেন এবং লিপিবদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

হাদীসের বিষয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী ইমামগণের মুলনীতি হাদীস নামে প্রচারিত বক্তব্য গ্রহণের আগে যাচাই করা। কেবলমাত্র "সহীহ" হাদীস গ্রহণ করা। অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্জন করা এবং হাদীসের নামে জালিয়াতির সর্বাত্মক বিরোধিতা করা। দুর্বল বা জাল হাদীস নিজেদের মতের পক্ষে হলেও তা বর্জন করে তার জালিয়াতি বা দুর্বলতা বর্ণনা করা এবং সহীহ হাদীস নিজেদের মতের বিরুদ্ধে হলেও তার বিশুদ্ধতা স্বীকার করে তার আলোকে নিজেদের মত সংশোধন ও সমন্বয় করা। সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ এবং চার ইমাম এ বিষয়ে অনেক নির্দেশনা দিয়েছেন। ইমাম আযমের কিছু বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। পাশাপাশি তাদের মূলনীতি হলো, সহীহ হাদীস বাহ্যিক ও সরল অর্থে গ্রহণ করা, ব্যাখ্যার নামে বিকৃত না করা এবং সকল সহীহ হাদীস যথাসম্ভব সমন্বিতভাবে গ্রহণ করা।

খারিজী, শীয়া, মুতাযিলা ও অন্যান্য গোষ্ঠী হাদীস বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্যের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। সেগুলির অন্যতম:

(১) হাদীস গ্রহণ না করা। শীয়াগণের মতে সাহাবীগণ বিশ্বস্ত ছিলেন না (নাউযূ বিল্লাহ); কাজেই তাঁদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। মুতাযিলীগণ হাদীসের বর্ণনায় ভুল থাকতে পারে অজুহাতে, কুরআন দিয়ে অথবা বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে হাদীস যাচাইয়ের নামে হাদীস প্রত্যাখ্যান করে।

(২) সনদ যাচাই নয়, বরং পছন্দ অনুসারে হাদীস গ্রহণ করা। তারা বিশুদ্ধতা যাচাই করে হাদীস গ্রহণ করেন না। বরং যে হাদীস তাদের মতের পক্ষে তা তারা গ্রহণ করেন ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। আর যে হাদীস তাদের মতের বিপক্ষে তা নানা অজুহাতে অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করেন।

(৩) হাদীসের নামে মিথ্যা বলা বা জাল হাদীস প্রচার ও গ্রহণ করা। এ বিষয়ে শীয়াগণ অগ্রগামী ছিলেন। এছাড়া "আহলুস সুন্নাত" নামে পরিচয় দানকারী "কাররামিয়া" ও অন্যান্য সম্প্রদায়ও নিজেদের মতের পক্ষে হাদীস জাল করা ও জাল হাদীস প্রচার করায় অগ্রণী ছিলেন। উপরন্তু আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ যখন সনদ-বিচার করে সেগুলোর জালিয়াতি উদ্ঘাটন করতেন তখন তারা সনদ-প্রমাণের দিকে না যেয়ে তাঁদেরকে 'নবীর (ﷺ) দুশমন', "আলী-বংশের শত্রু", "এযিদের দালাল" ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করতেন। এভাবে তারা সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদের জালিয়াতির গ্রহণযোগ্যতা ও মুহাদ্দিসগণের যাচাইয়ের প্রতি বিরূপ মানসিকতা তৈরি করতেন। অন্যান্য ফিরকা নিজেরা জালিয়াতির ক্ষেত্রে অতটা অগ্রসর না হলেও নিজেদের পক্ষের জাল হাদীস গ্রহণ ও প্রচার করতেন।

(৪) ব্যাখ্যার নামে সরল অর্থ বিকৃত করা। হাদীসের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যার নামে হাদীসের সরল অর্থ বিকৃত করা এ সকল বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য।

২. ১. ৩. মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীস

যে হাদীস সাহাবীগণের যুগ থেকেই বহু সনদে বর্ণিত তাকে "মুতাওয়াতির" (recurrent; frequent) বা বহুমুখে বর্ণিত হাদীস বলা হয়। মূলত কুরআনের পাশাপাশি এরূপ হাদীসই আকীদার ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে বিশুদ্ধতম আকীদা ও আমল শিখিয়ে গিয়েছেন। আমলের ক্ষেত্রে বিকল্প আছে। সব মুসলিমের উপর ফরয কিছু কাজ ব্যতীত বিভিন্ন ফযীলতমূলক নেক কর্ম একটি না করলে অন্যটি করা যায়। কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প নেই। আকীদা সবার জন্য একই রূপে সর্বপ্রথম ফরয। যে বিষয়টি বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য প্রয়োজন সে বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সকল সাহাবীকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে জানিয়েছেন এবং সাহাবীগণও এভাবে তাবিয়ীগণকে জানিয়েছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, আকীদার বিষয় সুস্পষ্টভাবে কুরআনে অথবা মুতাওয়াতির হাদীসে বর্ণিত।

দু-একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসকে 'আহাদ' বা "খাবারুল ওয়াহিদ" অর্থাৎ একক হাদীস বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফাসহ প্রথম দু শতাব্দীর সকল ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে 'মুতাওয়াতির' ও 'আহাদ' উভয় প্রকার সহীহ হাদীসই আকীদার ভিত্তি ও উৎস হিসেবে গৃহীত। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার একাধিক বক্তব্য আমরা দেখেছি এবং আরো দেখব। এক্ষেত্রে পার্থক্য হলো, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফর বলে গণ্য আর 'আহাদ' পর্যায়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করা বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা বলে গণ্য করা হয়।

২. ২. ওহী অনুধাবনে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ঐকমত্য

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে কুরআনে ও হাদীসে যা বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে তা সরলভাবে বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি। কুরআন ও হাদীসের বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (ﷺ) শিক্ষার মধ্যে কোনো জটিলতা,

গোপনীয়তা বা স্ববিরোধিতা নেই। তারপরও কখনো জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে কুরআন-হাদীস অনুধাবন বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা দ্বিধা সৃষ্টি হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ এবং পরবর্তী দু প্রজন্ম 'তাবিয়ী' ও 'তাবি-তাবিয়ীগণের' ব্যাখ্যা ও মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। বিশেষত তাঁদের ইজমা বা ঐকমত্য আকীদার প্রমাণ হিসেবে গণ্য। কুরআন ও হাদীসই তাঁদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছে। আমরা পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়ক কিছু আয়াত ও হাদীস দেখব, ইনশা আল্লাহ।

মুসলিম সমাজের প্রথম বিভ্রান্ত ফিরকা "খারিজীগণ" কুরআন ও হাদীসকে ইসলামী শরীয়ত ও আকীদার উৎস বলে স্বীকার করত। তাদের বিভ্রান্তির শুরু "জ্ঞানের অহঙ্কার" থেকে। ওহী অনুধাবনের জন্য সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার গুরুত্ব তারা অস্বীকার করত। এছাড়া "সুন্নাত"-এর গুরুত্বও অস্বীকার করত। অর্থাৎ তাঁরা কুরআনের আয়াত বা হাদীস দিয়ে যে মতটি গ্রহণ করছে সে মত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্মধারা বা রীতির মধ্যে বা প্রায়োগিক সুন্নাতের মধ্যে আছে কিনা তা বিবেচনা করত না। সর্বোপরি তারা কুরআন ও হাদীসের কিছু বক্তব্যের ভিত্তিতে নিজেদের মত গ্রহণ করত। এর বিপরীতে কুরআন-হাদীসের অন্যান্য বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দিত। এভাবে আমরা দেখছি যে, খারিজীগণের বিভ্রান্তির উৎস (১) সুন্নাতের গুরুত্ব অস্বীকার, (২) সাহাবীগণের মতামত অস্বীকার ও (৩) "পছন্দ" অনুসারে কুরআন-হাদীসের কিছু বক্তব্য গ্রহণ ও কিছু ব্যাখ্যার নামে বাতিল করা।

২. ৩. ওহী বহির্ভূত ঐশিক-অলৌকিক জ্ঞান

মুসলিম সমাজের দ্বিতীয় ফিরকা "শীয়া"। সাহাবীগণ বর্ণিত হাদীস তারা অস্বীকার করে। তাদের ইমামগণের নামে অগণিত জাল ও মিথ্যা কথা হাদীস নামে তাদের মধ্যে প্রচলিত। তাদের অনেকে কুরআনকেও অস্বীকার করে এবং বিকৃত বলে দাবি করে। তবে স্বীকার বা অস্বীকার এখানে মূল্যহীন। তাদের বিভ্রান্তির মূল কারণ কুরআন-সুন্নাহর বাইরে "আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান" গ্রহণের পথ আছে বলে বিশ্বাস করা। তাদের বিশ্বাসে ঈমান, আকীদা ও দীনের একমাত্র ভিত্তি আলী-বংশের ইমামগণ ও তাঁদের 'খলীফা' বা 'ওলী'-গণের 'গাইবী' জ্ঞান। তারা এ গাইবী জ্ঞানকে 'ওহী', 'ইলম লাদুন্নী', 'ইলহাম', 'ইলম বাতিন', 'কাশফ', 'ইলকা' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করত ও করে। তাদের মতে ইমামগণ, তাঁদের খলীফাগণ বা ওলীগণ আল্লাহর কাছ থেকে এভাবে যে "ঐশিক" বা "অলৌকিক" জ্ঞান লাভ করেন তা-ই আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি। কুরআন-হাদীস সঠিকভাবে অনুধাবনের ক্ষমতাও তাঁদেরই আছে। তাঁরা মাসূম বা অভ্রান্ত, অর্থাৎ দীন বুঝার ক্ষেত্রে তাদের ভুল হতে পারে না। কুরআন-হাদীসের বক্তব্য গ্রহণ, বর্জন বা ব্যাখ্যা করতে হবে তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে।

ইসলামের প্রথম বরকতময় তিন শতাব্দীর পরে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শীয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও সাধারণ "সুন্নী" মুসলিমগণও বিভিন্ন শীয়া আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হন। এজন্য আমরা দেখি যে, শীয়াগণ ও শীয়াগণের দ্বারা প্রভাবিত অগণিত "সুন্নী" ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিভিন্ন গালভরা উপাধিতে ভুষিত করে বিভিন্ন বুজুর্গকে অভ্রান্ত বলে দাবি করে "শিরক ফিন-নুবুওয়াত" বা 'নুবুওয়াতে শিরকের" মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। তাঁরা নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন বুজুর্গের নামে গাওস, কুতুব, ইমাম, মুজাদ্দিদ... ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করে তাদেরকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ) থেকে সরাসরি "ঐশী" বা অভ্রান্ত ইলম-প্রাপ্ত বলে দাবি করেছেন। উল্লেখ্য যে, গাওস, কুতুব ইত্যাদি কোনো উপাধি কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয় নি। 'ইমাম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। উম্মাতের মধ্যে মুজাদ্দিদগণ থাকবেন। তবে কে মুজাদ্দিদ তা নিশ্চিতভাবে কেউই জানেন না। কাউকে মুজাদ্দিদ বলে চিহ্নিত করা একান্তই আন্দায ও অনুমান মাত্র। আর মুজাদ্দিদ দাবিতে কাউকে নির্ভুল মনে করা, মুজাদ্দিদকে ইলহাম বা কাশফ-সম্পন্ন হতে হবে বলে মনে করা বা কাউকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে তার মতামতকে দলীলের মান দেওয়া সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি।[২৫০]

বস্তুত কুরআন ও হাদীসের পরে অন্য কিছুকে ভুলের উর্ধ্বে বা চূড়ান্ত বলে গণ্য করা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে অন্য কাউকে ভুলের উর্ধ্বে বলে গণ্য করা এবং কাশফ, ইলকা, স্বপ্ন ইত্যাদিকে 'কারামত' বা ব্যক্তিগত সম্মাননার পর্যায় থেকে বের করে ঈমান, আকীদা বা দীনের হক্ক-বাতিল নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা আকীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ। ইমামগণ এরূপ প্রবণতার ঘোর আপত্তি করেছেন। ইমাম মালিক (রাহ) বলেন:

كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ﷺ.

"এ কবরে যিনি শায়িত আছেন-রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য সকল মানুষের ক্ষেত্রেই তার কিছু কথা গ্রহণ ও কিছু কথা বর্জন করতে হয়।।"[২৫১]

এজন্য আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে কোনো ব্যক্তির নিষ্পাপত্ব, অভ্রান্ততা বা বিশেষ জ্ঞানে বিশ্বাস না করা। তাঁরা কাশফ, ইল্‌হাম, ইত্যাদির অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন এবং এগুলিকে ব্যক্তি মুমিনের জন্য 'কারামত' ও নিয়ামত বলে গণ্য করেন। কিন্তু এগুলোকে আকীদার ভিত্তি বা কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না। কোনো আলিম-বজুর্গই 'মাসূম' বা অভ্রান্ততার পদমর্যাদা পাবেন না। তার অনেক সঠিক মতের পাশাপাশি কিছু ভুল মত থাকবে এটাই স্বাভাবিক ও সুনিশ্চিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে আর কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা হয় না, কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে হয়। কারো কথা দিয়ে কুরআন বা সুন্নাহ বিচার করা যায় না বরং কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে প্রত্যেকের কথা বিচার করতে হয়।

আল্লামা উমর ইবন মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি) "আল-আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ" ও আল্লামা সা'দ উদ্দীন মাসউদ ইবন উমর তাফতাযানী (৭৯১হি) "শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ"–তে লিখেছেন:

اَلإِلْهَامُ الْمُفَسَّرُ بِإِلْقَاءِ مَعْنًى فِيْ الْقَلْبِ بِطَرِيْقِ الْفَيْضِ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ.

"হক্কপন্থীগণের নিকট ইলহাম বা ইলকা-ফয়েজ কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার কোনো মাধ্যম নয়।"[২৫২]

২. ৪. আকলী দলীল বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও দর্শন

জাহমিয়া, মুতাযিলা ও অন্যান্য ফিরকার বিভ্রান্তির কারণ ছিল 'আকলী দলীল', অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক বা দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণকে ওহীর উপরে স্থান দেওয়া। তাদের মতে আকীদার সত্য জানার জন্য 'আকল'ই সুনিশ্চিত পথ। 'আকলী দলীল'-এর নির্দেশনা 'একীনী' অর্থাৎ 'সুনিশ্চিত'। পক্ষান্তরে 'নকলী দলীল' বা কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা 'যান্নী', অর্থাৎ 'অস্পষ্ট' বা 'ধারণা প্রদানকারী'। ওহীর নির্দেশনা 'আকলসম্মত' হলে তা গ্রহণ করতে হবে। আর তা আকলসম্মত না হলে ব্যাখ্যা করে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

ইসলাম 'আকল', 'আকলী দলীল' ও যৌক্তিকতাকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। কখনোই ধর্মের নামে মানবীয় জ্ঞান, যুক্তি বা 'আকলী দলীলের' সাথে সাংঘর্ষিক কিছু বিশ্বাস করতে শেখানো হয় নি। 'আহলুস সুন্নাত' 'আকল'-এর গুরুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু আকীদা প্রমাণের ক্ষেত্রে আকলী দলীলকে ওহীর ঊর্ধ্বে স্থান দেন না। মানবীয় প্রকৃতি ও সহজাত অনুভূতির নিকট গ্রহণযোগ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ওহী নির্দেশিত বিশ্বাসকে 'আকলী দলীলের' নামে প্রত্যাখ্যানের নিন্দা করেন তাঁরা। মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত। আল্লাহ মানুষকে এ নিয়ামত দিয়েই সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। যেহেতু আকল ও ওহী দুটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিয়ামত সেহেতু এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকতে পারে না। তবে এ দুয়ের বিচরণ ক্ষেত্র পৃথক। গাইবী বিষয়ে 'আকলী দলীল' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে অক্ষম। এক্ষেত্রে ওহীই নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে।

ওহীপ্রাপ্ত জাতিগুলোর বিভ্রান্তির বড় কারণ ওহীর বিপরীতে 'আকলী দলীল' বা 'দার্শনিক যুক্তি' পেশ করা। প্রচলিত খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পল ও তার অনুসারীগণ ত্রিত্ববাদ, যীশুর ঈশ্বরত্ব, মহান আল্লাহর মানবীয় দেহধারণ, আদিপাপ, প্রায়শ্চিত্ববাদ ইত্যাদি ওহী বিরোধী ও ঈসা মাসীহের বক্তব্য বিরোধী বিশ্বাসগুলোর পক্ষে 'আকলী দলীল' নামে যে সকল দলীল প্রদান করেছেন সেগুলো পর্যালোচনা করলে যে কেউ বুঝবেন যে, কত উদ্ভট কথা 'আকলী দলীল' নামে অগণিত আদম সন্তান গ্রহণ করছেন।

সর্বোপরি, মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত। একজনের কাছে যা যৌক্তিক বা 'নিশ্চিত আকলী দলীল' অন্যের কাছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও জ্ঞান-বিরুদ্ধ। আবার একই ব্যক্তির বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দেয়। দেবতার জন্য নরবলি প্রদানের পক্ষে অনেকে 'আকলী দলীল' প্রদান করছেন। আবার মানুষের জন্য মাংস ভক্ষণকে অনেকে মানবতা বিরোধী বলে 'আকলী দলীল' পেশ করছেন।

ধর্মের নামে যদি বলা হয় স্রষ্টা জন্ম, বর্ণ বা বংশের কারণে তাঁর কোনো সৃষ্টিকে ঘৃণা বা হেয় করেন, তিনি মানুষের বেশ ধরে পৃথিবীতে আসেন, তিনি একজনের পাপে অন্যজনকে শাস্তি দেন ... তবে তা 'ওহী' নয় বলে প্রমাণিত হবে। কারণ এ সকল বিষয় সহজাত বিবেকে ও জ্ঞানবুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল-করুণাময় এবং তিনি ন্যায়বিচারক-শাস্তিদাতা তবে উভয় বিষয়ই মানবীয় বিবেকসম্মত ও যৌক্তিক। আকীদা বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর সকল নির্দেশনাই এরূপ মানবীয় বিবেকসম্মত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। এরূপ বিষয়ে যদি কেউ নিজের বুদ্ধি দিয়ে উভয় বিশেষণের মধ্যে বৈপরীত্য অনুভব করেন এবং বিভিন্ন যুক্তি বা দর্শন নির্ভর বক্তব্যকে 'আকলী দলীল' নাম দিয়ে ওহীর শিক্ষা বাতিল বা ব্যাখ্যা করেন তবে তা বিভ্রান্তি।

২. ৫. ওহী বনাম ওহীর ব্যাখ্যা

কোনো বক্তব্যের ব্যাখ্যা দু পর্যায়ের হতে পারে: (১) বাহ্যিক ও সরল অর্থ এবং (২) বাহ্যিক অর্থের ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো অর্থ যা বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায় না। প্রথম পর্যায়ের ব্যাখ্যা মূলত ওহীরই অর্থ। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাখ্যা ওহী অনুধাবনের বিভিন্ন ব্যক্তির মত। আমরা ব্যাখ্যা বলতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাখ্যা বুঝাচ্ছি। বিভ্রান্ত সকল গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ওহীর এরূপ ব্যাখ্যাকে ওহীর সমতূল্য মনে করা। তাদের আকীদার ভিত্তিই "তাফসীর"। একটি নমুনা দেখুন। আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

"তোমাদের অভিভাবক-বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকু-রত।"[২৫৩]

ইবন আব্বাস (রা), আলী (রা), আম্মার (রা), মুজাহিদ ইবন জাব্র প্রমুখ সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি আলী (রা)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ। এ বিষয়ক বর্ণনাগুলোর অধিকাংশ সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এ বর্ণনাগুলোর সার সংক্ষেপ এই যে, একজন ভিক্ষুক মসজিদের মধ্যে ভিক্ষা চান। কেউ তাকে কোনো ভিক্ষা প্রদান করেন না। আলী (রা) তখন মসজিদের মধ্যে নফল সালাত আদায়ে রত ছিলেন। তিনি এ সময় রুকুরত অবস্থায় ছিলেন। এ অবস্থাতেই তিনি ইশারায় ভিক্ষুককে ডাকেন এবং নিজের হাতের আংটি খুলে ভিক্ষুককে প্রদান করেন। ভিক্ষুক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বিষয়টি জানান। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, "আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ, আলীকে যে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাকে আপনি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন এবং আলীর সাথে যে শত্রুতা করে আপনি তার সাথে শত্রুতা করুন।"[২৫৪]

এ শানে নুযূল ও তাফসীরকে শীয়াগণ তাদের আকীদার ভিত্তি বানিয়েছেন। তারা বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আলীকে

বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা বা তাঁর দলভুক্ত হওয়া ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই সাহাবীগণ ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকল মুসলিমই আল্লাহর দুশমন। আলীকে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান না করে, তাঁর বিরোধিতা করে বা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আবূ বকর, উমার, উসমান, মুআবিয়া (ﷺ) ও অন্যান্য সাহাবী আল্লাহর দুশমন হয়েছেন। আর তাঁদের সমর্থকগণও আল্লাহর দুশমন। তাঁরা সকলেই কুরআনের নির্দেশ অস্বীকার করার কারণে কাফির-মুরতাদ বলে গণ্য (নাউযূ বিল্লাহ!)।

কুরআন ও তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন। কুরআনের নির্দেশ: মুমিনদের অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে এবং সালাত কায়েমকারী ও যাকাত প্রদানকারী মুমিনগণকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আলী (রা) ও সকল সাহাবী ও অন্যান্য মুমিন এর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে আলী (রা)-এর বিশেষত্ব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং দুর্বল বা 'আহাদ' পর্যায়ের হাদীসে বর্ণিত এবং কোনো কোনো মুফাস্সিরের মত। এ সকল মত দ্বারা আলী (রা)-এর মর্যাদা জানা যায়, তবে অন্যান্য সাহাবীর অবমূল্যায়ন জানা যায় না। সর্বোপরি কখনোই বিষয়টিকে আকীদার অংশ বানানো যায় না। যে কোনোভাবে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিরোধিতা বা বিদ্বেষেপোষণ ঈমান বিনষ্টকারী। কিন্তু জাগতিক বা ইজতিহাদী কারণে আলী (রা)-এর বিরোধিতা করা তদ্রূপ নয়। কিন্তু শীয়াগণ তাফসীরকে বিশ্বাসের ভিত্তি বানিয়েছেন। আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আলী-বংশের ইমামগণের নূর (আলো) থেকে সৃষ্টি, তাদের গাইবী ইলম ইতাদি আকীদার ক্ষেত্রেও শীয়াগণ এরূপ তাফসীরের উপরেই নির্ভর করেন।

২. ৬. পছন্দ-নির্ভরতা ও অপব্যাখ্যা

বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর বৈশিষ্ট্য কুরআন-হাদীসের যে বক্তব্য তাদের মত বা পছন্দের সাথে মিলে তা গ্রহণ করা এবং অন্য সকল বক্তব্যের সরল অর্থ অপব্যাখ্যা করে বাতিল করা। পূর্ববর্তী উম্মাতগুলোর বিভ্রান্তিরও অন্যতম কারণ ছিল এ পছন্দ নির্ভরতা, যাকে কুরআনে 'হাওয়া' (الهوى) (love; liking, bias) বলা হয়েছে।

২. ৭. আকীদার উৎস বিষয়ে ইমাম আযমের মত

ফিকহ, আকীদা ও দীনের সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নির্ভরতার বিষয়ে ইমাম আযমের কিছু বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। আমরা দেখেছি, ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন (১৫৮-২৩৩ হি) তাঁর সনদে ইমাম আবূ হানীফার নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন:

"আমি আল্লাহর কিতাবের উপর নির্ভর করি। আল্লাহর কিতাবে যা না পাই সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের সূত্রে নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করি। কিতাব ও সুন্নাতে যা না পাই সে বিষয়ে সাহাবীগণের বক্তব্যের উপর নির্ভর করি। তাঁদের মধ্য থেকে যার মত ইচ্ছা গ্রহণ করি এবং যার মত ইচ্ছা বাদ দেই, তবে তাঁদের মত ছেড়ে অন্য কারো কথার দিকে যাই না। আর যখন বিষয়টি ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, ইবন সীরীন, হাসান বসরী... পর্যায়ে আসে তখন তাঁরা যেমন ইজতিহাদ করেছেন আমিও তেমন ইজতিহাদ করি।"[২৫৫]

এখানে ইমাম আবূ হানীফা কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন:

প্রথমত: দীনের মূল ভিত্তি কুরআন ও হাদীসের উপর। কুরআনে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট রয়েছে তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। কুরআনে কোনো বিষয় সুস্পষ্ট না থাকলে হাদীসে তা অনুসন্ধান করতে হবে। কুরআন ও হাদীসের বিদ্যমান কোনো নির্দেশনার বিষয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির বক্তব্য, ব্যাখ্যা বা ইজতিহাদ গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত: হাদীসের ক্ষেত্রে রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা ও সনদের পরম্পরার মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করে গ্রহণ করা জরুরী।

তৃতীয়ত: ওহী বা কুরআন-হাদীসের পরেই 'রিজালুল ওহী' বা 'রিজালুল্লাহ' বা 'ওহীর মানুষ': সাহাবীগণ। কুরআনে তাঁদের সঠিক অনুসরণকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫৬] কাজেই তাঁদের মতের বাইরে যাওয়া মুমিনের জন্য বৈধ নয়। কুরআন-হাদীসে যে সকল বিষয় নেই সে সকল বিষয়ে এবং কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার বিষয়ে তাঁদের ইজমা বা ঐকমত্য অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের মতভেদ থাকলে তাঁদের মতের মধ্যেই থাকতে হবে; নতুন কোনো মত গ্রহণ করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আযমের ছাত্র ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ লুলুয়ী (২০৪ হি) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা বলতেন:

ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص عن كتاب الله أو سنة عن رسول الله أو إجماع عن الأمة وإذا اختلف الصحابة على أقوال نختار منها ما هو أقرب الى الكتاب أو السنه ونجتنب عما جاوز ذلك

"আল্লাহর কিতাবে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতে কোনো বক্তব্য থাকলে অথবা উম্মাতের ইজমা বিদ্যমান থাকলে সে বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ দ্বারা কথা বলার অধিকার কারো নেই। আর যদি সাহাবীগণ মতভেদ করেন তবে আমরা তাঁদের মতগুলোর মধ্য থেকে কুরআন অথবা সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী বক্তব্যটি গ্রহণ করি এবং এর ব্যতিক্রম সব কিছু পরিত্যাগ করি।"[২৫৭]

চতুর্থত: সাহাবীগণের পর আর কারো এরূপ মর্যাদা নেই। তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী সকল আলিমের মত বিচার ও যাচাই পূর্বক গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন:

ما جاء عن الله ورسوله لا نتجاوز عنه وما اختلف فيه الصحابة أخترناه وما جاء عن غيرهم أخذنا وتركنا

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) থেকে যা বর্ণিত তার বাইরে আমরা যাই না। যে বিষয়ে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন সে বিষয়ে আমরা একটি গ্রহণ করি। আর অন্যদের থেকে যা বর্ণিত তা আমরা গ্রহণ এবং বর্জন করি।"[২৫৮]

হাদীসের ক্ষেত্রে সনদ সহীহ হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন:

إِذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَعْدُهُ

''রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ সনদে হাদীস পাওয়া গেলে তাঁর উপরেই আমরা নির্ভর করব, তার বাইরে যাব না।''[২৫৯]

আমরা দেখব যে, এ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন:

وَسَائِرُ عَلاَمَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الأَخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ حَقٌّ كَائِنٌ

"কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই।"[২৬০]

ইমাম আযম খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আকীদার ভিত্তি কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের মত। পরবর্তী যুগের নতুন বিষয়গুলো বিদআত। তিনি বলেন:

ما الأمر إلا ما جاء به القرآن، ودعا إليه النبي– صلى الله عليه وسلم –، وكان عليه أصحابه حتى تفرق الناس. فأما ما سوى ذلك فمبتدَع محدَث.

"বিষয় তো শুধু তাই যা কুরআন নিয়ে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার দাওয়াত দিয়েছেন এবং মানুষদের দল-ফিরকায় বিভক্ত হওয়ার আগে তাঁর সাহাবীগণ যার উপরে ছিলেন। এগুলো ছাড়া যা কিছু আছে সবই নব-উদ্ভাবিত বিদআত।"[২৬১]

এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদের (রাহ) মত ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জাফার তাহাবী (৩২১ হি) বলেন:

وَجَمِيْعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ وَالبَيَانِ حَقٌّ. ... وَكُلُّ مَا جَاءَ فِيْ ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَهُوَ كَمَا قَالَ...

"শরয়ী বিধিবিধান এবং ঈমান-আকীদা বিষয়ক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা কিছু সহীহভাবে বর্ণিত সবই সত্য। ... এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই তিনি যেরূপ বলেছেন সেরূপই বিশ্বাস করতে হবে।"[২৬২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দীনের সকল বিষয়ের ন্যায় আকীদার ক্ষেত্রেও মূল ভিত্তি হলো কুরআন কারীম, সহীহ হাদীস এবং এরপর সাহাবীগণের মত। আকীদা ও ফিকহের মৌলিক পার্থক্য হলো, ফিকহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ, কিয়াস, যুক্তি বা আকলী দলীলের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে এর কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের অনুসরণই একমাত্র করণীয়। কারণ ফিকহের বিষয়বস্তু পরিবর্তনশীল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণের যুগে ছিল না এমন কোনো নতুন বিষয়ে ফিকহী মত জানার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আকীদার বিষয়বস্তু মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, নবী-রাসূলগণ... ইত্যাদি। এগুলো অপরিবর্তনীয়। এক্ষেত্রে মুমিনের একমাত্র দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের আকীদা জানা ও মানা। এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসূফ বলেন:

لَيْسَ التَّوْحِيْدُ بِالْقِيَاسِ.... لأَنَّ الْقِيَاسَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ لَهُ شِبْهٌ وَمِثْلٌ، فَاللهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ لاَ شِبْهَ لَهُ وَلاَ مِثْلَ لَهُ... فَقَدْ أَمَرَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَكُوْنَ تَابِعاً سَامِعاً مُطِيْعاً وَلَوْ يُوَسَّعُ عَلَى الأُمَّةِ الْتِمَاسُ التَّوْحِيْدِ وَابْتِغَاءُ الإِيْمَانِ بِرَأْيِهِ وَقِيَاسِهِ وَهَوَاهُ إِذَنْ لَضَلُّوا، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللهِ: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) فَافْهَمْ مَا فُسِّرَ بِهِ ذَلِكَ.

"তাওহীদ বা আকীদা কিয়াস দ্বারা শেখা যায় না। .... কারণ কিয়াস তো চলে এমন বিষয়ে যার তুলনা ও নমুনা আছে। আর মহান মহাপবিত্র আল্লাহর তো কোনো তুলনাও নেই এবং নমুনাও নেই। মহান আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তুমি অনুসরণ করবে, শুনবে ও আনুগত্য করবে। যদি উম্মাতকে তাওহীদ সন্ধান ও ঈমান অর্জনের জন্য নিজস্ব মত, কিয়াস ও পছন্দের সুযোগ দেওয়া হয় তবে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তুমি কি শুন নি? মহান আল্লাহ বলেছেন: 'সত্য যদি এদের মতামত-পছন্দের অনুগত

হতো তবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছু।'[২৬৩] কাজেই এ আয়াতের তাফসীর ভাল করে হৃদয়ঙ্গম কর।"[২৬৪]

বস্তুত কিয়াস, ইজতিহাদ, আলিমগণের মত, যুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্র ইলমুল ফিকহ। গাইব বা আকীদার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনাকে আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করাই নিরাপত্তার একমাত্র পথ। নিজের পছন্দ, বুদ্ধি বা অন্যের মতের উপর নির্ভর করে ওহীর বক্তব্যের সহজ অর্থকে ব্যাখ্যা করে ঘুরানো বিভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়। পরবর্তীতে আমরা দেখব যে, ইমাম আবূ হানীফা এরূপ ব্যাখ্যার কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। সকল ক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্যের স্বাভাবিক আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করতে ও ব্যাখ্যার নামে আক্ষরিক অর্থ বাতিল করতে নিষেধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের ইমাম-ত্রয় ও আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি উল্লেখ করে ইমাম তাহাবী বলেন:

لا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا، وَلا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا ، فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ ﷺ.

"আমরা আমাদের রায়, মত বা ইজতিহাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করে বা আমাদের পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে এ বিষয়ে প্রবেশ করি না। কারণ দীনের বিষয় মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) উপর পরিপূর্ণভাবে ন্যস্ত না করা পর্যন্ত কেউই নিজের দীনকে নিরাপদ করতে পারবে না।"[২৬৫]

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী হানাফী 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন: "আমাদের রব্ব মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওহীদ বা দীনের ভিত্তির বিষয়ে অমুকের মত, তমুকের অনুভূতি, কারো পছন্দ বা কারো আবেগ-চিন্তার মুখাপেক্ষী করেন নি। (এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর বাইরে কোনো কিছুরই প্রয়োজন আমাদের নেই।) এজন্য আমরা দেখি যে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ-এর ব্যতিক্রম করেছেন তারা মতভেদ ও দ্বিধার মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[২৬৬]

কাজেই দীনকে পূর্ণ করার জন্য আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহ বলেছেন:

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ

"তাদের জন্য কি এ-ই যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি যা তাদের উপর পঠিত হয়?"[২৬৭]

আল্লাহ আরো বলেছেন[২৬৮]:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো, আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।"[২৬৯]

আমরা দেখেছি, ইমাম তাহাবী বলেছেন: "শরীয়ত ও ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহভাবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই সত্য।"[২৭০] ইমাম তাহাবীর এ কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবন আবিল ইয্য হানাফী বলেন: "প্রত্যেক বিদআতী ফিরকার মূলনীতি এই যে, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে তারা তাদের বিদআতের মানদণ্ডে অথবা যাকে তারা 'আকলী' বা 'বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল' ও 'যুক্তি' বলে কল্পনা করে তার মানদণ্ডে বিচার করে। যদি কুরআন-হাদীসের বক্তব্য তাদের বিদআত বা 'যুক্তি'র সাথে মিলে যায় তবে তারা সে বক্তব্যটিকে 'মুহকাম' বা দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট বলে দাবি করে, তা গ্রহণ করে এবং তাকে দলীল হিসেবে পেশ করে। আর কুরআন-হাদীসের যে বক্তব্য তাদের বিদআত বা 'যুক্তি'-র সাথে না মিলে সে বক্তব্যকে তারা 'মুতাশাবিহ' বা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট বলে উল্লেখ করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করে। ... অথবা তারা এ বক্তব্যের অর্থ বিকৃত করে এবং এরূপ বিকৃতিকে তারা 'ব্যাখ্যা' বলে আখ্যায়িত করে। এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কঠিনভাবে তাদের এ সকল কর্মের প্রতিবাদ করেছেন। আহলুস সুন্নাতের রীতি এই যে, কোনো ভাবেই তাঁরা কুরআন বা সহীহ হাদীসের কোনো বক্তব্য পরিত্যাগ করেন না বা তার বাইরে যান না। কুরআন বা সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় কোনো 'আকলী দলীল' বা কোনো ব্যক্তির বক্তব্য তাঁরা পেশ করেন না। ইমাম তাহাবী এ বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।"[২৭১]

২. ৮. আকীদার উৎস: সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র

এখানে আকীদার উৎস বিষয়ে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি এবং পাশাপাশি

শীয়া-রাফিযী, খারিজী, মুতাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর মূলনীতি উল্লেখ করা হলো:

	সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাহ	বিভ্রান্ত সম্প্রদায়
১	কুরআন-হাদীস বা ওহীর বাইরে আকীদার জ্ঞান বা বিশ্বাসের কোনো নিশ্চিত উৎস নেই।	আকীদার অন্যান্য নিশ্চিত উৎস আছে: ইলহাম, ইলকা, কাশফ, ইলম লাদুন্নী, দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ইত্যাদি।
২	ওহীর সরল অর্থই ওহী। এর ব্যাখ্যায় আলিমদের মতামত মানবীয় জ্ঞান-প্রসূত কথা, তা ওহীর সমতুল্য নয়।	মানবীয় তাফসীর-ব্যাখ্যাকে ওহীর মর্যাদা প্রদান এবং তাফসীরের নামে ওহীর সুস্পষ্ট অর্থ পরিত্যাগ।
৩	হাদীস আকীদার উৎস ও ভিত্তি।	হাদীসের গুরুত্ব অস্বীকার বা অবমূল্যায়ন।
৪	যাচাই পূর্বক শুধু বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ।	যাচাই ছাড়া পছন্দমত হাদীস গ্রহণ।
৫	কুরআন-হাদীসের বক্তব্য সুনিশ্চিত; দর্শন-যুক্তির প্রমাণে অনিশ্চয়তা আছে। দর্শন ও যুক্তিকে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য দিয়ে যাচাই করতে হবে।	দর্শন-যুক্তির প্রমাণ সুনিশ্চিত; কুরআন-হাদীসের বক্তব্য অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কুরআন-হাদীসের বক্তব্য দর্শন ও যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে হবে।
৬	অনির্ভরযোগ্য ও জাল হাদীস বর্জন।	জাল হাদীস তৈরি বা গ্রহণ।
৭	'আকলী দলীল' বা দার্শনিক যুক্তিকে ওহী দ্বারা যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন।	ওহীকে 'আকলী দলীল' দিয়ে বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করা।
৮	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে কারো নির্ভুলতা বা অভ্রান্ততা নেই। সকলের মতামত ওহী দিয়ে যাচাই করে গ্রহণ-বর্জন করতে হবে।	পরবর্তী অনেকেই ভুলের উর্ধ্বে । তাদের ভুল হতে পারে না। তাদের মতের আলোকে কুরআন-হাদীস গ্রহণ বা ব্যাখ্যা করতে হবে।
৯	ওহী অনুধাবনে সাহাবীগণের অনুসরণ।	সাহাবীগণের গুরুত্ব অস্বীকার।
১০	রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণ যা বলেন নি বা করেন নি তাকে দীনের অংশ না বানানো।	পরবর্তী যুগের ব্যক্তিবর্গের মত ও কর্মকে দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানানো।
১১	উম্মতের- বিশেষত সাহাবীগণের- ইজমা বা ঐকমত্যকে গুরুত্ব দেওয়া।	শুধু স্বপক্ষের আলিমগণের ঐকমত্যকে গুরুত্ব দেওয়া বা ইজমা বলে দাবি করা।

৩. আল্লাহর বিশেষণ কেন্দ্রিক বিভ্রান্তি

প্রথম হিজরী শতকের শেষ থেকে মুসলিম সমাজে ইহূদী, খৃস্টান, পারশিয়ান ও হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটে। এগুলোর প্রভাবে এ সকল ধর্ম থেকে আগত মুসলিমগণ এবং অন্যান্য অনেক মুসলিম আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন এবং অনেকে মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনীয় বলে দাবি করতে থাকেন। এ সময়ে মুসলিম সমাজে এ বিষয়ে নিম্নের তিনটি মত বিদ্যমান ছিল:

(১) মহান আল্লাহর বিশেষণের মানবীয়করণের মতবাদ

(২) মহান আল্লাহর বিশেষণ অস্বীকার করার মতবাদ

(৩) সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও মূলধারার ব্যাখ্যামুক্ত স্বীকৃতির মতবাদ

৩. ১. তুলনাকারী মুশাব্বিহা-মুজাস্সিমা মতবাদ

মুশাব্বিহা অর্থ তুলনাকারী এবং মুজাস্সিমা অর্থ দেহে বিশ্বাসী। এ মতবাদের অনুসারীগণ মহান আল্লাহর বিশেষণ ও কর্ম মানুষেরই মত এবং তিনি মানুষের মত দেহধারী বলে বিশ্বাস করত। সাবাইয়া, বায়ানিয়্যা, মুগীরিয়্যাহ, হিশামিয়্যা ইত্যাদি শীয়া রাফিযী ফিরকার মানুষেরা এরূপ বিশ্বাস করতেন। প্রসিদ্ধ মুফাস্সির আবুল হাসান মুকাতিল ইবন সুলাইমান বালখী (১৫০ হি) এ মতের প্রচারক ছিলেন।[২৭২]

৩. ২. ব্যাখ্যা ও অস্বীকারের জাহমী-মুতাযিলী মতবাদ

জা'দ ইবন দিরহাম (১১৮ হি) নামক একজন নতুন প্রজন্মের পারসিক মুসলিম মহান আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করে তাঁকে 'নির্গুণ' বলে দাবি করতে থাকেন। তার ছাত্র জাহম ইবন সাফওয়ান সামারকান্দী (১২৮ হি)। তিনি এ মতটিকে জোরালোভাবে প্রচার করতে থাকেন এবং এর সাথে অনেক দর্শনভিত্তিক মতবাদ তিনি প্রচার করেন। জাহমের মতবাদ নিম্নরূপ:

(ক) বিশেষণের অস্বীকৃতি। তার মতে যে সকল বিশেষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা কখনো স্রষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। তবে যে বিশেষণগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, যেমন স্রষ্টা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা... ইত্যাদি। কাজেই এ কথা বলা যাবে না যে, মহান আল্লাহ দেখেন, শুনেন, কথা বলেন, দয়া করেন, ক্রোধান্বিত হন, তিনি আরশের উপরে অধিষ্ঠিত, তাঁর হাত, চক্ষু বা মুখমণ্ডল বিদ্যমান, তাঁকে আখিরাতে দেখা যাবে....। কারণ এ সকল বিশেষণ আল্লাহর ক্ষেত্রে আরোপ করলে তাঁর অতুলনীয়ত্ব নষ্ট হয় এবং তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়।

(খ) কুরআন সৃষ্ট। উপরের যুক্তির ভিত্তিতেই তিনি আল্লাহর কথার অনাদিত্ব অস্বীকার করতেন। তার মতে, আল্লাহর কালাম

আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই কখনোই বলা যাবে না যে আল্লাহ কথা বলেছেন, বরং বলতে হবে যে, আল্লাহ কথা সৃষ্টি করেছেন।

(গ) আল্লাহ সর্বস্থানে। বিরোধীরা তাকে বলেন, কোনো বিশেষণই যখন আল্লাহর ক্ষেত্রে আরোপ করা যায় না তাহলে আমরা কিভাবে তাঁকে অনুভব করব? তিনি বলেন: আল্লাহ আত্মা বা বাতাসের মত, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সকল স্থানেই তিনি রয়েছেন।

(ঘ) মারিফাতই সব। তার মতে মারিফাত বা জ্ঞানই ঈমান এবং জাহালত বা অজ্ঞতা-ই কুফর। অন্তরে মারিফাত বা জ্ঞান এসে গেলে মুখে স্বীকারোক্তি বা কর্মের কোনো প্রয়োজন থাকে না। এটি মুরজিয়া মতের ভিত্তি।

(ঙ) মানুষের অক্ষমতা। তিনি প্রচার করতেন যে, মানুষের কোনোরূপ ক্ষমতা নেই। চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি যেমন ইচ্ছাহীনভাবে আবর্তন করে, মানুষও তেমনি ইচ্ছাহীন ক্ষমতাহীন ভাবে কলের পুতুলের মত চলমান।

(ঙ) জান্নাত-জাহান্নামের বিলুপ্তি। তার মতে এগুলোর বিলুপ্তি ঘটবে।[২৭৩]

এ সময়েই মুতাযিলী মতবাদের উদ্ভব হয়। ওয়াসিল ইবন আতা গাজ্জাল (৮০-১৩১ হি), আমর ইবন উবাইদ ইবন বাব (৮০-১৪৪ হি) এবং তাদের ছাত্রগণ এ মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন। জাহমীদের মত তাঁরাও মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করতেন। তাদের বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহর সত্তার অতিরিক্ত কোনো অনাদি-অনন্ত বিশেষণ বা কর্ম (attribute) নেই। শুধু তাঁর অস্তিত্ব ও সত্তাই অনাদি-অনন্ত। তাঁর সকল কর্ম ও বিশেষণ তাঁর সৃষ্টি মাত্র। তাদের মতে, অনাদি-অনন্ত হওয়াই মহান আল্লাহর মূল বিশেষণ। আল্লাহর কোনো বিশেষণকে অনাদি বিশ্বাস করার অর্থ একাধিক অনাদি সত্তায় বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর এ মূল বিশেষণে শরীক করা।

এছাড়া তাদের মতে কুরআনে উল্লেখিত অধিকাংশ বিশেষণ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। আর মহান আল্লাহ অতুলনীয়। এজন্য এ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা করা জরুরী। মহান আল্লাহকে জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। এ সকল বিশেষণ ব্যাখ্যা করতে হবে। বিভিন্নভাবে তারা ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন: আল্লাহ জ্ঞানী অর্থ তিনি মুর্খ নন। কেউ বলেছেন: আল্লাহ জ্ঞানী অর্থ তাঁর সত্তার নাম বা অংশ জ্ঞান...।

আমরা আগেই বলেছি, তাদের মতে আকীদার সত্য জানার জন্য "আকল" (জ্ঞান-বুদ্ধি)-ই একমাত্র সুনিশ্চিত পথ। আকলের নির্দেশনা একীনী অর্থাৎ সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে ওহীর নির্দেশনা যান্নী, অর্থাৎ অস্পষ্ট'। ওহীর নির্দেশনা যদি আকল-সম্মত হয় তাহলে তা গ্রহণ করতে হবে। আর যদি তা না হয় তাহলে তা ব্যাখ্যা করে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তাদের মতে আকল প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ 'জিসম' বা দেহধারী নন। কাজেই কুরআন বা হাদীসে যে সকল বিশেষণ তাঁকে দেহবিশিষ্ট বলে মনে করায় সেগুলি ব্যাখ্যা করা বাধ্যতামূলক। যেমন মহান আল্লাহর হস্ত, চক্ষু, মুখমণ্ডল, কথা বলা, ক্রোধ, ভালবাসা, আরশে সমাসীন হওয়া, আখিরাতে তাঁর দর্শন, ইত্যাদি বিশেষণ। তাদের মতে এগুলো বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা কুফর; কারণ এরূপ বিশ্বাসের অর্থই আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা এবং তাঁকে দেহ বিশিষ্ট বলে বিশ্বাস করা।[২৭৪]

৩. ৩. তুলনা-মুক্ত স্বীকৃতি: সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত

এ দু প্রান্তিক ধারার মাঝে ছিলেন সাহাবীগণের অনুসারী মুলধারার তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ, যাঁরা "আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" নামে পরিচিত। এ বিষয়ে তাঁদের মূলনীতি ছিল যে, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যে সকল বিশেষণ বা কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে তা সবকিছু সরল অর্থে বিশ্বাস করা। যুক্তিতর্ক দিয়ে এগুলোর প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা ও এগুলোকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনা করা যেমন নিষিদ্ধ তেমনি সৃষ্টির সাথে তুলনীয় হওয়ার ভয়ে এগুলো অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করাও নিষিদ্ধ।

তাঁদের মতে গাইবী বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র নিশ্চিত উৎস ওহী। এক্ষেত্রে 'আকল' বা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পূরক ও সহযোগী। ওহীর নিশ্চিত বক্তব্য এ সকল বিশেষণের কথা বলেছে এবং মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিতে এগুলো অবাস্তব, অযৌক্তিক বা অসম্ভব নয়। কাজেই এগুলো সরল অর্থে বিশ্বাস করা আবশ্যক। ব্যাখ্যার নামে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ অস্বীকার করা ওহী অস্বীকারের নামান্তর। ইমাম আযম এ পরিচ্ছেদে বিশেষণ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের এ আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন।

৪. আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আযমের মত

৪. ১. বিভ্রান্তদের স্বরূপ উন্মোচন

ইমাম আযম বিভিন্ন বক্তব্যে মুতাযিলীগণের ইলম কালামের ভয়াবহতা, জাহমের ব্যাখ্যা-তত্ত্ব এবং মুকাতিলের তুলনা-তত্ত্ব বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলতেন:

أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مشبه

"পূর্ব দিক (ইরান-খুরাসান) থেকে দুটি অপবিত্র নোংরা মতবাদ আমাদের নিকট আগমন করেছে: (১) মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো অকার্যকরকারী জাহমের মতবাদ এবং (২) মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনাকারী মুকাতিলের মতবাদ।"[২৭৫]

তিনি আরো বলতেন:

لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس بابا إلى علم الكلام وقاتل الله جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان هذا أفرط فى النفي وهذا أفرط فى التشبيه

"আল্লাহ অভিশপ্ত করুন (মুতাযিলী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা-প্রচারক) আমর ইবন উবাইদকে; কারণ সে মানুষের জন্য ইলম কালামের দরজা খুলেছে; আল্লাহ ধ্বংস করুন জাহম ইবন সাফওয়ানকে ও মুকাতিল ইবন সুলাইমানকে; কারণ একজন অস্বীকারে সীমালজ্ঘন করেছে এবং অন্যজন তুলনায় সীমালজ্ঘন করেছে।"[২৭৬]

ইমাম আবূ হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ সায়িদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমদ নাইসাপূরী (৩৪৩-৪৩২ হি) বলেন, জারূদ ইবন ইয়াযীদ বলেন:

سمعت أبا حنيفة– رضي الله عنه– يقول: نفى جهم، حتى قال: لا شيء، وغضب على التنْزيل، قال: فقال له الجارود: ما تقول أنت رحمك الله؟ قال: أنا أقول كما قال الله تعالى في تنْزيله، ورُوِي عن رسول الله ﷺ

"আমি আবূ হানীফা (রা)-কে বলতে শুনলাম: জাহম (মহান আল্লাহর বিশেষণ) এমনভাবে অস্বীকার করল যে, সে বলল: (মহান আল্লাহ) কিছুই নন। আর সে কুরআনের উপরেও বিরক্ত-ক্রোধান্বিত। জারূদ বলেন, আমি বললাম: আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, আপনার মত কী? তিনি বলেন: আমি তাই বলি যা মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।"[২৭৭]

৪. ২. আল্লাহর গুণাবলির অস্তিত্ব ও অতুলনীয়ত্ব

এ পরিচ্ছেদের শুরুতে উদ্ধৃত 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর বক্তব্যে আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন:

"তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর মত নন। তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান রয়েছেন তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর যাতী (সত্তীয়) ও ফি'লী (কর্মীয়) সিফাতসমূহ-সহ।

মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের মূল বিভ্রান্তি ছিল মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো শব্দগতভাবে মানবীয় বা সৃষ্টিজগতের বিশেষণের মত প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁকে সৃষ্টির মত এবং তাঁর গুণাবলিকে সৃষ্টির মত বলে দাবি করা। এভাবে তারা মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো বিশ্বাস করার নামে তাঁর 'অতুনীয়ত্ব' অবিশ্বাস করেছে। অপরপক্ষে জাহমিয়া-মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মূল বিভ্রান্তি ছিল সৃষ্টির সাথে তুলনীয় হওয়ার অজুহাতে আল্লাহর বিশেষণ ব্যাখ্যার নামে অস্বীকার করা। তাদের মতে মহান আল্লাহর কোনো বিশেষণ স্বীকার করার অর্থই তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। জ্ঞান, ক্ষমতা, কথা, শ্রবণ, দর্শন, হস্ত, মুখমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদির অধিকারী হওয়া, আরশে সমাসীন হওয়া ইত্যাদি সবই মানবীয় বা সৃষ্টজগতের বিশেষণ। মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকে এ সকল বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। মহান আল্লাহর এরূপ বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে তাঁকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, "কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়" সেহেতু আল্লাহর ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষণ আরোপ করা যাবে না। কুরআন-হাদীসের কোনো কথা দ্বারা এরূপ বিশেষণ বুঝা গেলে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। এভাবে তারা "অতুলনীয়ত্ব" প্রমাণের নামে বিশেষণগুলো অস্বীকার করেছে।

পক্ষান্তরে সাহাবীগণ এবং মূলধারার তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মূলনীতি ছিল কুরআন ও হাদীসে মহান আল্লাহর যত বিশেষণ ও কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই সরল অর্থে বিশ্বাস করা। সৃষ্টির সাথে তুলনার অজুহাতে আল্লাহর কোনো বিশেষণ ব্যাখ্যা বা অস্বীকার করা যাবে না। বরং বিশেষণকে সরল অর্থে বিশ্বাস করে তুলনাকে অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন যে, কোনো কিছুই তাঁর তুলনীয় নয়। আবার তিনিই সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এ সকল বিশেষণ তাঁর নিজের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। মুমিনের দায়িত্ব আল্লাহর অতুলনীয়ত্ব ও তাঁর বিশেষণ উভয়কে সমানভাবে বিশ্বাস করা।

মুশাব্বিহা ও জাহমী-মুতাযিলীদের বিশ্বাস দীনের মধ্যে উদ্ভাবিত 'বিদআত' ও কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীত। সাহাবী-তাবিয়ীগণ কখনো কোনো বিশেষণকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করেন নি এবং তুলনার অজুহাতে কোনো বিশেষণকে ব্যাখ্যা করেন নি। কখনো জিজ্ঞাসিত হলে এরূপ ব্যাখ্যার কঠোর বিরোধিতা করেছেন।

এ সকল 'বিদআত' থেকে উম্মাতকে রক্ষা করার জন্য ইমাম আবূ হানীফা আল্লাহর সিফাত (বিশেষণ) বিষয়ক মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর উপরের বক্তব্য থেকে আমরা জানছি যে, আল্লাহর বিশেষণের 'অতুলনীয়ত্ব' ও 'অস্তিত্ব' সমানভাবে বিশ্বাস করতে হবে। উভয় বিষয়কে মেনে নেওয়া 'আকল' বা জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ইমাম আবূ হানীফা বিষয়টি পরবর্তীতে আরো ব্যাখ্যা করবেন।

৪. ৩. আল্লাহর যাতী ও ফি'লী বিশেষণ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: **"তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর যাতী (সত্তীয়) ও ফি'লী (কর্মীয়) সিফাতসমূহ (বিশেষণসমূহ)-সহ। তাঁর সত্তীয় বিশেষণসমূহ: হায়াত (জীবন), কুদরাত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সাম' (শ্রবণ), বাসার (দর্শন) ও ইরাদা (ইচ্ছা)। আর তাঁর ফি'লী সিফাতসমূহের মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টি করা, রিয্ক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত বা বিশেষণ।"**

কুরআন-হাদীসে বর্ণিত মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য পরবর্তী আলিমগণ বিভিন্নভাবে এগুলোকে ভাগ

করেছেন। আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ এগুলোকে দু ভাগে ভাগ করেছেন: 'যাতী' ও 'ফি'লী'। আধুনিক গবেষকগণ নিশ্চিত করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফাই সর্বপ্রথম এ শ্রেণী বিন্যাস করেন।[২৭৮]

'যাত' (الذات) শব্দটির অর্থ self: সত্তা, স্বকীয় ব্যক্তিত্ব, অহং ইত্যাদি। 'যাতী সিফাত' অর্থ সত্তীয় বিশেষণ। মহান আল্লাহর যে সকল সিফাত বা বিশেষণ তাঁর সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে ও চিরন্তনরূপে বিদ্যমান সেগুলিকে যাতী সিফাত বা সত্তাগত বিশেষণ (Attributes of essence) বলা হয়। 'ফি'ল (الفعل) শব্দটির অর্থ ক্রিয়া বা কর্ম (action, work, performance, doing)। ফি'লী সিফাত অর্থ কর্মীয় বিশেষণ বা কর্মগত বিশেষণ। মহান আল্লাহর যে সকল সিফাত বা বিশেষণ তাঁর ইচ্ছায় কর্মে পরিণত হয় সেগুলি ফি'লী সিফাত বা কর্মগত বিশেষণ।[২৭৯]

ইমাম আযম এখানে ৭টি যাতী সিফাত উল্লেখ করেছেন: (১) হায়াত (জীবন), (২) কুদরাত (ক্ষমতা), (৩) ইলম (জ্ঞান), (৪) কালাম (কথা), (৫) সাম' (শ্রবণ), (৬) বাসার (দর্শন) ও (৭) ইরাদা (ইচ্ছা)। আমরা দেখব যে, তিনি তাঁর 'আল- ফিকহুল আকবার' ও 'আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থে অন্যান্য যে সকল যাতী সিফাত উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে: (৮) উলুও (العلو) অর্থাৎ ঊর্ধ্বত্ব বা উর্দ্ধে অবস্থান, (৯) ইয়াদ (اليد): হস্ত, (১০) আল-ওয়াজহ (الوجه): মুখমণ্ডল ও (১১) নাফস (النفس): সত্তা।

ইমাম আযম এখানে ৫টি ফি'লী সিফাত উল্লেখ করেছেন: (১) সৃষ্টি করা, (২) রিয্ক প্রদান করা, (৩) নবসৃষ্টি করা, (৪) উদ্ভাবন করা ও (৫) তৈরি করা। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, তিনি তাঁর বিভিন্ন বইয়ে আরো যে সকল ফি'লী সিফাত উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে: (৬) ইসতিওয়া (الاستواء) বা আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া, (৭) নুযূল (النزول) বা অবতরণ করা, (৮) গাদাব (الغضب) বা ক্রোধ, (৯) রিদা (الرضا) সন্তুষ্টি, (১০) মহব্বত (المحبة) ভালবাসা, ইত্যাদি। পরবর্তীতে আমরা এ সকল সিফাত বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আমরা সহজেই যাতী (সত্তীয়) ও ফি'লী (কর্মীয়) বিশেষণের পার্থক্য বুঝতে পারি। কর্মীয় বিশেষণগুলো মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, রিযক দেন, আরশে অধিষ্ঠিত হন, অবতরণ করেন, ক্রোধান্বিত হন, সন্তুষ্ট হন বা ভালবাসেন। এগুলো বিশেষণ হিসেবে অনাদি ও চিরন্তন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছায় কর্মে পরিণত হয় নতুনভাবে। এগুলো তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। তিনি কখনো ক্রোধান্বিত হতে পারেন এবং কখনো ক্রোধমুক্ত থাকতে পারেন।

পক্ষান্তরে যাতী বা সত্তীয় বিশেষণ তদ্রূপ নয়। এগুলি কখনোই তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। আমরা বলতে পারি যে, মহান আল্লাহ যখন ইচ্ছা ক্রোধান্বিত হন এবং যখন ইচ্ছা ক্রোধ বিহীন থাকেন। কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে, তিনি যখন ইচ্ছা ক্ষমতাবান হন এবং যখন ইচ্ছা ক্ষমতাহীন হন। সকল বিশেষণই এরূপ।

কিছু বিশেষণ 'যাতী" (সত্তীয়) এবং 'ফি'লী' (কর্মীয়) হতে পারে, যেমন মহান আল্লাহর কালাম বা কথার বিশেষণ।

৪. ৪. আল্লাহর বিশেষণ অনাদি, চিরন্তন ও অসৃষ্ট

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন: **"তিনি তাঁর গুণাবলি এবং নামসমূহ-সহ অনাদি-রূপে বিদ্যমান। তাঁর নাম ও বিশেষণের মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা পরিবর্তন ঘটে নি। তিনি অনাদিকাল থেকেই তাঁর জ্ঞানে জ্ঞানী এবং জ্ঞান অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতা অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই তাঁর কথায় কথা বলেন এবং কথা অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি করা অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই তাঁর কর্মে কর্মী, কর্ম অনাদিকাল থেকে তাঁর বিশেষণ। আল্লাহ তাঁর কর্ম দিয়ে যা সৃষ্টি করেন তা সৃষ্ট, তবে আল্লাহর কর্ম সৃষ্ট নয়। তাঁর সিফাত বা বিশেষণাবলি অনাদি। কোনো বিশেষণই নতুন বা সৃষ্ট নয়। যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহর কোনো সিফাত বা বিশেষণ সৃষ্ট অথবা নতুন, অথবা এ বিষয়ে সে কিছু বলতে অস্বীকার করে, অথবা এ বিষয়ে সে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে আল্লাহর প্রতি ঈমানবিহীন কাফির।"**

কুরআন-হাদীসে উল্লেখকৃত আল্লাহর সকল বিশেষণ সরল অর্থে বিশ্বাস করার আরেকটি দিক এগুলোর অনাদিত্বে বিশ্বাস করা। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও মূলধারার মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ অনাদিকাল থেকেই তাঁর সকল বিশেষণে বিশেষায়িত। তিনি সকল বিশেষণসহই অনাদি ও চিরন্তন। তিনি অনাদিকাল থেকেই তাঁর সকল নাম ও বিশেষণ নিয়ে বিদ্যমান, তবে তাঁর নাম ও গুণাবলি সৃষ্টির কাছে প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে।

পক্ষান্তরে মুতাযিলী ও জাহমীগণ যেহেতু মহান আল্লাহর সত্তার অতিরিক্ত কোনো অনাদি-অনন্ত বা চিরন্তন গুণ আছে বলে স্বীকার করতেন না সেহেতু তারা দাবি করতেন যে, মহান আল্লাহর যে সকল বিশেষণ কুরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি মূলত তাঁর সৃষ্ট 'মাখলূক' মাত্র, তাঁর নিজস্ব কোনো চিরন্তন বিশেষণ নয়। অনাদিকালে তাঁর কোনো 'বিশেষণ' ছিল না। যখন তিনি সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর জন্য 'সৃষ্টিকর্তা' নামক বিশেষণটি জন্ম নিল। 'সৃষ্টিকর্তা' নামটি তখন থেকে তাঁর জন্য প্রযোজ্য। এ নামটি তাঁরই একটি সৃষ্টি মাত্র। 'কথা বলা' অনাদিকাল থেকে তাঁর 'বিশেষণ' নয়; অনাদিকালে তিনি 'নির্গুণ' ছিলেন। তিনি যখন শ্রবণের মত প্রাণী সৃষ্টি করলেন তখন তিনি কথা সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর কথা তারা শুনলো। কথা তাঁর বিশেষণ নয়, তাঁর সৃষ্টি মাত্র। তাঁর সকল বিশেষণই তাঁরা এভাবে ব্যাখ্যা

করেন। তারা দাবি করেন যে, মহান আল্লাহর কোনো অনাদি চিরন্তন বিশেষণ নেই; তাঁর নাম ও বিশেষণগুলো পরবর্তীকালে সৃষ্ট।

তাদের এরূপ বিশ্বাসের একটি বড় কারণ ছিল গ্রীক দর্শনভিত্তিক খৃস্টধর্মীয় বিশ্বাস। মহান আল্লাহ ঈসা (আ)-কে তাঁর 'বাক্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন; কারণ পিতামাতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ভাবে তাঁকে সৃষ্টি না করে তিনি তাঁকে 'কুন' বা 'হও' বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, আল্লাহর 'কালিমা' অর্থাৎ কথা বা বাক্য যেহেতু তাঁর অনাদি বিশেষণ, সেহেতু ঈসা (আ) আল্লাহর মতই অনাদি ও চিরন্তন। তিনি অনাদিকাল থেকে আল্লাহর সাথে বিরাজমান ছিলেন এবং মানব রূপ ধারণ করে বা মানব রূপের সাথে মিশ্রিত হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন। মুসলিমগণ যখন গ্রীক দর্শন অধ্যয়ন শুরু করেন তার আগেই খৃস্টান পণ্ডিতগণ তাদের এ উদ্ভট আকীদা theory of Logos বা 'বাক্যতত্ত্ব' নামে গ্রীক দর্শনের সাথে মিশ্রিত করেছেন। মুতাযিলী পণ্ডিতগণ মহান আল্লাহর সাথে শিরকের এ পথ বন্ধ করার জন্য দার্শনিক যুক্তিতর্ক দিয়েই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন যে, মহান আল্লাহর কোনো বিশেষণই অনাদি বা চিরন্তন নয়, বরং সবই তাঁর সৃষ্টি।

তাঁদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, বাস্তবে তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হন। তারা ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে একটি 'বিদআত' বা নব-উদ্ভাবিত বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটান যা কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বিশ্বাসের মধ্যে ছিল না। সর্বোপরি এরূপ বিশ্বাস কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। মহান আল্লাহর বিশেষণকে সৃষ্ট বলে দাবি করার অর্থ তাঁর অনাদি-অনন্ত ও চিরন্তন পূর্ণতাকে অস্বীকার করা। মহান আল্লাহ তাঁর সকল বিশেষণ ও কর্মসহ অনাদি ও চিরন্তন। আর তিনি তাঁর বিশেষণ বা কর্মের দ্বারা যা সৃষ্টি করেন তা সৃষ্ট। কাজেই মহান আল্লাহর 'কালিমা' বা বাক্য অনাদি হলেও বাক্য দ্বারা সৃষ্ট ঈসা (আ) অনাদি নন। বিষয়টি এভাবে অনুধাবন করলেই মহান আল্লাহর চিরন্তন পূর্ণতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একাধিক অনাদি সত্তায় বিশ্বাসের শিরক অপনোদন হয়।

লক্ষণীয় যে, গ্রীক দর্শনের অনুপ্রবেশই খৃস্টধর্মকে বিকৃত করে। সাধু পলের উদ্ভাবিত দর্শনভিত্তিক এ আকীদা বাদ দিয়ে যদি খৃস্টানগণ প্রচলিত চার ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান মহান আল্লাহর বক্তব্য ও ঈসা মাসীহের বক্তব্যের কাছে আত্মসমর্পন করতেন তবে তারাও এ সকল শিরক থেকে রক্ষা পেতেন। বর্তমানে প্রচলিত ও বহুভাবে বিকৃত চার-ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান এ সকল বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ঈসা মাসীহ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, তিনি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর অবতার বা আল্লাহর কোনো বিশেষণের দেহরূপ হওয়া তো অনেক দূরের কথা, কোনো গাইবী ইলম বা মানুষকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর নেই। ঈসা মাসীহের নামে অতিভক্তিতে মুক্তি মিলবে না, বরং তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস ও শরীয়ত পালনই মুক্তির একমাত্র পথ।[২৮০]

৫. আল্লাহর কালাম বা কথা

জাহমী-মুতাযিলীগণ আল্লাহর কথাকে সৃষ্ট বলে দাবি করতেন। তারা বলতেন, আল্লাহ কথা বলেন না, তিনি কথা সৃষ্টি করেন। কুরআনও আল্লাহর একটি সৃষ্টি। কথা বলা সৃষ্টির কর্ম। আল্লাহ কথা বলেন বললে তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। আল্লাহ বলেছেন "কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়"[২৮১], কাজেই তিনি কথা বলেন বলে বিশ্বাসকারী কুরআনের এ আয়াত অবিশ্বাস করার কারণে কাফির বলে গণ্য।

কুরআনে বারবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহর কথা বলার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ নিজের বিষয়ে বা তাঁর রাসূল (ﷺ) তাঁর বিষয়ে যে বিশেষণ উল্লেখ করেছেন তা আল্লাহর পবিত্রতার অজুহাতে ব্যাখ্যা করে বাতিল করার অর্থ আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) কথা অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করা এবং নিজেকে তাঁদের চেয়েও বুদ্ধিমান ও ধার্মিক বলে দাবি করা। আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের বিশেষণটি যেমন কুরআন থেকে জানা যায়, তেমনি তাঁর কথা বলার বিশেষণটিও কুরআন থেকে জানা যায়। কোনো একটিকে গ্রহণ করতে অন্যটিকে ব্যাখ্যা করে বাতিল করার অর্থ নিজের বুদ্ধিকে ওহী গ্রহণ বা বর্জনের মানদণ্ড বানানো। আর এটিই বিভ্রান্তির কারণ।

এজন্য মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ একমত যে, 'কালাম' বা 'কথা বলা' আল্লাহর অনাদি বিশেষণসমূহের একটি। কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তা সৃষ্ট নয়, বরং তা স্রষ্টার একটি বিশেষণ। আমরা দেখেছি, এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন:

কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম, মুসহাফগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ, হৃদয়গুলোর মধ্যে সংরক্ষিত, জিহ্বাসমূহ দ্বারা পঠিত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরে অবতীর্ণ। কুরআন পাঠে আমাদের জিহ্বার উচ্চারণ সৃষ্ট, কুরআনের জন্য আমাদের লিখনি সৃষ্ট, আমাদের পাঠ সৃষ্ট, কিন্তু কুরআন সৃষ্ট নয়। মহান আল্লাহ কুরআনের মধ্যে মূসা (আ) ও অন্যান্য নবী (আ) থেকে এবং ফিরাউন এবং ইবলীস থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তা সবই আল্লাহর কালাম (কথা), তাদের বিষয়ে সংবাদ হিসেবে। আল্লাহর কথা সৃষ্ট নয়, মূসা (আ) ও অন্য সকল মাখলূকের কথা সৃষ্ট। কুরআন আল্লাহর কথা কাজেই তা অনাদি, মাখলূকগণের কথা সেরূপ নয়। মূসা (আ) আল্লাহর কথা শুনেছিলেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "মূসার সাথে আল্লাহ প্রকৃত বাক্যালাপ করেছিলেন"[২৮২] মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলার আগেই- অনাদিকাল থেকেই- মহান আল্লাহ তাঁর কালাম বা কথার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন, যেমন সৃষ্টজগত সৃষ্টি করার পূর্বেই- অনাদিকাল

থেকেই- তিনি সৃষ্টিকর্তার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন। "কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[২৮৩] যখন তিনি মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেন তখন তিনি তাঁর সেই অনাদি বিশেষণ কথার বিশেষণ দ্বারা কথা বলেন। তাঁর সকল বিশেষণই মাখলূকদের বা সৃষ্টপ্রাণীদের বিশেষণের ব্যতিক্রম। তিনি জানেন, তবে তাঁর জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে তাঁর ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। তিনি দেখেন, তবে তাঁর দেখা আমাদের দেখার মত নয়। তিনি কথা বলেন, তবে তাঁর কথা বলা আমাদের কথা বলার মত নয়। তিনি শুনেন, তবে তাঁর শোনা আমাদের শোনার মত নয়। আমরা বাগযন্ত্র ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলি, আর মহান আল্লাহ বাগযন্ত্র এবং অক্ষর ছাড়াই কথা বলেন। অক্ষরগুলি সৃষ্ট। আর আল্লাহর কথা (কালাম) সৃষ্ট নয়।"

এখানে তিনি যে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(১) কুরআন আল্লাহর কালাম, যা তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ করেন। কুরআন "মুসহাফ" বা গ্রন্থরূপ কুরআনের মধ্যে লিপিবদ্ধ, মুমিনদের অন্তরে মুখস্ত এবং মুমিনদের জিহ্বা দ্বারা পঠিত।

(২) কুরআন পাঠকারীর পাঠ বা উচ্চারণ তার নিজের কর্ম এবং তা মানবীয় কর্ম হিসেবে আল্লাহর সৃষ্ট। তবে কুরআন অনাদি ও অসৃষ্ট।

(৩) কুরআনে অনেক মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ সকল সৃষ্টি যে কথা পৃথিবীতে বলেছিলেন তা সৃষ্টির বক্তব্য হিসেবে সৃষ্ট। তবে মহান আল্লাহ তাঁর অনাদি বিশেষণে তাঁদের বিষয়ে যা বলেছেন তা সবই তাঁর অনাদি বিশেষণের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) মহান আল্লাহ তাঁর নবী মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেন এবং সে কথা মূসা (আ) শ্রবণ করেন।

(৫) আল্লাহর সকল বিশেষণই মাখলূকের বিশেষণের ব্যতিক্রম ও অতুলনীয়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ اللهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلاَ كَيْفِيَّةٍ قَوْلاً وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَحْياً وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى بِالْحَقِيْقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ كَكَلاَمِ الْبَرِيَّةِ. فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلاَمُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. وَقَدْ ذَمَّهُ اللهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: "سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ". فَلَمَّا أَوْعَدَ اللهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: "إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ" عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ وَلاَ يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ.

"আর নিশ্চয় কুরআন আল্লাহর কথা। কোনোরূপ স্বরূপ বা কিরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে কথা হিসেবে তাঁর থেকেই প্রকাশিত ও উদ্ভূত, তিনি তা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর উপরে ওহীরূপে অবতীর্ণ করেছেন। আর মুমিনগণ তা সুনিশ্চিত সত্যরূপে বিশ্বাস ও গ্রহণ করেছেন এবং তারা সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেছেন যে, তা প্রকৃত ও আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর কালাম। তা সৃষ্টির কথার মত সৃষ্ট নয়। কাজেই যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে তা মানুষের কথা, সে কাফির। আর এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন এবং জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন: 'অচিরেই আমি তাকে সাকার-জাহান্নামে প্রবিষ্ট করব'। যে ব্যক্তি কুরআনের বিষয়ে বলে যে 'এটি মানুষের কথা মাত্র'[২৮৪] আল্লাহ তার এ পরিণতির কথা বলেছেন। এ থেকে আমরা জানলাম ও সুদৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হলাম যে, কুরআন মানুষের কথা নয়, মানুষের স্রষ্টার কথা।"[২৮৫]

ইমাম তাহাবী আরো বলেন:

ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين. نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين... ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.

"আমরা আল্লাহ্‌র সত্ত্বা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না। আমরা পবিত্র কুরআনে ব্যাপারে কোন বিতর্ক-বাদানুবাদে জড়িত হই না। আমরা একথার সাক্ষ্য প্রদান করি যে, তা নিখিল বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালকের বাণী, রূহুল আমীন জিবরাঈল (আ) তা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতঃপর তিনি নবীদের নেতা মুহাম্মদ ﷺ-কে তা শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন মহান আল্লাহর কালাম। সৃষ্টিজগতের কোন কালাম এর সমকক্ষ হতে পারে না। "কুরআন সৃষ্ট" এমন মন্তব্য আমরা করি না এবং আমরা এ ব্যাপারে মুসলিম জামা'আতের বিরুদ্ধাচারণ করি না। ... যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট সে সম্বন্ধে আমরা বলি: "আল্লাহই এ বিষয়ে সর্বাধিক জানেন।"[২৮৬]

৬. আল্লাহর হস্ত, মুখমণ্ডল, সত্তা, ক্রোধ, সন্তুষ্টি

এ পরিচ্ছেদের শুরুতে ইমাম আযমের বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে: **"তিনি 'শাইউন': 'বস্তু' বা 'বিদ্যমান অস্তিত্ব', তবে অন্য কোনো সৃষ্ট 'বস্তু' বা 'বিদ্যমান বিষয়ের' মত তিনি নন। তাঁর 'শাইউন'- 'বস্তু' হওয়ার অর্থ তিনি বিদ্যমান অস্তিত্ব, কোনো দেহ, কোনো জাওহার (মৌল উপাদান) এবং কোনো 'আরায' (অমৌল উপাদান) ব্যতিরেকেই। তাঁর কোনো সীমা নেই, বিপরীত নেই, সমকক্ষ নেই, তুলনা নেই। "অতএব তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।" তাঁর ইয়াদ (হাত) আছে, ওয়াজহ (মুখমণ্ডল) আছে, নফস (সত্তা) আছে, কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলো উল্লেখ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ যা কিছু উল্লেখ করেছেন, যেমন মুখমণ্ডল, হাত, নফস ইত্যাদি সবই তাঁর বিশেষণ, কোনো 'স্বরূপ' বা প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর ক্ষমতা অথবা তাঁর নিয়ামত। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর বিশেষণ বাতিল করা। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের রীতি। বরং তাঁর হাত তাঁর বিশেষণ, কোনো স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে। তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর দুটি বিশেষণ, আল্লাহর অন্যান্য বিশেষণের মতই, কোনো 'কাইফ' বা 'কিভাবে' প্রশ্ন করা ছাড়াই।"**

এ বক্তব্যে তিনি মহান আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছেন:

৭. আল্লাহর সিফাত: অস্তিত্ব, স্বরূপ ও তুলনা

আল্লাহর বিশেষণসমূহের বিষয়ে মুশাব্বিহা ও জাহমী সম্প্রদায়ের প্রান্তিকতার বিষয় আমরা জেনেছি। মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের যুক্তি নিম্নরূপ: (১) কুরআন-হাদীসের বক্তব্য অনুসারে মহান আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, অবস্থান, হস্ত, চক্ষু, মুখমণ্ডল ইত্যাদি বিদ্যমান। (২) মানুষের মধ্যেও এগুলো বিদ্যমান (৩) এ সকল বিশেষণের স্বরূপ ও প্রকৃতি আল্লাহর ক্ষেত্রেও অবশ্যই মানুষের মতই। (৪) কাজেই মহান আল্লাহ মানুষের মতই দেহধারী এবং বিশেষণধারী। তারা 'কোনো কিছুই আল্লাহর মত নয়' মর্মের আয়াতগুলিকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন।

জাহমিয়্যাহ-মু'তাযিলাদের যুক্তি নিম্নরূপ: (১) মানুষের শ্রবণ, দর্শন, হস্ত, চক্ষু, মুখমণ্ডল ইত্যাদি রয়েছে। (২) এ সকল বিশেষণের স্বরূপ আল্লাহর ক্ষেত্রেও অবশ্যই মানুষের মতই হতে হবে। (৩) আল্লাহর এ সকল বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করার একমাত্র অর্থ তাঁকে মানুষের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করা। (৪) আল্লাহর অতুলনীয়ত্ব সমুন্নত রাখতে এ সকল বিশেষণ অস্বীকার, ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থে বিশ্বাস করা ফরয।

তাদের মতে আল্লাহর হাত অর্থ আল্লাহর ক্ষমতা বা নিয়ামত। আল্লাহর মুখমণ্ডল অর্থ আল্লাহর অস্তিত্ব বা সত্তা। ক্রোধ ও সন্তুষ্টি মানসিক পরিবর্তন, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বুঝায়। মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য নয়। আল্লাহর ক্রোধ অর্থ শাস্তির ইচ্ছা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্থ পুরস্কারের ইচ্ছা.... ইত্যাদি। এভাবে তারা আল্লাহর 'অতুলনীয়ত্বে' বিশ্বাস করার নামে আল্লাহর ওহীকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা ব্যাখ্যা করেন নি, তা ব্যাখ্যা করাকে তারা দীনের জন্য জরুরী বানিয়েছে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য সরল অর্থে বিশ্বাস করাকে কুফরী বলে দাবি করেছে!

সাহাবীগণ ওহীর এ সকল নির্দেশনা সরল অর্থে বিশ্বাস করেছেন। তাঁরা ওহীর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য কল্পনা করেন নি। কারণ আল্লাহর বিশেষণকে সৃষ্টজীবের বিশেষণের সাথে তুলনা করলেই বৈপরীত্যের কল্পনা আসে। ওহীর উভয় শিক্ষাকে আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করলে কোনো বৈপরীত্য থাকে না। এ মতের যুক্তি নিম্নরূপ:

(১) আল্লাহর বিশেষণ ও অতুলনীয়ত্ব উভয়ই ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত বিষয়। (২) বিশেষণের প্রকৃতি ও স্বরূপ অজ্ঞাত। (৩) অজ্ঞাত বিষয়ের অজুহাতে ওহীর জ্ঞাত বিষয় ব্যাখ্যা বা অস্বীকার করার অর্থ ওহীকে অস্বীকার করা। (৪) এজন্য অজ্ঞাত বিষয়কে অজ্ঞাত রেখে বিশেষণ ও অতুলনীয়ত্ব উভয় জ্ঞাত বিষয় বিশ্বাস করতে হবে।

মহান স্রষ্টার জন্য তাঁর মর্যাদার সাথে সুসমঞ্জস ও সৃষ্টির সাথে অতুলনীয় হস্ত, মুখমণ্ডল, সত্তা, ক্রোধ, সন্তুষ্টি ইত্যাদি বিশেষণ থাকা মানবীয় বুদ্ধির সাথে কোনোভাবেই সাংঘর্ষিক নয়। যেহেতু তাঁর সৃষ্টির সাথে অতুলনীয় অস্তিত্ব আছে কাজেই তাঁর অস্তিত্বের সাথে সুসমঞ্জস অতুলনীয় বিশেষণাদি থাকাই স্বাভাবিক। আহলুস সুন্নাত এক্ষেত্রে দুটি মূলনীতি অনুসরণ করেছেন: (ক) ওহীর বক্তব্য বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা এবং (খ) সাহাবীগণের অনুসরণ করা। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফার উপরের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ শাইখ আহমদ ইবন মুহাম্মাদ মাগনীসাবী (১০০০ হি) বলেন:

أصلها معلوم ووصفها مجهول لنا، فلا يبطل الأصل المعلوم بسبب التشابه والعجز عن إدراك الوصف... قال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي في أصول الفقه: وكذلك إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه، ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف. وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه؛ فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات

"এ সকল বিশেষণের মূল অর্থ জ্ঞাত কিন্তু এগুলোর বিবরণ বা ব্যাখ্যা আমাদের অজ্ঞাত। জ্ঞাত মূল বিষয়টি বিবরণের অস্পষ্টতা বা তা জানতে অক্ষম হওয়ার কারণে বাতিল করা যায় না। ইমাম ফাখরুল ইসলাম আলী (ইবন মুহাম্মাদ) বাযদাবী (৪৮২ হি) 'উসূলুল

ফিকহ' গ্রন্থে বলেন: হাত ও মুখমণ্ডল বিশ্বাস করা আমাদের নিকট তার মূল অর্থে জ্ঞাত কিন্তু তার বিবরণে দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্ট। বিবরণ জানতে অক্ষমতার কারণে মূল বিষয় বাতিল করা বৈধ নয়। এ দিক থেকেই মুতাযিলীগণ বিভ্রান্ত হয়েছে। বিবরণ বা ব্যাখ্যা না জানার কারণে তারা মূল বিষয়ই প্রত্যাখ্যান করেছে।"[২৮৭]

মুতাযিলা-জাহমিয়াগণ সাধারণত আহলুস্ সুন্নাত-কে মুশাব্বিহা (তুলনাকারী) বা মুজাসসিমা (দেহেবিশ্বাসী) বলে অপবাদ দেন। তাদের দাবি, মহান আল্লাহর হাত, মুখমণ্ডল, চক্ষু, আরশের ঊর্ধ্বে থাকা ইত্যাদির কথা কুরআন-হাদীসে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে বিশ্বাস করার অর্থই তাঁকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা এবং তাঁকে 'দেহবিশিষ্ট' বলে দাবী করা। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন যে, আহলুস সুন্নাত এগুলোকে বিশেষণ হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, এগুলো কোনোভাবে সৃষ্টির কোনো বিশেষণের সাথে তুলনীয় নয়। এগুলোর প্রকৃতি আমরা জানি না এবং জানতে চেষ্টা করি না। তাঁরা তুলনা অস্বীকার করেন, কারণ আল্লাহ তুলনা অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁরা তুলনা অস্বীকারের নামে মূল বিশেষণ অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করেন না, কারণ মহান আল্লাহই এ সকল বিশেষণ উল্লেখ করেছেন। তাঁকে কি বিশেষণে বিশেষিত করলে তাঁর মর্যাদা রক্ষা হয় তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৮. মহান আল্লাহর আরো দুটি বিশেষণ

৮. ১. আরশের উপর ইসতিওয়া

উপরে ইমাম আযম আল্লাহর কথা, হাত, মুখমণ্ডল, ইত্যাদি বিশেষণ আলোচনা করেছেন। মহান আল্লাহর আরেকটি বিশেষণ আরশের উপর অধিষ্ঠান। কুরআনে সাত স্থানে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর 'ইসতিওয়া' করেছেন।[২৮৮] আরবীতে কোনো কিছুর উপর 'ইসতিওয়া' অর্থ তার ঊর্ধ্বে অবস্থান (rise over, mount, settle)। সালাতের নিষিদ্ধ সময় বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন প্রশ্নকারীকে বলেন:

حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلاَةَ

"(সালাত বৈধ থাকবে) যতক্ষণ না সূর্য তোমার মাথার উপরে তীরের মত ইসতিওয়া (ঊর্ধ্বে অবস্থান) করবে। যখন সূর্য তোমার মাথার উপর তীরের মত ইসতিওয়া (ঊর্ধ্বে অবস্থান) করবে তখন সালাত পরিত্যাগ করবে।"[২৮৯] আমরা এ বইয়ে 'ইসতিওয়া'-র অনুবাদে উপরে অবস্থান বা অধিষ্ঠান শব্দ ব্যবহার করব, ইনশা আল্লাহ।

জাহমী-মুতাযিলীগণ এ বিশেষণ অস্বীকার করেছেন। তারা দাবি করেন, আরশের উপরে অধিষ্ঠান বা স্থিতি গ্রহণ কোনোভাবেই মহান আল্লাহর বিশেষণ হতে পারে না; কারণ মহান আল্লাহর জন্য এভাবে অবস্থান পরিবর্তন বা কোনো কিছুর উপরে স্থিতি গ্রহণের মত মানবীয় কর্ম অশোভনীয় এবং তাঁর অতুলনীয়ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। এছাড়া মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি বান্দার সাথে ও নিকটে।[২৯০] কাজেই তিনি আরশের উপর থাকতে পারেন না। বরং তাঁরা দাবি করেন যে, মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান; তাঁকে কোনো স্থান বা দিকে সীমাবদ্ধ করা তাঁর অতুলনীয়ত্বের পরিপন্থী। তারা দাবি করেন, আরশে অধিষ্ঠান গ্রহণের অর্থ আরশের নিয়ন্ত্রণ, দখল বা ক্ষমতা গ্রহণ।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকেই তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী ইমামগণ এবং পরবর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ জাহমীগণের এ মত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং একে কুরআন অস্বীকার বলে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে তাঁরা উপরের মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। মহান আল্লাহর আরশের উপরে অবস্থান বা আরশের ঊর্ধ্বে থাকার বিশেষণটি কুরআন ও হাদীস দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত। তবে এর প্রকৃতি ও স্বরূপ অজ্ঞাত। অজ্ঞাতকে অজ্ঞাত রেখে কুরআনের অন্যান্য বক্তব্যের ন্যায় এ বক্তব্যও স্বীকার ও বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য জরুরী। তাঁরা বলেন: মহান আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন। তাঁর এ অধিষ্ঠান বা অবস্থানের স্বরূপ আমরা জানি না এবং জানতে চেষ্টাও করি না। বরং বিশ্বাস করি যে, তাঁর এ অধিষ্ঠান কোনোভাবেই কোনো সৃষ্টির বিশেষণ বা কর্মের মত নয়। তাঁর অতুলনীয়ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান তিনি গ্রহণ করেন।

যখন মানুষ কল্পনা করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মতই; তিনি একই সাথে আরশের উপরে এবং বান্দার নিকটবর্তী হতে পারেন না- তখনই কুরআনের এ দুটি নির্দেশনার মধ্যে বৈপরীত্য আছে বলে কল্পনা হয়। মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহান আল্লাহ সৃষ্টির মত নন। কাজেই নৈকট্য ও ঊর্ধ্বত্ব উভয়কে সমানভাবে বিশ্বাস করে এর স্বরূপ ও প্রকৃতি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করলে কুরআনের সকল নির্দেশনা বিশ্বাস ও মান্য করা হয়। আর নৈকট্যের অজুহাতে তাঁকে সর্বত্র বিরাজমান বলে দাবি করলে, তিনি কোথায় আছেন তা জানি না বলে দাবি করলে, আরশ কোথায় তা জানি না বলে দাবি করলে বা তাঁর আরশের উপর অধিষ্ঠানের আয়াতগুলো ব্যাখ্যার নামে অস্বীকার করলে কুরআন ও হাদীসের অগণিত বক্তব্য অস্বীকার করা হয়, যা কুফরীর নামান্তর।

ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'ওসীয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন:

نُقِرُّ بِأَنَّ اللهَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْحَافِظُ لِلْعَرْشِ وَغَيْرِ الْعَرْشِ، فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ لَمَا قَدِرَ عَلَى إِيْجَادِ الْعَالَمِ وَتَدْبِيْرِهِ كَالْمَخْلُوْقِين، وَلَوْ صَارَ مُحْتَاجاً إِلَى الْجُلُوْسِ وَالْقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ أَيْنَ كَانَ اللهُ تَعَالَى؟ فَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيْراً.

"আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন, আরশের প্রতি তাঁর কোনোরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং আরশের উপরে স্থিরতা-উপবেশন ব্যতিরেকে। তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষক। তিনি যদি আরশের মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে বিশ্ব সৃষ্টি করতে ও পরিচালনা করতে পারতেন না, বরং তিনি মাখলূকের মত পরমুখাপেক্ষী হতেন। আর যদি তাঁর আরশের উপরে উপবেশন করার প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? কাজেই আল্লাহ এ সকল বিষয় থেকে পবিত্র ও অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।"[২৯১]

ইমাম আযমের এ বক্তব্য উল্লেখ করে মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন: "এ বিষয়ে ইমাম মালিক (রাহ) খুবই ভাল কথা বলেছেন। তাঁকে আল্লাহর আরশের উপরে ইসিতিওয়া বা অধিষ্ঠান বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন:

اَلِاسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ

"ইসতিওয়া বা অধিষ্ঠান পরিজ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত এবং এ বিষয় বিশ্বাস করা জরুরী।"[২৯২]

ইমাম সায়িদ নাইসাপূরী হানাফী বলেন:

حكي عن أبي حنيفة ﷺ في رسالته إلى مقاتل بن سليمان جواب كتابه، في فصل منها: وأما قوله تعالى على العرش استوى حقا، فإنّما ننتهي من ذلك إلى ما وصف كتابُ ربنا في قوله تعالى {ثم استوى على العرش}، وتَعْلَمَنَّ أنه كما قال، ولا ندعي في استوائه على العرش علما، ونزعم أنه قد استوى، ولا يشبه استواؤه باستواء الخلق، فهذا قولنا في الاستواء على العرش.

"ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত, তিনি (তাঁর সমসাময়িক দেহে বিশ্বাসী মুফাস্সির) মুকাতিল ইবন সুলাইমান (১৫০ হি)-এর পত্রের উত্তরে লেখা তাঁর পত্রের একটি অনুচ্ছেদে লিখেন: 'মহান আল্লাহ বলেছেন: তিনি আরশের উপর ইসিতওয়া (অধিষ্ঠান বা অবস্থান) গ্রহণ করেছেন। সত্যই তিনি তা করেছেন। আমাদের রবের কিতাব এ বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন সেখানেই আমরা থেমে যাই। আল্লাহ বলেছেন: 'অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ করলেন।' আপনি নিশ্চিত জানুন যে, তিনি যা বলেছেন বিষয়টি তা-ই। আমরা তাঁর অধিষ্ঠান বিষয়ে কোনো জ্ঞানের দাবি করি না। আমরা মনে করি তিনি অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর অধিষ্ঠান সৃষ্টির অধিষ্ঠানের অনুরূপ বা তুলনীয় নয়। আরশের উপর অধিষ্ঠানের বিষয়ে এটিই আমাদের বক্তব্য।"[২৯৩]

আমরা বলেছি, মহান আল্লাহর আরশের ঊর্ধ্বে থাকা অস্বীকার করার জন্য জাহমী-মুতাযিলীগণ তাঁর নৈকট্য বিষয়ক আয়াতগুলোকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে দাবি করতেন যে, তিনি আত্মার মত বা বাতাসের মত। আত্মা যেমন দেহের সর্বত্র বিদ্যমান এবং বাতাস যেমন পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান তেমনি মহান আল্লাহ সৃষ্টি জগতের সর্বত্র বিরাজমান। এভাবে তাঁরা আল্লাহকে অতুলনীয় বলে প্রমাণ করার দাবিতে তাঁকে আত্মা ও বাতাসের সাথে তুলনা করতেন। উপরন্তু তারা তাঁকে সৃষ্টির অংশ বানিয়ে ফেলেন। বিশ্বজগত সৃষ্টির পূর্বে মহান আল্লাহ তাঁর অনাদি সত্তায় বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তাঁর সত্তার বাইরে ও নিম্নে বিশ্বজগত সৃষ্টি করেন। তাঁর সত্তা বিশ্বজগতের সর্বত্র বিরাজমান বলার অর্থ একথা দাবি করা যে, মহান আল্লাহ বিশ্ব জগতকে তাঁর সত্তার অভ্যন্তরে সৃষ্টি করেছেন!! অথবা বিশ্ব জগত সৃষ্টির পরে তিনি এর অভ্যন্তরে সর্বত্র প্রবেশ করেছেন!!! এগুলো সবই মহান আল্লাহর নামে ওহী-বহির্ভুত বানোয়াট অশোভনীয় ধারণা।

আল্লাহর সত্তা যেমন সৃষ্টির মত নয়, তেমনি তাঁর বিশেষণাবলিও সৃষ্টির মত নয়। সকল মানবীয় কল্পনার ঊর্ধ্বে তাঁর সত্তা ও বিশেষণ। কাজেই মহান আল্লাহর আরশের উপরে অধিষ্ঠান এবং বান্দার নৈকট্য উভয়ই সত্য এবং মুমিন উভয়ই বিশ্বাস করেন। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য কল্পনা করা মানবীয় সীমাবদ্ধতার ফসল। তদুপরি জাহমীদের এ বিভ্রান্তি দূর করতে ইমামগণ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক বলেন:

الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان

"আল্লাহ আসমানে (ঊর্ধ্বে) এবং তাঁর জ্ঞান সকল স্থানে। কোনো স্থানই মহান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়।"[২৯৪]

ইমাম আযম আবূ হানীফা থেকেও অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ইমাম বাইহাকী।[২৯৫] এ প্রসঙ্গে পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মালিকী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবন আব্দুল বার্র ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি) বলেন:

علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله

"সাহাবী-তাবিয়ী আলিমগণ, যাদের থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে, তারা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি আরশের উপরে এবং তাঁর জ্ঞান সর্বত্র। দলিল হিসেবে গ্রহণ করার মত একজন আলিমও তাঁদের এ মতের বিরোধিতা করেন নি।"[২৯৬]

ইমামদ্বয়ের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, 'ইসতিওয়া' শব্দটিকে তাঁরা সাধারণ আরবী অর্থেই গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এ শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক, মুতাশাবিহ, রূপক বা অজ্ঞাত বলে দাবি করেন নি। বরং তাঁরা বলেছেন যে, এ শব্দটির অর্থ 'জ্ঞাত বিষয়', এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা, রূপকতা বা দ্ব্যর্থতা নেই। অর্থাৎ আরবী ভাষায় অন্যন্য সকল ক্ষেত্রে 'ইসতিওয়া আলা' বলতে যা বুঝানো হয় এখানেও সেই অর্থই গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ ঊর্ধ্বত্ব। এখানে অর্থটি রূপক বা অজ্ঞাত বলে দাবি করার সুযোগ নেই। তবে ইসতিওয়ার স্বরূপ বা ব্যাখ্যা অজ্ঞাত (মুতাশাবিহ)। এ অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে জ্ঞাত বিষয়কে বিশ্বাস করাই মুমিনের দায়িত্ব।

কুরআন কয়েকটি বিষয় আমাদেরকে জানায়: (১) মহান আল্লাহ অনাদি অনন্ত, কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন এবং সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, (২) মহান আল্লাহ কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন, (৩) মহান আল্লাহ সৃষ্টির এক পর্যায়ে আরশ সৃষ্টি করেন এবং আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন এবং (৪) মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার নিকটবর্তী।

সাহাবীগণ বিষয়গুলো সবই সরল অর্থে বিশ্বাস করেছেন এবং এ বিষয়ে কোনো বৈপরীত্য অনুভব করেন নি। কারণ আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হওয়া, অতুলনীয় হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া এবং আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া কোনোটিই মানবীয় বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক নয় বা অসম্ভব নয়। কাজেই ওহীর মাধ্যমে যা আল্লাহ জানিয়েছেন তা নিয়ে বিতর্ক করা বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়। সমস্যার শুরু হয় যখন মানুষ এগুলোর গভীর স্বরূপ সন্ধানে ব্যস্ত হয়। আল্লাহ যদি অমুক্ষাপেক্ষী হন তাহলে আরশের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠানের দরকার কি? আরশের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠান গ্রহণ না করলে এ কথা বারবার বলার দরকার কী? অধিষ্ঠান অর্থ যদি ক্ষমতা গ্রহণ হয় তবে কাকে হটিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করলেন? শুধু আরশের ক্ষমতা গ্রহণের অর্থ কী? এরূপ জিজ্ঞাসা মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

এসবের সহজ সমাধান ওহীর সবগুলো বিষয় সরলভাবে বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহ বলেছেন তিনি অমুক্ষাপেক্ষী ও অতুলনীয় এবং তিনিই বলেছেন তিনি আরশের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠান করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝি যে, কোনোরূপ মুখাপেক্ষিতা বা প্রয়োজন ছাড়াই আল্লাহ তা করেছেন এবং তাঁর এ বিশেষণ কোনোভাবেই কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়। তবে কেন করেছেন, কিভাবে করেছেন বা এর স্বরূপ কী তা তিনি আমাদের বলেন নি। এগুলি নিয়ে প্রশ্ন করা বা উত্তরের সন্ধান করা দীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন বা বিদ'আত। কারণ সাহাবীগণ কখনো এরূপ প্রশ্ন বা উত্তর সন্ধান করেন নি।

ইমাম আবূ হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, মানবীয় সহজাত প্রকৃতিই মহান আল্লাহর উর্ধ্বত্ব প্রমাণ করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহকে ডাকতে ঊর্ধ্বমুখি হয়। এছাড়া হাদীসে এ উর্ধ্বত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন:

مَنْ قَالَ لاَ أَعْرِفُ رَبِّيْ فِيْ السَّمَاءِ أَوْ فِيْ الأَرْضِ فَقَدْ كَفَرَ وَكَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَلاَ أَدْرِيْ الْعَرْشَ أَفِيْ السَّمَاءِ أَوْ فِيْ الأَرْضِ لأَنَّ اللهَ يَقُوْلُ: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَاللهُ تَعَالَى يُدْعَى مِنْ أَعْلَى لاَ مِنْ أَسْفَلَ لَيْسَ مِنْ وَصْفِ الرُّبُوْبِيَّةِ وَالأُلُوْهِيَّةِ فِيْ شَيْءٍ وَعَلَيْهِ مَا رُوِيَ فِيْ الْحَدِيْثِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ: وَجَبَ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَفَتُجْزِئُ هَذِهِ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَمُؤْمِنَةٌ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَيْنَ اللهُ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

"যদি কেউ বলে যে, 'আমার রব্ব আকাশে না পৃথিবীতে তা আমি জানি না' তবে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে যে, 'তিনি আরশের উপরে, কিন্তু আরশ কোথায়- আসমানে না যমিনে- তা আমি জানি না' তবে সেও অনুরূপ। কারণ আল্লাহ বলেছেন: 'দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমাসীন'। মহান আল্লাহকে ডাকতে হয় ঊর্ধে, নিম্নে নয়। নিম্নে থাকা রুবূবিয়্যাত বা উলূহিয়্যাতের কোনো বিশেষত্ব নয়। আর এ অর্থেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে[২৯৭]: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি কাফ্রী দাসীকে নিয়ে আগমন করে বলে যে, তাকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। এ দাসীকে মুক্ত করলে কি তার দায়িত্ব পালন হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত দাসীকে বলেন, তুমি কি ঈমানদার? সে বলে: হ্যাঁ। তিনি বলেন: আল্লাহ কোথায়? সে আসমানের দিকে ইশারা করে। তখন তিনি বলেন: একে মুক্ত করে দাও, এ নারী ঈমানদার।"[২৯৮]

আকীদা তাহাবিয়ার ব্যাখ্যায় ইবন আবীল ইজ্জ হানাফী বলেন: "শাইখুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল আনসারী (৪৮১ হি) তাঁর "আল-ফারূক" গ্রন্থে আবূ মুতী বালখী পর্যন্ত সনদে উদ্ধৃত করেছেন, আবূ মুতী বলেন, আবূ হানীফাকে (রাহ) প্রশ্ন করলাম: যে ব্যক্তি বলে, আমার রব্ব আসমানে না যমীনে তা আমি জানি না, তার বিষয়ে আপনার মত কি? তিনি বলেন: এ ব্যক্তি কাফির। কারণ আল্লাহ বলেছেন: 'দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমাসীন'[২৯৯], আর তাঁর আরশ সপ্ত আসমানের উপরে। আমি (আবু মুতী) বললাম: যদি সে বলে, তিনি আরশের উপরে, কিন্তু সে বলে: আরশ কি আসমানে না যমীনে তা আমি জানি না, তাহলে কি হবে? তিনি (আবূ হানীফা) বলেন: তাহলেও সে কাফির। কারণ সে তাঁর আসমানে বা ঊর্ধে হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে, আর যে ব্যক্তি তাঁর ঊর্ধ্বত্ব অস্বীকার করবে সে কাফির। ... ।"[৩০০]

ইসতিওয়া ও অন্যান্য বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের মূলনীতি ও আকীদা ব্যাখ্যা করে আবূ বাকর খাল্লাল আহমদ ইবন মুহাম্মাদ (৩১১ হি) বলেন:

وكان يقول إن الله عز وجل مستو على العرش المجيد ... وكان يقول في معنى الاستواء هو العلو والارتفاع ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء وإنما خص الله العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء والعرش أفضل الأشياء وأرفعها فامتدح الله نفسه بأنه على العرش أستوى أي عليه علا ولا يجوز أن يقال أستوى بمماسة ولا بملاقاة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. وكان ينكر على من يقول إن الله في كل مكان بذاته لأن الأمكنة كلها محدودة وحكي عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن الله تعالى مستو على عرشه المجيد كما أخبر وأن علمه في كل مكان ولا يخلوا شيء من علمه وعظم عليه الكلام في هذا واستبشعه.

ইমাম আহমদ বলতেন, মহান আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত। ... অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ তিনি এর ঊর্ধ্বে। মহান আল্লাহ আরশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি সকল কিছুর ঊর্ধ্বে এবং সকল কিছুর উপরে। এখানে আরশকে উল্লেখ করার কারণ আরশের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোনো কিছুর মধ্যে নেই। তা হলো আরশ সবচেয়ে মর্যাদাময় সৃষ্টি এবং সব কিছুর ঊর্ধ্বে। মহান আল্লাহ নিজের প্রশংসা করে বলেছেন যে, তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনি আরশের ঊর্ধ্বে। আরশের উপরে অধিষ্ঠানের অর্থ আরশ স্পর্শ করে অবস্থান করা নয়। মহান আল্লাহ এরূপ ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে। আরশ সৃষ্টির পূর্বে এবং আরশ সৃষ্টির পরে মহান আল্লাহ একই অবস্থায় রয়েছেন; কোনোরূপ পরিবর্তন তাঁকে স্পর্শ করে নি, কোনো গণ্ডি বা সীমা তাঁকে সীমায়িত করতে পারে না। যারা বলেন যে, মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাদের কথা তিনি অস্বীকার ও প্রতিবাদ করতেন। কারণ সকল স্থানই গণ্ডি বা সীমায় আবদ্ধ। তিনি আব্দুর রাহমান ইবন মাহদী থেকে, তিনি ইমাম মালিক থেকে উদ্ধৃত করতেন: মহান আল্লাহ মহা-পবিত্র আরশের ঊর্ধ্বে সমাসীন এবং তাঁর জ্ঞান-ইলম সর্বত্র বিদ্যমান। কোনো স্থানই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান কথাটি ইমাম আহমদ ঘৃণ্য বলে গণ্য করতেন।[৩০১]

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالأَرْكَانِ وَالأَعْضَاءِ وَالأَدَوَاتِ، لا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ. .... وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ

"আল্লাহ্ তা'আলা সীমা-পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাদান-উপকরণের বহু ঊর্ধ্বে। যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাঁকে ষষ্ঠ দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না। আল্লাহর আরশ ও কুরসী (আসন) সত্য। আরশ ও তার নীচে যা কিছু বিদ্যমান সব কিছু থেকে তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী এবং সকল কিছুর ঊর্ধ্বে।"[৩০২]

অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্ট দিক, স্থান ও সীমার ঊর্ধ্বে। তবে সৃষ্টির সীমা যেখানে শেষ তার ঊর্ধ্বে তাঁর মহান আরশ। আরশ সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে বিদ্যমান। তিনি তারও ঊর্ধ্বে। কাজেই তিনি সকল কিছুর ঊর্ধ্বে এবং সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন:

وهو فوق العرش كما وصف نفسه، لكن لا بمعنى التحيز ولا الجهة، بل لا يعلم كنه هذا التفوق والاستواء إلا هو...

"তিনি আরশের ঊর্ধ্বে, যেভাবে তিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন। এর অর্থ কোনো দিক বা স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়া নয়। বরং এ ঊর্ধ্বত্বের এবং অধিষ্ঠানের প্রকৃতি তিনি ছাড়া কেউ জানে না... ।"[৩০৩]

৮. ২. অবতরণ

মহান আল্লাহর অন্য একটি বিশেষণ 'নুযূল' বা অবতরণ। এ অর্থের একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ

"প্রতি রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের মহিমান্বিত মহা-কল্যাণময় প্রতিপালক নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন। তিনি বলেন: আমাকে ডাকার কেউ আছ কি? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। আমার কাছে চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে প্রদান করব। আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করব।"[৩০৪]

এ বিশেষণও জাহমী-মু'তাযিলীগণ অস্বীকার করেন। তারা বলেন, স্থান পরিবর্তন আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। তিনি আরশ থেকে অবতরণ করলে আরশ কি শূন্য থাকে? তাঁরা বলেন: অবতরণ অর্থ নৈকট্য বা বিশেষ করুণা। কিন্তু প্রশ্ন হলো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো অনেক স্থানেই নৈকট্য ও করুণা শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নৈকট্য বা করুণা না বলে অবতরণ বললেন কেন? আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য বিশ্বাসকে কঠিন ও জটিল করতে চান? না সহজ করতে চান?

আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ অন্যান্য বিশেষণের মত এটিকেও তুলনামুক্তভাবে মেনে নেন। তাঁরা বলেন: এটি মহান আল্লাহর একটি বিশেষণ। আমরা সরল অর্থে বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ অতুলনীয়, তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন এবং তিনি যখন এবং যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন। তাঁর অবতরণ কোনোভাবেই কোনো সৃষ্টির অবতরণের মত নয়। তাঁর অবতরণের স্বরূপ ও প্রকৃতি কি তা আমরা জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না। ইমাম আবূ হানীফা (রা) কে মহান আল্লাহর অবতরণ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন:

ينزل بلا كيف

"মহান আল্লাহ অবতরণ করেন, কোনোরূপ পদ্ধতি বা স্বরূপ ব্যতিরেকে।"[৩০৫]

৯. বিশেষণ বিষয়ে চার ইমাম ও সালাফ সালিহীন

আমরা মহান আল্লাহর বিশেষণ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও প্রসঙ্গত ইমাম মালিক (রাহ) ও ইমাম আহমদ (রাহ)-এর মত জানলাম। বস্তুত চার ইমামসহ 'সালাফ সালিহীন' বা ইসলামের প্রথম চার প্রজন্মের সকল বুজুর্গ একই আকীদা অনুসরণ করতেন। তাঁরা সকলেই কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত বিশেষণগুলোকে সরল অর্থে বিশ্বাস করতে এবং ব্যাখ্যা ও তুলনা বর্জন করতে নির্দেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী প্রথম হিজরী শতকের দুজন প্রসিদ্ধ তাবিয়ীর মত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

قال أبو العالية (استوى إلى السماء) ارتفع.. وقال مجاهد (استوى) علا (على العرش)

"(প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ রুফাই ইবন মিহরান) আবুল আলিয়া (৯০ হি) বলেন: 'আসমানের প্রতি ইসতিওয়া করেছেন অর্থ: আসমানের উপরে থেকেছেন।' (অন্য প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির ও ফকীহ ইমাম) মুজাহিদ (১০৪ হি) বলেন: 'আরশের উপর 'ইসতিওয়া' করেছেন অর্থ আরশের ঊর্ধ্বে থেকেছেন।"[৩০৬]

সায়িদ নাইসাপূরী ইমাম আবূ হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন:

سئل محمد بن إسحاق بن خزيْمة عن الكلام في الأسماء والصفات، فقال: بدعة ابتدعوها، ولم يكن أئمةُ المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وأرباب المذاهب، مثلُ مالكِ بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق الحنظلي، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن المبارك، ومحمد بن يحيى رضي الله عنهم أي لم يكن يتكلمون في ذلك، وينهون عن الخوض فيه، والنظرِ فى كتبهم بحال والله أسأل أن يعيذَنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.

"ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমা (২২৩-৩১১ হি)-কে মহান আল্লাহর নাম ও বিশেষণ বিষয়ক কথাবার্তা বা ইলমুল কালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন: এটি একটি বিদআত যা তারা উদ্ভাবন করেছে। মুসলিমদের ইমামগণ, অর্থাৎ সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ, প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর ইমামগণ, যেমন মালিক ইবন আনাস, সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, শাফিয়ী, আহমদ ইবন হাম্বাল, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহি হানযালী, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া যুহলী- রাদিআল্লাহু আনহুম- কেউই এ বিষয়ে কথা বলতেন না। তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করতেন এবং যারা এ সকল বিষয়ে কথা বলেন তাদের বইপত্র পড়তে নিষেধ করতেন। আমি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, তিনি যেন আমাদেরকে প্রকাশ্য ও গোপন বিভ্রান্তিকর ফিতনা থেকে রক্ষা করেন।"[৩০৭]

প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ইমাম সুফইয়ান ইবন উআইনা (১০৭-১৯৮ হি) বলেন:

كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثل

"আল্লাহ কুরআনে নিজের বিষয়ে যে সকল বিশেষণ উল্লেখ করেছেন তার পাঠই তার ব্যাখ্যা কোনো 'কাইফ' (স্বরূপ) নেই এবং কোনো 'মিসল' (তুলনা) নেই।"[৩০৮]

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ফকীহ ইমাম আওযায়ী আব্দুর রাহমান ইবন আমর (১৫৭ হি) বলেন:

كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته

"যে সময়ে তাবিয়ীগণ বহু সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন সে সময়ে আমরা বলতাম: মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে এবং সুন্নাতে (হাদীসে) মহান আল্লাহর যা কিছু বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে তা আমার বিশ্বাস করি।"[৩০৯]

প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ওয়ালীদ ইবন মুসলিম (১৯৫ হি) বলেন:

سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا أَمِرُّوهَا كما جاءت بلا كيف

"ইমাম আওযায়ী (১৫৭ হি), ইমাম মালিক ইবন আনাস (১৭৯ হি), ইমাম সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম লাইস ইবন সা'দ (১৭৫ হি)-কে আমি মহান আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ক হাদীসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তাঁরা বলেন: এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে নাও; কোনোরূপ স্বরূপ-প্রকৃতি ব্যতিরেকে।"[৩১০]

মহান আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ক মূলনীতি ব্যাখ্যা করে 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাষ্য 'আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থে ইমাম আযম বলেন:

لاَ يُوْصَفُ اللهُ تَعَالَى بِصِفَاتِ الْمَخْلُوْقِيْنَ. وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِهِ بِلاَ كَيْفٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَهُوَ يَغْضِبُ وَيَرْضَى وَلاَ يُقَالُ: غَضَبُهُ عُقُوْبَتُهُ وَرِضَاهُ ثَوَابُهُ. وَنَصِفُهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ حَيٌّ قَيُّوْمٌ قَادِرٌ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ عَالِمٌ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ لَيْسَتْ كَأَيْدِيْ خَلْقِهِ وَلَيْسَتْ جَارِحَةٌ وَهُوَ خَالِقُ الأَيْدِيْ وَوَجْهُهُ لَيْسَ كَوُجُوْهِ خَلْقِهِ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ الْوُجُوْهِ وَنَفْسُهُ لَيْسَتْ كَنَفْسِ خَلْقِهِ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ النُّفُوْسِ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

"মহান আল্লাহ সৃষ্টির বিশেষণে বিশেষায়িত হন না। তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর বিশেষণসমূহের দুটি বিশেষণ, কোনো স্বরূপ নির্ণয় ছাড়া। এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর মত। মহান আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর ক্রোধ অর্থ তাঁর শাস্তি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্থ তাঁর পুরস্কার। আল্লাহ নিজে নিজেকে যেরূপে বিশেষিত করেছেন আমরাও তাঁকে সেভাবেই বিশেষিত করি। তিনি একক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কারো জন্ম দেন নি, তিনি জন্মপ্রাপ্ত নন, কেউ তাঁর তুলনীয় নয়। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসংরক্ষক, ক্ষমতাবান, শ্রবণকারী, দর্শনকারী, জ্ঞানী, আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর, তাঁর হাত তাঁর সৃষ্টির হাতের মত নয়; তা অঙ্গ নয়; তিনি হস্তসমূহের স্রষ্টা। তাঁর মুখমণ্ডল তাঁর সৃষ্টির মুখমণ্ডলের মত নয়; তিনি সকল মুখমণ্ডলের স্রষ্টা। তাঁর নফস তাঁর সৃষ্টির নফসের মত নয়, তিনি সকল নফসের স্রষ্টা। (আল্লাহ বলেন[৩১১]) "কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[৩১২]

এখানে তিনি তিনটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন:

(১) মহান আল্লাহর বিশেষণগুলোর অতুলনীয়ত্বে বিশ্বাস করতে হবে।
(২) মহান আল্লাহ নিজের বিষয়ে যে সকল শব্দ, বাক্য, কর্ম বা বিশেষণ ব্যবহার করেছেন মুমিনের দায়িত্ব সেগুলো সর্বান্তকরণে গ্রহণ, বিশ্বাস ও ব্যবহার করা।
(৩) তাঁর বিশেষণ রূপক অর্থে ব্যবহৃত বলে দাবি করা বা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

মহান আল্লাহর বিশেষণ ব্যাখ্যায় কিছু বলার অর্থ মহান আল্লাহ সম্পর্কে মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি বা ইজতিহাদ দিয়ে কিছু বলা। আর মহান আল্লাহর বিষয়ে ইজতিহাদ করে কিছু বলা যাবে না। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشئ من ذاته، ولكن يصفه بما وصف سبحانه به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك الله تعالى رب العالمين.

"মহান আল্লাহর বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা কারো জন্য বৈধ নয়; বরং তিনি নিজের জন্য যে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন

তাঁর বিষয়ে শুধু সে বিশেষণই ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে নিজের মত, যুক্তি বা ইজতিহাদ দিয়ে কিছুই বলা যাবে না। মহাপবিত্র, মহাসম্মানিত-মহাকল্যাণময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"[৩১৩]

ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম প্রধান ছাত্র প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান শাইবানী (১৮৯ হি) বলেন:

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ﷺ في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي ﷺ وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء.

"পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল দেশের ফকীহগণ সকলেই একমত যে, মহান আল্লাহর বিশেষণ সম্পর্কে কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে, কোনোরূপ পরিবর্তন, বিশেষায়ন এবং তুলনা ব্যতিরেকে। যদি কেউ বর্তমানে সেগুলোর কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করে তবে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথ ও পদ্ধতি পরিত্যাগকারী এবং উম্মাতের পূর্বসূরীদের ইজমার (ঐকমত্যের) বিরোধিতায় লিপ্ত। কারণ তাঁরা এগুলোকে বিশেষায়িত করেন নি এবং ব্যাখ্যাও করেন নি। বরং তাঁরা কুরআন ও সুন্নাতে যা বিদ্যমান তার ভিত্তিতে ফাতওয়া দিয়েছেন এবং এরপর নীরব থেকেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি জাহম-এর মত গ্রহণ করবে সে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ঐকমত্যের পথ পরিত্যাগ করবে; কারণ সে মহান আল্লাহকে নেতিবাচক ও অবিদ্যমানতার বিশেষণে বিশেষিত করে।"[৩১৪]

ইমাম মুহাম্মাদের ছাত্র ইমাম আবূ উবাইদ কাসিম ইবন সাল্লাম (২২৪হি) বলেন:

هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا نُفَسِّرُ هذا ولا سمعنا أحدًا يفسره

"এগুলো সহীহ হাদীস। মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণ পরস্পর এগুলো গ্রহণ ও বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতে এগুলো সত্য ও সঠিক, এগুলোর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি বলা হয়: তিনি কিভাবে জাহান্নামে পদ স্থাপন করলেন? তিনি কিভাবে হাসলেন? তবে আমরা বলব: আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করি না। পূর্ববর্তী কাউকে আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করতে শুনি নি।"[৩১৫]

ইমাম সায়িদ ইবন মুহাম্মাদ নাইসাপূরী হানাফী বলেন:

فصل في رواية ما صح من الآثار في الصفات وترك الخوض فيها. وروي عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال في مثل هذه الأحاديث قد روتْها الثقات، ونحن نرويها، ونُصدِّقها، ونؤمن بِها، ولا نفسرها

"আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ে এবং এগুলো নিয়ে বিতর্ক না করার বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত বক্তব্য বিষয়ক অনুচ্ছেদ।... মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি এ সকল বিশেষণ বিষয়ক হাদীসগুলো সম্পর্কে বলেন: এ সকল হাদীস বিশ্বস্ত রাবীগণ বর্ণনা করেছেন। আমরাও এগুলো বর্ণনা করি এবং এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করি ও বিশ্বাস করি। আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করি না।"[৩১৬]

ইমাম শাফিয়ীর ছাত্র রাবী ইবন সুলাইমান বলেন:

سألت الشافعي عن صفات من صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه

"আমি শাফিয়ীকে মহান আল্লাহর বিশেষণাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন: মহান আল্লাহর তুলনা বা নমুনা স্থাপন মানবীয় জ্ঞানের জন্য হারাম, তাঁকে সীমায়িত করা মানবীয় কল্পনার জন্য হারাম, এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া মানবীয় ধারণার জন্য হারাম, এ নিয়ে চিন্তা করা মানব প্রবৃত্তির জন্য হারাম, এর গভীরে যাওয় মানব অন্তরের জন্য হারাম এবং সব বুঝে ফেলার চেষ্টা করা মানবীয় বুদ্ধির জন্য হারাম। মহান আল্লাহ তাঁর গ্রন্থে বা তাঁর রাসূল ﷺ-এর জবানীতে তাঁর নিজের বিষয়ে যা কিছু উল্লেখ করে নিজেকে বিশেষিত করেছেন তা বিশ্বাস করা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই করা বৈধ নয়।"[৩১৭]

ইমাম শাফিয়ীর অন্য ছাত্র ইউনুস ইবন আব্দুল আ'লা বলেন:

سمعت أبا عبد الله الشافعي يقول– وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به – فقال: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه ﷺ أمته، لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، لان القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله ﷺ القول بها، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه، فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة، فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، ولا بالروية والفكر، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، ونثبت هذه الصفات، وننفي عنها التشبيه، كما نفاه عن نفسه، فقال: (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير).

"আবূ আব্দুল্লাহ শাফিয়ীকে মহান আল্লাহর বিশেষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তখন তিনি বললেন: আল্লাহর নামসমূহ এবং বিশেষণসমূহ রয়েছে। কুরআনে সেগুলির উল্লেখ রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতকে তা জানিয়েছেন। যার কাছে তা প্রমাণিত হয়েছে তার জন্য তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কারণ কুরআনে তা অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এগুলি বলেছেন। যদি কেউ তার কাছে বিষয়গুলো প্রমাণিত হওয়ার পরেও বিরোধিতা করে তবে সে ব্যক্তি কাফির। তবে যদি কেউ তা তার নিকট প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে বিরোধিতা করে তবে সে ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে ওজর-অব্যাহতির যোগ্য (excusable, forgivable)। কারণ এ বিষয়ক জ্ঞান মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক, যুক্তি, গবেষণা ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। কাজেই কারো নিকট এ বিষয়ক কুরআন-হাদীসের সংবাদ পৌঁছানোর আগে এ বিষয়ক অজ্ঞতার কারণে আমরা কাউকে কাফির বলে গণ্য করি না। আমরা এ সকল বিশেষণ প্রমাণ ও বিশ্বাস করি এবং এগুলি থেকে তুলনা বাতিল ও অস্বীকার করি। কারণ মহান আল্লাহ নিজেই নিজের তুলনীয় হওয়ার বিষয়টি বাতিল করে বলেছেন[৩১৮]: "কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়; তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা"।[৩১৯]

ইমাম শাফিয়ীর অন্য ছাত্র আবূ সাওর বলেন, ইমাম শাফিয়ী বলেন:

القول في السُّنّة التي وردت وأنا عليها، ورأيتُ أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتُهم وأخذتُ عنهم . مثل: سفيان الثّوريّ ومالك وغيرهما . : الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله، وأنّ الله . تعالى . على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وأنّ الله تعالى ينزل إلى السّماء الدُّنيا كيف شاء.

"সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও অন্যান্য যে সকল মুহাদ্দিসকে আমরা দেখেছি এবং তাঁদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি, আমাদের সে সব সাথী এবং আমি যে সুন্নাত আকীদার উপর রয়েছি তা হলো এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, এবং মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে তাঁর আসমানের ঊর্ধ্বে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে বান্দার নিকটবর্তী হন এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন।"[৩২০]

মহান আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের মূলনীতি ও আকীদা ব্যাখ্যা করে তাঁর ছাত্র আবূ বাকর খাল্লাল বলেন:

ومذهب .. أحمد بن حنبل.. أن لله عز وجل وجها لا كالصور المصورة والأعيان المخططة بل وجهه وصفه ....وليس معنى وجه معنى جسد عنده ولا صورة ولا تخطيط ومن قال ذلك فقد ابتدع. وكان يقول إن لله تعالى يدان وهما صفة له في ذاته ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين ولا جسم ولا جنس من الأجسام ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح ولا يقاس على ذلك لا مرفق ولا عضد ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق القرآن به أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة فيه ... وذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أن الله عز وجل يغضب ويرضى وأن له غضب ورضى ... والغضب والرضى صفتان له من صفات نفسه لم يزل الله تعالى غاضبا على ما سبق في علمه أنه يكون ممن يعصيه ولم يزل راضيا على ما سبق في علمه أنه يكون مما يرضيه. وأنكر على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الأسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل

"আহমদ ইবন হাম্বালের মাযহাব এই যে, মহান আল্লাহর একটি 'ওয়াজহ' বা মুখমণ্ডল আছে। তাঁর মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি বা আকৃতি নয় এবং আঁকানো বস্তুর মতও নয়। বরং মুখমণ্ডল তাঁর একটি মহান বিশেষণ। ... তাঁর মতে মুখমণ্ডল অর্থ দেহ, ছবি বা আকৃতি নয়। যদি কেউ তা বলে তাহলে সে বিদআতী। তিনি বলতেন: মহান আল্লাহর দুটি হস্ত বিদ্যমান। এদুটি তাঁর সত্ত্বার বিশেষণ। হস্তদ্বয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, দেহের অংশ নয়, দেহ নয়, দেহ জাতীয় কিছু নয়, সীমা, সংযোজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাতীয় কিছুই নয়। এ বিষয়ে কিয়াস-যুক্তি অচল। এতে কনুই, বাহু ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনার সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে তার অতিরিক্ত মানুষের ব্যবহার থেকে কিছু সংযোজন করা যাবে না। .... আহমদ (রাহ) বলতেন, আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন। তাঁর ক্রোধ

এবং সন্তুষ্টি আছে। ... তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর সত্তার বিশেষণগুলির মধ্যে দুটি বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকে তাঁর অনাদি-অনন্ত জ্ঞানে যাদেরকে অবাধ্য বলে জানেন তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত রয়েছেন এবং তাঁর অনাদি অনন্ত জ্ঞানে যাদেরকে অনুগত বলে জানেন তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। মহান আল্লাহকে যারা দেহবিশিষ্ট বলে দাবি করেন তিনি তাদের কথা অস্বীকার ও প্রতিবাদ করেন। কারণ নাম তো শরীয়াহ এবং ভাষার ব্যবহার থেকে গ্রহণ করতে হবে। ভাষার ব্যবহারে দেহ বলতে গণ্ডি, সীমা, দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা, অংশ, আকৃতি ও সংযোজন ইত্যাদির সমাহার বুঝানো হয়। মহান আল্লাহ এর সবকিছুর ঊর্ধ্বে। শরীয়াতেও মহান আল্লাহকে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয় নি। কাজেই মহান আল্লাহর দেহ আছে বা তিনি দেহবিশিষ্ট এরূপ কথা বাতিল।"[৩২১]

ইমাম আহমদের পুত্র হাম্বাল বলেন:

سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تروى: "إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا"، و "أن الله يُرى"، و "إن الله يضع قدمه"، وما أشبهه؟ فقال أبو عبدالله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى

"বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক রাতে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন, মহান আল্লাহকে দেখা যাবে, মহান আল্লাহ তাঁর পদ স্থাপন করেন, ইত্যাদি। এ ধরনের হাদীসগুলো সম্পর্কে আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন: আমরা এগুলো বিশ্বাস করি, সত্য বলে গ্রহণ করি, কোনো 'কিভাবে' নেই এবং কোনো অর্থ নেই (স্বরূপ সন্ধান বা অর্থ সন্ধান ব্যতিরেকে)।"[৩২২]

এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। একটি সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামত দিবসের বর্ণনায় বিভিন্নভাবে মহান আল্লাহর দর্শন, জাহান্নামে তাঁর পদ স্থাপনের ফলে জাহান্নামের সংকুচিত হওয়া ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন:

وقد روي عن النبي ﷺ روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية... وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي أختاروه وذهبوا إليه

"রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ অনেক হাদীস বর্ণিত, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, মানুষেরা তাদের রবকে দেখবে, মহান আল্লাহর পায়ের কথা এবং এ জাতীয় বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবন আনাস, ইবনুল মুবারাক, ইবন উ'আইনা, ওকী ও অন্যান্য ইমাম ও আলিমের মাযহাব এ-ই যে, তাঁরা এগুলো বর্ণনা করেছেন এরপর বলেছেন যে, এ সকল হাদীস এভাবে বর্ণনা করা হবে এবং আমরা এগুলো বিশ্বাস করি। এ বিষয়ে 'কাইফা': কিরূপে বা কিভাবে বলা যাবে না। এভাবে মুহাদ্দিসগণের মত এ-ই যে, এ সকল বিষয় যেভাবে এসেছে সেভাবেই বর্ণনা করতে হবে এবং এগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে। এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে না, কোনো কল্পনা করা যাবে না এবং একথাও বলা যাবে না যে, কিরূপে বা কিভাবে? আলিমগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন এবং এটিই তাঁদের মাযহাব।"[৩২৩]

এভাবে আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো ব্যাখ্যা, তুলনা ও স্বরূপসন্ধান ব্যতিরেকে বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা এবং এ অর্থের হাদীসগুলো আক্ষরিকভাবে বর্ণনা করার বিষয়ে সালাফ সালিহীন ঐকমত্য পোষণ করেছেন। পাশাপাশি কখনো কখনো তাঁদের কেউ কেউ দু-একটি আয়াতের সহজবোধ্য ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ

স্মরণ করুন, সে দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত হবে, সেদিন তাদেরকে ডাকা হবে সাজ্দা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।"[৩২৪]

এখানে 'পায়ের গোছা'র ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, এ দ্বারা কাঠিন্য বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যেদিন কাঠিন্য উন্মোচিত হবে। তিনি বলেন:

يريد القيامة والساعة لشدَّتها

"কিয়ামত দিবস ও পুনরুত্থান বুঝানো হয়েছে, তার কাঠিন্যের কারণে।"[৩২৫]

কিয়ামত দিবসের বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

"এবং আগমন করলেন আপনার রব ও ফিরিশতাগণ কাতারে কাতারে।"[৩২৬]

ইমাম ইবন কাসীর বলেন:

روى البيهقي ... عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول الله تعالى: (وجاء ربك) أنه جاء ثوابه. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه.

"বাইহাকী তাঁর সনদে হাম্বাল থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ 'আগমন করলেন আপনার প্রতিপালক' কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন: 'আগমন করল তাঁর পুরস্কার'। এরপর বাইহাকী বলেন: বর্ণনাটির সনদে কোনো আপত্তি নেই।"[৩২৭]

মহান আল্লাহ বলেন:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

"সকল বস্তুই ধ্বংস হবে শুধু মহান আল্লাহর মুখমণ্ডল ব্যতীত।"[৩২৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী বলেন:

إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله

"শুধু মহান আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত। বলা হয়: শুধু মহান আল্লাহর মুখমণ্ডলের (সন্তুষ্টির) জন্য পালিত কর্ম ব্যতীত।"[৩২৯]

মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো ব্যাখ্যা ও তুলনামুক্তভাবে গ্রহণের বিষয়ে সালাফ সালিহীন থেকে বর্ণিত অসংখ্য নির্দেশনার পাশাপাশি এরূপ বিচ্ছিন্ন দু-একটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরাও অন্যত্র বিশেষণ ব্যাখ্যার কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। এজন্য পরবর্তী প্রজন্মের আলিমগণ এ বক্তব্যগুলোকে বিশেষণের ব্যাখ্যার অনুমতি বলে গণ্য করেন নি; বরং নির্দিষ্ট একটি আয়াতের ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যাখ্যা বলে গণ্য করেছেন। পাশাপাশি বিশেষণ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলো ব্যাখ্যামুক্ত, তুলনামুক্ত ও স্বরূপ অনুসন্ধানমুক্তভাবে সরল অর্থে বিশ্বাস ও বর্ণনা করার বিষয়ে তাঁদের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। আমরা দেখলাম যে, ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবন খুযাইমা ও অন্যান্য আলিম এ ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।

এ ইজমার কারণেই প্রসিদ্ধ আশআরী কালামবিদ ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী জুওয়াইনী (৪৭৮ হি) আশআরী মতবাদের প্রসিদ্ধ মত ত্যাগ করে সালাফ সালিহীনের মত গ্রহণ করেন। তিনি আর-রিসালাহ আন-নিযামিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন:

والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على ان إجماع الأمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع

"আমরা যে মতটি গ্রহণ করছি এবং যে আকীদা গ্রহণ করে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করছি তা হলো উম্মাতের সালফ সালিহীনের অনুসরণ। কারণ উম্মাতের ইজমা বা ঐকমত্য একটি সুনিশ্চিত দলীল। যদি এ সকল বাহ্যিক বিশেষণগুলোর ব্যাখ্যা করা জরুরী হতো তবে নিঃসন্দেহে শরীয়তের ফিকহী মাসআলাগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেয়ে ঈমান-আকীদা বিষয়ক এ সকল আয়াত-হাদীসের ব্যাখ্যার বিষয়ে তাঁরা অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন। অথচ কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়াই সাহাবী ও তাবিয়ীগণের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এতে প্রমাণিত হলো যে, ব্যাখ্যামুক্ত বিশ্বাসের এ মতটিই অনুসরণযোগ্য আকীদা।"[৩৩০]

ইমামুল হারামাইনের উপরের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করে নবম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ আল্লামা হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন:

فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাক্ষ্য অনুসারে প্রথম তিন প্রজন্মের মানুষেরাই উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। তাঁরা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সে বিষয়ের উপর নির্ভর না করার কোনোই কারণ নেই।"[৩৩১]

সালফ সালিহীনের এ সকল বক্তব্য থেকে আরো স্পষ্ট যে, তাঁরা একমাত্র ওহী বা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকেই আকীদার উৎস ও ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আকীদা বিষয়ে ওহীর বাইরে কিছু বলতেই তাঁরা রাজি ছিলেন না।

তৃতীয় হিজরী শতকের শুরুতে আব্বাসী খলীফা মামুন (রাজত্ব ১৯৮-২১৮ হি) মুতাযিলী ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। আমরা দেখেছি যে, মুতাযিলী আকীদার অন্যতম বিষয় "কুরআন সৃষ্ট বা মাখলূক" বলে বিশ্বাস করা এবং আখিরাতে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করা। দুটি বিষয়ই মহান আল্লাহর মর্যাদা ও অতুলনীয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা দাবি করেন। তাদের মতে কথা বলা, আরশে উপরে থাকা ইত্যাদি কর্মের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হয়, মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এরূপ মানবীয় গুণ আরোপ

করা কুফর। অনুরূপভাবে তাদের মতে মহান আল্লাহ নিরাকার। তাঁকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই কোনো না কোনো ভাবে তাঁর আকৃতি দাবি করা। আর মহান আল্লাহর আকৃতি আছে বলে বিশ্বাস করা কুফরী। তাদের দাবিকৃত এ কুফরী থেকে মুসলিমদের বাঁচানোর জন্য খলীফা মামুন এবং পরবর্তী দুজন খলীফা মু'তাসিম (২১৮-২২৭ হি) ও ওয়াসিক (২২৮-২৩২ হি) এ আকীদা গ্রহণের জন্য সকল মুসলিমকে নির্দেশ দেন। এ মত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী আলিমদেরকে গ্রেফতার করে অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়। কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের এ কুফরী মতাদর্শের শাসন ও অত্যাচারের সময়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলিমগণের অন্যতম নেতা ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (১৬৪-২৪১ হি)।

ইমাম আহমদকে কারাগারের মধ্যে খলীফা মু'তাসিমের সম্মুখে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। বিচারপতি আহমদ ইবন আবী দুআদ ও অন্যান্য মুতাযিলী পণ্ডিত খলীফার সামনে ইমাম আহমদের সাথে বির্তক করেন। তিনি তাদেরকে বারবারই বলেন আপনারা যে আকীদা দাবি করছেন তার পক্ষে কুরআন বা হাদীস থেকে অন্তত একটি বক্তব্য প্রদান করুন। কুরআন, হাদীস বা সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করুন যাতে বলা হয়ছে: কুরআন সৃষ্ট, আখিরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে না অথবা মহান আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ক বক্তব্যগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা যাবে না।

মুতাযিলীগণ বিভিন্ন আকলী প্রমাণ পেশ করেন। ইমাম আহমদ সেগুলো খণ্ডন করেন এবং কুরআন বা হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করার দাবিতে অটল থাকেন। তখন বিচারপতি আহমদ ইবন আবী দুআদ বলেন: হে আমীরুল মুমিনীন, এ ব্যক্তি একজন মুশরিক। একে হত্যা করুন। এর রক্তের দায় আমি বহন করব। এ সময়ে তাঁকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়। ক্ষত-বিক্ষত অর্ধমৃত ইমাম আহমদকে খলীফা বলেন, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আপনি উম্মাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহ। আপনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং আমার আনুগত্যের জন্য জনগণকে নির্দেশনা দেন। আমি আমার পুত্র হারূন-এর জন্য যেরূপ মমতা অনুভব করি আপনার জন্যও অনুরূপ মমতা অনুভব করি। তবে কুরআন আল্লাহর অনাদি বাণী, আখিরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে ইত্যাদি কুফরী মতবাদ পরিত্যাগ না করলে আপনাকে আমি হত্যা করতে বাধ্য হব। আপনি এমন কিছু বলুন যে, আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি। আমি নিজে হাতে আপনার বাঁধন খুলে দেব। অর্ধমৃত ইমাম আহমদ বারবার বলতে থাকেন:

أعطوني شيئًا من كتاب الله وسنة رسوله.

"আমাকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত থেকে কিছু প্রদান করুন।"[৩৩২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী যুগের সকল ইমাম একমত হয়েছেন যে, আকীদার মূল সূত্র, ভিত্তি ও দলীল ওহী। ওহীর বক্তব্য সরল ও প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা, ওহী যা বলেছে তা-ই বলা এবং ওহীতে যা বলা হয় নি তা আকীদার অন্তর্ভুক্ত না করাই ইসলামী আকীদার মূলসূত্র।

আর এখানেই আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল বিদআতের পার্থক্য। আহলুস সুন্নাহ কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে হুবহু বিশ্বাস ও মান্য করেন। তাঁরা 'সুন্নাত'-এর সাথে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে রাজি হন না। পক্ষান্তরে আহলুল বিদআত কুরআন বা হাদীসের বক্তব্যের সাথে সংযোজন, বিয়োজন বা ব্যাখ্যা করে উক্ত সংযোজন বা ব্যাখ্যাকেই দীনের মূল বানিয়ে দেন। উপরন্তু যারা ওহীর বক্তব্যকে হুবহু গ্রহণ করেন তাঁদেরকে কাফির, বিভ্রান্ত ইত্যাদি বলে শোরগোল করেন এবং সম্ভব হলে শক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে সচেষ্ট হন। প্রসিদ্ধ মুতাযিলী পণ্ডিত আল্লামা যামাখশারীর 'কাশ্‌শাফ' নামক তাফসীর গ্রন্থে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক বক্তব্যগুলো অধ্যয়ন করলেই পাঠক বিষয়টি বুঝতে পারবেন।

১০. আশ'আরী, মাতুরিদী ও অন্যান্য মতবাদ

১০. ১. কুল্লাবিয়া ও আশ'আরী মতবাদ

ইমাম আবূ হানীফার প্রায় এক শতাব্দী পরে মূলধারার আলিমগণের মধ্যে চতুর্থ আরেকটি ধারা জন্মলাভ করে। তাঁরা 'আহলুস সুন্নাহ' বা সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইমামগণের মতের ধারক ছিলেন। পাশাপাশি মুতাযিলীদের দর্শনভিত্তিক মতবাদ খণ্ডন করতে যেয়ে তাঁরাও দর্শন-প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাঁরা আল্লাহর কিছু বিশেষণ স্বীকার করেন এবং কিছু বিশেষণ ব্যাখ্যা করেন। বাহ্যত দর্শনের প্রভাব এবং সাধারণ মানুষের মন থেকে তুলনার ধারণা অপসারণ করতেই তারা এরূপ ব্যাখ্যা করেন। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও ক্রমান্বয়ে দর্শন নির্ভরতা ও ব্যাখ্যা প্রবণতা বাড়তে থাকে।

এ ধারার প্রবর্তকদের অন্যতম বসরার সুপ্রসিদ্ধ 'ইলম কালাম' বিশেষজ্ঞ ইমাম ইবন কুল্লাব: আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (২৪১ হি)। মুতাযিলীদের প্রতাপের যুগে মামুনের দরবারে তিনি আহলুস সুন্নাতের পক্ষে বিতর্কে মুতাযিলীদেরকে পরাস্ত করেন। তিনি মহান আল্লাহর 'যাতী' বা 'সত্তীয়' বিশেষণগুলো স্বীকার করতেন। তবে তিনি মহান আল্লাহর 'ফিলী' বা কর্ম বিষয়ক বিশেষণগুলো ব্যাখ্যা করতেন। ইবন কুল্লাবের ছাত্র ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন ইসমাঈল আল-আশআরী (৩২৪ হি) তাঁর মত সমর্থন করেন এবং "আশআরী" মতবাদের জন্ম হয়।

১০. ২. ইমাম তাহাবী ও ইমাম মাতুরিদী

আমরা দেখেছি যে, মুতাযিলীগণ ফিকহী বিষয়ে হানাফী ফিকহের অনুসারী ছিলেন এবং অনেক হানাফী ফকীহ স্বেচ্ছায় বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের জালে পড়ে মুতাযিলীগণের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এরপরও মূলধারার হানাফী ইমাম ও ফকীহগণ আকীদার বিষয়ে ইমাম আবূ

হানীফা ব্যাখ্যাকৃত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুসরণ করতেন। পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে কুল্লাবিয়া ও আশআরী মতবাদের প্রভাবও তাদের মধ্যে প্রসারিত হয়। চতুর্থ হিজরী শতকের প্রথমার্ধে ইমাম আবুল হাসান আশআরীর সমসাময়িক দুজন হানাফী ইমাম আকীদার বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন:

(১) আবূ জাফর আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ তাহাবী (৩২১হি)

(২) আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ মাতুরিদী (৩৩৩ হি)

এরা দুজন সমসাময়িক হলেও দুজন মুসলিম বিশ্বের দু প্রান্তে বাস করেছেন। ইমাম তাহাবী মুসলিম বিশ্বের পশ্চিম প্রান্তে মিসরে এবং ইমাম মাতুরিদী মুসলিম বিশ্বের পূর্ব প্রান্ত সামারকান্দে বসবাস করেছেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে কোনো প্রকারের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা যায় না। অনুরূপভাবে তাঁদের সমসাময়িক ইমাম আবুল হাসান আশআরী (৩২৪ হি)-এর সাথে তাঁদের দুজনের কারো সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা যায় না। তবে আকীদা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইমাম মাতুরিদী ইমাম ইবন কুল্লাব ও ইমাম আশআরীর ইলম কালাম নির্ভর ধারা অনুসরণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম তাহাবী মূলত ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর দু সঙ্গীর আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন।

পরবর্তী যুগে হানাফী ফকীহগণের মধ্যে, বিশেষত ইরাক, খুরাসান, সমরকন্দ, ভারত ও মুসলিম বিশ্বের পূর্বদিকের দেশগুলোর হানাফীগণের মধ্যে মাতুরিদী মতবাদ প্রসার লাভ করে। শাফিয়ী ফকীহগণের মধ্যে আশআরী মাযহাব প্রসার লাভ করে।

১০. ৩. পূর্ববর্তীদের সাথে পরবর্তীদের বৈপরীত্য

ইসলামী আকীদার বিভিন্ন দিকে আশআরী ও মাতুরিদী মতবাদ সাহাবী-তাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থেকেছে। তবে খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ের পাশাপাশি দুটি বিষয়ে চার ইমাম ও সালাফ সালিহীনের মতের সাথে আশআরী-মাতুরিদী মতের বৈপরীত দেখা যায়: (১) ওহী-নির্ভরতা বনাম 'আকল'-নির্ভরতা এবং (২) মহান আল্লাহর বিশেষণের ব্যাখ্যা।

১০. ৩. ১. ওহী-নির্ভরতা বনাম আকল-নির্ভরতা

আমরা দেখেছি যে, 'সালাফ সালিহীন' আকীদা বিষয়ে ওহী বা কুরআন-সুন্নাহের বক্তব্যের উপরে সার্বিকভাবে নির্ভর করতেন। পক্ষান্তরে আশআরী-মাতুরিদী মতের কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, আকীদা প্রমাণের ক্ষেত্রে 'আকলী দলীল' বা মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিই মূল। আকলী দলীল একীন বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে। পক্ষান্তরে 'নকল' বা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য একীন প্রদান করে না। বিশেষত আকীদা বিষয়ে তা একীন বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। এ প্রসঙ্গে আশআরী মতবাদের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শাফিয়ী ফকীহ আল্লামা আব্দুর রাহমান ইবন আহমদ আযুদুদ্দীন ঈজী (৭৫৬) এবং সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ সাইয়িদ শরীফ আলী ইবন মুহাম্মাদ জুরজানী (৮১৬ হি) 'আল-মাওয়াকিফ' ও 'শারহুল মাওয়াকিফ' গ্রন্থে বলেন:

الدلائل النقلية هل تفيد اليقين بما يستدل بها عليه من المطالب أو لا؟ قيل: لا تفيد، وهو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة لتوقفه.... فقد تحقق أن دلالتها أي دلالة الأدلة النقلية على مدلولاتها يتوقف على أمور عشرة ظنية فتكون دلالتها أيضا ظنية .... وإذا كانت دلالتها ظنية لم تكن مفيدة لليقين بمدلولاتها هذا ما قيل والحق أنها أي الدلائل النقلية قد تفيد اليقين أي في الشرعيات بقرائن ....، نعم في إفادتها اليقين في العقليات نظر

"নকলী দলীল বা কুরআন-হাদীসের বক্তব্য যে অর্থে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয় সে অর্থে তা নিশ্চিত বিশ্বাস বা একীন প্রদান করে কি না? বলা হয় যে, তা নিশ্চিত বিশ্বাস বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। এটিই মুতাযিলীগণের মত এবং আশআরী মতবাদের অধিকাংশ আলিমের মত। কারণ নকলী দলীল বা কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের অর্থ অনুধাবন অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। .... এভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-হাদীসের বক্তব্য তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত কি না তা জানার আগে দশটি ধারণা-নির্ভর বিষয় জানতে হয়। এজন্য ওহীর বক্তব্য অনুমান বা ধারণা প্রদানকারী মাত্র। .... আর যেহেতু ওহীর বক্তব্য ধারণা প্রদানকারী কাজেই ওহী দ্বারা তার অর্থের বিষয়ে একীন বা নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন করা যায় না। এভাবেই এ বিষয়টি বলা হয়। তবে সঠিক বিষয় (আশআরী মতবাদের অল্পসংখ্যক আলিমের মত) হলো, কুরআন-হাদীসের বক্তব্য আনুষঙ্গিক প্রমাণাদির মাধ্যমে ফিকহী বিষয়ে কখনো কখনো নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতেও পারে।... তবে আকীদার আকলী বিষয়ে কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের একীন বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদানের বিষয়ে আপত্তি আছে।"[৩৩৩]

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয ফারহারী (১২৩৯ হি) 'নিবরাস' গ্রন্থে বলেন:

قد ذهبت الأشاعرة إلى أن النص المخالف للدليل العقلي مصروف عن الظاهر: لأن صحة النص إنما تعرف بالدليل العقلي، وهو أنه كلام صاحب المعجزة المصدوق من عند الله تعالى. فالعقل هو أصل النقل فلا يدفع الأصل بالفرع. بل ذهب جمهورهم إلى أن النصوص لا تفيد القطع بمعانيها أصلاً؛ لأن اللغة والنحو والصرف إنما نقلها الآحاد كالأصمعي والخليل وسيبويه، ومع هذا فاحتمال المجاز والاشتراك قائم. ولكن الصحيح خلافه إذ من العربية ما نقل بالتواتر، وقد تقدم القرائن على أن المراد هذا المعنى دون ذلك، فلا

يمتنع أن يفيد بعض النقليات القطع.

"আশআরীগণের মাযহাব এই যে, আকলী (জ্ঞানবৃত্তিক) দলীলের বিপরীত 'নস্স' অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের বক্তব্যকে তার প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা যাবে না; বরং অন্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে। কারণ কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা তো কেবলমাত্র আকলী দলীল দ্বারাই প্রমাণিত হয়। আকলই নির্দেশ করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যবাদী বলে প্রমাণিত মু'জিযার অধিকারী নবীর কথা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আকলই হলো নকল বা কুরআন-হাদীসের দলীলের মূল ভিত্তি। কাজেই কোনো শাখা বা দ্বিতীয় পর্যায়ের দলীলের কারণে মূল বা প্রথম পর্যায়ের দলীলকে বাদ দেওয়া যাবে না। উপরন্তু আশআরীগণের অধিকাংশের মত এই যে, কুরআন-হাদীসের বক্তব্যগুলো মূলতই তাদের অর্থের বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। কারণ ভাষা, শব্দতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় তো আসমায়ী, খলীল, সিবাওয়াইহি প্রমুখ একক ব্যক্তির বর্ণনা। এছাড়া ভাষার মধ্যে রূপক অর্থ ও একাধিক অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে তাদের কথা পুরো সঠিক নয়। কারণ আরবী ভাষার মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যা মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত এবং পারিপার্শিক প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ শব্দের এটিই অর্থ। কাজেই কুরআন-হাদীসের কোনো কোনো বক্তব্য দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ অসম্ভব নয়।"[৩৩৪]

১০. ৩. ২. মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহের ব্যাখ্যা

আমরা দেখেছি যে, আবূ হানীফা, মালিক, শাফিয়ী, আহমদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) ও প্রথম তিন/চার প্রজন্মের মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুজূর্গগণ কুরআন ও হাদীসে উল্লেখকৃত মহান আল্লাহর সকল বিশেষণ ব্যাখ্যা ও তুলনা ব্যতিরেকে সরল অর্থে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ফিকহুল আকবার, ফিকহুল আবসাত, ওসিয়্যাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে ২১টি যাতী (সত্তীয়) ও ফি'লী (কর্মীয়) সিফাত প্রমাণ করেছেন। পক্ষান্তরে আশআরী ও মাতুরীদী মতবাদে আল্লাহর ৭ বা ৮ টি বিশেষণকে স্বীকার করা হয়। সেগুলো নিম্নরূপ: (১) হায়াত (الحياة) বা জীবন, (২) কুদরত (القدرة) বা ক্ষমতা, (৩) ইলম (العلم) বা জ্ঞান, (৪) ইরাদা (الإرادة) বা ইচ্ছা, (৫) সামউ (السمع) বা শ্রবণ, (৬) বাসার (البصر) বা দর্শন, (৭) কালাম (الكلام) বা কথা, (৮) তাকবীন (التكوين) বা তৈরি করা।[৩৩৫]

'সুনিশ্চিত', একীনী বা আকলী দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার যুক্তিতে এ বিশেষণগুলো ছাড়া সকল বিশেষণ ব্যাখ্যা করাকেই অধিকাংশ আশআরী-মাতুরিদী আলিম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহর মুখমণ্ডল, হাত, আরশের উপর অধিষ্ঠান, অবতরণ, ক্রোধ, সন্তুষ্টি, ভালবাসা, ইত্যাদি সকল বিশেষণই তারা রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আরশের উপর অধিষ্ঠান বিশেষণ বিষয়ে 'আল-মাওয়াকিফ' ও 'শারহুল মাওয়াকিফ' গ্রন্থের নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়:

لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي الدال على نقيض ما دل عليه الدليل النقلي إذ لو وجد ذلك المعارض لقدم على الدليل النقلي قطعا بأن يؤول الدليل النقلي عن معناه إلى معنى آخر مثاله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فإنه يدل على الجلوس وقد عارضه الدليل العقلي الدال على استحالة الجلوس في حقه تعالى فيؤول الاستواء بالاستيلاء أو يجعل الجلوس على العرش كناية عن الملك وإنما قدم المعارض العقلي على الدليل النقلي إذ لا يمكن العمل بهما ... وتقديم النقل على العقل بأن يحكم بثبوت ما يقتضيه الدليل النقلي دون ما يقتضيه الدليل العقلي إبطال للأصل بالفرع فإن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل ... ... فقد تحقق أن دلالتها أي دلالة الأدلة النقلية على مدلولاتها يتوقف على أمور عشرة ظنية فتكون دلالتها أيضا ظنية .... وإذا كانت دلالتها ظنية لم تكن مفيدة لليقين بمدلولاتها هذا ما قيل والحق أنها أي الدلائل النقلية قد تفيد اليقين أي في الشرعيات بقرائن ....، نعم في إفادتها اليقين في العقليات نظر

"নকলী দলীল (কুরআন বা হাদীসের বক্তব্য) গ্রহণ করার পূর্বে জানতে হবে যে, ওহীর এ বক্তব্যটির বিপরীত অর্থ প্রকাশক কোনো আকলী দলীল বা জ্ঞানবৃত্তিক প্রমাণ বিদ্যমান নেই। কারণ যদি কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের বিপরীতে কোনো জ্ঞানবৃত্তিক প্রমাণ বিদ্যমান থাকে তবে নিশ্চিতভাবে জ্ঞানবৃত্তিক দলীলটিকে ওহীর বক্তব্যের উপরে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এজন্য নকলী দলীল বা ওহীর বক্তব্যকে তার অর্থ থেকে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। এর উদাহরণ মহান আল্লাহর বক্তব্য: 'দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।' এ বক্তব্য থেকে উপবেশন প্রমাণ হয়। আর জ্ঞানবৃত্তিক দলীল প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর জন্য উপবেশন অসম্ভব। কাজেই এখানে ইসতিওয়া (অধিষ্ঠান) শব্দটির ব্যাখ্যা হবে অধিকার করা বা দখল করা। অথবা আরশের উপর উপবেশন বলতে রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু দুটি দলীল একত্রে গ্রহণ করা সম্ভব নয় সেহেতু ওহীর বক্তব্যের উপরে জ্ঞানবৃত্তিক দলীলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদি জ্ঞান ও যুক্তির দাবিকে উপেক্ষা করে ওহীর বক্তব্য গ্রহণ করা হয় তবে তা শাখাকে গ্রহণ করার জন্য মূলকে বাতিল করা বলে গণ্য হবে। কারণ ওহীর বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা জ্ঞানবৃত্তিক দলীল ছাড়া প্রমাণ করা যায় না। ...."[৩৩৬]

তাঁরা আল-মাওয়াকিফ ও শারহুল মাওয়াকিফ গ্রন্থে আরো বলেন:

أنه تعالى ليس في جهة ولا في مكان.... وخالف فيه المشبهة، وخصصوه بجهة الفوق ... الاستدلال بالظواهر الموهمة بالتجسم من الآيات والأحاديث نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا... وحديث النزول، وقوله للخرساء أين الله فأشارت إلى السماء فقرر، ... والجواب أنها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات ومهما تعارض دليلان وجب العمل

بهما ما أمكن فتؤول الظواهر إما إجمالا ويفوض تفصيلها إلى الله كما هو رأي من يقف على إلا الله وعليه أكثر السلف كما روي عن أحمد الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة وأما تفصيلا كما هو رأي طائفة فنقول الاستواء الاستيلاء نحو قد استوى عمرو على العراق... والنزول محمول على اللطف والرحمة ...

"মহান আল্লাহ কোনো দিকে বা স্থানে নন। ... মুশাব্বিহা বা তুলনাকারী ফিরকা এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। উর্ধ্ব দিক বা স্থানকে তারা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।... তাদের পক্ষে দলিল হিসেবে কুরআন ও হাদীসের কিছু বক্তব্য- আয়াত ও হাদীস- পেশ করা হয় যেগুলো থেকে বাহ্যত ধারণা হয় যে, মহান আল্লাহ দেহধারী। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন", "আগমন করলেন আপনার রব এবং ফিরিশতাগণ কাতারে কাতারে"[৩৩৭], ... মহান আল্লাহর প্রথম আসমানে অবতরণ বিষয়ক হাদীস, অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাকশক্তিহীন মহিলাকে বলেন: আল্লাহ কোথায়? তখন মহিলা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার ইঙ্গিত মেনে নেন।... এ সকল আয়াত ও হাদীসের উত্তর এই যে, এগুলো সবই 'যান্নী' বা ধারণা প্রদানকারী (অস্পষ্ট) বাহ্যিক বক্তব্য (এগুলো একীন বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না) কাজেই এগুলোকে একীনী প্রমাণগুলোর বিপরীতে পেশ করা যাবে না। আর যখন দুটো দলীল পরস্পর বিরোধী হয় তখন যথাসম্ভব উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করে তা গ্রহণ করতে হয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসের এ সকল বাহ্যিক বক্তব্য এজমালিভাবে বা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। যারা বিষয়টিকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন তাদের মত হলো এজমালিভাবে এগুলোকে ব্যাখ্যা করা এবং বিস্তারিত আল্লাহর উপর সোপর্দ করা। অধিকাংশ সালফ সালিহীন (পূর্ববর্তী বুজুর্গ) এ মত গ্রহণ করেছেন। যেমন ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: অধিষ্ঠান জ্ঞাত, পদ্ধতি অজ্ঞাত এবং এ বিষয়ে গবেষণা বিদআত। বিস্তারিত ব্যাখ্যা এক দলের মত। এজন্য আমরা বলব: অধিষ্ঠান অর্থ দখল করা, যেমন বলা যায়: 'উমার ইরাকের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছে'- অর্থাৎ ইরাক দখল করেছে বা ইরাকের ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। ... অবতরণ বলতে মমতা ও রহমত বুঝানো হয়েছে। ...."[৩৩৮]

মাতুরিদী মতবাদের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা মাসঊদ ইবন উমার সা'দুদ্দীন তাফতাযানী (৭৯২ হি) এ প্রসঙ্গে বলেন:

الأدلة القطعية قائمة على التنزيهات، فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى على ما هو دأب السلف إيثارا للطريق الأسلم، أو يؤول بتأويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون....

"নিশ্চিত জ্ঞান প্রদানকারী দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ মানবীয় বিশেষণাদি থেকে পবিত্র। কাজেই কুরআন-হাদীসের বক্তব্যগুলোর জ্ঞান আল্লাহর কাছে সমর্পন করতে হবে। প্রথম যুগগুলোর সালাফ সালিহীন-এর এটিই রীতি এবং এটিই নিরাপদ পথ। অথবা এগুলোকে সঠিক ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যায়িত করতে হবে। পরবর্তী যুগের আলিমগণ এ মত গ্রহণ করেছেন.... ।"[৩৩৯]

উল্লেখ্য যে, আশআরী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবুল হাসান আশআরী নিজে অধিকাংশ বিশেষণ স্বীকার ও প্রমাণ করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز و جل وبسنة نبينا محمد ﷺ وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ... وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن الممارسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد. وأن له سبحانه وجها بلا كيف كما قال: "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام". وأن له سبحانه يدين بلا كيف كما قال سبحانه: "خلقت بيدي"، وكما قال: "بل يداه مبسوطتان"، وأن له سبحانه عينين بلا كيف كما قال سبحانه: "تجري بأعيننا".

"আমাদের মত, দীন ও ধর্ম এই যে, আমরা মহান আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সুন্নাত এবং উম্মাতের পুরোধাগণ: সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ এবং হাদীসের ইমামগণ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি... । আরো বলি যে, মহান আল্লাহ আরশের উপরে অধিষ্ঠান করেছেন, তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই এবং যে অর্থ তিনি উদ্দেশ্য করেছেন সে অর্থেই। এ অধিষ্ঠান স্পর্শ ও স্থিতি, উপবেশন, সংমিশ্রণ ও স্থানান্তর থেকে পবিত্র। আরশ তাঁকে বহন করে না; বরং আরশ ও আরশের বাহকগণ তাঁর সুক্ষ্ম ক্ষমতায় নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁর কবজার অধীন। তিনি আরশের উর্ধ্বে এবং মহাবিশ্বের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সকল কিছুর উর্ধ্বে। তাঁর এ উর্ধ্বত্ব তাঁকে আরশের ও আসমানের অধিক নিকটবর্তী করে না। বরং তিনি আরশ থেকে যেমন সুউচ্চ মর্যাদায় তেমনি যমিন থেকেও সুউচ্চ মর্যাদায়। একই সাথে তিনি সকল সৃষ্টির নিকটবর্তী। তিনি কণ্ঠের শিরার চেয়েও বান্দার নিকটবর্তী। এবং তিনি সকল কিছুর প্রত্যক্ষকারী। আমরা আরো বলি যে, মহান আল্লাহর একটি মুখমণ্ডল আছে, কোনোরূপ স্বরূপ বা প্রকৃতি ছাড়াই; কারণ তিনি বলেছেন[৩৪০]: "এবং

অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের মহিমাময় মহানুভব মুখমণ্ডল"। এবং মহান আল্লাহর দুটি হাত আছে, কোনোরূপ স্বরূপ-প্রকৃতি ব্যতিরেকে; কারণ তিনি বলেছেন[৩৪১]: "আমি সৃষ্টি করেছি আমার হস্তদ্বয় দ্বারা"। তিনি আরো বলেছেন[৩৪২]: "বরং তাঁর উভয় হাতই প্রসারিত"। এবং মহান আল্লাহর দুটি চোখ আছে কোনোরূপ স্বরূপ বা প্রকৃতি ব্যতিরেকে। কারণ আল্লাহ বলেছেন[৩৪৩]: "যা চলছিল আমার অক্ষির সম্মুখে..।"[৩৪৪]

ইমাম আবূ হানীফার "আল-ফিকহুল আবসাত" নামে পরিচিত 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর দ্বিতীয় ভাষ্যটির একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইমাম আবূ মানসূর মাতুরিদীর নামে মুদ্রিত। তবে গবেষকগণ নিশ্চিত করেছেন যে, গ্রন্থটি মূলত মাতুরিদীর ছাত্র পর্যায়ের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবুল লাইস সামারকান্দী নাসর ইবন মুহাম্মাদ (৩৭৩ হি)-এর রচিত। গ্রন্থটিতে বারবার ইমাম মাতুরিদীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং মাতুরিদী মাযহাবের ভিত্তিতেই গ্রন্থটি রচিত। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার একস্থানে বলেন:

وقالت القدرية والمعتزلة إن الله تعالى في كل مكان، واحتجتا بقوله تعالى: "وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله"، أخبر أنه في السماء وفي الأرض، إلا أنا نقول: لا حجة لكم في الآية... المراد به نفوذ الإلهية في السماء وفي الأرض، وبه نقول. وقول المعتزلة والقدرية في هذا أقبح من قول المشبهة؛ لأن قولهم يؤدي إلى أن الله تعالى في أجواف السباع والهوام والحشرات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما مذهب أهل السنة والجماعة أن الله على العرش علو عظمة وربوبية، لا علو ارتفاع مكان ومسافة

"মুতাযিলী ও কাদারিয়াগণ বলেন, আল্লাহ সকল স্থানে। আল্লাহ বলেছেন: "আসমানে তিনি মাবূদ এবং পৃথিবীতে তিনি মাবূদ"। এ আয়াত দিয়ে তারা বলে: তিনি তো বললেন যে, তিনি আসমানের মধ্যে এবং পৃথিবীর মধ্যে। আমরা বলি, এ আয়াত তোমাদের দাবি প্রমাণ করে না। ... এ আয়াতের অর্থ আসমান-যমীন সর্বত্র একমাত্র তাঁর ইবাদতই কার্যকর। ... মুতাযিলী ও কাদারিয়াদের কথা মুশাব্বিহা বা তুলনাকারীদের কথার চেয়েও জঘন্যতর। কারণ তাদের দাবি অনুসারে মহান আল্লাহ বন্যপ্রাণী, পশুপাখী ও কীটপতঙ্গের দেহের মধ্যে রয়েছেন। এরূপ অবস্থা থেকে আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে। আহলুস সুন্নাতের (মাতুরিদী) মত এই যে, আল্লাহ আরশের উপরে। তাঁর এ ঊর্ধ্বত্ব স্থান ও দূরত্বের ঊর্ধ্বত্ব নয়, বরং মর্যাদা ও প্রতিপালনের ঊর্ধ্বত্ব।"[৩৪৫]

ইমাম আশআরী ও ইমাম সামারকান্দীর বক্তব্যে আমরা দেখেছি যে, তাঁরা মহান আল্লাহর 'বাহ্যত মানবীয়' বিশেষণগুলো কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে গ্রহণ করেছেন। 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান' মতটিকে 'সর্বেশ্বরবাদ' বলে গণ্য করেছেন। অথচ বর্তমানে অনেক মুসলিম এ বিভ্রান্ত মতটিকেই ইসলামী আকীদা বলে গণ্য করেন। ওহীর বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহ বান্দার সাথে ও নিকটে এবং তাঁর জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর মহান সত্তা নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফের মত দেখুন। বাশ্‌শার ইবন মূসা খাফ্‌ফাফ বলেন:

جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف فقال له تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون قال وما يقولون قال يقولون الله في كل مكان فقال أبو يوسف علي بهم فانتهوا إليهم وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول وبالآخر شيخ فقال أبو يوسف ونظر إلى الشيخ لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك فأمر به إلى الحبس وضرب الأحول وطوف به

"বিশর ইবন ওলীদ কিন্দী কাযী আবূ ইউসুফের নিকট আগমন করে বলেন: আপনি তো আমাকে ইলমুল কালাম থেকে নিষেধ করেন, কিন্তু বিশর আল-মারীসী, আলী আল-আহওয়াল এবং অমুক ব্যক্তি কালাম নিয়ে আলোচনা করছে। আবূ ইউসুফ বলেন: তারা কী বলছে? তিনি বলেন: তারা বলছে যে, আল্লাহ সকল স্থানে বিরাজমান। তখন আবূ ইউসুফ বলেন: তাদেরকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এস। তখন তারা তাদের নিকট গমন করে। ইত্যবসরে বিশর আল-মারীসী উক্ত স্থান পরিত্যাগ করেছিলেন। এজন্য আলী আহওয়াল এবং অন্য একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ধরে আনা হয়। আবূ ইউসুফ বৃদ্ধ ব্যক্তিটির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন: আপনার দেহে শাস্তি দেওয়ার মত স্থান থাকলে আমি আপনাকে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিতাম। তিনি উক্ত বৃদ্ধকে কারারুদ্ধ করার নির্দেশ দেন এবং আলী আহওয়ালকে বেত্রাঘাত করা হয় এবং রাস্তায় ঘুরানো হয়।"[৩৪৬]

১০. ৪. বিশেষণ বিষয়ে প্রান্তিকতা

আশআরী-মাতুরিদী আলিমগণের মধ্যে অনেকেই ব্যাখ্যমুক্তভাবে বিশেষণগুলো বিশ্বাস করা উত্তম বলেছেন। কেউ ব্যাখ্যার পক্ষে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। মহান আল্লাহর হাত, চক্ষু, আরশের উপর অধিষ্ঠান, অবতরণ ইত্যাদি বিশেষণ তুলনামুক্তভাবে বিশ্বাসকারীদেরকে তাঁরা ঢালাওভাবে 'মুশাব্বিহা' (তুলনাকারী), 'মুজাস্‌সিমা (দেহে বিশ্বাসী) বা কাফির বলে গালি দিয়েছেন। এমনকি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যামুক্ত, তুলনামুক্ত ও 'কাইফ' বা স্বরূপ সন্ধানমুক্ত অনুবাদ করাকেও তারা একইরূপ বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেছেন। এর বিপরীতে সালফ সালিহীনের মত অনুধাবন ও ব্যাখ্যায়ও নানাবিধ প্রান্তিকতা বিদ্যমান। সালাফের অনুসরণের দাবিতে অনেকে আশআরী-মাতুরিদীগণকে ঢালাওভাবে 'জাহমী' বলেন। বিশেষণকে ব্যাখ্যামুক্তভাবে গ্রহণ করার পর অতুলনীয়ত্ব ব্যাখ্যায় কিছু বললেও তারা তা বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেন।

প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম হাসান ইবন হামিদ (৪০৩ হি), কাযী আবূ ইয়ালা মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), ইবনুয যাগওয়ানী আলী ইবন উবাইদুল্লাহ (৫২৭ হি) প্রমুখ প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ মহান আল্লাহর মুখগহ্বর, দাঁত, বক্ষ, উরু... ইত্যাদি আছে বলে বিশ্বাস করতেন। ইবনুল জাওযীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কুরআন, সহীহ হাদীস, যয়ীফ হাদীস, তাবিয়ী যুগের কোনো কোনো আলিমের বক্তব্য সবকিছুকে একইভাবে 'ওহীর' মান প্রদানের ফলে তাঁরা এরূপ প্রান্তিকতায় নিপতিত হন। ব্যাখ্যাবিহীন গ্রহণের নামে তাঁরা ওহীর সাথে সংযোজনের মধ্যে নিপতিত হতেন।[৩৪৭]

১১. পরবর্তীগণের মতপার্থক্য পর্যালোচনা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, জাহমী, মুতাযিলী ও সমমনা ফিরকা ছাড়াও সাহাবী-তাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের মধ্যেও নানাবিধ মতভেদ ও প্রান্তিকতা জন্ম নিয়েছে। নিম্নের কয়েকটি বিষয় হয়ত আমাদেরকে এ বিষয়ক প্রান্তিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে:

১১. ১. বিশেষণগুলোর অর্থ অজ্ঞাত অথবা জ্ঞাত

কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, সালাফ সালিহীন আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ক কুরআন-হাদীসের বক্তব্যগুলো "অজ্ঞাতঅর্থ" বা "অর্থ বিহীন শব্দ" হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এগুলোর অর্থ মানবীয় জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত বলে গণ্য করেছেন এবং অর্থের বিষয়টি মহান আল্লাহর উপর সমর্পন করেছেন। সালাফ সালিহীনের দু-একটি বক্তব্যকে তাঁরা তাঁদের এ মতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন। আমরা দেখেছি সুফইয়ান ইবন উআইনা বলেছেন: "আল্লাহ কুরআনে নিজের বিষয়ে যে সকল বিশেষণ উল্লেখ করেছেন তার পাঠই তার ব্যাখ্যা কোনো স্বরূপ নেই এবং তুলনা নেই।" আওযায়ী, মালিক, সুফিয়ান সাওরী, লাইস ইবন সা'দ প্রমুখ আলিম বলেছেন: "এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে নাও; কোনোরূপ স্বরূপ-প্রকৃতি ব্যতিরেকে।" আহমদ ইবন হাম্বাল বলেছেন: "আমরা এগুলো বিশ্বাস করি, সত্য বলে গ্রহণ করি, কোনো 'কিভাবে' নেই এবং কোনো অর্থ নেই। " এ সকল বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন যে, সালাফ সালিহীনের মতে মহান আল্লাহর বিশেষণগুলোর অর্থ "অজ্ঞাত"।

কিন্তু আমরা যখন সালফ সালিহীনের বক্তব্যগুলো পূর্ণভাবে পাঠ করি তখন আমরা নিশ্চিত হই যে, তাঁরা এ সকল বিশেষণের অর্থ জ্ঞাত তবে ব্যাখ্যা অজ্ঞাত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা অর্থ বিশ্বাস করেছেন এবং স্বরূপ, হাকীকত বা ব্যাখ্যার জ্ঞানকে আল্লাহর উপর সমর্পন করেছেন। তাঁরা সর্বদা বলেছেন, এ সকল বিশেষণ পাঠ বা শ্রবণ করলে যা বুঝা যায় তাই এর অর্থ এবং তুলনামুক্ত ও স্বরূপহীনভাবে এ অর্থ বিশ্বাস করতে হবে। এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ, তাবীল বা ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা যাবে না।

আমরা দেখেছি তাবিয়ী মুজাহিদ বলেছেন: 'আরশের উপর 'ইসতিওয়া' করেছেন অর্থ আরশের ঊর্ধ্বে থেকেছেন।" তিনি বলেন নি যে, এ বাক্যটির অর্থ অজ্ঞাত। 'ইসতিওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে ইমাম মালিক ও অন্যান্য ইমাম বলেন নি যে, আল্লাহর ক্ষেত্রে ইসতিওয়া কথাটির অর্থ আমরা জানি না। বরং তাঁরা স্পষ্টভাবেই বলেছেন 'ইসতিওয়া' একটি জ্ঞাত বিষয়, তবে তার পদ্ধতি, স্বরূপ বা প্রকৃতি অজ্ঞাত।

ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন: "তাঁর হস্ত আছে, মুখমণ্ডল আছে, নফস আছে, কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলো উল্লেখ করেছেন।" এখানে লক্ষণীয় যে, এ কথাগুলো কুরআনের হুবহু বক্তব্য নয়। কুরআনের বক্তব্য: তিনি হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর হস্তদ্বয় প্রসারিত... ইত্যাদি। ইমাম আযমের বক্তব্য কুরআনের বক্তব্যের 'আরবী অনুবাদ'। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, তারা এগুলোর অর্থ পরিজ্ঞাত ও বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত বলে গণ্য করেছেন। তাঁকে অবতরণ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন নি যে, তিনি অবতরণ করেন না অথবা অবতরণ শব্দের অর্থ অপরিজ্ঞাত। বরং তিনি বলেছেন: "মহান আল্লাহ অবতরণ করেন, কোনোরূপ পদ্ধতি বা স্বরূপ ব্যতিরেকে।"

আমরা দেখব যে, ইমাম আবূ হানীফা আল্লাহর বিশেষণসমূহ অনুবাদ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ ইসলাম সকল ভাষার মানুষের জন্য। অনুবাদ না করলে অন্য ভাষার মানুষেরা এ বিশেষণগুলো কিভাবে বিশ্বাস করবেন? 'অর্থহীন শব্দ'- বিশ্বাস করবেন? না ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করবেন? 'রহমান আরশের উপর অধিষ্ঠান করলেন' কথাটির অনুবাদে কী লিখতে হবে? 'ইসতিওয়া' লিখলে অন্য ভাষার মুমিনগণ কী বিশ্বাস করবেন? আর 'ক্ষমতা গ্রহণ' লিখলে তো নিষিদ্ধ ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেওয়া হলো। 'আল্লাহর শেষ রাত্রে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন' হাদীসটির অনুবাদ কিভাবে হবে? 'নুযুল করেন' লিখলে অনারব পাঠক কী বুঝবেন ও বিশ্বাস করবেন? আর ব্যাখ্যা লিখলে তো মুতাযিলা ও কাদারিয়াদের পথে চলা হলো। এতে সুস্পষ্ট যে, ইমামগণ এ সকল বিশেষণের অর্থ জ্ঞাত (মুহকাম) ও হাকীকত অজ্ঞাত (মুতাশাবিহ) বলে গণ্য করতেন।

১১. ২. বিশেষণগুলোর প্রকাশ্য অর্থ স্বীকৃত বা বর্জিত

উপরের অর্থেই কোনো কোনো আশআরী-মাতুরিদী আলিম বলেছেন, সালাফ সালিহীন একমত যে, এ সকল বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যক্ত। বাহ্যিক অর্থ বলতে যদি 'তুলনাযুক্ত বাহ্যিক অর্থ' বুঝানো হয় তবে কথাটি ঠিক। অর্থাৎ হাত, অধিষ্ঠান, চক্ষু, নফস, ক্রোধ, সন্তুষ্টি, অবতরণ ইত্যাদি শব্দ থেকে যদি কেউ সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান এ সকল বিশেষণ বা কর্ম কল্পনা করে তবে তা বাতিল। আর যদি বাহ্যিক অর্থ বলতে 'তুলনামুক্ত আভিধানিক অর্থ' বুঝানো হয় তবে এ কথাটি সঠিক নয়। সালাফ সালিহীনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তারা এগুলোকে আভিধানিক অর্থে তুলনামুক্ত ও স্বরূপমুক্তভাবে বিশ্বাস করেছেন। তাঁরা বারবার বলেছেন: এগুলো বিশ্বাস করতে হবে। যদি এগুলোর অর্থ অজ্ঞাত থাকে বা প্রকাশ্য অর্থ বর্জিত হয় তবে কী বিশ্বাস করতে হবে?

পাঠক, উপরে উদ্ধৃত চার ইমাম ও অন্যান্য সালাফ সালিহীনের বক্তব্য আরেকবার পাঠ করুন। আপনি নিশ্চিত হবেন যে, তাঁরা মহান আল্লাহর বিশেষণগুলোকে বাহ্যিক অর্থে তুলনার কল্পনা মন থেকে তাড়িয়ে স্বরূপবিহীনভাবে বিশ্বাস করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ

"তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও ফিরিশ্তারা মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন? এবং সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে।"[৩৪৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বাগাবী হুসাইন ইবন মাসঊদ (৫১০ হি) বলেন:

والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث، على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة.

"এ আয়াত এবং এ ধরনের আয়াতগুলোর বিষয়ে উত্তম এই যে, এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ বিশ্বাস করবে এবং এর জ্ঞান আল্লাহর উপর সমর্পন করবে। এবং বিশ্বাস করবে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র। সালাফ সালিহীন ইমামগণ এবং আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ এ বিশ্বাসের উপরেই থেকেছেন।"[৩৪৯]

মহান আল্লাহ জাহান্নামের মধ্যে পদ স্থাপন করবেন, তিনি হাসবেন, তিনি আনন্দিত হন ইত্যাদি অর্থের হাদীসগুলো উল্লেখ করে ইমাম বাগাবী বলেন:

فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد بها السمع يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق ... وعلى هذا مضى سلف الأمة ، وعلماء السنة ، تلقوها جميعا بالإيمان والقبول ، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل ، ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل

"এগুলো এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয় মহান আল্লাহর বিশেষণ। শ্রুতি বা ওহীর বর্ণনা এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো: এগুলোকে বিশ্বাস করা এবং বাহ্যিক অর্থের উপর এগুলো চালিয়ে নেওয়া। এগুলোর ব্যাখ্যা বর্জন করতে হবে এবং তুলনা পরিত্যাগ করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান সৃষ্টিকর্তার কোনো বিশেষণই সৃষ্টির বিশেষণের মত নয়; যেমন তাঁর সত্তা সৃষ্টির সত্তার মত নয়।... উম্মাতের সালাফ সালিহীন এবং আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ এ বিশ্বাসের উপরেই থেকেছেন। তাঁরা সকলেই তা বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছেন এবং তুলনা ও ব্যাখ্যা বর্জন করেছেন। এর জ্ঞান মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছেন।...।"[৩৫০]

এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী বলেন: "বর্তমানে বাহ্যিক অর্থ দু প্রকার হয়ে গিয়েছে: একটি হক্ক ও অন্যটি বাতিল। 'হক্ক বাহ্যিক অর্থ' এ কথা বলা যে, মহান আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী, ইচ্ছাকারী, কথা বলেন, হায়াত বা প্রাণের অধিকারী চিরঞ্জীব, জ্ঞানী, তাঁর মুখমণ্ডল ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হবে, তিনি আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন, তিনি মূসার সাথে প্রকৃতই কথা বলেন, তিনি ইবরাহীমকে খলীল (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেন... এবং অনুরূপ বিষয়াদি; এগুলোকে আমরা যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে নিই। এগুলো থেকে আমরা সম্বোধনের অর্থ বুঝি যা মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এর ব্যতিক্রম কোনো ব্যাখ্যা আছে বলে আমরা বলি না। আর অন্য 'বাহ্যিক অর্থ' বাতিল এবং বিভ্রান্তি। তা হলো অদৃশ্যকে দৃশ্যমানের উপর কিয়াস বা তুলনা করা এবং স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করায় বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহ এরূপ তুলনা থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। বরং তাঁর বিশেষণও তাঁর সত্তার মতই। তার সমতুল্য নেই, বিপরীত নেই, নমুনা নেই, তুলনা নেই, প্রতিরূপ নেই, কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, তাঁর সত্তার ক্ষেত্রেও নয় এবং তাঁর বিশেষণের ক্ষেত্রেও নয়। আর এ বিষয়টির ক্ষেত্রে আলিম-পণ্ডিত এবং সাধারণ মানুষ সকলেই সমান। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।"[৩৫১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, সালাফ সালিহীন এগুলো 'বাহ্যিক অর্থ' জ্ঞাত বলে বিশ্বাস করেছেন এবং এগুলোকে বাহ্যিক অর্থে চালিয়ে নিতে ও বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি এর 'বাহ্যিক তুলনা' বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা ও হাকীকতের জ্ঞান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

১১. ৩. ওহীর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ তুলনা কি না

এ সকল বিশেষণের অর্থ অজ্ঞাত এবং এর প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যক্ত- এ দুটি দাবির ভিত্তিতে কোনো কোনো আলিম তুলনামুক্তভাবে প্রকাশ্য অর্থে আল্লাহর বিশেষণ বিশ্বাসকারীকে মুজাস্সিমা (দেহে বিশ্বাসী) বা মুশাব্বিহা (তুলনাকারী) বলে অভিযুক্ত করেন। অর্থাৎ যদি কেউ বলেন: "মহান আল্লাহর হস্ত আছে, মুখমণ্ডল আছে, তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠান করেছেন, শেষ রাত্রে অবতরণ করেন; স্বরূপ ছাড়া, সৃষ্টির মত নয়" তবে তাঁরা তাকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন। বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। কেউ নিজ মুখে তুলনার দাবি না করলে তাকে তুলনাকারী বলা সঠিক নয়; বিশেষত কুরআন-হাদীসের বক্তব্য হুবহু বিশ্বাসের পাশাপাশি যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের স্বীকৃতি

প্রদান করছেন। এছাড়া কুরআন বা হাদীস যা বলেছে হুবহু তা নিজের ভাষায় বললে বা বিশ্বাস করলে কোনো মুমিন অপরাধী হন বলে চিন্তা করাও মুমিনের জন্য কঠিন। এখানে প্রসঙ্গত ইমাম তিরমিযীর একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন:

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ .... قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ... وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ وَنُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالُوا قَدْ تَثْبُتُ الرِّوَايَاتُ فِى هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلاَ يُتَوَهَّمُ وَلاَ يُقَالُ كَيْفَ هَكَذَا رُوِىَ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِى هَذِهِ الأَحَادِيثِ أَمِرُّوهَا بِلاَ كَيْفٍ. وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَالُوا هَذَا تَشْبِيهٌ. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْيَدَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ فَتَأَوَّلَتِ الْجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الآيَاتِ فَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ. وَقَالُوا إِنَّ مَعْنَى الْيَدِ هَا هُنَا الْقُوَّةُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ إِذَا قَالَ يَدٌ كَيَدٍ أَوْ مِثْلُ يَدٍ أَوْ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ. فَإِذَا قَالَ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ فَهَذَا التَّشْبِيهُ وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَدٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ وَلاَ يَقُولُ كَيْفَ وَلاَ يَقُولُ مِثْلُ سَمْعٍ وَلاَ كَسَمْعٍ فَهَذَا لاَ يَكُونُ تَشْبِيهًا وَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِى كِتَابِهِ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).

"... রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আল্লাহ দান কবুল করেন এবং তা তাঁর ডান হাত দ্বারা গ্রহণ করেন। .... আবূ ঈসা (তিরমিযী) বলেন: এটি হাসান সহীহ হাদীস। .... এ হাদীস এবং এ ধরনের যে সকল হাদীসে আল্লাহর বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, মহান মহাপবিত্র প্রতিপালকের প্রথম আসমানে অবতরণের কথা বর্ণিত হয়েছে সে সকল হাদীস বিষয়ে আলিমগণ বলেছেন যে, হাদীস দ্বারা এগুলো প্রমাণিত এবং এগুলো বিশ্বাস করতে হবে, তবে কোনো কল্পনা করা যাবে না এবং 'কিভাবে' বলা যাবে না। মালিক, সুফিয়ান ইবন উআইনা, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক থেকে এ সকল হাদীসের বিষয়ে বর্ণিত যে, তোমরা এগুলোকে 'কিভাবে' (স্বরূপ সন্ধান) ব্যতিরেকে চালিয়ে নেও। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমদের এটিই মত। কিন্তু জাহমীগণ এ সকল হাদীস অস্বীকার করেছে। তারা বলে, এগুলো তুলনা। মহান আল্লাহ কুরআনের অনেক স্থানে হাত, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি বিশেষণ উল্লেখ করেছেন। জাহমীগণ এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করে। আলিমগণ এগুলোর যে ব্যাখ্যা করেছেন (স্বরূপ বিহীন বিশ্বাস করা) জাহমীদের ব্যাখ্যা তার বিপরীত। তারা বলে: আল্লাহ আদমকে তাঁর হাত দিয়ে সৃষ্টি করেন নি। তারা বলে: এখানে হাত অর্থ ক্ষমতা। ইসহাক ইবন ইবরাহীম (ইবন রাহওয়াইহি) বলেন: তুলনা তো তখনই হয় যখন কেউ বলে: হাতের মত হাত, অথবা হাতের সাথে তুলনীয় হাত, শ্রবণের মত শ্রবণ অথবা শ্রবণের তুলনীয় শ্রবণ। কাজেই যদি কেউ বলে শ্রবণের মত শ্রবণ বা শ্রবণের সাথে তুলনীয় শ্রবণ তবে তা 'তুলনা'। আর যখন কেউ আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে বলে: হাত, শ্রবণ, দর্শন, কিন্তু 'কিভাবে' বলে না এবং 'শ্রবণের মত' বা 'শ্রবণের সাথে তুলনীয়'ও বলে না তখন তা তুলনা নয়। আল্লাহ কুরআনে এভাবেই বলেছেন: "কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয় এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[৩৫২]

এখানে ইসহাক ইবন রাহওয়াইহি বলেছেন যে, জাহমীগণের মতে আল্লাহর হাত, আল্লাহর শ্রবণ ইত্যাদি বলা বা বিশ্বাস করার অর্থই মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত বলেন, তুলনা করলেই তো তুলনা হয়। কেউ যদি বলে মহান আল্লাহর হাত সৃষ্টির হাতের মত, তাঁর শ্রবণ সৃষ্টির শ্রবণের মত, তাঁর দর্শন সৃষ্টির দর্শনের সাথে তুলনীয়... তবেই তা তুলনা বলে গণ্য হবে। আর যদি কেউ আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবেই বলে তাহলে তা কখনোই তুলনা হতে পারে না।

১১. ৪. ব্যাখ্যা সমস্যার সমাধান করে না

ব্যাখ্যাপন্থী আলিমগণ বলেন যে, বিশেষণগুলোর ব্যাখ্যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের বিশ্বাস রক্ষা করা যায়। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত: আশআরী-মাতুরিদীগণ ৮টি বিশেষণ স্বীকার এবং অন্যান্য বিশেষণ অস্বীকার করেছেন। যে যুক্তিতে তাঁরা অন্যান্য বিশেষণ অস্বীকার করেছেন সে যুক্তিতেই এ ৮ টি বিশেষণও অস্বীকার করেছেন জাহমী-মুতাযিলীগণ। জাহমীগণ বলেন: কর্ণ ছাড়া শ্রবণ, চক্ষু ছাড়া দেখা, বাগযন্ত্র ছাড়া কথা বলা, মানসিক পরিবর্তন ছাড়া ইচ্ছা ইত্যাদি কল্পনা করা যায় না। কর্ণ, চক্ষু, বাগযন্ত্র, মানসিক পরিবর্তন ইত্যাদি আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। জীবন, ক্ষমতা, ইলম, ইচ্ছা ইত্যাদি বিশেষণেরও একই অবস্থা। এগুলো সৃষ্টির বিশেষণ। মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলো বিশ্বাস করার অর্থই মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনীয় ও দেহধারী বলে বিশ্বাস করা। এছাড়া আশআরী-মাতুরিদী আকিদাবিদগণ আখিরাতে আল্লাহর দর্শনে বিশ্বাসী। মুতাযিলীগণ তাদেরকে এজন্য মুজাস্সিমা-মুশাব্বিহা বলেন। কারণ অবয়ব ও কোনো স্থানে অবস্থান ছাড়া কাউকে দেখা সম্ভব নয়। তাদের মতে মহান আল্লাহকে আখিরাতে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনীয় ও দেহধারী বলে বিশ্বাস করা।

আশআরী-মাতুরিদী আলিমগণ বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলেন যে, মহান আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, জীবন ইত্যাদি কোনো বিশেষণই সৃষ্টির মত নয়। আখিরাতে আল্লাহকে দেখা আর দুনিয়াতে কোনো সৃষ্টিকে দেখা এক নয়। বাস্তবে এ যুক্তিগুলোই অবশিষ্ট যাতী ও ফি'লী সকল বিশেষণ স্বীকার ও বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত: ব্যাখ্যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্ব রক্ষা করার দাবিও সঠিক নয়। যেমন, আরশের উপর অধিষ্ঠান বলতে 'দখল' বা 'ক্ষমতা গ্রহণ' বললেও একই সমস্যা থাকে। কারণ দখল বা ক্ষমতা গ্রহণও অধিষ্ঠানের মতই মানবীয় কর্ম। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ

মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও হানাফী ফকীহ আল্লামা মাহমূদ ইবন আব্দুল্লাহ হুসাইনী আলূসী (১২৭০হি/১৮৫৪খৃ) বলেন: "জেনে রাখুন, অনেক মানুষ নকলী দলীল বা কুরআন-হাদীসের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত বিশেষণগুলো মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট অর্থবোধক বলে গণ্য করেন। যেমন আরশের উপর অধিষ্ঠান, হস্ত, পদ, প্রথম আসমানে অবতরণ, হাস্য, অবাক হওয়া ইত্যাদি বিশেষণ। সালফ সালিহীন বা প্রথম যুগের বুজুর্গদের মতানুসারে এগুলো সবই প্রমাণিত বিশেষণ, তবে এগুলোর প্রকৃতি মানবীয় জ্ঞানের অগম্য। এগুলোর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদেরকে অন্য কোনো (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা প্রকৃতি উন্মোচনের) দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। এগুলোর অস্তিত্বে বিশ্বাসের সাথে সাথে বিশ্বাস করতে হবে যে এগুলো দেহ নয় এবং সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়। এভাবেই কুরআন-হাদীসের বক্তব্য ও জ্ঞানবৃত্তিক যুক্তির মধ্যে বৈপরীত্য দূরীভূত হয়।

পরবর্তী যুগের আলিমগণ এগুলো ব্যাখ্যা করার এবং এগুলো দ্বারা মহান আল্লাহ কি বুঝিয়েছেন তা নির্ধারণ করার মত গ্রহণ করেছেন। যেমন তারা বলেন: আরশের উপর অধিষ্ঠান অর্থ দখল গ্রহণ ও বিজয় লাভ। তাঁদের মতে মহান আল্লাহর আটটি বিশেষণ ছাড়া আর কোনো বিশেষণ নেই। আর দখল করা বা বিজয় লাভ করা আটটি বিশেষণের কোনো একটি বিশেষণের প্রকাশ মাত্র। .... শা'রানী (৯৭৩ হি) আদ-দুরারুল মানসূরাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সালফ সালিহীনের মাযহাবই অধিক নিরাপদ ও অধিক শক্তিশালী। কারণ ব্যাখাকারীগণ আরশের উপর অধিষ্ঠানের অর্থ করেছেন রাজ্য দখল করা। এভাবে দেহ ও স্থান থেকে পবিত্র করতে যেয়ে তারা অন্য একটি মানবীয় ও স্থান নির্ভর কর্মের সাথে তাঁকে সম্পৃক্ত করেছেন। বস্তুত তাদের জ্ঞান মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় শরীয়তের পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারে নি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় শরীয়তের পূর্ণতা প্রকাশিত হয় কুরআনের বক্তব্যে: "কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়"। আরশের উপরে অধিষ্ঠানের ব্যাখ্যায় আরশের উপর ক্ষমতাবান বা দখলদার হওয়ার কথা বললেও সাথে সাথে এ কথা বলতেই হবে যে, মহান আল্লাহর আরশ দখল মানুষদের দেশ দখলের সাথে তুলনীয় নয়। বরং মহান আল্লাহ তাঁর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো পদ্ধতিতে আরশের উপর ক্ষমতাবান হন। আর 'অধিষ্ঠান'-কে 'দখল গ্রহণ' বলে ব্যাখ্যা করার পরেও যেহেতু এরূপ কিছু বলতে হচ্ছে, সেহেতু ব্যাখ্যার কষ্ট বহনের পূর্বেই তাদের বলা উচিত যে, মহান আল্লাহ আরশের উপরে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন, তবে তা মানবীয় অধিষ্ঠানের সাথে তুলনীয় নয়। তাঁর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো পদ্ধতিতে তিনি তা করেছেন। মানবীয় জ্ঞান তাঁর ক্ষমতার প্রকৃতি জানতে অক্ষম। এরূপ বলাই আদবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ... ।[৩৫৩]

১১. ৫. সকল ব্যাখ্যাকারীই জাহমী কি না

এর বিপরীতে আমরা দেখি যে, সালাফ সালিহীনের কোনো কোনো অনুসারী আশআরী-মাতুরিদীগণকে ঢালাওভাবে জাহমী বলছেন বা মুতাযিলী, জাহমী, আশআরী, মাতুরিদী সকলকেই এক সারিতে দাঁড় করাচ্ছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(ক) আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে 'জাহমী-মুতাযিলী' আকীদার পার্থক্য শুধু বিশেষণ বিষয়ে নয়। অনেক বিষয়ের মধ্যে বিশেষণ একটি বিষয়। সকল বিষয়ে বিভ্রান্তি এবং একটি বিষয়ে বিভ্রান্তিকে একই পর্যায়ের বলে গণ্য করা সঠিক নয়।

(খ) বিশেষণ বিষয়েও জাহমী-মুতাযিলীগণের মতবাদ ও আশআরী-মাতুরিদী মতবাদের মধ্যে ব্যাখ্যার বিষয়, পরিধি, মূলনীতি ও প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। এজন্য বিশেষণ বিষয়েও উভয় মতকে এক পর্যায়ভুক্ত করা সঠিক নয়।

(গ) অনেক আলিম ব্যাখ্যাহীন বিশ্বাস ও ব্যাখ্যা উভয় মত স্বীকার করার পাশাপাশি কোনো কোনো বিশেষণ ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে ব্যাখ্যাহীন ও তুলনাহীন বিশ্বাসকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন কিন্তু কোনো কোনো বিশেষণ ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে তাঁদেরকেও ব্যাখ্যাকারী-অস্বীকারকারীদের কাতারভুক্ত করেন। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। আমরা দেখেছি যে, সালাফ সালিহীন এবং তাঁদের অনুসারী কোনো কোনো ইমাম থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত।

(ঘ) আমরা দেখেছি, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন: "তাঁর হাত ... অঙ্গ নয়...", "আমরা বাগযন্ত্র ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলি, আর মহান আল্লাহ বাগযন্ত্র এবং অক্ষর ছাড়াই কথা বলেন", "মহান আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন, ... আরশের উপরে স্থিরতা-উপবেশন ব্যতিরেকে"... ।

ইমাম আহমদ বলেছেন: "মহান আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত। ... অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ তিনি এর উর্ধ্বে ... অধিষ্ঠানের অর্থ আরশ স্পর্শ করে অবস্থান করা নয়,...", "মহান আল্লাহর ... মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি বা আকৃতি নয় এবং আঁকানো বস্তুর মতও নয়। বরং মুখমণ্ডল তাঁর একটি মহান বিশেষণ। ... মুখমণ্ডল অর্থ দেহ, ছবি বা আকৃতি নয়। ... মহান আল্লাহর দুটি হস্ত বিদ্যমান। ... হস্তদ্বয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, দেহের অংশ নয়, দেহ নয়, দেহ জাতীয় কিছু নয়, সীমা, সংযোজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাতীয় কিছুই নয়। ... এতে কনুই, বাহু ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনার সুযোগ নেই।... ।"

অনেক আবেগী মুমিন এগুলোকে নিন্দনীয় ব্যাখ্যা বলে গণ্য করে প্রশ্ন করেন: তাঁর হস্ত অঙ্গ নয়, তাঁর কথা অক্ষর নয়, তাঁর ইসতিওয়া স্পর্শ নয়, তাঁর মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি নয়... আমরা কিভাবে জানলাম? যেহেতু ওহীতে এ কথাগুলো নেই, সেহেতু এগুলো বলা যাবে না, বরং শুধু বলতে হবে আল্লাহর হস্ত, মুখমণ্ডল.. ইত্যাদি আছে এবং তা সৃষ্টির মত নয়। প্রকৃতপক্ষে ইমামগণের এ কথা বিশেষণের ব্যাখ্যা বা ওহীর সাথে কোনো সংযোজন নয়, বরং মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের ব্যাখ্যা। মহান আল্লাহ তাঁর নিজের বিষয়ে বলেন নি যে, তাঁর মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি, তাঁর হস্ত অঙ্গ, তাঁর ইসতিওয়া স্পর্শ ... । অথচ এ সকল বিশেষণ বর্ণনা বা শ্রবণ করলে মানবীয় ধারণায় এরূপ চিন্তা চলে আসে। এজন্য অতুলনীয়ত্ব নিশ্চিত করতেই ইমামগণ এরূপ বলেছেন।

(ঙ) ব্যাখ্যাকে ভুল বলা ও ব্যাখ্যাকারীকে বিভ্রান্ত বলা এক নয়। পারিপার্শিকতা বা যুগের প্রভাবে অথবা সাধারণ মানুষদেরকে

তুলনায় নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে অনেক প্রসিদ্ধ আলিম মহান আল্লাহর কোনো কোনো বিশেষণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের ইজতিহাদকে ভুল বলে গণ্য করা আর তাঁদের অবমূল্যায়ন করা এক নয়। 'তাকফীর' প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, ইবন তাইমিয়া ও অন্যান্য আলিম বলেছেন: ফিকহী বিষয়ের ন্যায় আকীদার বিষয়ে ইজতিহাদী ভুল ক্ষমাকৃত। এজন্য আমাদের উচিত জ্ঞানবৃত্তিক সমালোচনা করা। আমরা বলতে পারি, অমুকের অমুক বক্তব্য তুলনা বা অস্বীকারের পর্যায়ে চলে যায় বা কথাটি সঠিক নয়। পাশাপাশি সকল মুমিন, বিশেষত আলিমগণের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ করা, মুমিনের বিষয়ে সুধারণা পোষণ এবং মুমিনের বক্তব্যের ভাল ব্যাখ্যা করাই আমাদের দায়িত্ব।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা অনুধাবন করছি যে, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব প্রতিটি মানুষই তার জন্মগত প্রকৃতি ও সহজাত অনুভূতি দিয়ে অনুভব করে। তবে তাঁর সত্তার ও বিশেষণের প্রকৃতি পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা মানবীয় সাধ্যের বাইরে। এক্ষেত্রে ওহীর নিকট আত্মসমর্পনই নিরাপত্তার একমাত্র উপায়। ওহীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর যে পরিচয় প্রদান করেছেন তাঁকে জানার বা তাঁর মারিফাত অর্জনের সেটিই আমাদের একমাত্র উপায়। পাশাপাশি এ বিষয়ক প্রান্তিকতা পরিহার করা প্রয়োজন।

১২. মহান আল্লাহর বিশেষণ অস্বীকার বা ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: **"যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহর কোনো সিফাত বা বিশেষণ সৃষ্ট অথবা নতুন, অথবা এ বিষয়ে সে কিছু বলতে অস্বীকার করে, অথবা এ বিষয়ে সে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান-বিহীন কাফির।"**

বিশেষণের ব্যাখ্যা করা বা বাহ্যিক অর্থের বাইরে কোনো রূপক অর্থ গ্রহণ করাকেও ইমাম আবূ হানীফা বিশেষণ অস্বীকার করা বা বাতিল করার সমপর্যায়ের বলে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন: **"এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর ক্ষমতা অথবা তাঁর নিয়ামত। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর বিশেষণ বাতিল করে দেওয়া। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের রীতি।"**

ইমাম আযমের এ কথার ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী বলেন: অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর আরশের উপর অধিষ্ঠানের (ইসতিওয়ার) ব্যাখ্যায় ক্ষমতা গ্রহণ (ইসতিলা) বলা যাবে না। কারণ এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বিশেষণটিকে পুরোপুরিই বাতিল করা হয়।[৩৫৪]

ইমাম আবূ হানীফা আরো বলেছেন: **"তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর বিশেষণসমূহের দুটি বিশেষণ, কোনো স্বরূপ নির্ণয় ছাড়া। এ-ই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর মত। মহান আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর ক্রোধ অর্থ তাঁর শাস্তি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্থ তাঁর পুরস্কার। আল্লাহ নিজে নিজেকে যেরূপে বিশেষিত করেছেন আমরাও তাঁকে সেভাবেই বিশেষিত করি।"**

বস্তুত কুরআন বা হাদীসের কোনো কিছু কোনো মুসলিম সরাসরি অস্বীকার করেন না। কিন্তু অনেক সময় ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন, যা অস্বীকার করারই নামান্তর। কোনো বিশেষণকে ব্যাখ্যা করে তার সরল অর্থের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ বিশেষণটিকে বাতিল করা। আর এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা ব্যাখ্যা বা রূপক অর্থ গ্রহণ করাও বিভ্রান্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

১৩. ইমামগণের ব্যাখ্যা-বিরোধিতার কারণ

সালফ সালিহীন অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর প্রথম যুগগুলোর বুজুর্গগণের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন কারণে তাঁরা মহান আল্লাহর বিশেষণ ব্যাখ্যা করার বিরোধিতা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নের কারণগুলো অন্যতম:

১৩. ১. আল্লাহর নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুমান-নির্ভর কথা বর্জন

মহান আল্লাহই তাঁর নিজের সত্তা ও বিশেষণাদি সম্পর্কে সঠিক জানেন। তিনি চান যে বান্দা তাঁর প্রকৃত মারিফাত অর্জন করে তাঁর ইবাদত করুক। এজন্যই তিনি কুরআন অবতরণ করেছেন, অনুধাবনের জন্য সহজ করেছেন, সকল মুমিনের জন্য সালাতে ও সালাতের বাইরে নিয়মিত কুরআন পাঠের বিধান করেছেন এবং কুরআনের মধ্যে তাঁর পরিচয় সহজ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্য মুমিনের বিশ্বাস করা উচিত যে, কুরআনে মহান আল্লাহ নিজের বিষয়ে যা বলেছেন তা সরলভাবে বিশ্বাস করা এবং এগুলো থেকে মহান আল্লাহর মারিফাত, ঈমান, মহব্বত ও ইবাদত অর্জন করাই মুমিনের দায়িত্ব। এ সকল বিশেষণের কোনো রূপক জানিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, এগুলোর সরল অর্থ বাদ দিয়ে কোনো রূপক অর্থ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলেও আল্লাহ জানান নি। এজন্য এ সকল বিশেষণের কোনো রূপক অর্থ আছে বলে দাবি করা যেমন ওহীর ইলম ছাড়া আন্দাযে আল্লাহর বিষয়ে কথা বলা, তেমনি কোনো একটি বিশেষণের এক বা একাধিক রূপক অর্থ নির্ধারণ করাও ওহীর জ্ঞান ছাড়া অনুমানের উপর আল্লাহর নামে কথা বলা। মহান আল্লাহ তাঁর বিষয়ে আন্দাযে কথা বলতে বারবার নিষেধ করেছেন।[৩৫৫] এ অর্থেই ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন: "মহান আল্লাহর সত্তার বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা কারো জন্য বৈধ নয়; বরং তিনি নিজেকে যে বিশেষণে বিশেষিত করেছেন তাঁর বিষয়ে শুধু সে বিশেষণই আরোপ করতে হবে। এ বিষয়ে নিজের মত, যুক্তি বা ইজতিহাদ দিয়ে কিছুই বলা যাবে না।"

১৩. ২. সুন্নাতে নববী ও সাহাবীগণের অনুসরণ

মহান আল্লাহর প্রকৃত মর্যাদা ও বিশেষণ সবচেয়ে ভাল জানতেন তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ)। মহান আল্লাহর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি সচেষ্টও ছিলেন তিনি। তিনি কখনো এ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর পরে তাঁর সাহাবীগণও কখনো কোনো বিশেষণের ব্যাখ্যা করেন নি। সাহাবীগণের জীবদ্দশাতেই ইসলাম অমুসলিম দেশ ও সমাজগুলোতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহূদী, খৃস্টান,

পারসিয়ান ও অন্যান্য ধর্মের লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। সাহাবীগণ তাদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহর অগণিত বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁরা এ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁরা এ সকল বিশেষণ প্রকাশ্য অর্থে পাঠ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। মানুষেরা এগুলো থেকে ভুল বুঝবে বা মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্ব বিনষ্ট হওয়ার মত কোনো অর্থ গ্রহণ করবে ভেবে তাঁরা এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা তাদের সামনে করেন নি। এগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে বুঝলে কোনো ক্ষতি হবে বলেও তাঁরা জানান নি।

তাবিয়ীগণের যুগও এভাবেই অতিক্রান্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে, তাবিয়ীগণের যুগের শেষ দিকে, এ বিষয়ক বিতর্ক শুরু হয়। জাহম ইবন সাফওয়ান ও তার অনুসারীগণ মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্ব প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিশেষণের ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থ প্রচার করতে থাকে। তখন তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণ সকলেই এরূপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেন এবং একবাক্যে ব্যাখ্যামুক্ত ও তুলনামুক্ত বিশ্বাসের কথা বলতে থাকেন। সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবার ব্যতিক্রম কোনো কিছুই তাঁরা দীনের অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি ছিলেন না। কারণ দীন তো তা-ই যা কুরআন ও সুন্নাহ-এ বিদ্যমান এবং সাহাবীগণ কর্তৃক আচরিত। এর বাইরে কোনো কথা, ব্যাখ্যা, মত বা কর্মকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করাই বিদআত। আর এ অর্থেই ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন: "বিষয় তো শুধু তাই যা কুরআন নিয়ে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার দাওয়াত দিয়েছেন এবং মানুষদের দল-ফিরকায় বিভক্ত হওয়ার আগে তাঁর সাহাবীগণ যার উপরে ছিলেন। এগুলো ছাড়া যা কিছু আছে সবই নব-উদ্ভাবিত বিদআত।"

কর্মে ও বর্জনে তাঁদের অনুসরণই ইসলাম। তাঁরা যা বলেছেন তা বলা যেমন দীন। তেমনি তাঁরা যা বলেন নি তা না বলাই দীন। যা কুরআনে নেই, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেন নি এবং সাহাবীগণও যা বলেন নি তা বলতেও তাঁরা রাজি ছিলেন না। এজন্য প্রচণ্ড নির্যাতনের মধ্যেও ইমাম আহমদ শুধু বলছিলেন: "আমাকে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত থেকে কিছু প্রদান করুন।"

এ মূলনীতি ব্যাখ্যা করে ইমামুল হারামাইন বলেছেন: "যদি এ সকল বাহ্যিক বিশেষণগুলোর ব্যাখ্যা জরুরী হতো তবে নিঃসন্দেহে শরীয়তের ফিকহী মাসআলাগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেয়ে ঈমান-আকীদা বিষয়ক এসকল আয়াত-হাদীসের ব্যাখ্যার বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণ অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন। অথচ কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়াই সাহাবী ও তাবিয়ীগণের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এতে প্রমাণিত হলো যে, ব্যাখ্যামুক্ত বিশ্বাসের এ মতটিই অনুসরণযোগ্য আকীদা।"

১৩. ৩. ওহীর মানবীয় ব্যাখ্যাকে ওহীর মান প্রদান রোধ

ব্যাখ্যা নির্ভর আকীদার ভয়ঙ্কর একটি দিক মানবীয় ব্যাখ্যাকে ওহীর মান প্রদান। ওহীর বক্তব্য অনুধাবনের জন্য অনেক সময় সাধারণ ব্যাখ্যা কিছুটা সহায়ক হয়। তবে এরূপ ব্যাখ্যা মানবীয় বুদ্ধিপ্রসূত কথা ছাড়া কিছুই নয়। অনুধাবন, শিক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি প্রয়োজনে এগুলোর সহায়তা নেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যাকে ওহীর মতই দীন, ঈমান বা আকীদার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা দীনের বিকৃতির অন্যতম কারণ। খৃস্টধর্মের বিকৃতির বিষয়টি অধ্যয়ন করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্ত দলগুলোর বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ 'তাফসীর' বা ব্যাখ্যাকে ওহীর মান প্রদান।

১৩. ৪. ব্যাখ্যার নামে ওহীর বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তন রোধ

আমরা দেখেছি যে, ওহীর জ্ঞানই দীনের মূল। ওহীকে সরল ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করাই মুক্তির সুনিশ্চিত পথ। পক্ষান্তরে ওহীকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করার দরজা উন্মোচন করাই ধ্বংসের সুনিশ্চিত পথ। এক্ষেত্রে নিম্নের কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) মহান আল্লাহ সকল মানুষের প্রেমময় স্রষ্টা। মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে মানুষ যে বিষয়ে নিশ্চিত সত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না বা মতভেদ সৃষ্টি করে সে বিষয়ে মতভেদ দূর করে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্যই মহান আল্লাহ ওহীসহ নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং ওহীর বক্তব্য সকলের জন্য সহজবোধ্য করেন।[৩৫৬] সাধারণ উপদেশের ক্ষেত্রে অলঙ্কার-এর আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হলেও ঈমান-আকীদার বিষয় অলঙ্কারের নামে অস্পষ্ট করার অর্থ মানুষের জন্য মুক্তির পথকে দুর্বোধ্য করা এবং মতভেদ দূরীভূত না করে তা আরো ঘনীভূত করা। ওহীকে ব্যাখ্যার নামে বাহ্যিক অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে ব্যবহার করার অর্থ ওহীকে অকার্যকর করা।

(২) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী ও কিতাব লাভের পরেও বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিপতিত হওয়ার অন্যতম পথ ওহীর ব্যাখ্যা। সাধু পল কর্তৃক খৃস্টধর্মের বিকৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রচলিত ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান ঈসা মাসীহের বক্তব্যের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদ, ঈসা মাসীহের মানবত্ব, তাঁর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, মুক্তি দানে তাঁর অপারগতা, মুক্তির জন্য শরীয়ত পালনের বাধ্যবাধকতা, মানুষের জন্মগত নিষ্পাপত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ত্রিত্ববাদ, ঈসা মাসীহের ঈশ্বরত্ব, শরীয়ত পালনের অপ্রয়োজনীয়তা, আদিপাপ, প্রায়শ্চিত্তবাদ, ঈসা মাসীহের পাপ বহন ইত্যাদি বিষয়ে একটিও সুস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য নেই। সাধু পল প্রথমে গ্রীক দর্শন ও রোমান পৌত্তলিক ধর্মের আদলে এ সকল বিভ্রান্তিকর কুফরী মতবাদ তৈরি করেন। এরপর বাইবেলের কিছু বক্তব্যের দূরবর্তী অপব্যাখ্যাকে তার এ কুফরী মতবাদের "দলীল" হিসেবে পেশ করেন। এরপর এগুলোর বিপরীতে তাওহীদ, রিসালাত, শরীয়ত, ঈসা মাসীহের মানবত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান অগণিত সুস্পষ্ট বক্তব্যকে নানাবিধ উদ্ভট দূরবর্তী ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করতে থাকেন। আমার লেখা **"কিতাবুল মুকাদ্দাস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম"** বইটি পাঠ করলে পাঠক এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানতে পারবেন। মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্তদেরও একই অবস্থা। শীয়া, কাদিয়ানী, বাতিনী, মারিফতী-ফকীর সম্প্রদায় ও অন্যান্য সকল বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সকল বিভ্রান্তির ভিত্তি ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থ গ্রহণ। কাজেই ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থের দরজা বন্ধ না করলে ওহীর কার্যকারিতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

(৩) ব্যাখ্যার নামে ওহীকে বাহ্যিক অর্থ থেকে বের করা মানব হৃদয়ের মহাব্যাধি। নিজের মন-মর্জির বিপরীত হলেই সে ইচ্ছামত ওহীর একটি রূপক অর্থ বা ব্যাখ্যা করে। আল্লাহর অধিষ্ঠান অর্থ ক্ষমতা দখল, হস্ত অর্থ ক্ষমতা ইত্যাদি বলার পরে জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ক অপব্যাখ্যাও সহজ হয়ে যায়। আকীদা বিষয়ক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পর ফরয-ওয়াজিব ও হালাল-হারাম বিষয়ক ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থ করে সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি বর্জন করা এবং মদ, ব্যভিচার ইত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত হওয়ার পথও উন্মুক্ত হয়ে যায়। আমরা দেখব যে, কিয়ামতের আলামত বিষয়ক হাদীসগুলো আক্ষরিক অর্থ থেকে বের করে রূপক ব্যাখার মাধ্যমে মানুষ কিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে ও হচ্ছে। এজন্যই প্রথম যুগগুলোর ইমামগণ ব্যাখ্যা বা রূপক অর্থের নামে ওহীর কোনো শব্দ বা বাক্যকে বাহ্যিক অর্থের ব্যতিক্রম অর্থে গ্রহণ করার বিরোধিতা করেছেন।

১৪. আল্লাহর সৃষ্টি, ইলম, তাকদীর ও পাপ-পুণ্য

আল্লাহর বিশেষণের বিষয়ে বৈপরীত্য কল্পনার একটি দিক তাকদীর। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা আল্লাহর অনাদি-অনন্ত, সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা, তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছার কথা জানতে পারি এবং পাশাপাশি আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার ও করুণার কথা জানতে পারি। অনেকে এ দু বিশেষণের মধ্যে বৈপরীত্য কল্পনা করেছেন।

প্রথম বিশেষণের মাধ্যমে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ অনাদিকাল থেকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কে, কখন, কিভাবে কি কর্ম করবে তা সবই জানেন। আমরা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানি যে, মহান আল্লাহ তাঁর এ জ্ঞান লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। আমরা আরো জানি যে, মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের ন্যূনতম দাবি যে, তাঁর জ্ঞানের অগোচরে ও ইচ্ছার বাইরে পৃথিবীতে কিছুই ঘটতে পারবে না। এ থেকে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, তাহলে মানুষ যা কিছু করে তা আল্লাহর নির্দেশেই করে, কাজেই মানুষের কর্মের জন্য তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা যায় না। এরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা ও কর্মফল বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলো বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বাতিল করেন। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে, আল্লাহর জ্ঞান, লিখন ও ইচ্ছার এ সকল বিষয় তাঁর ন্যায়পরায়ণতার বিশেষণের সাথে সাংঘর্ষিক। কাজেই ন্যায়পরায়ণতার বিশেষণ গ্রহণ করে অন্যান্য বিশেষণ ব্যাখ্যা করে বাতিল করতে হবে।

আসলে এ সবই আল্লাহর বিশেষণকে মানুষের বিশেষণের সাথে তুলনা করার ফল। আল্লাহর ক্ষেত্রে তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান, লিখনি ও ইচ্ছার সাথে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, ও ন্যায়বিচারের কোনোরূপ বৈপরীত্য নেই। মুমিন সরল ও সহজ অর্থে উভয় প্রকারের বিশেষণ বিশ্বাস করবেন। সমন্বয়ের জন্য এ বিষয়ক মূলনীতি অনুসরণ করবেন। কোনোভাবেই একটি প্রমাণ করার জন্য অন্যটি ব্যাখ্যা করে বাতিল করবেন না।

তাকদীরে বিশ্বাস ইতোপূর্বে আরকানুল ঈমানের ব্যাখ্যার সময় আলোচনা করেছি। ইমাম আবূ হানীফার সময়ে বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্ত দলগুলো ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়াতো। কাদারিয়াগণ ও মুতাযিলাগণ তাকদীর সম্পূর্ণ অস্বীকার করত। অপরদিকে জাবারিয়াগণ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণ অস্বীকার করত। এজন্য ইমাম এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ পরিচ্ছেদের শুরুতে উদ্ধৃত বক্তব্যে তিনি বলেছেন:

"মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। সকল কিছু সৃষ্টির আগেই অনাদিকাল থেকে তিনি এগুলোর বিষয়ে অবগত ছিলেন। সকল কিছুই তিনি নির্ধারণ করেছেন এবং বিধান দিয়েছেন। দুনিয়ায় ও আখিরাতে কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান, বিধান, নির্ধারণ ও লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ-করণ ছাড়া ঘটে না। তাঁর লিখনি বর্ণনামূলক, নির্দেশমূলক নয়। বিধান প্রদান, নির্ধারণ ও ইচ্ছা তাঁর অনাদি বিশেষণ, কোনো স্বরূপ, কিরূপ বা কিভাবে অনুসন্ধান ছাড়া। সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ ও ইচ্ছা তাঁর অনাদি-অনন্ত বিশেষণ কোনো স্বরূপ জিজ্ঞাসা ছাড়া। মহান আল্লাহ অস্তিত্বহীন বিষয়কে অস্তিত্বহীন অবস্থায় অস্তিত্বহীন হিসেবে জানেন, এবং তিনি জানেন যে, তিনি তাকে অস্তিত্ব দিলে তা কিরূপ হবে। আল্লাহ অস্তিত্বশীল বিষয়কে তার অস্তিত্বশীল অবস্থায় জানেন এবং তিনি জানেন যে, তা কিভাবে বিলোপ লাভ করবে। আল্লাহ দণ্ডায়মানকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দণ্ডায়মান রূপে জানেন। এবং যখন সে উপবিষ্ট হয় তখন তিনি তাঁকে উপবিষ্ট অবস্থায় উপবিষ্ট জানেন। এরূপ জানায় তাঁর জ্ঞানের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না বা তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে কোনো নতুনত্ব সংযোজিত হয় না। পরিবর্তন ও নতুনত্ব সবই সৃষ্টজীবদের অবস্থার মধ্যে।

মহান আল্লাহ সৃষ্টজগত সৃষ্টি করেছেন ঈমান ও কুফর থেকে বিমুক্ত অবস্থায়। অতঃপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি কুফরী করেছে সে নিজের কর্ম দ্বারা, অস্বীকার করে, সত্যকে অমান্য করে এবং আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফরী করেছে। আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে তার কর্ম দ্বারা, স্বীকৃতি দ্বারা, সত্য বলে ঘোষণা করে এবং আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য লাভের মাধ্যমে ঈমান এনেছে। তিনি আদমের পিঠ থেকে তাঁর বংশধরদেরকে পরমাণুর আকৃতিতে বের করে তাদেরকে বোধশক্তি প্রদান করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করেন "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলেঃ হ্যাঁ"। তিনি তাদেরকে ঈমানের নির্দেশ দেন এবং কুফ্র থেকে নিষেধ করেন। তারা তাঁর রুবূবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ছিল তাদের পক্ষ থেকে ঈমান। আদম সন্তানগণ এই ফিতরাতের উপরেই জন্মলাভ করে। এরপর যে কুফরী করে সে নিজেকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে। আর যে ঈমান আনে এবং সত্যতার ঘোষণা দেয় সে তার সহজাত ঈমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তিনি তাঁর সৃষ্টির কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করেন নি এবং ঈমান আনতেও বাধ্য করেন নি। তিনি কাউকে মুমিন রূপে বা কাফির রূপে সৃষ্টি করেন নি। তিনি তাদেরকে ব্যক্তি রূপে সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফ্র বান্দাদের কর্ম। কাফিরকে আল্লাহ তার কুফরী অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন। যখন সে এরপর ঈমান আনয়ন করে তখন আল্লাহ তাকে তার ঈমানের অবস্থায় মুমিন

হিসেবে জানেন এবং ভালবাসেন। আর এতে আল্লাহর জ্ঞান ও বিশেষণে কোনো পরিবর্তন হয় না।

বান্দাদের সকল কর্ম ও নিষ্কর্মতা- অবস্থান ও সঞ্চলন সবই প্রকৃত অর্থেই তাদের উপার্জন, আল্লাহ্ তা'আলা সে সবের স্রষ্টা। এ সবই তাঁর ইচ্ছায়, জ্ঞানে, ফয়সালায় ও নির্ধারণে। আল্লাহর আনুগত্যের সকল কর্ম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জরুরী এবং তা আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও নির্ধারণ অনুসারে। সকল পাপকর্ম আল্লাহর জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘটিত, তবে তা আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সংঘটিত নয়।"

এখানে মূল বিষয় বান্দার নিজের দায়িত্ব অনুভব করা। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, বান্দা তুমি কর্ম কর, আমি কখনোই কারো কর্মফল নষ্ট করব না বা কারো উপর জুলুম করব না। আবার তিনি বলেছেন, বান্দা আমি জানি তুমি কি করবে, আমি ইচ্ছা করলে তোমার কর্ম পরিবর্তন করতে পারি এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যেতে পার না। এখন বান্দার সামনে দুটি বিকল্প: একজন বান্দা জানে যে আল্লাহ সবই জানেন এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ্ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তার মনে নানান প্রশ্ন। আল্লাহর ইলমে কী আছে আমার বিষয়ে? আল্লাহ্ যখন সবই জানেন তাহলে আর কষ্ট করে কী লাভ? আল্লাহ্ কাজ করতে বলেছেন বটে, তবে তাতে কী লাভ হবে? এভাবে বান্দা আল্লাহর জ্ঞান ও কর্মের হিসাব গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের দায়িত্বে অবহেলা করে। এ বান্দা মূলত আল্লাহর নিদের্শেও বিশ্বাস করে নি এবং আল্লাহর ওয়াদাতেও বিশ্বাস করে নি। সে নিজেকে আল্লাহর কাজের হিসাব গ্রহণকারী বলে মনে করেছে। নিঃসন্দেহে সে ধ্বংসগ্রস্ত।

অন্য একজন বান্দা জানে যে, আল্লাহ্ সবই জানেন এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ্ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে জানে আল্লাহর মহান জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রকৃতি অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার দায়িত্বও নয়। আমি আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছায় বিশ্বাস করি এবং আল্লাহর ওয়াদা ও দয়ায় বিশ্বাস করি। আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি এবং আল্লাহর সাহায্য ও দয়া চাইতে থাকি। নিঃসন্দেহে এ বান্দা সফলতার পথ পেয়েছে।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ (لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)، فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

"মূল তাকদীর সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্ তা'আলার এক রহস্য। এ সম্পর্কে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত কোনো ফিরিশতাও অবগত নন, কোনো নবী রাসূলও অবগত নন। এ বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা বা চিন্তা ভাবনা করার পরিণতি ব্যর্থতা, বঞ্চনা ও সীমালংঘন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও কুমন্ত্রণা হতে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, আল্লাহ্ স্বয়ং তাকদীরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর তত্ত্ব উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো থেকে বারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেন: "তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না বরং তারাই আপন কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।"[৩৫৭] সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, 'তিনি কেন এ কাজ করলেন?' সে আসলে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলো। আর যে ব্যক্তি কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে সে কাফিরদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায়।"[৩৫৮]

ইমাম তাহাবী আরো বলেন;

فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقَدَرِ خَصِيمًا، وَأَحْضَرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهَمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا.

"অতএব, এমন লোকের ধ্বংস অবধারিত যে তাকদীরের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে বিরোধে লিপ্ত হয় এবং বিকারগ্রস্ত হৃদয় নিয়ে এতে চিন্তা ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়। নিশ্চয়ই সে নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে অদৃশ্য জগতের একটি গুপ্ত রহস্যের অনুসন্ধানে সচেষ্ট হলো এবং এ বিষয়ে অসঙ্গত অবাস্তব কথা বলে সে নিজেকে মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠে পরিণত করলো।"[৩৫৯]

এ গ্রন্থের পরবর্তী কোনো কোনো অনুচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) তাকদীর বিষয়ক আরো কিছু প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

ইসমাতুল আম্বিয়া, সাহাবায়ে কেরাম, তাকফীর, সুন্নাত ও ইমামাত

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু'মান ইবন সাবিত (রাহ) বলেন:

اَلأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلاَّتٌ وَخَطِيْئَاتٌ.

وَمُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّهُ، وَعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَصَفِيُّهُ وَنَقِيُّهُ، وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ، وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً قَطُّ.

وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفَارُوْقُ ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ذُوْ النُّوْرَيْنِ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ الْمُرْتَضَى رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ، عَابِدِيْنَ ثَابِتِيْنَ عَلَى الْحَقِّ وَمَعَ الْحَقِّ كَانُوْا، نَتَوَلاَّهُمْ جَمِيْعاً وَلاَ نَذْكُرُ الصَّحَابَةَ إِلاَّ بِخَيْرٍ.

وَلاَ نُكَفِّرُ مُسْلِماً بِذَنْبٍ مِنَ الذُّنُوْبِ وَإِنْ كَانَتَ كَبِيْرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا، وَلاَ نُزِيْلُ عَنْهُ اسْمَ الإِيْمَانِ، وَنُسَمِّيْهِ مُؤْمِناً حَقِيْقَةً وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ مُؤْمِناً فَاسِقاً غَيْرَ كَافِرٍ.

وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ سُنَّةٌ، وَالتَّرَاوِيْحُ فِيْ لَيَالِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ

وَالصَّلاَةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَائِزَةٌ.

বঙ্গানুবাদ

নবীগণ সকলেই সগীরা গোনাহ্, কবীরা গোনাহ্, কুফ্র ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও বিমুক্ত ছিলেন। তবে কখনো কখনো সামান্য পদস্খলন ও ভুলত্রুটি তাঁদের ঘটেছে।

এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর নবী, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর মনোনীত নির্বাচিত, তাঁর বাছাইকৃত। তিনি কখনো মূর্তির ইবাদত করেন নি এবং কখনোই এক পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেন নি। তিনি কখনোই কোনো সগীরা বা কবীরা কোনো প্রকারের পাপে লিপ্ত হন নি।

নবীগণের (আ) পরে মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবূ বাক্র সিদ্দীক, তাঁর পরে উমার ইবনুল খাত্তাব আল-ফারূক, তাঁর পরে যুন্নুরাইন উসমান ইবন আফ্ফান, তাঁর পরে আলী ইবন আবী তালিব আল-মুরতাযা, রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন, আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাঁরা আজীবন আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে, সত্যের উপরে ও সত্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। আমরা তাঁদের সকলকেই ভালবাসি ও ওলী হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো একজন সাহাবীর বিষয়েও ভাল কথা ছাড়া কিছু বলি না।

আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফির বলি না, যদিও তা কোনো কবীরা গোনাহ হয়, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি উক্ত পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। আমরা পাপের কারণে কোনো মুসলিমের 'ঈমান'-এর নাম অপসারণ করি না। বরং আমরা তাকে প্রকৃতই মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফির না হয়ে একজন পাপী মুমিন হতে পারে।

মোজাদ্বয়ের উপর মাস্হ করা (মোছা) সুন্নাত। এবং রামাদান মাসের রাত্রিগুলিতে তারাবীহ্ সুন্নাত।

সকল নেককার ও পাপী মুমিনের পিছনে সালাত আদায় বৈধ।

ব্যাখ্যা ও টীকা

১. ইসমাতুল আম্বিয়া

ইসমাত (العصمة) শব্দটি 'আসামা' (عَصَمَ) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ নিষেধ করা, সংরক্ষণ করা বা হেফাযত করা (prevent, guard, protect)। ইসলামী পরিভাষায় 'ইসমাত' বলতে বুঝানো হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তিকে পাপ বা ভুল-ভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করা। সাধারণত একে অভ্রান্ততা, নিষ্কলঙ্কত্ব, পাপাক্ষমতা বা নিষ্পাপত্ব (infallibility, impeccability; sinlessness) বলা হয়। ইসমাতুল আম্বিয়া অর্থ নবীগণের অভ্রান্ততা বা নিষ্পাপত্ব। এ বিষয়ে ইমাম আযম (রাহ) বললেন: **"নবীগণ সকলেই সগীরা গোনাহ, কবীরা গোনাহ, কুফ্‌র ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও বিমুক্ত ছিলেন। তবে কখনো কখনো সামান্য পদস্খলন ও ভুলক্রটি তাঁদের ঘটেছে।"**

মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

''হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষদের থেকে সংরক্ষণ করবেন।[৩৬০]

কুরআন-হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর মনোনীত নিষ্কলুষ নিষ্পাপ প্রিয় বান্দা ছিলেন। আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, নবীগণ বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হেদায়াত ও মনোনয়ন প্রাপ্ত। আল্লাহ বলেন:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا

"এরা নবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তারা আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভুত, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভুত ও যাদেরকে আমি পথ-নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম।"[৩৬১]

এ অর্থের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায় যে, বিশেষভাবে পবিত্র ও নিষ্কলুষ বাছাই করা ব্যক্তিদেরকেই আল্লাহ নুবুওয়াত প্রদান করেছেন। এছাড়া আল্লাহ বারংবার নবীগণকে পবিত্র, একনিষ্ঠ, সৎ ইত্যাদি বিশেষণে ভুষিত করেছেন।[৩৬২] সর্বোপরি আল্লাহ মানব জাতিকে নবী-রাসূলদের 'ইত্তিবা' বা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশও প্রমাণ করে যে, তাঁরা 'নিষ্পাপ' ছিলেন। কারণ যার থেকে পাপ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে নিঃশর্ত 'ইত্তিবা' করার নির্দেশ আল্লাহ দিবেন না। কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস এই যে, নবীগণ সকলেই আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাঁরা সবাই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও নিষ্পাপ ছিলেন। মানবীয় ভুলক্রটি ছাড়া কোনো পাপে তাঁরা লিপ্ত হন নি।

২. ইসমাতুল আম্বিয়া বিষয়ে খুঁটিনাটি মতভেদ

এ মূলনীতির উপর ঐকমত্যের পর খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। আল্লামা উমর ইবন মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭হি.) এ বিষয়ে বলেন:

كُلُّهُمْ كَانُوْا مُخْبِرِيْنَ مُبَلِّغِيْنَ عَنِ اللهِ تَعَالَى صَادِقِيْنَ نَاصِحِيْنَ لِلْخَلْقِ

"তাঁরা সকলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদান করেছেন এবং প্রচার করেছেন, সত্যবাদী ছিলেন, সৃষ্টির উপদেশদাতা ও কল্যাণকামী ছিলেন।"[৩৬৩]

এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১হি) বলেন:

"এতে ইশারা করা হয়েছে যে, নবীগণ বিশেষভাবে শরীয়তের বিষয়ে, দীনের আহকাম প্রচারের বিষয়ে ও উম্মাতকে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে মা'সূম বা নির্ভুল ও সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে তাঁরা ইচ্ছাকৃত কোনো ভুল করেন না সে বিষয়ে সকলেই একমত। অধিকাংশের মতে এক্ষেত্রে তাঁরা অনিচ্ছাকৃত বা বেখেয়ালেও কোনো ভুল করতে পারেন না। অন্যান্য সকল পাপ থেকে তাঁদের মাসূম বা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ: মুসলিম উম্মাহর ইজমা এই যে, নবীগণ ওহী বা নুবুওয়াত লাভের পূর্বে ও পরে কুফ্‌রী থেকে সংরক্ষিত। অনুরূপভাবে অধিকাংশের মতে তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকেও মা'সূম। হাশাবিয়া সম্প্রদায় এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছে। .... আর ইচ্ছাকৃত সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে অধিকাংশের মত এই যে, তা সম্ভব। তবে মুতাযিলী নেতা আল-জুবাঈ[৩৬৪] ও তাঁর অনুসারীরা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছে। আর নবীগণের জন্য অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া সকলের মতেই সম্ভব, তবে যে সকল সগীরা গোনাহ নীচতা প্রমাণ করে তা তাঁদের

দ্বারা সম্ভব নয়, যেমন এক লোকমা খাদ্য চুরি করা, একটি দানা ওযনে কম দেওয়া, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে (সগীরা গোনাহের ক্ষেত্রে) মুহাক্কিক আলিমগণ শর্ত করেছেন যে, নবীগণকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা তা বর্জন করেন। এ মতভেদ সবই ওহী বা নুবুওয়াত প্রাপ্তির পরের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে নবীগণ থেকে কবীরা গোনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব বলে কোনো দলীল নেই। মু'তাযিলাগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও নবীগণ কর্তৃক কবীরা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে না; কারণ এর ফলে জনগণের মধ্যে তাঁর প্রতি অভক্তি সৃষ্টি হয়, যা তাঁর অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ফলে নবী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সত্য কথা এই যে, যে কর্ম তাঁদের প্রতি অভক্তি সৃষ্টি করে তা তাঁরা করতে পারেন না, যেমন, মাতৃগণের সাথে অনাচার, অশ্লীলতা ও নীচতা জ্ঞাপক সগীরা গোনাহ। শীয়াগণ মনে করেন যে, নবীগণ থেকে নুবুওয়াতের পূর্বে ও পরে কখনোই কোনো সগীরা বা কবীরা গোনাহ প্রকাশিত বা সংঘটিত হতে পারে না। তবে তারা তাকিয়্যাহ বা আত্মরক্ষামূলকভাবে কুফ্‌র প্রকাশ সম্ভব বলেছে।"[৩৬৫]

মোল্লা আলী কারী বলেন, ইবনুল হুমাম বলেছেন: আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ আলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য মত এই যে, নবীগণ কবীরা গোনাহ থেকে সংরক্ষিত, ভুলক্রমে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে একক সগীরা গোনাহ করে ফেলা থেকে সংরক্ষিত নন। আহলুস সুন্নাতের কেউ কেউ নবীদের ক্ষেত্রে ভুল করাও অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। সঠিকতর বা সহীহ কথা এই যে, কর্মের মধ্যে ভুল হওয়া সম্ভব। সার কথা এই যে, আহলুস সুন্নাতের সকলেই একমত যে, নবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নিষিদ্ধ কর্ম করতে পারেন না। তবে অসতর্কতা বা ভুলের কারণে যা ঘটে তা পদস্খলন বলে অভিহিত।[৩৬৬]

৩. মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ইসমাত ও মর্যাদা

মুহাম্মাদ (ﷺ) এর নুবুওয়াত ও রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। নবীগণের নিষ্পাপত্বে বিশ্বাস করার অর্থই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিষ্পাপত্বে বিশ্বাস করা। তা সত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বিশেষভাবে তাঁর বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন: **"এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর নবী, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর মনোনীত নির্বাচিত, তাঁর বাছাইকৃত। তিনি কখনো মূর্তির ইবাদত করেন নি এবং কখনোই এক পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেন নি। তিনি কখনোই কোনো সগীরা বা কবীরা কোনো প্রকারের পাপে লিপ্ত হন নি।"**

ইমাম আবূ হানীফার এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাইখ আহমদ ইবন মুহাম্মাদ মাগনীসাবী হানাফী 'শারহুল ফিকহিল আকবার' গ্রন্থে বলেন:

ثم أشار الإمام الأعظم بقوله "وعبده" إلى فائدتين: أعني تشريف محمد (ﷺ) وحفظ الأمة عن قول النصارى. قال أبو القاسم سليمان الأنصاري: لما وصل محمد ﷺ إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعارج أوحى الله إليه: يا محمد بمَ أشرِّفك؟ قال: يا رب بنسبتي إلى نفسك (إليك) بالعبودية، فأنزل فيه "سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً"، فقال ﷺ: "لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا: عبد الله ورسوله. كذا في المشارق. أي لا تتجاوزوا عن الحد في مدحي كما بالغ النصارى في مدح عيسى عليه السلام حتى كفروا فقالوا إنه ابن الله، وقولوا في حقي: إنه عبد الله ورسوله، حتى لا تكونوا أمثالهم".

"ইমাম আযম 'তাঁর বান্দা' কথাটি এখানে উল্লেখ করে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন: (১) মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মর্যাদা প্রকাশ এবং (২) খৃস্টানদের মত কথা বলা থেকে উম্মাতকে রক্ষা করা। আবুল কাসিম সুলাইমান আনসারী (৫১১ হি) বলেন[৩৬৭]: যখন মুহাম্মাদ (ﷺ) মিরাজের সময় সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হলেন তখন আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করেন: হে মুহাম্মাদ, তোমাকে কিভাবে মর্যাদামণ্ডিত করব? তিনি বলেন: হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আপনার সাথে দাসত্বের সম্পর্কে সম্পর্কিত করে মর্যাদাময় করুন। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন: "পবিত্র তিনি যিনি তাঁর দাসকে (বান্দাকে) রজনীযোগে ভ্রমন করিয়েছেন...।"[৩৬৮] এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "খৃস্টানগণ যেরূপ ঈসা ইবনু মারিয়ামকে বাড়িয়ে প্রশংসা করেছে তোমরা সেভাবে আমার বাড়িয়ে প্রশংসা করবে না। আমি তো তাঁর বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বলবে: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[৩৬৯] মাশারিক গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসের অর্থ: যেভাবে খৃস্টানগণ ঈসা (আ)–এর প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করে কাফির হয়ে গিয়েছে তোমরা আমার নাত-প্রশংসায় এভাবে সীমালঙ্ঘন করো না। খৃস্টানগণ সীমালঙ্ঘন করে বলেছিল: তিনি আল্লাহর পুত্র। তোমরা আমার সম্পর্কে বল: তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল; যেন তোমরা তাদের মত না হও।"[৩৭০]

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

وإنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ المصطفَى، ونبيُّه المجْتَبى، ورَسُولُهُ المُرْتَضَى. وإنَّه خَاتِمُ الأنبياءِ، وإمَامُ الأتْقِيَاءِ، وسيِّدُ المرسَلينَ، وحَبيبُ ربِّ العالَمين. وكُلُّ دَعْوى النُّبوةِ بَعدَهُ فَغَيٌّ وَهَوى. وَهُو المبعوثُ إلى عَامَّةِ الجِنِّ وكَافَّةِ الوَرَى بالحقِّ والهدى، وبالنُّور والضِّياء.

"নিশ্চয়, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত বান্দা (দাস), তাঁর নির্বাচিত নবী ও তাঁর সন্তোষভাজন রাসূল। তিনি সর্বশেষ নবী,

সর্বকালের মুত্তাকীগণের ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামীনের একান্ত প্রিয়জন। তাঁর পরবর্তীকালে নবুওয়াতের সব দাবী ভ্রান্ত ও প্রবৃত্তিপ্রসূত। তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র জিন ও মানবকুলের প্রতি সত্য, হেদায়ত, নূর ও আলো সহকারে।"[৩৭১]

৪. সাহাবীগণের মর্যাদা

নবীগণের নিষ্পাপত্ব বর্ণনার পাশাপাশি সাহাবীগণের মর্যাদার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)। আমরা দেখেছি যে, তিনি বলেছেন: **"নবীগণের (আ) পরে মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বাক্র সিদ্দীক, তাঁর পরে উমার ইবনুল খাত্তাব আল-ফারূক, তাঁর পরে যুন্নুরাইন উসমান ইবন আফ্ফান, তাঁর পরে আলী ইবন আবী তালিব আল-মুরতাযা, রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন, আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাঁরা আজীবন আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে, সত্যের উপরে ও সত্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। আমরা তাঁদের সকলকেই ভালবাসি ও ওলী হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো একজন সাহাবীর বিষয়েও ভাল কথা ছাড়া কিছু বলি না।"**

এ বক্তব্যটি অনুধাবনের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো পর্যালোচনা প্রয়োজন:

৪. ১. সাহাবীগণ বিষয়ক শীয়া বিভ্রান্তি

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ঈমান-আকীদা বিষয়ক তাঁর যুগে বিদ্যমান বিভ্রান্তিঅপনোদন ও খণ্ডন করেছেন। আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের যুগেই মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি দেখা দেয় তার অন্যতম ছিল "শীয়া" ও "খারিজী" মতবাদ।

শীয়া ও খারিজী: মুসলিম উম্মাহর প্রথম ও প্রধান এদুটি ফিরকার উদ্ভব ঘটেছিল রাজনৈতিক কারণে। শীয়া (الشيعة) শব্দের অর্থ দল, অনুসারী বা সাহায্যকারী। পারিভাষিকভাবে শীয়া বলতে 'শীয়াতু আলী' (شيعة علي) বা আলীর (রা) দল, আলীর অনুসারী বা আলীর সাহায্যকারী বুঝানো হয়। শীয়াগণ নিজেদেরকে আলী (রা)–এর অনুসারী বা তাঁর দল বলে দাবি করেন। শীয়া ফিরকার মূল ভিত্তি আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দাবি। এ দাবিকে কেন্দ্র করে অগণিত আকীদা তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। এ সকল আকীদার অন্যতম বিষয় সাহাবীগণের অবমর্যাদা করা ও গালি দেওয়া। তারা 'আহল বাইতের (নবী-বংশের) ভালবাসা ও ভক্তির নামে সাহাবীগণের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারে রত। ইমাম আবূ হানীফা এখানে তাদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন।

৪. ২. আহল বাইত বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও ভালবাসার অংশ তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মান করা ও ভালবাসা। তাঁর সাহাবীগণকে, তাঁর পরিবার ও বংশধরদেরকে, তাঁর উম্মাতকে, তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে এবং তাঁর সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তাঁর কারণে সম্মান করা ও ভালবাসা তাঁরই সম্মান ও ভালবাসার অংশ। বিশেষত তাঁর সাহাবী ও আহল বাইতের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। এখানে কোনো বংশ বা বর্ণের 'অলৌকিকত্ব' বা পবিত্রতা ঘোষণা করা হয় নি। ইসলামে মর্যাদার ভিত্তি তাকওয়া; বংশ বা রক্ত নয়। কুরআনে বংশ, বর্ণ বা দেশ নির্বিশেষে সকল সাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে তাঁদের কর্ম ও ত্যাগের কারণে, বংশ বা বর্ণের কারণে নয়। আর স্বভাবতই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশের যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন সকলেই এ প্রশংসা ও মর্যাদার মধ্যে শামিল হয়েছেন। কাজেই পৃথকভাবে "নবী-বংশের" মর্যাদার উল্লেখ করা হয় নি।

কুরআনে 'আহল বাইত' দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। একস্থানে ইবরাহীম (আ)–এর স্ত্রীকে ফিরিশতারা "আহল বাইত" বলে সম্বোধন করেন।[৩৭২] অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে। আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে আহল বাইত (নবী-পরিবার)! আল্লাহ্ তো শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"[৩৭৩]

এখানে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণকে "আহল-বাইত" বা "নবী-পরিবার" বলে সম্বোধন করে তাঁদের পরিপূর্ণ পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু "আহল-বাইত" বিষয়ে শীয়াগণের বিশ্বাস কুরআনের এ ঘোষণার সাথে সাংঘর্ষিক। তারা নবী-পত্নীগণকে "আহল বাইত" বলে স্বীকার করেন না। উপরন্তু তাঁদের বিষয়ে তারা অত্যন্ত অশ্লীল ও নোংরা

ধারণা পোষণ করেন।

শীয়াগণ মূলত আহল বাইত বলতে "আলী-বংশ" বুঝান। আর এ বিষয়ে কুরআন কারীমে কোনো নির্দেশনা নেই। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

"বল, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না।"[৩৭৪]

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে দীন প্রচারের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাচ্ছি না। তবে তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তা রয়েছে সে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ও ভালবাসার দাবি যে, তোমরা আমাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকবে এবং আমার সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করবে। আমি তোমাদের কাছে এ সৌহার্দ্যটুকু দাবি করছি।

কারো কারো মতে এ আয়াতের অর্থ: 'আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, শুধু আমার আত্মীয়দের প্রতি তোমাদের সৌহার্দপূর্ণ আচরণ চাই।' অর্থাৎ এখানে তাঁর আত্মীয়দের ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ অর্থ কুরআনের স্বাভাবিক বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে তিনি 'আত্মীয়তার সৌহার্দ্য' দাবি করেছেন, 'আত্মীয়দের প্রতি বা আত্মীয়দের জন্য সৌহার্দ্য' দাবি করেন নি। এছাড়া তাঁর আত্মীয়দের অধিকাংশই সে সময়ে কাফির ছিলেন এবং তাদের সাথে অন্যান্য কাফির সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতো। উপরন্তু তিনি মক্কার যে কাফিরগণকে এ কথা বলেছিলেন তারাই তো তাঁর আত্মীয় ছিলেন। কাজেই তাদের কাছে তিনি কিভাবে তাঁর আত্মীয়দের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ আচরণ দাবি করবেন।

এদ্বারা তাঁর আত্মীয়দের অবমূল্যায়ন বা অবমর্যাদা উদ্দেশ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ভালবাসা ঈমানের স্বাভাবিক দাবি। তাঁর পরিবার ও বংশধরের প্রতি ভালবাসা তাঁরই ভালবাসার অংশ। তাঁর বংশের যারা ঈমান ও সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের মর্যাদাও কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা। এ মর্যাদার পাশাপাশি আত্মীয়তার মর্যাদা তাঁদেরকে মহিমান্বিত করে। সর্বোপরি হাদীসে তাঁদের মর্যাদার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

যাইদ ইবন আরকাম (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম' নামক স্থানে আমাদের মাঝে বক্তৃতা করেন। তিনি আল্লাহর গুণগান করলেন, ওয়ায করলেন ও উপদেশ প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন:

أَمَّا بَعْدُ أَلا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ... ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي... ثلاثا.

"হে মানুষেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি একজন মানুষ মাত্র। হয়ত শীঘ্রই আমার প্রভুর দূত এসে পড়বেন এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। আমি তোমাদের মধ্যে দুটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমত আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথের দিশা ও আলো। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। .... এরপর তিনি বললেন : 'এবং আমার বাড়ির মানুষ (আহল বাইত)। আমি আমার 'আহল বাইত' বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে রাখতে উপদেশ প্রদান করছি।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন।"[৩৭৫]

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَحِبُّوا اللَّهَ (لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ) وَأَحِبُّونِي (بِحُبِّ اللَّهِ) وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي (بِحُبِّي)

"তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে কারণ তিনি তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামত প্রদান করেন, এবং আল্লাহর ভালবাসায় আমাকে ভালবাসবে এবং আমার ভালবাসায় আমার 'আহল বাইত' বা বাড়ির মানুষদের (বংশধর ও আত্মীয়দের) ভালবাসবে।"[৩৭৬]

৪. ৩. সাহাবীগণ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিজন ও বংশধরের প্রতি এ ভালবাসা ও ভক্তি কখনোই তাঁর সহচর ও সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কিন্তু শীয়াগণ পরিবার ও বংশধরের ভালবাসার নামে সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয় এবং সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষকে ঈমানের অংশ বানিয়ে নেয়। তারা ইহূদীদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করে। তারা নবী-পরিবারের ভালবাসাকে সাহাবীগণের ভালবাসার পরিপন্থী বলে গণ্য করে। এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা তারা প্রচার করে। গত কয়েক শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্য-প্রাচ্যবিদগণও সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। এ সকল প্রচারের একটিই উদ্দেশ্য: ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও ইসলামের সৌধকে ভেঙ্গে ফেলা। সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়; কারণ কেবলমাত্র তাঁদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

সাহাবীগণের সততায় অবিশ্বাস করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়ত অবিশ্বাস করা। যারা মনে করেন যে, অধিকাংশ সাহাবী স্বার্থপর, অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী ছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে মনে করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন ব্যর্থ নবী ছিলেন (নাউযূ বিল্লাহ!)। লক্ষ মানুষের সমাজে অজ্ঞাত অখ্যাত দু-চার জন মুনাফিক থাকা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। কিন্তু সুপরিচিত

সাহাবীগণের সততায় সন্দেহ পোষণ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যর্থতার দাবি করা হয়। একজন ধর্ম প্রচারক যদি নিজের সহচরদের হৃদয়গুলিকে ধার্মিক বানাতে না পারেন, তবে তিনি কিভাবে অন্যদেরকে ধার্মিক বানাবেন! তাঁর আদর্শ শুনে, ব্যবহারিকভাবে বাস্তবায়িত দেখে ও তাঁর সাহচর্যে থেকেও যদি মানুষ 'সততা' অর্জন করতে না পারে, তবে শুধু সে আদর্শ শুনে পরবর্তী মানুষদের 'সততা' অর্জনের কল্পনা বাতুলতা মাত্র।

আজ যিনি মনে করেন যে, কুরআন পড়ে তিনি সততা শিখেছেন, অথচ মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে কুরাআন পড়ে, জীবন্ত কুরআনের সাহচর্যে থেকেও আবূ বকর, উমার, উসমান, আবূ হুরাইরা, আমর ইবনুল আস, মুআবিয়া, আবূ মূসা আশআরী (ﷺ) বা অন্য কোনো সাহাবী সততা শিখতে পারেন নি, তিনি মূলত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়তকেই অস্বীকার করেন।

শীয়াগণ কাউকে দেবতা ও কাউকে দানব বানিয়েছেন। দুটি বিষয়ই মানবীয় প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। মানবীয় দুর্বলতার সাথে সততার কোনো বৈপরীত্য নেই। সাহাবীগণ মানুষ ছিলেন; মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন না। মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সাহচর্যে মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সততা ও বেলায়াত তাঁরা অর্জন করেছিলেন। কোনো স্কুলের সফলতা যেমন ছাত্রদের পাশের হারের উপর নির্ভর করে, তেমনি ধর্মপ্রচারকের সফলতা নির্ভর করে তাঁর সাহচর্য-প্রাপ্তদের ধার্মিকতার উপর। কাজেই নুবুওয়াতে বিশ্বাসের অনির্বার্য দাবি সাহাবীগণের সততায় বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাসই নিশ্চিত করেছে কুরআন ও হাদীস। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি:

(১) কুরআনে বারবার সাহাবীগণের প্রশংসা করা হয়েছে, তাঁদের ধার্মিকতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পূর্বের ও পরের সকল সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে আল্লাহ বলেন:

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কেই কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[৩৭৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল সাহাবীর ঢালাও প্রশংসা করে ও তাঁদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। তিনি কুফ্‌র, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।"[৩৭৮]

(২) বিশেষত প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের জন্য আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করাই অন্যদের জন্য জান্নাতের পথ বলে জানানো হয়েছে:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এ-ই মহাসাফল্য।"[৩৭৯]

(৩) বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা ও জান্নাতের সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"মুমিনগণ যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট 'বাইয়াত' গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।"[৩৮০]

তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীর প্রশংসায় আল্লাহ বলেন:

لَكِنْ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

"কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সংগে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।"[৩৮১]

(৪) মহান আল্লাহ কুরআনে প্রথমে মুহাজির এবং আনসারগণের উল্লেখ করে তাঁদের প্রশংসা করেন। এরপর পরবর্তী

মুমিনদের বিষয়ে বলেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"তাদের পরে যারা আগমন করল তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের পূর্ববর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো দয়াদ্র, পরমদয়ালু।"[৩৮২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিনদের দায়িত্ব সকল আনসার ও মুজাহির সাহাবীর জন্য দু'আ করা এবং তাঁদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা। অন্তরে কোনো সাহাবীর প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষভাব ঈমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَكْرِمُوْا أَصْحَابِيْ (فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ)، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ.

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে; কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পরে তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে।"[৩৮৩]

আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) বা তার অর্ধেক দানের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে না।"[৩৮৪]

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের বিষয়ে মুসলিমগণ নিম্নরূপ আকীদা পোষণ করেন:

(১) মানব জাতির মধ্যে নবীগণের পরেই সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহাবীগণের মধ্যে খুলাফায়ের রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব।

(২) খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য তাঁদের খিলাফাতের দায়িত্বের ক্রম অনুসারে।

(৩) অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী। কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন সামান্যতম অমর্যাদা বা অবজ্ঞা করেন না। তাঁদের কারো বিষয়েই কোনো অমর্যাদাকর কথা কোনো মুমিন কখনো বলেন না।

(৪) সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং কখনো কখনো যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে। ভুল বুঝাবুঝি, সামাজিক প্রেক্ষাপট, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দুজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ, মামলা বা যুদ্ধ হতে পারে। শুধু যুদ্ধ বা বিরোধের কারণে কাউকে অপরাধী বলা যায় না।

যুদ্ধবিগ্রহ ঐতিহাসিক সত্য। তবে সেগুলিতে কার কি ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ক ইতিহাস লেখা হয়েছে ঘটনার প্রায় ২০০ বৎসর পর শীয়া মতবাদ প্রভাবিত আব্বাসী শাসনামলে শীয়াগণের বর্ণনার উপর নির্ভর করে। কুরআন ও হাদীস সাহাবীগণের মর্যাদা ও সততা নিশ্চিত করেছে। এ সকল যুদ্ধবিগ্রহের অযুহাতে তাঁদের কারো নামে কুৎসা রটনা বা বিদ্বেষ পোষণ করার অর্থ কুরআন ও হাদীসের অগণিত নির্দেশনা জনশ্রুতির কারণে বাতিল করে দেওয়া।

কোনো কোর্টে যদি কোনো দলের নেতৃস্থানীয় কাউকে অপরাধী বলে রায় দেওয়া হয় তবে সে দলের অনুসারীরা রায়কে মিথ্যা বলবেন কিন্তু নেতার সততায় বিশ্বাস হারাবেন না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ অতি-সাম্প্রতিক বিষয়। তারপরও সকলেই শুধু ইতিহাস বিকৃতির কথা বলেন। ঐতিহাসিকরা যদি কোনো নেতার অপরাধের অনেক তথ্য পেশ করেন তবুও তার অনুসারীরা সে তথ্য বিশ্বাস করবেন না। তাহলে মুমিন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহচরদের বিষয়ে কুরআন প্রমাণিত সততার সাক্ষ্যের বিপরীতে ইতিহাসের বর্ণনার উপর নির্ভর করবেন?

আমরা শুধু এতটুকুই বলব যে, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে, কিন্তু কার কী ভূমিকা তা আমরা এতদিন পরে ইতিহাসের বর্ণনার উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে পারব না। তবে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার উপর নির্ভর করে আমরা তাঁদের পরিপূর্ণ সততা ও বেলায়াতে বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি যে, তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ভুল বুঝাবুঝি ও ইজতিহাদী মতপার্থক্যের কারণেই ঘটেছে। এতে তাঁদের তাকওয়া ও বেলায়াত (আল্লাহর ওলী হওয়ার মর্যাদা) ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি।

উপরের বিষয়গুলোই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর "আল-ওয়াসিয়্যাহ" পুস্তিকায় এ বিষয়ে আরো বলেন:

وَنُقِرُّ بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ"، وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَسْبَقَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَيُحِبُّهُمْ كُلُّ

مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ، وَيُبْغِضُهُمْ كُلُّ مُنَافِقٍ شَقِيٍّ.

"এবং আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম আবূ বাকর সিদ্দীক, অতঃপর উমার, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম; কারণ আল্লাহ বলেছেন: "এবং অগ্রগামীগণ অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই তো নৈকট্যপ্রাপ্ত, নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে"[৩৮৫]। আর (সাহাবীগণের মধ্যে ইসলামগ্রহণে) যে যত বেশি অগ্রবর্তী তাঁর মর্যাদা তত বেশি। আর প্রত্যেক মুত্তাকী মুমিন তাঁদেরকে ভালবাসে এবং প্রত্যেক হতভাগা মুনাফিক তাঁদেরকে বিদ্বেষ করে।"[৩৮৬]

অনেক সময় আবেগ-তাড়িত মুমিন পরবর্তী প্রজন্মের কোনো একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গের নেককর্মের আধিক্য দেখে তাকে কোনো সাহাবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী বলে মনে করতে থাকেন। এভাবে শীয়াগণ ও অন্য অনেকে তাবিয়ী উমার ইবন আব্দুল আযীয (রাহ)-কে সাহাবী মুআবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান (রা) থেকে উত্তম বলে মনে করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান ও ভালবাসার দুর্বলতা থেকে এরূপ ধারণার জন্ম হয়। মুমিনের ঈমানের দাবি যে, তিনি কোনোভাবেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যের সাথে কোনো নেককর্মের তুলনা করতে পারেন না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য, ঈমানের সাথে দু চোখ ভরে তাঁকে দেখা, তাঁর মুখের কথা শোনার বা তাঁর সাথে জিহাদে অংশ নেওয়ার চেয়ে অধিক মর্যাদার কর্ম কি আর কিছু হতে পারে? তাঁর সাহচর্যের মাধ্যমে ঈমান, তাকওয়া ও বেলায়াতের যে গভীরতা অর্জন হয় তা কি আর কোনোভাবে সম্ভব? আর মুমিনের আমলের মর্যাদা শুধু বাহ্যিক পরিমাপ দ্বারা হয় না, বরং ঈমান ও তাকওয়ার গভীরতাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: পরবর্তীদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ বা লক্ষ লক্ষ টন সম্পদ দান সাহাবীগণের অর্ধ মুদ্দ বা ২০০/৩০০ গ্রাম সম্পদ দানের সমকক্ষ হতে পারে না। আর এজন্যই পরবর্তী কোনো বুজুর্গ অনেক বেশি আমল করলেও মর্যাদায় কোনো অতি সাধারণ সাহাবীর সমকক্ষ হতে পারেন না। পরবর্তী কোনো প্রজন্মের কোনো বুজুর্গকে কোনো সাহাবীর সমকক্ষ বা উত্তম বলে মনে করলে মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এবং তাঁর সাহচর্যের অবমূল্যায়ন করা হয়।

এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) কোনো তাবিয়ীকে বা অন্য কোনো বুজুর্গকে মুআবিয়া (রা) বা কোনো সাহাবীর সাথে তুলনা করার প্রবণতার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন:

مقام أحدهم مع رسول الله ﷺ ساعة واحدة، خير من عمل أحدنا جميع عمره، وإن طال

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একজন সাহাবীর এক মুহূর্তের অবস্থান আমাদের আজীবনের আমলের চেয়েও উত্তম, আমাদের জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন।"[৩৮৭]

এ অর্থে অন্য এক বুজুর্গ বলেন:

غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله ﷺ أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে মুআবিয়ার নাকের মধ্যে যে ধুলা প্রবেশ করেছে তাও উমার ইবন আব্দুল আযীযের আমলের চেয়ে উত্তম।"[৩৮৮]

ইমাম আবূ হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে চতুর্থ-পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ বিচারপতি সায়িদ নাইসাপূরী (৩৪৩-৪৩২ হি) বলেন:

روي عن ابن المبارك رحمه الله قال: كنت عند أبي حنيفة – رضي الله عنه – مع نوح بن أبي مريم، فقام، فقال: يا أبا حنيفة! إني قد كتبتُ هذه الكتبَ، وأريد أن أكتب من الآثار، فعمَّنْ أحمل؟ فقال: عن كل عدل في هواه إلا الرافضة، فإن أصل عقدِهم تضليلُ أصحاب النبي ﷺ. فَضِّلْ أبا بكر وعمر، وأَحِبَّ عليّا وعثمانَ، ولا تحمِلِ الآثار عمن لا يُحبّهم.

"আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবূ হানীফা (রাদি)-এর নিকট ছিলাম। আমার সাথে নূহ ইবন আবী মরিয়ম ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: হে আবূ হানীফা, আমি তো এ সকল (ফিকহী) কিতাব লেখাপড়া করলাম। এখন আমি হাদীস শিক্ষা করতে চাই। কার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করব? আবূ হানীফা বলেন: সকল সৎ-বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিখবে, যদিও তার মধ্যে কিছু বিদআত থাকে। তবে শীয়া-রাফিযীদের থেকে কিছুই লেখা যাবে না। কারণ তাদের মতবাদের মূল ভিত্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণকে বিভ্রান্ত বলে দাবি করা। তুমি আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-কে সাহাবীগণের মধ্যে সর্বোত্তম বলে বিশ্বাস করবে এবং আলী (রা) ও উসমান (রা)-কে ভালবাসবে। যারা তাঁদেরকে ভালবাসে তারা ছাড়া আর কারো নিকট থেকে হাদীস শিখবে না।"[৩৮৯]

সম্মানিত পাঠক, ইমাম আবূ হানীফার এ কথাটি অনুধাবনের জন্য একটি বিষয় চিন্তা করুন। যদি ইহূদীদেরকে প্রশ্ন করা হয়:

শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী মূসার (আ) সহচরগণ। যদি খৃস্টানদেরকে প্রশ্ন করা হয়: শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী ঈসার (আ) হাওয়ারী-সহচরগণ। আর যদি শীয়াদেরকে প্রশ্ন করা হয় নিকৃষ্ট-ঘৃণ্যতম মানুষ কারা? তবে তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সহচরগণ!!

শীয়াদেরকে প্রশ্ন করুন: সবচেয়ে ভাল মানুষ কারা? তারা বলবেন: আলী (রা)-এর সাথীগণ। তাদেরকে প্রশ্ন করুন: সবচেয়ে খারাপ মানুষ কারা? তারা একবাক্যে বলবেন: মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথীগণ!!

সম্মানিত পাঠক, কাউকে ভালবাসার অতি স্বাভাবিক প্রকাশ তার সাথে জড়িত সকলকে ভালবাসা ও সম্মান করা। এমনকি তাদের কোনো অপরাধ প্রমাণিত হলেও অজুহাত খুঁজে তা বাতিল করতে চেষ্টা করা। কারণ প্রিয়তমের সাথীদেরকে খারাপ কল্পনা করতে মন মানে না। আর কারো সঙ্গীসাথীকে সর্বোচ্চ ঘৃণা করার সুনিশ্চিত অর্থ ঐ ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা না থাকা। কাজেই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথীদেরকে পথভ্রষ্ট প্রমাণ করা ও তাঁদেরকে ঘৃণা করা যাদের ধর্মের মূল ভিত্তি তাঁদের থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হাদীস বা দীন শিক্ষা করা কি সম্ভব?

সাহাবীগণ বিষয়ে ইমাম আযমের আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী বলেন:

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسُولِ الله ﷺ، وَلاَ نُفْرِطُ في حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُم؛ وَلاَ نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم، وَبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُم، ولا نَذْكُرُهُم إلاَّ بِخَيْرٍ, وَحُبُّهُم دِينٌ وإيمَانٌ وإحْسَانٌ، وَبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ. وَنُثْبِتُ الْخِلافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوّلاً لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه تَفْضِيلاً لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الأُمَّةِ، ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، ثُمَّ لِعُثْمَانَ رضي الله عنه، ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ. وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ رضي الله عنهم. وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ. وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ –أَهْلُ الْخَيْرِ وَالأَثَرِ، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ–، لا يُذْكَرُونَ إِلاَّ بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণকে ভালবাসি। তাঁদের কারো ভালবাসায় সীমালঙ্ঘন করি না এবং তাঁদের কারো প্রতি অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি না। যারা সাহাবীগণকে বিদ্বেষ করে বা ঘৃণা করে বা ভালভাবে ছাড়া তাঁদের উল্লেখ করে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাঁদেরকে ভাল কথা ছাড়া উল্লেখ করি না। তাঁদেরকে ভালবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাঁদেরকে বিদ্বেষ করা বা ঘৃণা করা কুফ্‌র, নিফাক ও অবাধ্যতা। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পর আবু বাকর সিদ্দিক (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করি এবং তা সমগ্র উম্মতের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও শীর্ষস্থানীয় হওয়ার কারণে। তারপর উমার ইবন খাত্তাব (রা), তারপর উসমান (রা) এবং তারপর আলী (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করি। এরাই হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন, (সুপথপ্রাপ্ত খলীফাবৃন্দ) ও আয়িম্মাহ মাহদিয়ীন (মাহদী ইমাম বা হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামবৃন্দ)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন আমার তাঁর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁদের জান্নাতবাসী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি। কেননা, তাঁর উক্তি সত্য। এরা হলেন: আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ (ইবন আবী ওয়াক্কাস), সাঈদ (ইবন যাইদ ইবন আমর), আব্দুর রহমান বিন আ'ওফ এবং আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ (رضي الله عنهم)। আর এ শেষোক্তজন এ উম্মতের আমীন (বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি) হিসেবে আখ্যায়িত। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সবাইর উপর সন্তুষ্ট হোন। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ, তাঁর নিষ্কলুষ সহধর্মিনী ও পূত-পবিত্র নির্মল বংশধরগণ সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলো সে নিফাক থেকে মুক্ত হলো। প্রথম যুগের 'সালাফ সালিহীন' (নেককার পূর্ববর্তীগণ) ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তীকালের কল্যাণময় আলিমগণ, মুহাদ্দিস ও হাদীস অনুসারীগণ এবং ফকীহ-মুজতাহিদ ও ফিকহ-অনুসারীগণ, তাঁদের সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান ও প্রশংসার সাথে স্মরণ ও উল্লেখ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।"[৩৯০]

৪. ৪. পূর্ববর্তী আলিমগণ

আমরা দেখছি যে, সাহাবীগণের বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদের আকীদা আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী 'সালাফ সালিহীন' বা পূর্ববর্তী নেককারগণ ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তী আলিম-বুজুর্গগণ বিষয়ক আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন।

এ বিষয়ক উগ্রতা তাঁর যুগে যেমন ব্যাপক ছিল, বর্তমান যুগেও তেমনি। আমরা দেখেছি যে, শীয়াগণ ভক্তির নামে আলী-বংশের ইমামগণ, তাঁদের খলীফাগণ এবং শীয়া সমাজের অগণিত আলিম, ইমাম ও পীরকে নির্ভুল, নিষ্পাপ, মাসূম বা "অভ্রান্ত" বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের কথা, কর্ম বা মতকেই দীনের জন্য চূড়ান্ত বলে গণ্য করেছেন এবং সেগুলোর ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য অস্বীকার, অমান্য বা ব্যাখ্যা ও বাতিল করেছেন। এভাবে তাঁদেরকে তারা নুবুওয়াতের মর্যাদায় সমাসীন করেছেন। পাশাপাশি সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ, চার ইমাম ও মূলধারার সকল আলিম-বুজুর্গর চরিত্র হরণ ও বিদ্বেষ প্রচারে বিভিন্ন প্রকারের জালিয়াতি ও নোংরামির আশ্রয় নিয়েছেন।

অপরদিকে খারিজীগণ এবং তাদের পাশাপাশি মুতাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকা পূর্ববর্তী আলিমগণের ইলম, ইজতিহাদ, জ্ঞান ও মতের গুরুত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, উপরন্তু তারা তাঁদের বিষয়ে কটূক্তি করেছেন। পূর্ববর্তী আলিমগণ কেউ বা তাদের মধ্যকার অমুক-তমুক ইসলাম মোটেও বুঝেন নি, অজ্ঞ ছিলেন, দালাল বা দুনিয়ামুখি ছিলেন ইত্যাদি অশালীন ও নোংরা মন্তব্য তারা করেছে।

এ দুটি বিভ্রান্ত ধারার পাশাপাশি "আহলুস সুন্নাত"-এর হাদীসপন্থী ও ফিকহপন্থী নামধারীদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের বিষয়ে অশালীন মন্তব্য করা শুরু হয়। হাদীসপন্থীরা ফকীহদের বিষয়ে ঢালাওভাবে এবং কখনো কখনো বিশেষ কোনো ফকীহ, মুজতাহিদ বা ইমামের বিষয়ে "হাদীস-বিরোধী", "অজ্ঞ" ইত্যাদি মন্তব্য করতেন। এর বিপরীতে ফিকহপন্থী বা ফিকহ অনুসারীগণ মুহাদ্দিসদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বা কোনো কোনো মুহাদ্দিসের বিষয়ে "প্রজ্ঞাহীন মুখস্তকারী", "নির্বোধ", "তোতাপাখি" ইত্যাদি মন্তব্য করতেন। এ প্রেক্ষাপটে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য ইমাম তাহাবী ইমাম আবূ হানীফার আকীদা উল্লেখ করে বলেন যে, উম্মাতের পূর্ববর্তী আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজতাহিদ, ইমাম সকলকেই সম্মান ও প্রশংসার সাথে স্মরণ করতে হবে।

বস্তুত সাধারণ মানুষ, এমনকি আলিম ও প্রাজ্ঞ মানুষেরাও মর্যাদার বিষয়ে বিশেষ প্রান্তিকতায় আক্রান্ত। তাঁরা মনে করেন যে, কাউকে সম্মান বা মর্যাদার আসনে বসানোর অর্থ তার সবকিছুকে সঠিক বলে গ্রহণ করা। অথবা মনে করা হয় যে, কারো কর্ম, মত বা কথার বিরোধিতা করার অর্থ তাকে অবমূল্যায়ন করা। কখনো মনে করা হয়, কারো মত বা কর্মে কিছু ভুল থাকার অর্থই তার অগ্রহণযোগ্যতা।

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা ও সাহাবীগণের কর্মধারা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। নবীগণ ছাড়া কেউ মাসূম, অভ্রান্ত বা নির্ভুল নন। ভুলের কারণে কোনো মানুষের গ্রহণযোগ্যতা বা বুজুর্গি নষ্ট হয় না। তেমনি কারো বেলায়াত বা বুজুর্গির কারণে তাঁর ভুলগুলি সঠিকে পরিণত হয় না। সাহাবীগণ, প্রসিদ্ধ ইমামগণ ও পরবর্তী প্রসিদ্ধ আলিমগণ অনেক সাহাবী-তাবিয়ীর অনেক মত গ্রহণ করেন নি বা বিরোধিতা করেছেন। কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী মোজার উপর মাস্‌হ করা সর্বাবস্থায় নিষেধ করেছেন, কেউ মোজাবিহীন পা মাস্‌হ করেছেন, কেউ তিনবার মাথা মাস্‌হ করেছেন, কেউ সালাত-রত অবস্থায় মুসাফাহা করেছেন, কেউ রুকুর মধ্যে দু হাটুর মধ্যে হাত রেখেছেন...।[৩৯১] এ সকল ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববীর বিপরীতে দু-একজন সাহাবী বা তাবিয়ীর কর্ম, মত বা কথা তাঁরা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু কখনোই কোনোভাবে তাঁরা বিরূপ মন্তব্য করেন নি। বরং তাঁদের প্রতি পরিপূর্ণ সম্মান ও ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। মুজতাহিদ তার সঠিক ইজতিহাদের জন্য দুটি সাওয়াব এবং ভুল ইজতিহাদের কারণে একটি সাওয়াব লাভ করেন।[৩৯২] তাঁর ভুল ইজতিহাদের কারণে তিনি অপরাধী হন না। কুরআন-সুন্নাহের আলোকে পূর্ববর্তী আলিমগণের মত আলোচনা, পর্যালোচনা, গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার পরবর্তী আলিমগণের রয়েছে। কিন্তু তাঁদের কারো কোনো বক্তব্য, কর্ম বা ভুল ইজতিহাদের জন্য তাঁদের প্রতি বিরূপ ধারণা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। ইমাম তাহাবী সে বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন।

এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

প্রথমত: আলিমের গ্রহণযোগ্যতার জন্য নির্ভুল হওয়া শর্ত নয়; কারণ নবীগণ ছাড়া কেউ মাসূম নন। একজন প্রসিদ্ধ আলিমকে প্রশ্ন করা হয়, অমুক ব্যক্তি আলিম হয়ে কিভাবে সুন্নাতের বিরোধিতা করলেন? কিভাবে এরূপ ভুল করলেন? কিভাবে এ বিষয়টি জানলেন না বা বুঝতে পারলেন না? উত্তরে তিনি বলেন: "যেন আলিমগণ নবীগণের মত না হন সেজন্যই আল্লাহ এ ব্যবস্থা করেছেন।"

দ্বিতীয়ত: আলিমগণের মর্যাদা কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত। আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। হাদীস, ফিকহ ও কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সকল প্রকার ইলমই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সকল আলিমকে শ্রদ্ধা করা ও ভালবাসা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। আকীদাহ তাহাবিয়্যার ব্যাখ্যাকারগণ, ইবন আবিল ইয্য হানাফী, সালিহ আল-ফাওযান, সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল-শাইখ ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, এখানে ইমাম তাহাবী প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। তাঁদের কারো ইজতিহাদী ভুলের জন্য বিরূপ মন্তব্য করা, তাঁদের মর্যাদাহানি বা অবমূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তাঁদের ভুলগুলি সংকলন বা প্রচার করা ইত্যাদি সবই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও সালফ সালিহীনের মত ও পথের সাথে সাংঘর্ষিক।

তৃতীয়ত: তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী জ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রসিদ্ধ আলিমগণের মাধ্যমেই উম্মাতের সাধারণ মানুষ দীন লাভ করেছেন। তাঁদের প্রতি বিরূপ ধারণা, মন্তব্য ও অশ্রদ্ধা সাধারণ মানুষের মনোজগতে দীনী ইলম চর্চায়-রত আলিমগণের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়, দীনের বিষয়ে তাঁদেরকে প্রশ্ন করতেও তারা উৎসাহ পায় না এবং ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিপতিত হয়। শাইখ সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল-শাইখ বলেন: "আলিমগণের বিষয়ে খারাপ মন্তব্য মূলত সাহাবীদের বিষয়ে খারাপ মন্তব্যের মতই। আর এজন্যই ইমাম তাহাবী সাহাবীদের পরে আলিমগণের কথা উল্লেখ করেছেন। সাহাবীদের বিষয়ে কু-ধারণা বা খারাপ মন্তব্য দীনের বিশুদ্ধতার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছাড়া কিছুই নয়। তেমনি প্রাজ্ঞ, প্রসিদ্ধ নেককার আলিম, ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ বা

মুহাদ্দিসগণের ইজতিহাদী ভুলভ্রান্তির কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য বা কু-ধারণাও দীন ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার।[৩৯৩]

ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশসহ সমালোচনা ইসলাম সম্মত। কিন্তু বর্তমানে আমরা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে আলিমদের চরিত্রহননে লিপ্ত। এতে প্রত্যেক দলের অনুসারীরা খুশি হচ্ছেন। কিন্তু সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ ও যুব সমাজ কোনো ধর্মীয় দলের অনুসারী না। তারা এতটুকুই বুঝছেন যে, আলিমরা অজ্ঞ, অসৎ ও অযোগ্য। ধর্মীয়, সামাজিক বা নৈতিক কোনো বিষয়ে তাঁদের সাথে কথা বলে লাভ নেই। খৃস্টান মিশনারি, কাদিয়ানী, বাহায়ী, নাস্তিক ও অন্যান্যরা এ বিষয়টি খুব ভালভাবে কাজে লাগাচ্ছেন।

সম্মানিত পাঠক, আমরা দেখেছি, পূর্ববর্তীদের প্রতি পরবর্তীদের দায়িত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ বলেছেন: "যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের যে সকল ভাই আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু'।"[৩৯৪]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এভাবে পূর্ববর্তী আলিম-বুজুর্গদের জন্য দুআ করার এবং পূর্ববর্তী ও সমকালীন সকল আলিম ও মুমিনকে ভালবাসার এবং তাদের প্রতি অতিভক্তি ও বিদ্বেষ থেকে হৃদয়কে পবিত্র করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

৫. তাকফীর বা কাফির কথন

এরপর ইমাম আবূ হানীফা 'তাকফীর' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন: **"আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফির বলি না, যদিও তা কোনো কবীরা গোনাহ হয়, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি উক্ত পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। আমরা পাপের কারণে কোনো মুসলিমের 'ঈমান'-এর নাম অপসারণ করি না। বরং আমরা তাকে প্রকৃতই মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফির না হয়ে একজন পাপী মুমিন হতে পারে।"**

৫. ১. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা

'কুফ্র' (الكُفْرُ) অর্থ আবৃত করা, অবিশ্বাস, অস্বীকার বা অকৃতজ্ঞতা (to disbelieve, to be ungrateful, to cover)। ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফ্র বা অবিশ্বাস। আল্লাহ, তাঁর রাসূল বা ঈমানের রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকা-ই ইসলামের পরিভাষায় 'কুফ্র' বলে গণ্য। অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, অহঙ্কার, ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে 'ঈমান' বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকে তবে তা ইসলামী পরিভাষায় 'কুফ্র' বলে গণ্য। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তাঁর সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও কুফর। এজন্য কুফর বলতে শিরক, সন্দেহ ও সকল প্রকার অবিশ্বাস বুঝানো হয়।

তাক্ফীর (التكفير) এবং ইক্ফার (الإكفار) অর্থ "কাফির বানানো"। অর্থাৎ কাউকে কাফির বলা বা অবিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করা (to accuse of unbelief, charge with infidelity)। যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বা বিশ্বাসী বলে দাবি করছেন তাকে অবিশ্বাসী বা কাফির বলে আখ্যা দেওয়াকে সাধারণভাবে "তাকফীর" বলা হয়।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রকাশিত প্রথম বিভ্রান্তিগুলোর অন্যতম ছিল "তাকফীর" বা মুসলিমকে কাফির বলা। দ্বিতীয় হিজরী শতকে বিদ্যমান বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে মিল ছিল, তা হলো, নিজেদের ছাড়া অন্যান্য মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করা। এদের মধ্যে "খারিজী" ফিরকার আকীদার মূল ভিত্তিই ছিল "তাকফীর"। অন্যান্য ফিরকাও পাপের কারণে বা মতভেদীয় বিষয়ে ভিন্নমতের কারণে মুসলিমদেরকে ঢালাওভাবে কাফির বলতে থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ্)-এর যুগে তাকফীর ছিল উম্মাতের অন্যতম ফিতনা ও বিভ্রান্তি। এ জন্য তিনি এ গ্রন্থে ও অন্যান্য পুস্তিকায় এ বিষয়টি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

৫. ২. কাফির কথনের পদ্ধতিসমূহ

বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর "তাকফীর" পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়: (১) কুফর-এর পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাকফীর, (২) ঈমান-এর পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাকফীর এবং (৩) কথা বা মতের পরিণতির অজুহাতে তাকফীর।

৫. ২. ১. কুফর-এর পরিধি বাড়ানো

"কুফর"-এর পরিধি বাড়ানো অর্থ যা কুফর নয় তাও কুফর বলে গণ্য করা। এর অন্যতম দিক কবীরা গোনাহকে কুফর বলে গণ্য করা। এ পদ্ধতিতে মুমিনকে কাফির বলার ধারা চালু হয় "খারিজী"-গণের মাধ্যমে। তারা যে কোনো কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়াকে কুফ্র বলে গণ্য করে। খারাজা (خَرَجَ) অর্থ বাহির হওয়া, আনুগত্য ত্যাগ বা বিদ্রোহ করা। খারিজ বা খারিজী (الخارج/الخارجي) অর্থ দলত্যাগী, বিদ্রোহী, সমাজ পরিত্যাগকারী বা বিচ্ছিন্নতার পথ গ্রহণকারী।

৩৭ হিজরী সালে আলী (রা)-এর সাথে মুআবিয়া (রা)-এর চলমান সিফ্ফীনের যুদ্ধের সময়ে একপর্যায়ে উভয় পক্ষ "সালিস"-এর মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নেন। এতে আলী (রা)-এর পক্ষের কয়েক হাজার যুবক সৈনিক পক্ষত্যাগ করে "বিদ্রোহী" বাহিনী তৈরি করেন। এদের মূলনীতি ছিল (১) তাকফীর, (২) জিহাদ ও (৩) রাষ্ট্র। এরা দাবী করেন যে, আল্লাহর কোনো বিধান অমান্য করা বা কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়াই কুফরী। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয আইন। এরূপ কাফির বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধান ও তার পক্ষের মানুষদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয আইন। তারা দাবি করেন, আল্লাহ কুরআনে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পন না করা পর্যন্ত যুদ্ধ

করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৯৫] আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) সে নির্দেশ অমান্য করে সালিস নিয়োগ করে কুফরী করেছেন। কাজেই তাঁরা ও তাঁদের অনুসারীরা সকলেই কাফির। এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে প্রকৃত মুসলিমদের নেতৃত্বে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ফরয।

এরা ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সারাদিন সিয়াম, যিক্র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুর্‌রা' বা 'কুরআনপাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এদের বাহ্যিক ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে।

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

"হুকুম, বা কর্তৃত্ব শুধু আল্লাহরই" বা "বিধান শুধু আল্লাহরই"।[৩৯৬]

এ থেকে তারা বুঝাতেন যে, আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানাই কুফর। আর পাপ মানেই আল্লাহর অবাধ্যতায় শয়তানের আনুগত্য করা ও তার হুকুম মানা। কাজেই পাপ অর্থই কুফরী। মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[৩৯৭]

এ থেকে তারা দাবি করতেন যে, আল্লাহর নাযিলকৃত যে কোনো হুকুমু বা বিধান অমান্য করাই কুফর। এছাড়া হাদীসে অনেক সময় পাপকে সুস্পষ্টভাবে কুফরী বলা হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।"[৩৯৮]

কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনার ভিত্তিতে তারা যে কোনো কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়াকে কুফরী বলে গণ্য করত, এরূপ ব্যক্তি, সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, যুদ্ধ ও হত্যা বৈধ ও জরুরী বলে দাবি করত।

বস্তুত ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলে দাবি করা মুসলিম সমাজের সকল সংঘাত, হানাহানি ও ফিতনার মূল উৎস। সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগগুলোর সকল ইমাম, ফকীহ ও আলিম এ বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আমি **"ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ"** গ্রন্থে ও **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা"** গ্রন্থে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, খারিজীদের বিভ্রান্তির কারণ ও স্বরূপ নিম্নরূপ:

(১) কুরআন-হাদীসের এক নির্দেশনা মান্য করার দাবিতে অন্য নির্দেশনা অস্বীকার, ব্যাখ্যা বা রহিত-মানসূখ বলে দাবি করা। কুরআনে একদিকে যেমন আল্লাহর বিধান বিরোধী ফয়সালা করা বা বিধান অমান্যকে কুফর বলা হয়েছে, অন্যদিকে বিধান বিরোধী ফয়সালা বা কর্মে লিপ্তদেরকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসে যেমন কোনো কোনো পাপকে কুফর বলা হয়েছে তেমনি অগণিত হাদীসে কঠিনতম পাপে লিপ্ত মুমিনকে "পাপী মুমিন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে "সুন্নাত" বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যবহারিক রীতি ও কর্মকে গুরুত্ব না দেওয়া। তাঁর ব্যবহারিক সুন্নাত থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, তিনি কখনো কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুমিনদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি।

(৩) কুরআন-হাদীস অনুধাবনের ক্ষেত্রে নিজেদের "বুঝ"-কে চূড়ান্ত এবং সাহাবীগণের মত ও ব্যাখ্যাকে গুরুত্বহীন ভাবা। সাহাবীগণ কুরআন নাযিল প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক রীতি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, পাপের কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা বৈধ নয়। তাঁরা বারবার বলেছেন যে, কুরআন ও হাদীসে কুফর বলতে কখনো অবিশ্বাস এবং কখনো অকৃতজ্ঞতা বুঝানো হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থাসহ তা অমান্য করা এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা ও অস্বীকৃতিসহ তা অমান্য করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৫. ২. ২. ওহী বহির্ভূত বিষয়কে 'ঈমান" বানানো

তাকফীর বা মুমিনকে কাফির কথনের দ্বিতীয় দিক ঈমানের পরিধি বাড়িয়ে মুমিনকে কাফির বানানো। শীয়া, মুতাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত দল এ নীতি অনুসরণ করে। ঈমানের ভিত্তি ওহীর জ্ঞান। কুরআনে বা সুপ্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসে যে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বাইরে অনেক বিষয়কে এ সকল বিভ্রান্ত সম্প্রদায় "ঈমানের অংশ" বানায় এবং এসকল বিষয় অস্বীকার বা অমান্য করার কারণে বিরোধীদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে।

যেমন শীয়াগণ দাবি করেন যে, (১) আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পর মুসলিম উম্মাহর রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতৃত্বে তাঁর

একমাত্র উত্তরাধিকারী ও ওসিয়তপ্রাপ্ত বলে বিশ্বাস করা, (২) সাহাবীগণ যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পরে আলী (রা)-কে খিলাফত প্রদান করেন নি সেহেতু তাঁদেরকে অবিশ্বাসী বা বিভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করা, (৩) সাহাবীগণকে বিদ্বেষ করা ও তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া, (৪) আলী ও তাঁর বংশের ইমামগণের ইমামতে, নিষ্পাপত্বে, গাইবী ইলমে ও অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা... ইত্যাদি বিষয় ঈমানের অংশ। এগুলো অস্বীকার করা কুফর।

এ সকল আকীদার কোনো কিছুই সুস্পষ্টভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। আমরা আগেই বলেছি, শীয়গণের নিকট কুরআন "আকীদা" বা বিশ্বাসের উৎস নয়। তাদের বিশ্বাস যে, তাদের ভক্তিকৃত ইমাম, বুজুর্গ ও নেতৃবৃন্দ 'ইলম লাদুন্নী' অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ বা আলী-বংশের ঈমামগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই তাদের 'তাফসীর' বা মতই বিশ্বাসের ভিত্তি। এরপর বিভিন্ন ফযীলত বিষয়ক আয়াত, হাদীস, ঐতিহাসিক ঘটনা, জাল হাদীস, যুক্তিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে তারা এগুলো প্রমাণের চেষ্টা করেন। সর্বশেষ এগুলো অস্বীকার করাকে কুফর বলে গণ্য করে। অন্যান্য সকল বিভ্রান্ত ফিরকাও এ পদ্ধতি অনুসরণ করে।

৫. ২. ৩. "কথার দাবি"-র অজুহাতে কাফির বানানো

বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভিন্নমতের মুমিনকে কাফির বলার বিষয়ে উদগ্রীবতা। তারা ভিন্নমতের মুমিনের কর্ম বা মতের ব্যাখ্যা করে সে ব্যাখ্যার অজুহাতে তাকে কাফির বলেন। আরবীতে একে বলা হয় 'লাযিমুল কাওল' (لازم القول), বা 'মাআল' (مآل) অর্থাৎ কথার দাবি বা পরিণতি। অর্থাৎ 'ক' কথাটির অবশ্যম্ভাবী অর্থ বা পরিণতি 'খ'। আর 'খ' কথা বললে সে নিশ্চিত কাফির। কাজেই 'ক' কথাটি যে বলেছে সেও নিশ্চিত কাফির। যেমন মুতাযিলীগণ দাবি করত, যে ব্যক্তি আখিরাতে আল্লাহর দর্শন পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করে সে কাফির। কারণ (১) আল্লাহকে মাখলূকের সাথে তুলনা করা কুফর, (২) আল্লাহকে আখিরাতে দেখা যাবে বলার অর্থই তাঁকে মাখলুকের সাথে তুলনা করা, (৩) অতএব এরূপ বিশ্বাসকারী কাফির।

কুরআন এবং হাদীসে আখিরাতে আল্লাহর দর্শনের কথা বলা হয়েছে। এর বিপরীতে একটি আয়াত বা হাদীসেও বলা হয় নি যে, আখিরাতে আল্লাহর দর্শন অসম্ভব বা এরূপ বিশ্বাস কুফর। যে ব্যক্তি আখিরাতে আল্লাহর দর্শন লাভের বিশ্বাস পোষণ করেন তিনি কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার উপর নির্ভর করেন। উপরন্তু তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ মাখলুকের সাথে তুলনীয় নন এবং তাঁকে তুলনীয় মনে করা কুফরী। কিন্তু এ মুতাযিলীগণ এ ঘোষণার প্রতি কর্ণপাত করতেন না। তাদের একই কথা "আখিরাতে আল্লাহর দর্শন লাভে বিশ্বাস করার অর্থই তাঁকে মাখলুকের সাথে তুলনা করা। কাজেই এরূপ ব্যক্তি যদি শতকোটিবারও বলে আল্লাহ মাখলূকের সাথে তুলনীয় নন, আমি তুলনাবিহীনভাবে তাঁর দর্শনে বিশ্বাস করি- তাহলেও তাকে কাফির বলে গণ্য করতে হবে।" এরূপ দাবির ভিত্তিতেই খলীফা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিক ইমাম আহমদ-সহ অগণিত আলিমকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেন এবং কয়েকজনকে হত্যা করেন।

শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ সাধারণ মানুষ নন। বরং তাঁরা নূরের তৈরি এবং গাইবী-অলৌকিক ইলম ও ক্ষমতার অধিকারী। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে এরূপ দাবি না করে শুধু ইমামদের নামে দাবি করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, এজন্য তারা দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও নূরের তৈরি এবং গাইবী ইলম ও ক্ষমতার অধিকারী। যারা এ কথা মানেন না তারা কাফির। কারণ: (১) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও ইমামগণের পরিপূর্ণ মর্যাদায় বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, (২) তাঁদের নূরত্ব এবং অলৌকিক ইলম ও ক্ষমতায় বিশ্বাস না করলে তাঁদের অবমর্যাদা করা হয়, (৩) অতএব তাঁদের নূরত্ব, গাইবী ইলম ও ক্ষমতায় অবিশ্বাসকারী কাফির এবং নবী (ﷺ) ও নবী-বংশের দুশমন।

আমরা জানি যে, কুরআন ও হাদীসে বারবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ ছিলেন এবং মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট। কুরআন-হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানে না। বারবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলিমুল গাইব ছিলেন না। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীর জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো গাইব তিনি জানতেন না। তিনি তাঁর নিজের বা অন্যের কোনো কল্যাণ-অকল্যাণের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। অন্য কাউকে আল্লাহ কোনো ক্ষমতা প্রদান করেন নি। এ সকল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের বিপরীতে একটি আয়াতে বা সহীহ হাদীসেও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা ইমামগণ কেউ নূর দ্বারা সৃষ্ট, তাঁরা কেউ আলিমুল গাইব ছিলেন বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও ইমামগণের নূরত্ব, গাইবী ইলম ও ক্ষমতার বিষয় অস্বীকার করেন তাঁরা কুরআন ও হাদীসের এ সকল সুস্পষ্ট নির্দেশনার উপর নির্ভর করেন। পাশাপাশি তাঁরা বলেন: আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ওহীর মাধ্যমে অগণিত গাইবের কথা জানিয়েছেন, তাঁর ও তাঁর বংশধরের বিষয়ে কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সকল মর্যাদায় আমরা বিশ্বাস করি এবং তাঁদের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা অকাতরে জীবন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু শীয়াগণ এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নি; বরং বিভিন্ন যুক্তি, তর্ক ও অজুহাতে ভিন্নমতের মানুষদের কাফির বলেছেন, সুন্নী সমাজ ও রাষ্ট্রগুলোকে "তাগূতী" ও কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করেছেন।[৩৯৯]

কথার দাবি বা পরিণতি দিয়ে একে অন্যকে কাফির বলা উম্মাতের ভয়ঙ্কর ব্যাধি। বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর পাশাপাশি অনেক সময় ভাল মানুষেরা এতে আক্রান্ত হন। বর্তমান যুগে এ জাতীয় তাকফীরের দুটি নমুনা দেখুন:

(১) যে ব্যক্তি মীলাদ-কিয়াম করে না.... রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করে না, সে তাঁর মর্যাদায় বিশ্বাস করে

না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমর্যাদা সর্বসম্মতভাবে কুফর। কাজেই যে মীলাদ-কিয়াম করে না.... সে কাফির!

(২) যে ব্যক্তি মীলাদ পড়ে, কিয়াম করে, কোনোরূপ লিপ্ত হয়, কোনো জাল হাদীস বলে সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নুবুওয়াত ও সুন্নাতের পূর্ণতায় বিশ্বাস করে না। আর যে ব্যক্তি তাঁর নুবুওয়াত ও সুন্নাতের পূর্ণতায় বিশ্বাস করে না সে সর্বসম্মতভাবে কাফির। কাজেই যে ব্যক্তি মীলাদ পড়ে, কিয়াম করে... সে কাফির!

৫. ৩. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞা

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলতে নিষেধ করে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন যাচাই করবে এবং যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে তাকে বলবে না যে, 'তুমি মুমিন নও।'"[৪০০]

বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণিত মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ)

"যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দু জনের একজনরে উপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার ভাই সত্যিই কাফির না হয় তবে যে তাকে কাফির বলল তার উপরেই কুফরী প্রযোজ্য হবে।"[৪০১]

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা হত্যার মতই পাপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

"কোনো মুমিনকে কুফরীতে অভিযুক্ত করা তাকে হত্যা করার মত অপরাধ।"[৪০২]

৫. ৪. তাকফীর বিষয়ে সাহাবীগণের আদর্শ

এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণ ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তাদেরকে কাফির বলার অনুমতি দেন নি। সিফফীনের যুদ্ধ চলাকালে আলী (রা)-এর পক্ষের এক ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়িমূলক কথা বললে আলী (রা) বলেন, এরূপ বলো না, তারা মনে করেছে আমরা বিদ্রোহী এবং আমরা মনে করছি যে, তারা বিদ্রোহী। আর এর কারণেই আমরা যুদ্ধ করছি। আম্মার ইবন ইয়াসার বলেন, সিরিয়া-বাহিনীকে কাফির বলো না, বরং আমাদের দীন এক, কিবলা এক, কথাও এক; তবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা লড়াই করছি।"[৪০৩]

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, খারিজীগণ আলী, মুআবিয়া ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকল সাহাবী (ﷺ) ও সকল মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করত এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালাত। সাহাবীগণ তাদেরকে বিভ্রান্ত বলতেন, কাফির বলতেন না। যদিও বিভিন্ন হাদীসে খারিজীদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তারা দীন থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যাবে, তবুও সাহাবীগণ তাদেরকে কাফির বলতেন না। তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন এমনকি এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন নি।[৪০৪]

আলী (রা)-কে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্‌র করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিক্‌রে লিপ্ত। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে।[৪০৫]

৫. ৫. তাকফীর বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি

কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা ও সাহাবীগণের কর্মধারার আলোকে 'আহলুস সুন্নাত' ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মুলনীতি হলো, মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। সকল কুফর, শিরক ও পাপ থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি গ্রহণ করার বিষয়ে বাহ্যিক দাবির উপর নির্ভর করবেন। কোনো ঈমানের দাবিদারকেই কাফির না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ভুল করে কোনো মু'মিনকে কাফির বলে মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফির-মুশরিককে মুসলিম মনে করা অনেক অনেক ভাল ও নিরাপদ। প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এ নীতির ভিত্তিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন, তাকে কোনো পাপের কারণে 'অমুসলিম', কাফির বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না, তিনি তার পাপ থেকে তাওবা করুন, অথবা না করুন, যতক্ষণ না তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা দিবেন। ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী বা আল্লাহর নির্দেশ

অমান্যকারী মুসলিম পাপী মুসলিম বলে গণ্য হবেন। তবে যদি তার এ পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে করেন, ইসলামী বিধানকে অচল বা 'অপালনযোগ্য' বলে মনে করেন অথবা ইসলামের কিছু বিধান পরিত্যাগ করেও ভাল মুসলিম হওয়া যায় বলে মনে করেন তবে তা কুফ্‌র বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে। কারো কর্ম দেখে "মনে করা"-র দাবি করা যাবে না। অর্থাৎ কারো ইসলাম বিরোধী কর্ম দেখে এ কথা দাবি করা যাবে না যে, সে নিশ্চয় পাপকে হালাল মনে করে বা আল্লাহর বিধানকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেই এরূপ করছে। বরং তার মুখের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করতে হবে।

ঈমানের দাবিদার জেনে শুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে। কারো কথা বা কর্ম বাহ্যত কুফরী হলেও যদি তার কোনোরূপ ইসলাম সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তবে দূরবর্তী হলেও ইসলামী ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে মুমিন বলে মেনে নিতে হবে। সর্বোপরি ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কোনো কুফরী বা শিরকী কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোনো ওযর আছে কিনা তা জানতে হবে। সে ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য কোনো ওজরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে।

মুসলিম নামধারী ব্যক্তিকে "কাফির" বলা মূলত নির্ভর করে তার স্বীকৃতির উপর। যদি সে তাওহীদ, রিসালাত বা আরকানুল ঈমানের মৌলিক কোনো বিষয়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলে গণ্য করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেখুন। কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টি কুফর। কেউ যদি অমুসলিম, নাস্তিক বা ইসলাম অবমাননাকারীর শিরক-কুফর মত বা কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে বা তারাও আখিরাতে মুক্তি লাভ করবে বলে বিশ্বাস করে তবে সে ব্যক্তি কাফির, যদিও সে ইসলামের সকল বিশ্বাস ও আহকাম পালন করে। কোনো মুসলিম নামধারী ব্যক্তি যদি এরূপ মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের সহযোগিতা করে তবে তার এরূপ অন্যায় কর্মের দ্বিবিধ কারণ থাকতে পারে: জাগতিক স্বার্থ, লোভ, ভয় বা না-বুঝে এরূপ করা অথবা কুফর, শিরক বা নাস্তিকতার প্রতি সন্তুষ্টির কারণে এরূপ করা। মুসলিম নামধারী ব্যক্তি প্রথম কারণেই এরূপ করছেন বলে ধরে নিতে হবে। তাকে তার কর্মের ভয়াবহতা বুঝাতে হবে, কিন্তু মুখের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ছাড়া তাকে কাফির বলে গণ্য করা যাবে না। ইমাম তাহাবী বলেন:

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ... وَلا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِيمَانِ إِلاَّ بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ.

"আমাদের কিবলাপন্থীদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মু'মিন মুসলিম বলে আখ্যায়িত করব যতক্ষণ তারা নবী (ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য বলে সাক্ষ্য দিবে। ... আমাদের কিবলাপন্থী কোনো মুমিনকে কোনো পাপের কারণে আমরা কাফির বলি না, যতক্ষণ না সে এ পাপ হালাল মনে করবে। .... যেসব বিষয় বান্দাকে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত করেছে, এমন কোনো বিষয় অস্বীকার না করলে, সে ঈমানের গণ্ডি হতে বের হয় না।"[৪০৬]

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, 'আহলু কিবলা' বলতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি যারা মেনে নিয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয়। তাওহীদ, রিসালাত, আরকানুল ঈমান ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যা কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন বা যে বিষয়টি মুসলিম উম্মার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এরূপ কোনো বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করেন বা অবিশ্বাস করেন তবে তাকে 'আহলু কিবলা' বলা হয় না। যেমন তাওহীদুর রুবূবিয়্যাত অস্বীকার করা, তাওহীদুল উলূহিয়্যাত অস্বীকার করা, মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা বা খাতমুন নুবুওয়াত অস্বীকার করা, কাউকে কোনো পর্যায়ে তাঁর শরীয়তের ঊর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করা, আখিরাত অস্বীকার করা ইত্যাদি। এরূপ অবিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আজীবন কিবলামুখি হয়ে সালাত পড়েন বা ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করেন তবুও তাকে 'আহলু কিবলা' বলা হবে না। কারণ তিনি ঈমানই অর্জন করেন নি, কাজেই তার ইসলাম বা কিবলামুখি হওয়া অর্থহীন।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো মুমিন মুসলিম যদি এমন কোনো কর্মে লিপ্ত হয় বা কথা বলে যা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশ অনুসারে কুফ্‌র বা শিরক বলে গণ্য তবে তার কর্মকে অবশ্যই শির্ক বা কুফর বলা হবে, তবে উক্ত ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে কাফির বা মুশরিক বলার আগে দেখতে হবে যে, অজ্ঞতা, ব্যাখ্যা, ভুল বুঝা বা এজাতীয় কোনো ওযর তার আছে কিনা।[৪০৭]

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামিদ গাযালী (৫০৫হি) "কিতাবুত তাফরিকা বাইনাল ঈমান ওয়ায যানদাকা" (ঈমান ও বেঈমানীর মধ্যে পার্থক্য) গ্রন্থে বলেন:

إِنَّ التَّكْفِيْرَ هُوَ صَنِيْعُ الْجُهَّالِ، وَلاَ يُسَارِعُ إِلَى التَّكْفِيْرِ إِلاَّ الْجَهَلَةُ، فَيَنْبَغِيْ الاِحْتِرَازُ مِنَ التَّكْفِيْرِ مَا وَجَدَ الإِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيْلاً، فَإِنَّ اسْتِبَاحَةَ الدِّمَاءِ وَالأَمْوَالِ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ إِلَى الْقِبْلَةِ، الْمُصَرِّحِيْنَ بِقَوْلِ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ"، خَطَأٌ. وَالْخَطَأُ فِيْ تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَأِ فِيْ سَفْكِ مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ. ... فَإِنَّ التَّكْفِيْرَ فِيْهِ خَطَرٌ، وَالسُّكُوْتُ لاَ خَطَرَ فِيْهِ!".

"তাকফীর বা কাফির বলা মুর্খদের কর্ম। মুর্খরা ছাড়া কেউ কাউকে কাফির বলতে ব্যস্ত হয় না। মানুষের উচিত সাধ্যমত কাউকে কাফির বলা থেকে বিরত থাকা। কিবলাপন্থীগণ যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলে সাক্ষ্য দেন তাদের রক্ত ও সম্পদ নষ্ট করা কঠিন অপরাধ (কাফির বলা থেকেই এর সূত্রপাত)। ভুলক্রমে এক হাজার কফিরকে পরিত্যাগ করা ভুল করে একজন মুসলিমের প্রাণ বা সম্পদের সামান্যতম ক্ষতি করা থেকে সহজতর। .... কাফির বলার মধ্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি, আর নীরব থাকায় কোনোই ঝুঁকি নেই।"[৪০৮]

৫. ৬. কুফরী কর্ম বনাম কাফির ব্যক্তি

মোল্লা আলী কারীর বক্তব্য থেকে আমরা জানলাম যে, ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি কুফরী কর্মে লিপ্ত হলে তার কর্মকে কুফ্র বলতে হবে, তাকে কুফরী পর্যায়ের পাপে লিপ্ত বলতে হবে, তবে তাকে কাফির বলার আগে তার কোনো ওজর আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। কিছু জানতে না পারলে ওজর আছে বলেই ধরে নিতে হবে। এ দ্বারা তার কুফরী কর্মকে অনুমোদন করা হয় না, বরং ভুলক্রমে মুমিনকে কাফির বলার মহাপাপ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। মুমিন সকল প্রকার কুফর-শিরককে ঘৃণা ও নিন্দা করার পাশাপাশি মুমিনকে কাফির বলার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। এ বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্য আমি **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা"** এবং **"ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ"** বইয়ে আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(১) আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে ফয়সালা না করাকে কুফর বলা হয়েছে। পাশাপাশি আল্লাহর বিধান বিরোধিতায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে মুমিন বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে বিভিন্ন কর্মকে কুফর বলা হলেও এরূপ কর্মে লিপ্ত ঈমানের দাবিদারদের মুসলিম বলেই গণ্য করা হয়েছে।

(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "একব্যক্তি জীবনভর সীমালঙ্ঘন ও পাপে লিপ্ত থাকে। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে তার পুত্রদেরকে ওসিয়ত করে বলে: আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে পুড়াবে। এরপর আমাকে বিচুর্ণ করবে। এরপর ঝড়ের মধ্যে আমাকে (আমার দেহের বিচুর্ণিত ছাই) সমূদ্রের মধ্যে ছাড়িয়ে দেবে। কারণ, আল্লাহর কসম, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে ধরতে সক্ষম হন তবে আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যে শাস্তি তিনি অন্য কাউকে দেন নি। তার সন্তানগণ তার ওসিয়ত অনুসারে কর্ম করে। তখন আল্লাহ যমিনকে নির্দেশ দেন যে যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দিতে। তৎক্ষণাৎ লোকটি পুনর্জীবিত হয়ে তার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে যায়। তখন তিনি লোকটিকে বলেন: তুমি এরূপ করলে কেন? লোকটি বলে: হে আমার প্রতিপালক: আপনার ভয়ে। তখন তিনি তাকে এজন্য ক্ষমা করে দেন।"[৪০৯]

আমরা দেখি যে, এ ব্যক্তি একটি কুফরী বিশ্বাস পোষণ করেছে। সে ধারণা করেছে যে, তার দেহ এভাবে পুড়িয়ে ছাই করে সমুদ্রে ছড়িয়ে দিলে আল্লাহ তাকে আর পুনরুজ্জীবিত করতে এবং শাস্তি দিতে পারবেন না। তবে তার এ ধারণা ছিল অজ্ঞতা প্রসূত। এজন্য তার মধ্যে বিদ্যমান নির্ভেজাল আল্লাহ-ভীতির কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে আমরা দেখি যে, একটি বিশ্বাস সুনিশ্চিত কুফরী হলেও উক্ত বিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(৩) মক্কা বিজয়ের পূর্বে হাতিব ইবন আবী বালতা'আ (রা) যুদ্ধের গোপন বিষয় ফাঁস করে মক্কার কাফিরদের নিকট একটি পত্র লিখেন। পত্রটি উদ্ধার করার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতিব (রা)-কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, মুনাফিকী বা কুফরীর কারণে তিনি এরূপ করেন নি, বরং নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে এরূপ করেছেন। হাতিবের কর্ম বাহ্যত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সাথে খিয়ানত ও কুফর ছিল। এজন্য উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিককে হত্যা করি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বিষয়ে হাতিবের বক্তব্যকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেছেন।[৪১০]

অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে একটি কর্ম সুনিশ্চিত কুফর হতে পারে। তবে এরূপ কর্মে লিপ্ত মুমিন যদি এর কোনো ওযর বা ব্যাখ্যা দেন তবে তা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে:

يَا مُحَمَّدُ، اتَّقِ اللَّهَ (مَا عَدَلْتَ)

"হে মুহাম্মাদ, আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি তো বে-ইনসাফি করলেন!"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তাকওয়া বা ইনসাফের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা সুনিশ্চিত কুফর। এজন্য মাজলিসে উপস্থিত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "না। হয়তবা লোকটি সালাত আদায় করে।" খালিদ (রা) বলেন: "কত মুসল্লীই তো আছে যে মুখে যা বলে তার অন্তরে তা নেই।" তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, আমি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখব বা তাদের পেট ফেড়ে দেখব।"[৪১১]

এ থেকে আমরা দেখছি যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম দাবি করে এবং ইসলামের ব্যাহ্যিক কিছু কর্ম করে তবে তাকে মুসলিম বলে গণ্য করতে হবে এবং লোকটি কুফরী কথা বললে তার কোনো ওযর আছে বলে ধরে নিতে হবে।

(৫) অজ্ঞতার ওযর সম্পর্কে হুযাইফা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَدْرُسُ الإِسْلامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلا صَلاةٌ وَلا نُسُكٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى (وَيسْرِي النسيان) عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلا يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا. فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَهُمْ لا يَدْرُونَ مَا صَلاةٌ وَلا صِيَامٌ وَلا نُسُكٌ وَلا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلاثًا

"কাপড়ের নকশি যেমন মলিন হয়ে মুছে যায় তেমনি মলিন ও বিলীন হয়ে যাবে ইসলাম। এমনকি মানুষ জানবে না যে, সালাত কী? সিয়াম কী? হজ্জ কী, যাকাত কী? এক রাতে কুরআন অপসারিত হবে (বিস্মৃতি কুরআনকে আবৃত করবে) ফলে পৃথিবীতে কুরআনের কোনো আয়াত অবশিষ্ট থাকবে না। অনেক বয়স্ক নারী-পুরুষ রয়ে যাবে যারা বলবে, আমার আমাদের পিতা-পিতামদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কালিমাটি বলতে শুনতাম কাজেই আমরা তা বলি।" তখন সিলাহ নামক এক শ্রোতা বলেন, "তারা সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত কিছুই জানে না, কাজেই তাদের জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কোনো কাজে লাগবে না।" তখন হুযাইফা মুখ ফিরিয়ে নেন। সিলাহ তিনবার কথাটি বলেন এবং তিন বারই হুযাইফা মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয় বারে তিনি বলেন: "হে সিলাহ, এ কালিমাটি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।" তিনি তিনবার একথাটি বললেন।"[৪১২]

(৬) ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীসে খারিজীগণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার বলেছেন যে, তারা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যাবে। সাহাবীগণ এ সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সবাইকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁরা খারিজীদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি। তাঁরা সাহাবীগণকে কাফির বলেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তাঁদের নিরস্ত্র পরিজনদেরকে হত্যা করেছে, কিন্তু সাহাবীগণ তাদেরকে কাফির বলেন নি। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া তাদের হত্যার অনুমতি দেন নি। তাদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রেখেছেন।[৪১৩]

(৭) চার ইমাম ও প্রথম যুগগুলোর অন্যান্য ইমাম খারিজী, শীয়া, মুতাযিলী, মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা, কাদারিয়া ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অনেক কর্মকে "কুফর" বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ সকল ফিরকার অনুসারীদের কাফির বলে গণ্য করেন নি। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল বারবার বলেছেন যে, কুরআনকে মাখলূক বা সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করা কুফর। পাশাপাশি তিনি এ কুফরী মতের প্রধান অনুসারী, প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক খলীফা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিককে মুমিন বলে গণ্য করেছেন, কুফরী আকীদা ও পাপ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের আনুগত্যের জন্য জনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁদের ও তাঁদের অনুসারী ইমামদের পিছনে জুমুআ ও ঈদের সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যান্য ইমামও একই পথ অনুসরণ করেছেন। বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর অনেক বিশ্বাস ও কর্ম কুফর বলে গণ্য হলেও এ সকল ফিরকার অনুসারী ব্যক্তি মুসলিমকে তারা কাফির বলে গণ্য করেন নি।

শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়া বলেন:

وَلا يَجُوزُ تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ بِذَنْبٍ فَعَلَهُ وَلَا بِخَطَأٍ أَخْطَأَ فِيهِ كَالْمَسَائِلِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا ... وَالْخَوَارِجُ الْمَارِقُونَ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقِتَالِهِمْ قَاتَلَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ.. أَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. وَاتَّفَقَ عَلَى قِتَالِهِمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ بَلْ جَعَلُوهُمْ مُسْلِمِينَ ... وَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ثَبَتَ ضَلَالُهُمْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ لَمْ يُكَفَّرُوا مَعَ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِقِتَالِهِمْ فَكَيْفَ بِالطَّوَائِفِ الْمُخْتَلِفِينَ الَّذِينَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ الْحَقُّ فِي مَسَائِلَ غَلِطَ فِيهَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ؟ .. هَذَا مَعَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْجَمَاعَةِ والائتلاف وَنَهَى عَنْ الْبِدْعَةِ وَالاخْتِلافِ ...

"কোনো পাপের কারণে বা আকীদাগত মতভেদীয় কোনো বিষয়ে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা বৈধ নয়। .... বিদ্রোহী খারিজীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। খলীফায়ে রাশেদ আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়ে সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের ইমামগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। এতদসত্ত্বেও আলী (রা), সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী কেউ তাদেরকে কফির বলেন নি, বরং তাদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করেছেন।.... হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও ইজমার মাধ্যমে যাদের বিভ্রান্তি প্রমাণিত তাদের বিষয়েই এরূপ বিধান। অন্যান্য বিভ্রান্ত দল-উপদলের বিভ্রান্তি আরো অনেক অস্পষ্ট। যে সকল বিষয়ে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে সে সকল বিষয়ে অনেক সময় তাদের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ আলিমেরও পদস্খলন হয়েছে। .... উপরন্তু মহান আল্লাহ জামাআত বা ঐক্যের ও সম্প্রীতির নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিদআত ও মতভেদ নিষেধ করেছেন।"[৪১৪]

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর বিশেষণ অস্বীকার করা ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমাম কুফর বলেছেন। এগুলো মূলত কর্মের

বিধান। কিন্তু অনেকে এ বিষয়ে প্রান্তিকতায় নিপতিত হয়েছেন। হাম্বালী-সালাফী ও আশআরী-মাতুরিদীগণ এ প্রসঙ্গে একে অপরকে কাফির বলেছেন। এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'কথার দাবি' দ্বারা কাফির বলা। কেউ বলেছেন: "মহান আল্লাহর হাত, মুখমণ্ডল, চক্ষু, আরশের উপরে থাকা, অবতরণ ইত্যাদি যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে সে কাফির। কারণ সে মহান আল্লাহকে দেহধারী বলে বিশ্বাস করে।" এরা 'তুলনাযুক্ত' ও 'তুলনামুক্ত' বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করছেন না। কেউ বলছেন: "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর হাত অর্থ ক্ষমতা, আরশে অধিষ্ঠান অর্থ ক্ষমতা গ্রহণ... বলে বা তাঁর ঊর্ধ্বত্ব অস্বীকার করে সে জাহমী-কাফির; কারণ সে কুরআন বা হাদীস অস্বীকার করে।" তারা ইজতিহাদী ব্যাখ্যা ও জেদপূর্বক অস্বীকারের মধ্যে পার্থক্য করছেন না।

যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের কোনো বক্তব্য বা বিশেষণ ইজতিহাদী কারণে ব্যাখ্যা করা জরুরী মনে করেন তার প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া বলেন: তার ইজতিহাদ ভুল হলেও তিনি কাফির নন। মৃতদেহ পোড়ানোর ওসিয়তকারী আল্লাহর 'কুদরত' বিশেষণ অবিশ্বাস করেছিল। এরপরও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। এ বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন:

وَالْمُتَأَوِّلُ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ الْحَرِيصُ عَلَى مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ أَوْلَى بِالْمَغْفِرَةِ مِنْ مِثْلِ هَذَا .

"যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণে সচেষ্ট, তবে ইজতিহাদের কারণে এরূপ তাবীল-ব্যাখ্যা করেন তিনি এ ব্যক্তির চেয়ে ক্ষমা লাভের অধিক যোগ্য।"[৪১৫]

ইবন তাইমিয়া আরো বলেন:

أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ، إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا : وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ.

"কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির বলা, ফাসিক বলা বা পাপী বলা আমি কঠোরভাবে নিষেধ করি। কেবলমাত্র যদি কারো বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুনিশ্চিতভাবে কুফর, ফিসক বা পাপাচার প্রমাণিত হয় তবেই তা বলা যাবে। আমি নিশ্চিত যে, মহান আল্লাহ এ উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেছেন। আর ফিকহী মাসআলার ভুল এবং আকীদা বিষয়ক ভুল উভয় প্রকারের ভুলই এ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত।"[৪১৬]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) বলেন:

لا يكفر بها حَتَّى الْخَوَارِجُ الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا وَسَبَّ الرَّسُولِ، وَيُنْكِرُونَ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَجَوَازَ رُؤْيَتِهِ لِكَوْنِهِ عَنْ تَأْوِيلٍ وَشُبْهَةٍ بِدَلِيلِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ، إلا الْخَطَّابِيَّةِ... وَإِنْ أَنْكَرَ بَعْضَ مَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً كَفَرَ بِهَا

"এমনকি খারিজীগণ, যারা আমাদের রক্তপাত ও ধনসম্পদ বৈধ বলে গণ্য করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গালি প্রদান করে, মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করে এবং আখিরাতে তাঁর দর্শন অস্বীকার করে তাদেরও এগুলির কারণে কাফির বলা হয় না। কারণ তাদের এ সকল মতের কারণ ব্যাখ্যা ও কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা। এর প্রমাণ যে, মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ মামলা-মুকাদ্দামায় তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হয়। তবে কেবল খাত্তাবিয়্যাহ ফিরকাকে কাফির বলা হয়েছে।[৪১৭] আর কোনো ফিরকা যদি দীনের কোনো অত্যাবশ্যকীয় সর্বজনজ্ঞাত বিশ্বাস অস্বীকার করে তবে এরূপ বিদ'আতের কারণে সে কাফির বলে গণ্য হবে।"[৪১৮]

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী বলেন:

نقل عن السلف – منهم إمامنا أبو حنيفة – أنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة وعليه بنى أئمة الكلام عدم تكفير الروافض والخوارج والمعتزلة والمجسمة وغيرها من فرق الضلالة سوى من بلغ اعتقاده منهم إلى الكفر

"সালাফ সালিহীন- আমাদের ইমাম আবূ হানীফাও তাঁদের অন্তর্ভূক্ত- থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা কোনো আহলু কিবলাকে কাফির বলি না। এ বক্তব্যের ভিত্তিতেই আকীদাবিদগণ মূলনীতি তৈরি করেছেন যে, শীয়া-রাফিযী, খারিজী, মুতাযিলী, মুজাস্‌সিমা (দেহে বিশ্বাসী) ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকাকে কাফির বলা যাবে না। তবে কারো আকীদা বিশ্বাস যদি কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে ভিন্ন কথা।"[৪১৯]

মোল্লা আলী কারী আল্লামা ইবন হাজার মাক্কীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন:

الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أنا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا إن أتوا بمكفر صريح لا استلزامي لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم والصلاة على موتاهم ودفنهم في مقابرهم لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين حقت عليهم كلمة الفسق والضلال إلا أنهم لم يقصدوا بما قالوه اختيار

الكفر وإنما بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل لهم لكن لتقصيرهم بتحكيم عقولهم وأهويتهم وإعراضهم عن صريح السنة والآيات من غير تأويل سائغ وبهذا فارقوا مجتهدي الفروع فإن خطأهم إنما هو لعذرهم بقيام دليل آخر عندهم مقاوم لدليل غيرهم من جنسه فلم يقصروا ومن ثم أثيبوا على اجتهادهم

"সালাফ সালিহীন এবং পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলিমের নিকট সঠিক মত এই যে, বিদআতপন্থী এবং বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর অনুসারীদেরকে আমরা কাফির বলব না। তবে যদি তারা সুস্পষ্ট কোনো কুফরী কর্ম বা মত গ্রহণ করে তবে তাদেরকে কাফির বলা হবে। কারো আকীদার দাবি বা পরিণতির অজুহাতে তাকে কাফির বলা যাবে না। কারণ সঠিক মত এই যে, কারো মতের দাবি বা পরিণতি তার মত বলে গণ্য নয়। আর এজন্যই সকল যুগেই আলিমগণ বিভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীদের সাথে মুসলিম হিসেবেই আচরণ করেছেন, যেমন তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক, তাদের মৃতদের জানাযার সালাত আদায়, মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করা ইত্যাদি। এ সকল সম্প্রদায় ভুলের মধ্যে নিপতিত এবং তাদের এ ভুলের পক্ষে তাদের কোনো ওযর বা গ্রহণযোগ্য কারণ নেই। এজন্য তাদেরকে পাপী ও পথভ্রষ্ট বলতে হবে। তবে তাদের উদ্দেশ্য কুফরী করা নয়। তারা সত্য সন্ধানে ইজতিহাদ বা চেষ্টা করেছে তবে সত্যে পৌঁছাতে পারে নি। আকল বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির উপর ও নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করা এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ছাড়া সুস্পষ্ট সুন্নাত এবং কুরআনের আয়াতগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণেই তারা সত্যে না পৌঁছে বিভ্রান্ত হয়েছে। আর এখানেই ফিকহী বিষয়ে ইজতিহাদকারীর সাথে তাদের পার্থক্য। ফিকহী বিষয়ে ইজতিহাদকারী ভিন্নমতের একটি দলীলের বিপরীতে একই পর্যায়ের অন্য দলীল থাকার কারণে ভিন্নমত পোষণ করেন। এজন্য তিনি ইজতিহাদের জন্য সাওয়াব লাভ করেন।"[৪২০]

ইমাম আবূ হানীফা এ পরিচ্ছেদে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এ মূলনীতি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি এ বিষয়টি বারবার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা দেখেছি যে, ইমাম আযম তাঁর "আল-ফিকহুল আবসাত" গ্রন্থে "আল-ফিকহুল আকবার" বা শ্রেষ্ঠতম ফিকহের সংজ্ঞায় বলেছেন: "পাপের কারণে কোনো কিবলাপন্থী মুসলিমকে কাফির বলবে না এবং কারো ঈমান অস্বীকার করবে না।" এ পুস্তকে তাঁর আরেকটি বক্তব্য দেখুন:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَهُوَ كَافِرٌ، مَا النَّقْضُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: يُقَالُ لَهُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: "وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"، فَهُوَ ظَالِمٌ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَلاَ مُنَافِقٍ. وَإِخْوَةُ يُوْسُفَ قَالُوْا: "يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ"، وَكَانُوْا مُذْنِبِيْنَ لاَ كَافِرِيْنَ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ ﷺ "لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ"، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ كُفْرِكَ. وَمُوْسَى حِيْنَ قَتَلَ الرَّجُلَ كَانَ فِيْ قَتْلِهِ مُذْنِباً لاَ كَافِراً

"আবূ মুতী বলেন: যদি কেউ বলে, যে পাপে লিপ্ত হয় সে-ই কাফির, তবে তার বক্তব্য কিরূপে খণ্ডন করা হবে তা বলুন। তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) বলেন: তাকে বলা হবে: আল্লাহ তাআলা বলেছেন[৪২১]: "এবং স্মরণ কর যুন্নুন-ইউনূস-এর কথা যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না; অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র মহান, নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম।" তাহলে তিনি যালিম মুমিন, কাফিরও নন, মুনাফিকও নন। ইউসূফের ভাইগণ বলেছিলেন[৪২২]: "হে আমাদের পিতা, আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয় আমরা ছিলাম অপরাধী"; তাঁরা ছিলেন পাপী, কিন্তু তাঁরা কাফির ছিলেন না। আর মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বলেছেন[৪২৩]: "যেন আল্লাহ মার্জনা করেন 'তোমার ত্রুটি' অতীত ও ভবিষ্যতের", তিনি বলেন নি: "তোমার কুফর"। আর মূসা (আ) যখন সে মানুষটিকে হত্যা করলেন তিনি হত্যার কারণে অপরাধী হন, কাফির হন নি।"[৪২৪]

আল-ফিকহুল আবসাত গ্রন্থে আবূ মুতী ও ইমাম আযমের আরেকটি কথোপকথন:

قُلْتُ لَهُ: مَا تَقُوْلُ فِيْ الْخَوَارِجِ الْمُحَكِّمَةِ؟ قَالَ: هُمْ أَخْبَثُ الْخَوَارِجِ. قُلْتُ لَهُ: أَتُكَفِّرُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ نُقَاتِلُهُمْ عَلَى مَا قَاتَلَهُمْ الأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ؛ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ يُكَبِّرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَتْلُوْنَ الْقُرْآنَ .... فَكُفْرُ الْخَوَارِجِ كُفْرُ النِّعَمِ كُفْرٌ بِمَا أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ.

"আমি (আবু মুতী) তাঁকে বললাম: হুকুম-পন্থী খারিজীগণ (যারা বলেন যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে হুকুম-বিধান-এর ক্ষমতা প্রদান বা কারো হুকুম-বিধান পালন করা কুফর)-এর বিষয়ে আপনি কী বলেন? তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) বলেন: এরা হলো খারিজীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দল। আমি বললাম: আপনি কি তাদেরকে কাফির বলেন? তিনি বলেন: না, তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যেভাবে নেককার ইমাম-রাষ্ট্রপ্রধানগণ, আলী (রা) এবং উমার ইবন আব্দুল আযীয (রাহ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। .... কারণ খারিজীগণ তাকবীর বলে, সালাত আদায় করে, কুরআন তিলাওয়াত করে.... অতএব খারিজীদের কুফর হচ্ছে

নিয়ামতের কুফর বা অকৃতজ্ঞতা, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের অস্বীকার ও অকৃতজ্ঞতা।"[৪২৫]

ইমাম আবূ হানীফা রচিত অন্য পুস্তিকা "আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম"-এ এক স্থানে ইমাম আযমের সাথে আবূ মুকাতিলের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর নিম্নরূপ:

أَخْبِرْنِيْ عَمَّنْ يَشْهَدُ عَلَيْكَ بِالْكُفْرِ، مَا شَهَادَتُكَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ...: شَهَادَتِيْ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ، وَلاَ أُسَمِّيْهِ بِذَلِكَ كَافِراً، وَلَكِنْ أُسَمِّيْهِ كَاذِباً؛ لأَنَّ الْحُرْمَةَ حُرْمَتَانِ: حُرْمَةٌ تُنْتَهَكُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَحُرْمَةٌ تُنْتَهَكُ مِنْ عَبِيْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَالْحُرْمَةُ الَّتِيْ تُنْتَهَكُ مِنْ عَبِيْدِ اللهِ، فَذَلِكَ مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَظَالِمِ. وَلاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ الَّذِيْ يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ كَالَّذِيْ يَكْذِبُ عَلَيَّ؛ لأَنَّ الَّذِيْ يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُوْلِهِ ذَنْبُهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ لَوْ كَذَبَ عَلَى جَمِيْعِ النَّاسِ؛ فَالَّذِيْ شَهِدَ عَلَيَّ بِالْكُفْرِ فَهُوَ عِنْدِيْ كَاذِبٌ، وَلاَ يَحِلُّ لِيْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ لِكَذِبِهِ عَلَيَّ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: "وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى".

"আবূ মুকাতিল বলেন: যে ব্যক্তি আপনাকে কাফির বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার বিষয়ে আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন? উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা বলেন: "তার বিষয়ে আমার সাক্ষ্য যে, সে মিথ্যাবাদী। এজন্য আমি তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করি না, বরং তাকে মিথ্যাবাদী বলি। কারণ মর্যাদা বা হক্ক দু প্রকার। এক হলো আল্লাহর হক্ক বা মর্যাদা নষ্ট করা, অন্যটি হলো আল্লাহর বান্দাদের হক্ক বা মর্যাদা নষ্ট করা। আল্লাহর বান্দাগণের মর্যাদা বা হক্ক নষ্ট করা হলো তাদের মধ্যকার জুলুম ও অন্যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ বিষয়ে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার অবস্থা আর আমার বিষয়ে যে মিথ্যা বলে তার অবস্থা এক হতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ নামে মিথ্যা বলছে তার পাপ দুনিয়ার সকল মানুষের নামে মিথ্যা বলার চেয়েও ভয়ঙ্করতর। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে কাফির বলে সাক্ষ্য দেয় সে ব্যক্তি আমার মতে মিথ্যাবাদী। তবে সে আমার বিষয়ে মিথ্যা বলেছে এ অজুহাতে তার বিষয়ে মিথ্যা বলা আমার জন্য বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ বলেছেন[৪২৬]: "কোনো গোষ্ঠীর সাথে শত্রুতা যেন তোমাদেরকে বে-ইনসাফী করার প্ররোচনা না দেয়; তোমরা ইনসাফ করবে; ইনসাফ তাকওয়ার সাথে সুসমঞ্জস"...।"[৪২৭]

এখানে ইমাম আযম আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কর্মধারা ব্যাখ্যা করেছেন, তা হলো প্রতিপক্ষ বা ভিন্নমতাবলম্বী মুমিনের বাহ্যত কুফরী কথা ব্যাখ্যা করে তাকে মুমিন বলে গণ্য করার চেষ্টা। আমরা দেখেছি যে, বিভ্রান্ত দলগুলো ভিন্নমতের মুমিনদেরকে কাফির বলতে উদগ্রীব থাকে। কোনো সুস্পষ্ট অজুহাত না পেলে তার কোনো একটি বক্তব্য ব্যাখ্যা করে তার ভিত্তিতে তাকে কাফির বলে। পক্ষান্তরে সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ ভিন্নমতের মুমিনকে মুমিন বলতে উদগ্রীব। তার কথার মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরী থাকলেও তা ব্যাখ্যা করে তাকে মুমিন বলতে চেষ্টা করেন তারা। বিষয়টি ইমাম আবূ হানীফা এখানে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা দেখেছি যে, খারিজী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত দল সুন্নাত অনুসারীদের কাফির বলত। ইমাম আবূ হানীফাকেও তারা কাফির বলেছে। প্রায় মুতাওয়াতির হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুমিনকে কাফির বলা কুফরী। এ সকল হাদীসের দলীল দিয়ে ইমাম আযম বলতে পারতেন যে আমাকে কাফির বলে সে কাফির। কারণ (১) অনেকগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, মুমিনকে কাফির বলা কুফরী, (২) আমি নিশ্চিতভাবেই মুমিন, (৩) কাজেই যে আমাকে কাফির বলেছে সে নিশ্চিতভাবেই কাফির। কিন্তু আহলুস সুন্নাত-এর ইমামগণ প্রতিপক্ষকে কাফির বানাতে উদগ্রীব ছিলেন না, বরং প্রতিপক্ষকে মুমিন বলে দাবি করতে উদগ্রীব ছিলেন। এজন্য অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে ইমাম আযম তাকে মিথ্যাবাদী মুমিন বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

"আল-ফিকহুল আবসাত" গ্রন্থের আরেকটি বক্তব্য দেখুন:

فَقُلْتُ: إِذَا أَنْكَرَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَقَالَ: لاَ أَدْرِيْ مَنْ خَالِقُ هَذَا؟ قَالَ: فَإِنَّهُ كُفْرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ"، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَهُ خَالِقٌ غَيْرُ اللهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لاَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالزَّكَاةَ، فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى "أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ" وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ"، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: "فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِيْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ". فَإِنْ قَالَ: أُوْمِنُ بِهَذِهِ الآيَةِ وَلاَ أَعْلَمُ تَأْوِيْلَهَا وَلاَ أَعْلَمُ تَفْسِيرَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَكْفُرُ؛ لأَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِالتَّنْزِيْلِ وَمُخْطِئٌ فِيْ التَّفْسِيْرِ.

"আমি (আবূ মুতী বালখী) বললাম: যদি কেউ আল্লাহর কোনো সৃষ্টি অস্বীকার করে বলে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছেন তা আমি জানি না, তাহলে তার বিধান কী? তিনি (আবূ হানীফা) বলেন: এ তো কুফরী করল; কারণ আল্লাহ বলেছেন[৪২৮]: "তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকারী"; আর উপরের কথা দ্বারা সে যেন বলল, এ দ্রব্যটির আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে। অনুরূপভাবে যদি সে বলে, আল্লাহ আমার উপর সালাত, সিয়াম ও যাকাত ফরয করেছেন বলে আমি জানি না (অর্থাৎ এগুলির আবশ্যকতা সে অস্বীকার করে) তবে সে কাফির হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন: "সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর"[৪২৯], এবং বলেছেন: "তোমাদের

উপর সিয়াম বিধিবদ্ধ হলো" ।[৪৩০] আল্লাহ আরো বলেছেন: "অতএব আল্লাহর তাসবীহ যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা প্রভাতে উপনীত হও। এবং তাঁরই জন্য প্রশংসা আসমানসমূহ এবং যমীনে অপরাহ্নে এবং যখন তোমরা যুহরের সময়ে উপনীত হও।"[৪৩১] (এ আয়াতে আল্লাহ সময়ের উল্লেখ করে সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন, কাজেই তা অস্বীকার করলে কাফির হবে।) যদি সে বলে আমি এ আয়াত বিশ্বাস করি, তবে এর ব্যাখ্যা জানি না, তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে না। কারণ সে কুরআনকে বিশ্বাস ও স্বীকার করেছে, কিন্তু ব্যাখ্যায় ভুল করেছে।"[৪৩২]

এ পুস্তকে আরো অনেক বিষয় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, যার মূল কথা একটিই: ঈমানের দাবিদারকে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা ও ওজর-অজুহাতের মাধ্যমে মুমিন বলে গণ্য করার চেষ্টা করা। যদি কেউ কুরআনের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয় অস্বীকার করার ঘোষণা দেয় তবে সে কাফির। আর যদি সে ব্যাখ্যায় ভুল করে, বা কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন :

لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام بذنب أذنبه بكفر وإن عظم جرمه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا

"কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফির বলে সাক্ষ্য দিবে, সে পাপ যতই বড় হোক না কেন। এটিই আবূ হানীফার মত এবং আমাদের ফকীহগণের সকলের মত।"[৪৩৩]

৬. বন্ধুত্ব ও শত্রুতা

মুসলিম নামধারী ব্যক্তিকে কাফির বলার সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয়: বন্ধুত্ব ও শত্রুতা। কাফিরের কুফরের প্রতি ঘৃণা এবং মুমিনের ঈমানের প্রতি প্রেম ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এজন্য ইসলামী আকীদার অন্যতম আলোচ্য বিষয় 'আল-ওয়ালায়াতু ওয়াল বারাআত' (الولاية والبراءة)। (الوِلايَة) বিলায়াত বা ওয়ালায়াত অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব। বারাআত (البراءة) অর্থ বিমুক্তি, সম্পর্কচ্ছিন্নতা, নির্দোষিতা বা অস্বীকৃতি।

কুরআন-হাদীসে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুমিনকে ভালবাসতে, তাঁর সাথে বিলায়াত (বন্ধুত্ব) প্রতিষ্ঠা করতে, কাফিরকে অপছন্দ করতে ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"এবং মুমিন পুরুষগণ ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু-নিকটবর্তী বা ওলী। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৪৩৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকু-রত।"[৪৩৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

"মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।"[৪৩৬]

এভাবে কুরআনে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুমিনগণ পরস্পর ভাই, বন্ধু, অন্তরঙ্গ সঙ্গী বা হৃদয়ের প্রিয়জন। পক্ষান্তরে কাফির কখনো মুমিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু বা হৃদয়ের প্রিয়জন হতে পারে না। অমুসলিমের সাথে মুসলিমের সামাজিক বা লৌকিক সুসম্পর্ক ও মানবিক সহযোগিতা থাকবে, তবে হৃদয়ের প্রেম থাকবে না।

এ বিষয়ে হাদীস শরীফেও বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ وَطَعْمَهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ فِى اللَّهِ وَأَنْ يُبْغِضَ فِى اللَّهِ وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا

"তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সে এগুলো দ্বারা ঈমানের মিষ্টত্ব ও স্বাদ লাভ করবে: (১) মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) অন্য সকলের চেয়ে তার নিকট প্রিয়তর হবে, (২) সে আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা বা অপছন্দ করবে এবং (৩) বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হলে সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়াকে সে আল্লাহর সাথে শিরক করা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করবে।"[৪৩৭]

অন্য হাদীসে আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ

"যে আল্লাহর জন্য ভালবাসে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্য প্রদান করে এবং আল্লাহর জন্য প্রদান থেকে বিরত থাকে সে ঈমান পরিপূর্ণ করেছে।"[৪৩৮]

এ সকল আয়াত ও হাদীসের নির্দেশনা খুবই সুস্পষ্ট। মুমিন ঈমান ও ঈামনদারদেরকে ভালবাসবেন এবং কুফর ও কুফরে লিপ্ত মানুষদেরক ঘৃণা করবেন বা অপছন্দ করবেন। ঈমান ও ঈমানদারকে ভালবাসা এবং কুফর ও কাফিরকে ঘৃণা করা মূলত "ঈমান"-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এজন্য এ বিষয় "ঈমান" ও "আকীদা" প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। তবে "তাকফীর"-এর একটি প্রচ্ছন্ন ও ভয়াবহ রূপ কাফিরদের বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াত বা হাদীসকে মুমিনদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এ ছিল খারিজী বিভ্রান্তির উৎস। তাদের বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন:

إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"কাফিরদের বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতগুলোর কাছে যেয়ে সেগুলোকে তারা মুমিনদের উপর প্রয়োগ করে।"[৪৩৯]

বন্ধুত্ব ও শত্রুতা বিষয়ক নির্দেশনাগুলোকে অনেক মুসলিম অন্য মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তারা পাপের কারণে, কর্মগত বা আকীদাগত মতভেদের কারণে "মুমিনগণকে" ঘৃণা করেন, বিদ্বেষ করেন বা শত্রুতা করেন এবং এরূপ ঘৃণা-বিদ্বেষকে "দীন" ও ইবাদত বলে গণ্য করেন।

অনেক সময় মানবীয় দুর্বলতায় আমরা ভালবাসা বা ঘৃণায় আবেগ-তাড়িত হয়ে পড়ি। ফলে এক্ষেত্রে ঈমানের নির্দেশনা অনুসারে সমন্বয় করতে পারি না। পাপ ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাও ঈমানের দাবি। তবে মুমিনের মধ্যে পাপের পাশাপাশি "ঈমান" ও অন্যান্য "পুণ্য" বিদ্যমান। এগুলির জন্য মুমিনকে ভালবাসা ঈমানের দাবি। যেহেতু ঈমান মুমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম সেহেতু পাপে লিপ্ত মুমিনকে ঈমানের কারণে এ পরিমাণ ভালবাসতে হবে এবং অন্যান্য নেক আমলের মূল্যায়ন করতে হবে। পাশাপাশি তার পাপের প্রতি আপত্তি ও দূরত্বও থাকতে হবে। পাপের জন্য ঘৃণার কারণে ঈমানের অবমূল্যায়ন করা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক।

মুমিনের ঈমানের দাবি যে, তিনি "ঈমান"-কে সর্বোচ্চ ভালবাসবেন ও মূল্যায়ন করবেন। এ ভালবাসা ও মূল্যায়নের দাবি এই যে, যে হৃদয়ে ঈমানের ন্যূনতম আভা বা ছোঁয়া বিদ্যমান সে হৃদয় ও হৃদয়ের অধিকারীর প্রতি তার অন্তরের প্রেম, গভীর ভালবাসা ও সর্বোচ্চ মূল্যায়ন থাকবে। এ ভালবাসার অর্থ মুমিনের অন্যায়কে সমর্থন করা নয়। "ঈমানদার" বা মুসলিম নামধারী ব্যক্তি যদি অন্যায়ে লিপ্ত হয় তবে তাকে অন্যায় থেকে নিষেধ করা ও ভাল কাজে আদেশ করা তার বন্ধুত্ব ও প্রেমেরই দাবি। তবে মুমিনের অন্যায়ের কারণে তার "ঈমান" মূল্যহীন হয়ে যায় না। কুরআনের নির্দেশনা এটিই।

পক্ষান্তরে ঈমানের ন্যূনতম দাবি যে, কুফরকে মুমিন সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করবে। যে হৃদয়ে "কুফর" বিদ্যমান সে হৃদয় ও হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে মুমিন কখনোই হৃদয়ের গভীরে ভালবাসতে পারে না। তাকে হৃদয়ের গভীরে ভালবাসার অর্থ তার "কুফর"-কে স্বীকৃতি দেওয়া বা "কুফর"-কে গুরুত্বহীন বলে গণ্য করা এবং কুফর-এর প্রতি হৃদয়ের আপত্তি অপসারিত হওয়া।

পাপ বা মতভেদের কারণে মুমিনকে ঢালাওভাবে ঘৃণা করা বা তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করা আর কোনো ভালকাজের কারণে কাফিরকে ভালবাসা ও তাকে হৃদয় দিয়ে প্রেম করা একই প্রকারের অপরাধ। উভয় ক্ষেত্রেই "ঈমান"-এর অবমূল্যায়ন করা হয়। এরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষকে যতই আমরা "আল্লাহর জন্য ঘৃণা" বলে দাবি করি, মূলত তা আল্লাহর জন্য নয়, বরং নিজেদের মনমর্জি, দল, মত, নেতা, ইমাম, আমীর, পীর বা অন্য কিছুর জন্য। কারণ ভালবাসা ও শত্রুতা যদি আল্লাহর জন্য হয় তাহলে তা ঈমান, নেকআমল ও পাপের পরিমাণে সমন্বিত হবে।

মুমিনের অন্যতম পরিচয় "ঈমান"-কে ভালবাসা ও ঈমানের সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা। এজন্য সুনিশ্চিত পাপ বা মতভেদীয় "পাপ"-এর কারণে মুমিনের প্রতি আপত্তি বা ঘৃণা থাকলেও সাথে সাথে তার মধ্যে বিদ্যমান ঈমান ও অন্যান্য নেক আমলের পরিমাণ ভালবাসা থাকতে হবে। এভাবে "বিলায়াত" ও "বারাআত" অর্থাৎ বন্ধুত্ব ও শত্রুতা বা সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতা একত্রিত হবে। এ

বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) তাঁর "আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম" গ্রন্থে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন:

قَالَ الْمُتَعَلِّمُ رَحِمَهُ اللهُ: ... أَخْبِرْنِيْ عَنْ تَفْسِيْرِ الْوَلاَيَةِ وَالْبَرَاءَةِ هَلْ تَجْتَمِعَانِ فِيْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ الْعَالِمُ رَحِمَهُ اللهُ: الْوَلاَيَةُ هِيَ الرِّضَا بِالْعَمَلِ الْحَسَنِ، وَالْبَرَاءَةُ هِيَ الْكَرَاهَةُ عَلَى الْعَمَلِ السَّيِّئِ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِيْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِيْهِ. فَهُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَعْمَلُ صَالِحاً وَسَيِّئاً، وَأَنْتَ تُجَامِعُهُ وَتُوَافِقُهُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَتُحِبُّهُ عَلَيْهِ، وَتُخَالِفُهُ وَتُفَارِقُهُ عَلَى مَا يَعْمَلُ مِنَ السَّيِّءِ وَتَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ. فَهَذَا مَا سَأَلْتَ عَنِ الْوَلاَيَةِ وَالْبَرَاءَةِ تَجْتَمِعَانِ فِيْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَالَّذِيْ فِيْهِ الْكُفْرُ لَيْسَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَإِنَّكَ تُبْغِضُهُ وَتُفَارِقُهُ فِيْ جَمِيْعِ ذَلِكَ. وَالَّذِيْ تُحِبُّهُ وَلاَ تَكْرَهُ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ قَدْ عَمِلَ بِجَمِيْعِ الصَّالِحَاتِ وَاجْتَنَبَ الْقَبِيْحَ، فَأَنْتَ تُحِبُّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلاَ تَكْرَهُ مِنْهُ شَيْئاً.

"আবূ মুকাতিল বলেন: ওয়ালায়াত ও বারাআত: বন্ধুত্ব ও সম্পর্কছিন্নতার ব্যাখ্যা আমাকে বলুন। একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি উভয় বিষয় একত্রিত হতে পারে? ইমাম আবূ হানীফা বলেন: 'ওয়ালায়াত' অর্থ ভাল কাজের প্রতি সন্তুষ্টি এবং 'বারাআত' অর্থ খারাপ কাজের প্রতি অসন্তুষ্টি বা অপছন্দ। অনেক সময় একই মানুষের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় একত্রিত হয় এবং অনেক সময় একত্রিত হয় না। যে মুমিন ব্যক্তি পুণ্য ও পাপ উভয় কর্মই করছে তার পুণ্য কর্মের বিষয়ে তুমি তার সাথে একত্রিত হবে, ঐকমত্য পোষণ করবে এবং এজন্য তুমি তাকে ভালবাসবে। আর সে যে অন্যায় কর্ম করছে সে জন্য তুমি তার বিরোধিতা করবে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং তা অপছন্দ করবে। এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা বা সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি একত্রিত হবে, যে বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করেছ। আর যার মধ্যে কুফর বিদ্যমান সে কোনো নেককর্মের মধ্যে নেই; তুমি তাকে ঘৃণা কর এবং সব বিষয়ে তার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। আর যাকে তুমি ভালবাসবে এবং তার কিছুই অপছন্দ করবে না সে ঐ মুমিন যে সকল নেক কর্ম করে এবং পাপ-অন্যায় বর্জন করে। এরূপ মুমিনের সবই তুমি ভালবাসবে এবং তার কিছুই অপছন্দ করবে না।[৪৪০]

এ হলো ভালবাসা ও সম্পর্কছিন্নতার বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি। এজন্যই আলী (রা), সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী ইমামগণ খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু কখনোই তাদেরকে কাফিরের মত ঘৃণা করেন নি। যদিও খারিজীগণ তাঁদেরকে কাফির বলে ঘৃণা করেছে, কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। বরং তাদের সাথে আত্মীয়তা করেছেন, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও সত্যপরায়ণ ছিলেন তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং হাদীস, ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদির বর্ণনায় তাদের উপর নির্ভর করেছেন।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আমরা অনেকেই নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা সুন্নাত ও ঐক্যের অনুসারী বলে দাবি করলেও বিদ'আত ও বিভক্তির প্রতিই আমাদের আকর্ষণ বেশি। ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম, ইলম, কুরআন, তাকওয়া, আমল ইত্যাদির ভিত্তিতে আমরা মুসলিমদেরকে ভালবাসি না। বরং দলীয় মতামত ও পরিচয়ের ভিত্তিতে তাদেরকে ভালবাসি। ধর্মীয় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে আমরা বিভক্ত। আমার দল, গোষ্ঠীর নেতা বা গুরুর "অনুসারী" ব্যক্তি যদি ঈমান, আমল ও তাকওয়ায় অনেক পিছনেও থাকে তাহলেও সে আমার অতি প্রিয়জন। আর ভিন্ন দল, মত, নেতা বা গুরুর অনুসারী যদি ঈমান ও তাকওয়ার বিচারে অনেক ভালও হন তবুও তিনি আমার শত্রু বা অপছন্দিত।

আবার এরূপ বিভক্তিকে দীনের রূপ দেওয়ার জন্য আমরা অনেক তথাকথিত "আকীদা" বা "ইবাদত-পদ্ধতি" উদ্ভাবন করেছি, যে সকল আকীদা বা পদ্ধতির কথা কুরআন-হাদীসে সরাসরি নেই, ইমাম আযমসহ চার ইমাম বা তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণ লিখেন নি অথবা তা মুস্তাহাব পর্যায়ের কোনো কর্ম মাত্র। এ সকল বিষয়ের অজুহাতে আমরা মুত্তাকী ব্যক্তিকে ঘৃণা করি এবং ফাসিক ব্যক্তিকে ভালবাসি। সর্বাবস্থায় মুমিনের ঈমান, ফরয-ওয়াজিব দায়িত্ব পালন, হারাম-মাকরূহ বর্জন, ইলম, কুরআন ইত্যাদির চেয়ে "আমার মতের সাথে শতভাগ মিল থাকা" বা "আমার পদ্ধতিতে ইবাদত পালন করা"-কেই আমার ভালবাসার মূলনীতি বানিয়েছি। এভাবে আমরা মূলত "আমার পছন্দের ভিত্তিতে ভালবাসছি" কিন্তু একে আবার "আল্লাহর জন্য ভালবাসা" বলে আখ্যায়িত করছি।

মুসলিম উম্মাহর সকল বিভক্তি, ফিতনা ও অবক্ষয়ের অন্যতম উৎস 'তাকফীর'। ইমাম আযমের সময়ে যেমন বিষয়টি অন্যতম ফিতনা ছিল, বর্তমানেও তা একইরূপ ফিতনা। রাজনৈতিক মতবাদ, মতভেদ, ধর্মীয় মতপার্থক্য ইত্যাদি কারণে কখনো বা মুসলিমদেরকে সরাসরি "কাফির" বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। "ইসলামের শত্রু", "কুরআনের শত্রু', "নবীর (ﷺ) শত্রু", "সুন্নাতের শত্রু", "ওলী-আউলিয়ার শত্রু", "কাফিরের চেয়েও খারাপ", "কাফিরদের দালাল" ইত্যাদি বলে প্রচ্ছন্ন ও কৌশলী তাকফীর করা হচ্ছে। এভাবে আমরা মুমিনকে কাফির বলার পাপে, বিদ্বেষের পাপে, দলাদলি ও বিভক্তির পাপে লিপ্ত হচ্ছি। সর্বোপরি জেনে বা না জেনে ইহূদী, খৃস্টান ও কাফিরগণ, যারা ইসলামের প্রকৃত শত্রু ও প্রকৃত কাফির তাদের স্বার্থরক্ষা ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র কার্যকর করার পরিবেশ তৈরি করছি। আমাদের উচিত, প্রত্যেকে নিজের মতে-পথে সুদৃঢ় থাকার পাশাপাশি প্রতিপক্ষ বা ভিন্নমতাবলম্বী মুসলিমকে কাফির বলা থেকে বিরত থাকি, মত বা কর্মের সমালোচনা করলেও ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর প্রতি তাকফীর বা বিদ্বেষ প্রচার থেকে বিরত থাকি এবং সকল মুসলিমের হেদায়াত ও নাজাতের জন্য দুআ করি। মহান আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

৭. সুন্নাত ও বিদ'আত

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: **"মোজাদ্বয়ের উপর মাস্‌হ করা (মোছা) সুন্নাত। এবং রামাদান মাসের রাত্রিগুলোতে তারাবীহ সুন্নাত।"**

ইমাম আযমের এ বক্তব্যটি অনুধাবনের জন্য সুন্নাত পরিভাষাটি প্রথমে বুঝতে হবে। এরপর এ বিষয়টি আকীদা প্রসঙ্গে উল্লেখের কারণ ও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

সুন্নাত শব্দের অর্থ বিস্তারিত আলোচনা করেছি **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে। এখানে অতি-সংক্ষেপে বলা যায় যে, আভিধানিকভাবে সুন্নাত অর্থ ছবি, কর্মধারা, জীবনপদ্ধতি বা রীতি। ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। সুন্নাতের দুটি অর্থ প্রচলিত। এক অর্থে সুন্নাত ফরয-ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের ইবাদত। সুন্নাতের দ্বিতীয় অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ও পদ্ধতি। হাদীসে 'সুন্নাত' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা এবং তিনি যে কাজ করেন নি- অর্থাৎ বর্জন করেছেন- তা না করাই সুন্নাত। যে কর্ম যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন করেছেন তা ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন করা, যে কর্ম যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন তা ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করা। এক কথায় কর্মে ও বর্জনে, গুরুত্বে ও পদ্ধতিতে হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণই সুন্নাত। সাহাবীগণ এবং পরবর্তী দু-প্রজন্মের কর্ম ও বর্জনও সুন্নাত-এর অন্তর্ভুক্ত।[৪৪১]

কথায়, কর্মে, বর্জনে, গুরুত্বে বা পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যতিক্রম করা "খিলাফে সুন্নাত" বা "সুন্নাতের ব্যতিক্রম"। তিনি যা করেছেন তা না করা অথবা তিনি যা করেন নি তা করা সুন্নাতের ব্যতিক্রম (খিলাফে সুন্নাত)। সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা সুন্নাত বিরোধী কর্ম বৈধ হতে পারে, কিন্তু দীন হতে পারে না। তিনি যা করেছেন তা বর্জন করা এবং তিনি যা করেন নি তা করা শরীয়তের অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে জায়েয বা বৈধ হতে পারে, তবে কখনোই তা দীনের অংশ হতে পারে না।

সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো আকীদা বা কর্মকে দীনের অংশ মনে করাকে বিদ'আত বলে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই বিদআতের উদ্ভাবন হয়। আল্লাহ্ বলেন:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"কিন্তু সন্ন্যাসবাদ- তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা উদ্ভাবন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দেই নি, অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি।"[৪৪২]

হাদীসে ইসলামের মধ্যে যে কোনো প্রকার উদ্ভাবন বা নতুন বিষয় প্রবেশ করানোকে "বিদ'আত" (নব-উদ্ভাবন), "ইহদাস" (নতুন বানানো), "সুন্নাত অপছন্দ" ও "নিজ পছন্দের অনুসরণ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বিদ'আতকে সকল বিভ্রান্তির মূল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বারংবার বিদ'আত ও বিদআতে লিপ্ত মানুষদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কুরআন, সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবার ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো বিষয়কে দীন বা আকীদার অন্তর্ভূক্ত করাকেই ইমাম আবূ হানীফা বিদআত বলে গণ্য করেছেন। আমরা দেখেছি, তিনি বলেছেন: "বিষয় তো শুধু তাই যা কুরআন নিয়ে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার দাওয়াত দিয়েছেন এবং মানুষদের দল-ফিরকায় বিভক্ত হওয়ার আগে তাঁর সাহাবীগণ যার উপরে ছিলেন। এগুলো ছাড়া যা কিছু আছে সবই নব-উদ্ভাবিত বিদআত।" এ বিষয়ে "আল-ফিকহুল আবসাত" গ্রন্থে তিনি বলেন:

حَدَّثَنِيْ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِيْ الإِسْلاَمِ فَقَدْ هَلَكَ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَقَدْ ضَلَّ وَمَنْ ضَلَّ فَفِيْ النَّارِ ... وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ شَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ.

"আমাকে হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে ইবন মাসউদ (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো নতুন বিষয় উদ্ভাবন করবে সে ধ্বংস হবে। আর যে কোনো বিদ'আত উদ্ভাবন করবে সে বিভ্রান্ত হবে। আর যে বিভ্রান্ত হবে সে জাহান্নামী হবে।... আর আমাকে হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে, ইবন মাসউদ (রা) থেকে, তিনি বলতেন: নিশ্চয় কাজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ নতুন উদ্ভাবিত কাজ, প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত কাজই বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই বিভ্রান্তি এবং প্রত্যেক বিভ্রান্তিই জাহান্নামী।"[৪৪৩]

এভাবে আমরা দেখছি, যে কর্ম বা বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ দীন বা ইবাদত হিসেবে পালন করেন নি তাকে দীন, ইবাদত বা সাওয়াবের কর্ম বলে মনে করা বিদ'আত। এখানে বিদআতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। বিস্তারিত জানতে পাঠককে **'এহইয়াউস সুনান'** গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

(ক) বিদআত একান্তই ধার্মিকদের পাপ। ধার্মিক ছাড়া কেউ বিদআতে লিপ্ত হয় না। বিদআতই একমাত্র পাপ যা মানুষ পুণ্য মনে করে পালন করে।

(খ) কোনো কর্ম বিদআত বলে গণ্য হওয়ার শর্ত তাকে ইবাদত মনে করা। যেমন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে বা নর্তনকুর্দন করে যিকর বা দরুদ-সালাম পড়ছেন। এরূপ দাঁড়ানো, লাফানো বা নর্তন-কুর্দন শরীয়তে মূলত নিষিদ্ধ নয়। কেউ যদি জাগতিক কারণে এরূপ করেন তা পাপ নয়। দাঁড়ানো বা নর্তন কুর্দনের সময় যিকর বা দরুদ-সালাম পাঠ পাপ নয়। দরুদ-সালাম বা যিকরের সময় কোনো কারণে বা অনিয়ন্ত্রিত আবেগে দাঁড়ানো বা লাফানো পাপ নয়। কিন্তু যখন কেউ 'দাঁড়ানো', 'লাফানো' বা 'নর্তন-কুর্দন'-কে দীন, ইবাদত বা ইবাদতের অংশ হিসেবে বিশ্বাস করেন তখন তা বিদআতে পরিণত হয়। ইবাদত মনে করার অর্থ: **(১)** যিকর বা দরুদ-সালাম দাঁড়ানো বা লাফানো ব্যতিরেকে পালন করার চেয়ে দাঁড়ানো বা লাফানো-সহ পালন করা উত্তম, অধিক আদব, অধিক সাওয়াব বা অধিক বরকত বলে মনে করা বা (২) দাঁড়ানো বা লাফানো ছাড়া যিকর বা দরুদ-সালাম পালন করতে অস্বস্তি অনুভব করার কারণে এপদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালনকে রীতিতে পরিণত কর।

(গ) হাদীস শরীফে বিদআতের কয়েকটি পরিণতির কথা বলা হয়েছে: **(১)** তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ এ কর্ম আল্লাহ কবুল করছেন না এবং এজন্য কোনো সাওয়াব হচ্ছে না। **(২)** তা বিভ্রান্তি। কারণ তিনি জেনে বা না-জেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের ইবাদতকে অপূর্ণ বলে মনে করছেন। **(৩)** বিদআত অন্যান্য ইবাদত কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। (৪) বিদআতে সুন্নাত অপছন্দ ও সুন্নাতের মৃত্যু।

(ঘ) বিদআতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক তা সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি করে। বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেকে সুন্নী বা আহলূস সুন্নাত মনে করেন। যে সুন্নাতগুলো তার বিদআতের প্রতিপক্ষ নয় সেগুলি তিনি পালন বা মহব্বত করেন। তবে তাঁর পালিত বিদআত সংশ্লিষ্ট সুন্নাতকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। উপরের উদাহরণটি বিবেচনা করুন। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পালন করছেন তিনি স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পালন করেছেন বা করতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে তিনি কোথাও দেখেন নি। তিনি স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ বসেবসে যিকর, দরুদ ও সালাম পাঠ করতেন বলে তিনি অনেক হাদীস থেকে জেনেছেন। তারপরও তিনি বসে যিকর বা দরুদ-সালাম পালনে অস্বস্তিবোধ করবেন। বিভিন্ন 'দলীল' দিয়ে এ সকল ইবাদত বসে পালনের চেয়ে দাঁড়িয়ে বা নেচে পালন করা উত্তম বলে প্রমাণের চেষ্টা করবেন।

তার বিদআতকে প্রমাণ করতে তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক দলীল পেশ করবেন এবং সুন্নাত-প্রমাণিত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করতে তিনি বলবেন: 'সবকিছু কি সুন্নাত মত হয়? ফ্যান, মাইক... কত কিছুই তো নতুন। ইবাদতটি একটু নতুন পদ্ধতিকে করলে সমস্যা কী? উপরন্তু সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করে বসেবসে দরুদ, সালাম ও যিকর পালনকারীর প্রতি কম বা বেশি অবজ্ঞা অনুভব করবেন।

(ঙ) তাওহীদের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে শিরকের উৎপত্তি এবং রিসালাতের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে বিদআতের উৎপত্তি। বিদআত মূলত মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা বা রিসালাতের পূর্ণতায় অনাস্থা। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যেমন শিরক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'গাইরুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া অন্য)-এর প্রতি হৃদয়ের আস্থা অধিক অনুভব করেন তেমনি বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদআতের ক্ষেত্রে 'গাইরুন্নবী' (নবী ছাড়া অন্য)-এর অনুসরণ-অনুকরণে অধিক স্বস্তি বোধ করেন। তিনি সর্বদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'সব কিছু কি নবীর তরীকায় হয়?' বলে এবং নানাবিধ 'দলীল' দিয়ে ইত্তিবায়ে রাসূল ﷺ গুরুত্বহীন বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকেন। পাশাপাশি তার 'বিদআত' আমল বা পদ্ধতিকে উত্তম প্রমাণ করতে 'গাইরুন্নবী' অর্থাৎ বিভিন্ন বুজুর্গের কর্মের প্রমাণ প্রদান করেন।

(চ) সকল পাপের ক্ষেত্রে মুমিন জানেন যে তিনি পাপ করছেন; ফলে তাওবার একটি সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বিদআত পালনকারী তার বিদআতকে নেক আমল মনে করেই পালন করেন। কাজেই এর জন্য তাওবার কথা তিনি কল্পনাও করেন না। এজন্য শয়তান বিদআতকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে।

(ছ) বিদআতের অন্য অপরাধ তা সুন্নাত হত্যা করে। সুন্নাত বহির্ভুত কোনো কর্ম বা পদ্ধতি ইবাদতে পরিণত হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট মাসনূন ইবাদত বা পদ্ধতির মৃত্যু। যিনি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পাঠ উত্তম বলে গণ্য করছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে বসে যিকর বা সালাম তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। সমাজের অন্যান্য মানুষেরা যখন এভাবে ইবাদতটি পালন করতে থাকবেন তখন সমাজ থেকেও সুন্নাতটি অপসারিত হবে।

(জ) বিদ'আত **"সুন্নাতের খিলাফ"** হলেও, **"দলীলের খিলাফ"** নয়। সকল বিদ'আতই **"দলীল"** নির্ভর। কুরআন-হাদীসের দলীল ছাড়া কোনো বিদ'আত উদ্ভাবিত হয় না। দলীল ছাড়া যা উদ্ভাবন করা হয় তা দীন বলে আখ্যায়িত করার সুযোগ থাকে না। 'দলীল' নামের কোনো কিছু থাকলেই শুধু সুন্নাহ বিরোধী কোনো আকীদা বা আমলকে 'দীন'-এর অংশ বানানো যায়। আল্লামা ইবন নুজাইম (৭৯০ হি) বলেন:

الْبِدْعَةِ ... اسْمٌ مِنْ ابْتَدَعَ الأَمْرَ إِذَا ابْتَدَأَهُ وَأَحْدَثَهُ ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى مَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ أَوْ نُقْصَانٌ مِنْهُ. وَعَرَّفَهَا الشُّمُنِّيُّ بِأَنَّهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلافِ الْحَقِّ الْمُتَلَقَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ حَالٍ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَاسْتِحْسَانٍ وَجُعِلَ دِينًا قَوِيمًا وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.

"বিদ'আত শব্দটি... 'ইবতাদ'আ' ফি'ল থেকে গৃহীত ইসম। এর অর্থ শুরু করা বা উদ্ভাবন করা। অতঃপর দীনের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন অর্থে বিদ'আত শব্দটির ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করে।' শুমুন্নী বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলেন: 'রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে গৃহীত সত্যের ব্যতিক্রম যে জ্ঞান-মত, কর্ম বা অবস্থা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য ভুল বুঝার কারণে এবং 'মুসতাহসান' বা ভাল মনে করে

উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং যাকে সঠিক দীন ও সিরাতে মুস্তাকীম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই বিদ'আত'।"[৪৪৪]

এজন্য আমরা দেখি যে, সকল বিভ্রান্ত দলই কুরআন-হাদীস থেকে দলীল প্রদান করে, তবে তারা সুন্নাত প্রদান করতে পারে না। এ সকল দলীল দিয়ে তারা এমন একটি কথা বা কর্ম দীনের অংশ বলে দাবি করে, যা কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন নি বা করেন নি। ইতোপূর্বে বিভ্রান্ত গোষ্ঠীদের আকীদায় আমরা তা দেখেছি। দু-একটি বিষয় পর্যালোচনা করা যায়।

কুরআনে বলা হয়েছে "কোনো কিছুই আল্লাহর সাথে তুলনীয় নয়"। কিন্তু কোথাও বলা হয় নি যে, আল্লাহ কথা বলেন বিশ্বাস করলে তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। এ ছাড়া কোথাও বলা হয় নি যে, কুরআন সৃষ্ট। মুতাযিলীগণ কুরাআনের "দলীল" দিয়ে এমন একটি মত উদ্ভাবন করে যা কখনোই কুরআন-হাদীসে বলা হয় নি। এরপর তারা এ উদ্ভাবিত মতটিকে দীনের অংশ বানিয়ে নেয়। কেউ যদি কুরআনের কথাগুলি হুবহু বিশ্বাস করেন এবং শতকোটিবার স্বীকার করেন তবুও তারা তাকে মুমিন বলে স্বীকার করতে রাযি হয় নি; যতক্ষণ না যে তাদের উদ্ভাবিত কথাটি স্বীকার করতো।

কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"আমি একে বানিয়েছি আরবী কুরআন; যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।"[৪৪৫]

মুতাযিলীগণ দাবি করত যে, "বানানো" অর্থই সৃষ্টি করা; কাজেই কুরআন সৃষ্ট। তাদের এ দলীল ভিত্তিহীন। (جعل) বা বানানো অর্থ কখনো "সৃষ্টি" করা হতে পারে, তবে এর মূল অর্থ একটি বিশেষ রূপ দেওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর কালাম কুরআনকে আরবীরূপে প্রকাশ করেছেন। যেমন আল্লাহ হস্তীবাহিনীর বিষয়ে বলেছেন:

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ

"তিনি তাদেরকে ভক্ষিত শস্যপাতার মত বানালেন।"[৪৪৬]

এর অর্থ এ নয় যে, তিনি তাদেরকে ভক্ষিত শস্যপাতার ন্যায় সৃষ্টি করেছিলেন, বরং তিনি তাদেরকে ভক্ষিত শস্যপাতার রূপ দিয়েছিলেন।

লক্ষণীয় যে, মুতাযিলীগণ তাদের উদ্ভাবিত অর্থকেই দীন বানিয়ে নেয়। "আল্লাহ কুরআনকে আরবীতে সৃষ্টি করেছেন"- এ কথাটি বলা ও বিশ্বাস করাকে তারা দীন মনে করেছে; কাজেই কেউ যদি শতকোটিবার বলেন যে, "আল্লাহ কুরআনকে আরবী বানিয়েছেন" কিন্তু তাদের উদ্ভাবিত কথাটি না বলে তবে তাকে মুমিন বা প্রকৃত মুমিন বলে মানতে রাযি হয় নি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আলী (রা) ও আলী-বংশের ইমামগণের গাইবী ইলম ও ক্ষমতা সম্পর্কে শীয়াগণের আকীদাও অনুরূপ। "ইমামগণ" বিষয়ে অতিভক্তিই শীয়াগণের মূল প্রেরণা। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বাদ দিয়ে তো আর তাঁদেরকে 'আলিমুল গাইব' বানানো যায় না। তাই তারা তাঁদের সকলের জন্য সামগ্রিক ইলম গাইব এবং ইমামগণের অনুসারী "ওলী" বা খলীফাগণের জন্য আংশিক ইলম গাইব দাবী করেন। শীয়াগণের প্রভাবে মূলধারার অনুসারী অনেক মুসলিম আলিম ও সাধারণ মানুষও পরবর্তী যুগে এ ধরনের আকীদা গ্রহণ করেছেন। তাদের এ আকীদা "উদ্ভাবিত"; কারণ এ বিষয়ে তারা যা বলেন তা কখনোই এভাবে কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। কুরআন-হাদীসের কিছু বক্তব্যের বিশেষ ব্যাখ্যা এবং অগণিত বানোয়াট কথা, গল্প ও কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তারা এরূপ আকীদা উদ্ভাবন করেন। **'ইসলামী আকীদা'** ও **'হাদীসের নামে জালিয়াতি'** গ্রন্থদ্বয়ে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কুরআন-হাদীসে বারবার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানেন না, একমাত্র আল্লাহই আলিমুল গাইব, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও অন্যান্য নবী-রাসূল গাইব জানতেন না, কিয়ামতের দিন তাঁরা সকলে একত্রিতভাবে এ সাক্ষ্য প্রদান করবেন। এর বিপরীতে কোথাও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা অন্য কেউ "গাইবের জ্ঞানী" বা "আলিমুল গাইব"। তবে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে 'গাইবের সংবাদ' জানিয়েছেন, অতীত-ভবিষ্যতের ও অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি তাঁকে জানিয়েছেন। শীয়াগণ ও তাদের অনুসারীগণ 'গাইবের অনেক সংবাদ জানানো'-কে "গাইবের সকল জ্ঞান প্রদান" অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুরআন-হাদীসের দ্ব্যর্থহীন অগণিত বক্তব্য বাতিল করেছেন। সর্বোপরি তারা তাদের "উদ্ভাবিত" ব্যাখ্যাকে "দীন" বানিয়েছেন। কেউ যদি কুরআন-হাদীসের এ বিষয়ক সকল নির্দেশ সরল অর্থে বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের "উদ্ভাবিত" ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে তবে তারা তাকে 'মুমিন' বা 'খাঁটি মুমিন' মানতে রাজি নন।

মহান আল্লাহ কুরআনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে শাহিদ/শাহীদ (شاهد/ شهيد) বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৪৭] এর অর্থ প্রমাণ, সাক্ষী বা উপস্থিত। এ জাতীয় আয়াত দিয়ে তাঁরা দাবি করেন যে, তিনি সদাসর্বদা উম্মাতের প্রত্যেকের নিকট "হাযির" বা উপস্থিত, "প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী", সবকিছু দেখছেন, শুনছেন এবং সকল গাইবের কথা জানেন।

এখানেও মুতাযিলীদের পদ্ধতি লক্ষণীয়। শাহিদ বা শাহীদ শব্দদ্বয় কখনো "উপস্থিত" অর্থে ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশ সময় প্রমাণ বা সাক্ষী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে বারবার সকল মুমিনকে মানব জাতির জন্য "শাহীদ" বলা হয়েছে[৪৪৮]; এতে প্রমাণিত

হয় না যে, সকল মুমিন 'আলিমুল গাইব' বা "সদা-সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত" ও "প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী"। যদি কেউ বিশ্বাস ও স্বীকার করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাহিদ ও শাহীদ, কিন্তু তিনি তাদের বিশেষ অর্থটি স্বীকার না করেন তাহলে তারা তাকে 'মুমিন' বা 'পূর্ণ মুমিন' বলে মানতে রাযি নন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ), ফাতিমা (রা), আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ "নূর" দ্বারা সৃষ্ট ছিলেন বলে শীয়াগণের আকীদাও অনুরূপ। পরবর্তীতে সাধারণ "অ-শীয়া" মুসলিম সমাজেও এ আকীদা অনুপ্রবেশ করে। শীয়াগণ এ বিষয়ে অনেক জাল হাদীস তৈরি ও প্রচার করে।[৪৪৯] এগুলোই তাদের "আকীদা"-র মূল ভিত্তি। পাশাপাশি তারা কুরআনের কিছু বাণীর কথিত "তাফসীর"-কে দীনের অংশ বানিয়ে নেয়। যেমন, আল্লাহ বলেন:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

"আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে, যা দিয়ে হেদায়ত করেন আল্লাহ যে তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে তাকে শান্তির পথে... ।"[৪৫০]

দ্বিতীয় আয়াতে "যা দিয়ে" বাক্যাংশে একবচনের ব্যবহার থেকে সুস্পষ্ট যে নূর ও কিতাব বলতে একটিই বিষয় বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল-কুরআন। এ ছাড়া কুরআনে অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে, কুরআনই নূর যা দিয়ে আল্লাহ মানুষদেরকে হেদায়াত করেন।[৪৫১] এরপরও কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে নূর অর্থ মুহাম্মাদ ﷺ।[৪৫২]

শীয়াগণ তাদের পদ্ধতিতে মানবীয় তাফসীরকে ওহীর মান প্রদান করেন। এরপর এ তাফসীরের আবার 'তাফসীর' করে বলেন: মুহাম্মাদ ﷺ-কে নূর বলার অর্থ তিনি নূরের তৈরি। এরপর এরূপ 'তাফসীরের তাফসীরকে' তারা আকীদার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এমনকি যদি কেউ বলেন যে, আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নূর বলে মানি, তবে নূরের তৈরি বলে মানি না, কারণ কুরআনে বা তাফসীরে তা বলা হয় নি, তবুও তারা তাকে মুমিন বা প্রকৃত মুমিন বলে মানতে রাজি নন।

সর্বোপরি তারা আল্লাহর সত্তা বা বিশেষণকে সৃষ্টিজগতের নূর বা আলোর মত কল্পনা করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর বংশধরকে আল্লাহর সত্তা বা বিশেষণের অংশ বলে বিশ্বাস করেন; ঠিক যেভাবে খৃস্টানগণ তাদের মূল আকীদা নাইসীন ক্রীড (Nicene creed)-এ ঈসা (আ) কে আল্লাহর সত্তা থেকে সৃষ্ট ((of the same substance/ substance of the Father) ও নূরের তৈরি নূর (light of light) বলে বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইমামগণের বা ওলীগণের গাইবী ও অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ক তাদের আকীদাও এভাবে উদ্ভাবিত বিদআত। আল্লাহর সিফাত, তাকদীর, তাকফীর, সাহাবীগণ, আহলু বাইত ইত্যাদি বিষয়ে জাহমী, মুতাযিলী, শীয়া, খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের আকীদা সবই এরূপ 'উদ্ভাবিত' বা বিদআত আকীদা।

৮. মোজার উপর মাস্‌হ করা

মোজা বুঝাতে আরবীতে দুটি শব্দ রয়েছে: খুফফ (الخف) অর্থাৎ চামড়ার মোজা এবং জাওরাব (الجورب) অর্থাৎ কাপড়, পশম ইত্যাদির মোজা। 'জাওরাব'-এর উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাসহ করেছেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো সাহাবী তা করেছেন। বিষয়টি নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফার মতে 'জাওরাব'-এর উপর মাসহ করা বৈধ নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে 'জাওরাব' যদি পুরু হয়, পায়ের চামড়া প্রকাশ না করে তবে তার উপর মাসহ করা বৈধ। ইমাম যাইলায়ী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আযম মৃত্যুর পূর্বে নিজ মত পরিত্যাগ করে তাঁর ছাত্রদ্বয়ের মত গ্রহণ করেন।[৪৫৩]

পক্ষান্তরে বহুসংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ওযু অবস্থায় চামড়ার মোজা পরিধান করা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করার সময় মোজা না খুলে মোজার উপর আদ্র হাত বুলিয়ে মুছে নিতেন বা মাস্‌হ করতেন। তিনি স্বগৃহে অবস্থানকারীর জন্য ২৪ ঘণ্টা এবং মুসাফিরের জন্য ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত এরূপ মাস্‌হ করার অনুমতি দিয়েছেন।

খারিজীগণ মোজার উপর মাস্‌হ করার বৈধতা অস্বীকার করেন। শীয়াগণ মোজাবিহীন পদযুগল মাসহ করা বৈধ বলেন। বিষয়টি কর্মের, আকীদার বিষয় নয়। তবে চামড়ার মোজার উপর মাস্‌হ মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এরূপ বিষয়ের বৈধতা অস্বীকার করার অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত একটি কর্মকে অবৈধ বলে মনে করা, নিজেদেরকে তাঁর চেয়েও বেশি মুত্তাকী ও কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে তাঁর চেয়ে পারঙ্গম বলে মনে করা। এগুলি সবই কুফরের নামান্তর। এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমাম বিষয়টি আকীদার মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

এখানে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন যে, খুফ্‌ফ বা চামড়ার মোজার উপর মাস্‌হ করা সুন্নাত। ওসিয়্যাহ গ্রন্থে তিনি একে ওয়াজিব বলেছেন। তিনি বলেন:

وَنُقِرُّ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاجِبٌ لِلْمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا؛ لأَنَّ الْحَدِيْثَ وَرَدَ هَكَذَا، فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَإِنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ

الْكُفْرُ؛ لأَنَّهُ قَرِيْبٌ مِنَ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ.

"নিজ গৃহে অবস্থানকারী বা মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত ও মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত্রি মোজার উপর মাস্হ করা ওয়াজিব বলে আমরা স্বীকার করি। কারণ হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ তা অস্বীকার করে তবে তার কাফির হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ তা মুতাওয়াতির হাদীস হওয়ার নিকটবর্তী।"[৪৫৪]

অর্থাৎ, মোজার উপর মাস্হ করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন-পদ্ধতি ও ইবাদত পদ্ধতির অংশ। তিনি যেভাবে যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে তা করেছেন, সেভাবে ততটকু গুরুত্ব দিয়ে তা গ্রহণ করা সুন্নাত। একে সুন্নাহ নির্দেশিত বৈধ কর্ম হিসেবে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। মোজার উপর মাস্হ না করলে গোনাহ হয় না। তবে মাস্হ না করে মোজা খুলে পা ধোয়াকে বেশি তাকওয়া মনে করা বা মাস্হ করাকে না-জায়েয মনে করা একটি বিদআত বা নব-উদ্ভাবিত বিশ্বাস। এরূপ আকীদা পোষণকারী সুন্নাহ নির্দেশিত ওয়াজিব আকীদা পরিত্যাগের জন্য পাপী।

৯. রামাদানের রাতে তারাবীহ

৯. ১. কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদ

তারাবীহ (التراويح) বহুবচন, একবচন তারবীহাহ (الترويحة)। এর অর্থ প্রশান্তি, আরাম, বিনোদন, শিথিলায়ন, শিথিল হয়ে বসা (refreshment, soothing, easing, relief, relaxation, recreation) ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় রামাদান মাসের রাত্রির কিয়ামুল্লাইল বা রাতের সালাতকে "তারাবীহ" বলা হয়।

কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের গুরুত্ব আমি **"রাহে বেলায়াত"** গ্রন্থে আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কিয়ামুল্লাইল (قيام الليل) অর্থ রাতের কিয়াম বা রাত্রিকালীন দাঁড়ানো। সালাতুল ইশার পর থেকে ফজরের ওয়াক্তের উন্মেষ পর্যন্ত সময়ে যে কোনো নফল সালাত আদায় করলে তা 'কিয়ামুল্লাইল' বা 'সালাতুল্লাইল' অর্থাৎ রাতের দাঁড়ানো বা রাতের সালাত বলে গণ্য। 'তাহাজ্জুদ' অর্থ ঘুম থেকে উঠা। রাতে ঘুম থেকে উঠে "কিয়ামুল্লাইল" আদায় করাকে "তাহাজ্জুদ" বলা হয়। কেউ যদি ইশার সালাত আদায় করে রাত ৯টা বা ১০টায় ঘুমিয়ে পড়েন এবং ১১/১২টায় উঠে নফল সালাত আদায় করেন তবে তা 'কিয়ামুল্লাইল' ও 'তাহাজ্জুদ' বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি ইশার পরে না ঘুমিয়ে রাত ২/৩ টার দিকে কিছু নফল সালাত আদায় করেন তবে তা 'কিয়ামুল্লাইল' বলে গণ্য হলেও 'তাহাজ্জুদ' বলে গণ্য নয়।

ইসলামের অন্যতম নফল ইবাদত কিয়ামুল্লাইল। প্রথম রাতে বা শেষ রাতে, ঘুমানোর আগে বা ঘুম থেকে উঠে অন্তত কিছু নফল সালাত আদায় করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটু ঘুমিয়ে উঠে 'তাহাজ্জুদ'-রূপে কিয়ামুল্লাইল আদায় করলে তার সাওয়াব ও মর্যাদা বেশি। রাতের শেষভাগে তা আদায় করা সর্বোত্তম। কুরআন মাজীদে কোনো নফল সালাতের উল্লেখ করা হয় নি, এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতেরও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের সালাতের কথা বারংবার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ও মুমিন জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিয়ামুল্লাইল বা সালাতুল্লাইলের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এত বেশি নির্দেশনা দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলি একত্রিত করলে একটি বৃহদাকৃতির পুস্তকে পরিণত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্য কোনো নফল বা সুন্নাত সালাতের সে গুরুত্ব দেন নি। তিনি কিয়ামুল্লাইল আদায় করতে তাকিদ দিতেন। কেউ আদায় না করলে আপত্তি করতেন। এ বিষয়গুলি বিবেচনা করলে সারা বৎসরই 'কিয়ামুল্লাইল' সুন্নাতে মুআক্কাদা বলে গণ্য হয়। তবে ফকীহগণ সাধারণভাবে 'কিয়ামুল্লাইল'-কে নফল পর্যায়ের সুন্নাত বা 'সুন্নাতে গাইর মুআক্কাদা' বলে গণ্য করেছেন।

৯. ২. রামাদানের কিয়ামুল্লাইল

রামাদানে 'কিয়ামুল্লাইল' আদায়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো অধিক তাকিদ প্রদান করেছেন। এজন্য রামাদানের কিয়ামুল্লাইলকে উম্মাতের আলিমগণ অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং 'সুন্নাত মুআক্কাদা' বলে গণ্য করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে সাধারণত রামাদান ও অন্য সকল সময়ে প্রথম রাতে সালাতুল ইশা আদায় করে ঘুমিয়ে পড়তেন। এরপর মাঝরাতে উঠে ৩/৪ ঘণ্টা যাবৎ একাকী তাহাজ্জুদ-কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন। একবার তিনি ২৩, ২৫ ও ২৭ রামাদানের রাত্রিতে সাহাবীগণ, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও স্ত্রীগণকে নিয়ে জামাতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করেন। ২৩ তারিখে রাতে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (আনুমানিক রাত ৮ টা থেকে ১০/১১ টা পর্যন্ত ২/৩ ঘণ্টা), ২৫ তারিখে মধ্য রাত পর্যন্ত (আনুমানিক রাত ৮-১২= ৪ ঘণ্টা) এবং ২৭ তারিখের রত্রিতে সাহরীর সময় পর্যন্ত (আনুমানিক রাত ৮- ৪= ৮ ঘণ্টা) কিয়ামুল্লাইল আদায় করেন।[৪৫৫]

এ তিন রাত্রিতে তিনি কত রাকআত কিয়াম করেছিলেন তা সহীহ বর্ণনায় স্পষ্ট নয়। তবে সাধারণত তিনি রামাদান ও অন্যান্য সময়ে তিন রাকআত বিতর ছাড়া ৮ রাকআত কিয়াম আদায় করতেন।[৪৫৬] এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে ২ রাকআত[৪৫৭], ৪ রাকআত[৪৫৮],

৬ রাকআত[৪৫৯], ১০ রাকআত[৪৬০], এবং ১২ রাকআত[৪৬১] কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর রাকআত সংখ্যা কমবেশি হলেও, সময়ের পরিমাণ বিশেষ কমবেশি হতো না। সাধারণত তিনি প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা ধরে কিয়াম আদায় করতেন। রাকআতের সংখ্যা কমালে দৈর্ঘ্য বাড়াতেন।

সাহাবীগণ রামাদানে তাঁর পিছনে জামাআতে কিয়ামুল্লাইল পালন করতে অতীব আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ফরয হওয়ার আশঙ্কায় তিনি একাকী তা আদায় করতেন এবং সাহাবীদেরকে এভাবে আদায় করতে পরামর্শ দেন।[৪৬২] উপরের হাদীসে আমরা দেখলাম যে, কয়েক রাত তিনি তা জামাতে আদায় করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি জামাআতে রামাদানের কিয়াম আদায়ের ফযীলতে বলেন:

مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"যে ব্যক্তি ইমামের কিয়ামুল্লাইল শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে কিয়ামুল্লাইল আদায় করবে তার জন্য পুরো রাত কিয়াম পালনের সাওয়াব লেখা হবে।"[৪৬৩]

সাহাবীগণ ও পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমগণ রামাদানের কিয়ামুল্লাইল আদায়ের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। যেহেতু শেষ রাতে উঠে তা আদায় করা অনেকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, এজন্য অনেকেই সালাতুল ইশার পরেই মসজিদে বা বাড়িতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করে ঘুমাতেন। যারা কুরআনের ভাল কারী বা হাফিয ছিলেন না তারা অনেক সময় কোনো ভাল কারী বা হাফিযের পিছনে মসজিদে বা বাড়িতে ছোট জামাত করে তা আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়ে ও তাঁর ওফাতের পরে প্রায় কয়েক বৎসর এভাবেই চলে।

খলীফা উমার (রা) লক্ষ্য করেন যে, এভাবে মদীনার মসজিদে নববীতে ছোট ছোট জামাতে বা পৃথকভাবে একাকী অনেকেই সালাতুল ইশার পরে কিয়ামুল্লাইল আদায় করছেন। তখন তিনি সাহাবী উবাই ইবন কা'বকে বলেন, মানুষেরা দিবসে সিয়াম পালন করেন, কিন্তু অনেকেই ভাল হাফিয বা কারী নন; কাজেই আপনি তাদেরকে নিয়ে জামাতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করেন। পাশাপাশি তিনি সুলাইমান ইবন আবী হাসমাহ (রা) নামক অন্য সাহাবীকে মহিলাদের নিয়ে মসজিদের শেষ প্রান্তে পৃথক জামাতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করার নির্দেশ দেন। মহিলাদের জামাতের ইমামতি তামীম দারী (রা) নামক অন্য সাহাবীও করতেন। খলীফা উসমান ইবন আফফানের (রা) সময়ে তিনি সুলাইমান ইবন আবী হাসমাহ (রা)-এর ইমামতিতে পুরুষ ও মহিলাদের এক জামাতে কিয়ামুল্লাইল আদায়ের ব্যবস্থা করেন।[৪৬৪] অধিকাংশ মানুষ জামাতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করতে থাকেন। তবে অনেক সাহাবী, তাবিয়ী ও যারা ভাল হাফিয ও আবিদ ছিলেন তারা সালাতুল ইশার পরে অথবা মধ্য রাতে ও শেষ রাতে একাকী রামাদানের কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন।

৯. ৩. রামাদানের কিয়ামের 'তারাবীহ' নামকরণ

উমার (রা)-এর সময় থেকেই রামাদানের কিয়ামুল্লাইলের জামা'আত দীর্ঘ সময় ধরে আদায় করা হতো। সাধারণত শেষ রাতে সাহরীর সময়ে শেষ হতো। বর্তমান সময়ের হিসেবে রাত ৮/৯ টা থেকে ৩/৪ পর্যন্ত প্রায় ৬/৭ ঘণ্টা যাবত কিয়ামুল্লাইল আদায় করা হতো। ইমামগণ তিন-চার দিনে বা এক সপ্তাহে কুরআন খতম করতেন। কেউ কেউ রামাদানের কিয়ামুল্লাইলে দু-তিন খতম কুরআন পাঠ করতেন। রুকু সাজদাও দীর্ঘ করা হতো। এজন্য প্রতি চার রাকআত পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার নিয়ম প্রচলিত হয়ে যায়। এ কারণে রামাদানের কিয়ামুল্লাইলকে "সালাতুত তারাবীহ", অর্থাৎ বিশ্রামের বা শিথিলায়নের সালাত বলা হতে থাকে।

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, উমার (রা)-এর সময়ে ৮ রাকআত এবং ২০ রাকআত কিয়ামুল্লাইল আদায় করা হতো। ইমাম মালিক মুহাম্মাদ ইবন ইউসূফ থেকে, তিনি সাইব ইবন ইয়াযিদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, উমার (রা) ১১ রাকআত (বিতর-সহ) কিয়ামুল্লাইলের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা শতশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং ফজরের সামান্য পূর্বে শেষ করতেন।[৪৬৫] পক্ষান্তরে ইমাম আব্দুর রায্যাক সানআনী দাউদ ইবন কাইস ও অন্যান্যদের থেকে, তারা মুহাম্মাদ ইবন ইউসূফ থেকে, তিনি সাইব ইবন ইয়াযিদ (রা) থেকে, তিনি বলেন: উমার ২১ রাকআত (বিতর-সহ) কিয়ামুল্লাইলের ব্যবস্থা করেন।[৪৬৬] ইমাম বাইহাকী ইয়াযিদ ইবন খাসীফার সূত্রে সাইব ইবন ইয়াযিদ থেকে উদ্ধৃত করেন: উমারের সময় তারা ২৩ রাকআত কিয়াম করতেন।[৪৬৭] এগুলি সবই সহীহ হাদীস। হাদীসগুলোর রাবীগণ সকলেই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবী। এছাড়াও অনেকগুলো সহীহ বা হাসান সনদে উমার (রা)-এর সময়ে ২০ রাকআত তারাবীহ আদায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে।

মুহাদ্দিসগণ বলেন, সম্ভবত প্রথমে দীর্ঘ সময় ধরে ৮ রাকআত আদায় করা হতো। পরে সময়ের দৈর্ঘ ঠিক রেখে রাকআত ও বিশ্রামের সংখ্যা বাড়ানো হয়। ৬/৭ ঘণ্টা ধরে ৮ রাকআতের চেয়ে ২০ রাকআত আদায় সহজতর। পরবর্তীকালে অধিকাংশ স্থানে ২০

রাকআত এবং কোথাও ৩৮ রাকআত পর্যন্ত তারাবীহ আদায় করা হতো।

৯. ৪. তারাবীহ: আকীদা, সুন্নাত ও বিদ‘আত

শীয়াগণ ও শীয়া প্রভাবিত মুতাযিলাগণ সাধারণভাবে সাহাবীগণের বিরুদ্ধে কুৎসা ও বিদ্বেষ প্রচার করেন। বিশেষত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বিরুদ্ধে তাদের অপপ্রচার ও বিদ্বেষ সীমাহীন। এ সকল অপপ্রচারের একটি বিষয় তারাবীহ। তারা তারাবীহকে বিদ‘আত বলেন এবং উমার (রা)-কে বিদ‘আতী বলেন। তারা বলেন, উমার (রা) ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু বিষয় প্রচলন করেন যার একটি তারাবীহ। তারাবীহ বিদ‘আত। উমার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তা বিদ‘আত। বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তারাবীহের জামা‘আত প্রচলনের পরে উমার বলেন: (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ): "এটি ভাল বিদআত'। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তো বলেছেন, সকল বিদ‘আতই বিভ্রান্তি এবং জাহান্নামী! কাজেই উমার নিজের স্বীকারোক্তিতেই বিভ্রান্ত ও জাহান্নামী! নাউযূ বিল্লাহ!!

আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করলেই তাদের বিভ্রান্তি বুঝতে পারব। আমরা প্রথমে দেখব তারাবীহের মধ্যে কোনো নতুনত্ব আছে কি না? দ্বিতীয়ত দেখব নতুনত্বে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের জন্য কোনো বিশেষ মর্যাদা আছে কিনা।

তারাবীহের মধ্যে কী নতুনত্ব রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে ছিল না? তারাবীহ? না তার জামা‘আত? উভয় কর্মই সুন্নাতে নববী দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে রামাদানের কিয়ামুল্লাইল নিয়মিত পালন করেছেন, পালন করতে তাকিদ দিয়েছেন, কয়েকদিন জামাআতে পালন করেছেন, জামাআতে পালনের ফযীলত বর্ণনা করেছেন, তাঁর সময়ে ও পরবর্তী সময়ে ছোট ছোট জামাআতে বাড়িতে ও মসজিদে সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণ তা আদায় করেছেন। তাহলে আমরা দেখছি যে, উমার (রা) একটি সুন্নাত জীবন্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরয হওয়ার আশঙ্কায় নিয়মিত জামাআতে তা আদায় করেন নি। তাঁর ওফাতের পরে ফরয হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, তবে বড় জামাআতে তারাবীহ আদায় না করার নিয়মটি রয়ে যায়। আবূ বাকর (রা)-এর দু বৎসরে তিনি এ দিকে নযর দিতে পারেন নি। এছাড়া সে সময়ে অধিকাংশ মুসলিমই ভাল হাফিয ও কারী ছিলেন, কাজেই জামাতে আদায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতো কম। উমার (রা) বড় জামাতে তারাবীহ আদায়ের সুন্নাতটি পুনর্জীবিত করেন। তিনি কোনো বিদ‘আত প্রচলন করেন নি, বরং সুন্নাত জীবন্ত করেছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে তিনি কেন একে "সুন্দর বিদ‘আত" বললেন? এর উত্তর খুবই সুস্পষ্ট। তিনি এখানে বিদ‘আত শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়, বরং আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আভিধানিক অর্থে বিদ‘আত অর্থ 'নতুন' বা নব-উদ্ভাবন। আর কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় বিদ‘আত অর্থ সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো নতুন বিষয়কে দীনের বা ইসলামের অংশ বানানো। উমার (রা) এখানে বিদ‘আত বলতে দ্বিতীয় অর্থ বুঝান নি। তিনি বুঝিয়েছেন যে, আমাদের দৃষ্টিতে এটি একটি নতুন বিষয়; কারণ নিয়মিত জামাতে তারাবীহ আদায় অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তবে যেহেতু বিষয়টি মূলত সুন্নাত, বিশেষ কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা নিয়মিত করেন নি; সেহেতু তা আপাত দৃষ্টিতে নতুন হলেও সুন্দর নতুন।

যেমন আমরা বলি, 'আল্লাহ প্রেমে মাদকতা বা উন্মত্ততা কতই না ভাল মাদকতা'। এর অর্থ এ নয় যে, কিছু কিছু মাদক দ্রব্য বৈধ অথবা আল্লার প্রেম মাদকতা হওয়ার কারণে তা অবৈধ। এর অর্থ বাহ্যিকভাবে একে মাদকতা বা উন্মত্ততা বলে মনে হলেও তা প্রশংসনীয়। ইমাম শাফিয়ী বলেন: 'নবী-বংশের ভালবাসা যদি রাফিযী-মত হয় তাহলে জিন-ইনসান সকলেই সাক্ষী থাকুক যে, আমি রাফিযী-শীয়া।'[৪৬৮] অর্থাৎ নবী-বংশের প্রেম শীয়াত্ব-ই নয় এবং নবী-বংশের ভালবাসায় কেউ শীয়া হয় না।

তাহলে তারাবীহর মধ্যে কোনো বিদ‘আত বা নতুনত্ব নেই, বরং সবই প্রমাণিত সুন্নাত। এবার আমরা দ্বিতীয় বিষয়টি পর্যালোচনা করব। খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ কি উম্মাতের অন্যদের মতই? না সুন্নাতের ব্যাখ্যায় তাঁদের বিশেষ কোনো মর্যাদা আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিভিন্ন নির্দেশনার পাশাপাশি যুক্তি ও বিবেক নিশ্চিত করে যে, তাঁদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল নির্দেশ ও সুন্নাতের প্রেক্ষাপট জানতেন। কোথায় সংযোজন, বিয়োজন বা ব্যতিক্রমের সুযোগ রাসূলুল্লাহ ﷺ রেখে গিয়েছেন তাও তাঁরা ভাল জানতেন। তাঁরা যদি সুন্নাতের কোনো ব্যাখ্যা দেন তা নতুন বলে মনে হলেও সুন্নাত বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ.

"আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তাঁরা অনেক মতবিরোধ দেখবে। কাজেই তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরের হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। খবরদার! নব উদ্ভাবিত কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে; কারণ সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ‘আত এবং সকল বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা।"[৪৬৯]

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মও সুন্নাত। বিদ‘আত অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কথা, কর্ম, রীতি বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম উদ্ভাবিত বিষয়। কাজেই তাঁরা যদি সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু করেন তাহলে তাকে বিদ‘আত বলার অধিকার পরবর্তীদের নেই, কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৭০]

"তারাবীহ" প্রসঙ্গে উমার (রা)-এর বক্তব্যে "বিদ‘আত" শব্দকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত দাবি করে শীয়াগণ যেমন বিভ্রান্ত

হয়েছেন, মূলধারার অনেক আলিমও তেমনি বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। এ কথা দিয়ে তাঁরা দুটি বিষয় প্রমাণ করতে চান: (১) পারিভাষিক বিদ'আত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কিছুকে দীনের অংশ বানানো ভাল বলে গণ্য হতে পারে এবং (২) উমার (রা) যেমন তারাবীহের বিদ'আত প্রচলন করেছেন তেমনি নতুন নতুন বিদ'আত প্রচলনের অধিকার পরবর্তী যুগের মুসলিমদেরও আছে।

আমি **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে এ বিষয়ক অস্পষ্টতা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়:

(১) সকল হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা"। এর বিপরীতে একটি হাদীসেও বলা হয় নি যে, 'কিছু বিদ'আত পথভ্রষ্টতা ও কিছু বিদ'আত ভাল'। কাজেই একটি বিশেষ কর্মকে কোনো সাহাবী আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বলে থাকলে সে হাদীসের দ্বারা অন্যান্য সকল হাদীসের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন অর্থ বাতিল করা যায় না। হাদীস শরীফে সর্বদা "বিদ'আত" শব্দকে নিন্দার অর্থে বলা হয়েছে। নিন্দার জন্য বিদআতের সাথে কোনো বিশেষণ যোগ করা হয় নি। উমারের এ বক্তব্য দ্বারা বিদআতের ভাল হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা আর ইমাম শাফিয়ীর বক্তব্য দ্বারা রাফিযী-শীয়া মতবাদ ভাল হওয়ার, কোনো কেনো রাফিযীর ভাল হওয়ার বা ইমাম শাফিয়ীর রাফিযী হওয়ার দাবী একই প্রকারের ভুল।

(২) আমরা দেখেছি যে, উমার (রা)-এর এ কর্মটি কোনোভাবেই বিদ'আত নয়, নতুনও নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ, বাণী ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত। কাজেই উমারের কথাকে যদি "ভাল বিদ'আত" বা বিদআতে হাসানার মানদণ্ড ধরা হয় তাহলে বলতে হবে, যে কর্ম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করেছেন, করার ফযীলত উল্লেখ করেছেন কিন্তু বিশেষ কারণে নিয়মিত করতে পারেন নি বা তাঁর পরে অব্যাহত থাকে নি, সে কর্ম পুনরুজ্জীবিত করাকে বিদআতে হাসানা বা ভাল বিদ'আত বলা হয়।

(৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি, অথচ খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ করেছেন এরূপ কর্ম দু প্রকারের হতে পারে: (১) তিনি নিজে বিশেষ কারণে না করলেও তা করার উৎসাহ বা অনুমতি তাঁর সুন্নাতে রয়েছে। যেমন কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত করা, খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইত্যাদি। তারাবীহের জামা'আতও এ পর্যায়ের। (২) তাঁরা জাগতিক প্রয়োজনে বা সুন্নাত পদ্ধতিতে ইবাদত পালনের উপকরণ হিসেবে তা উদ্ভাবন করেছেন। যেমন কুরআনে বিভক্তিচিহ্ন বা হরকত প্রদান, আরবী ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নিয়মকানুন প্রচলন ইত্যাদি। এগুলিকে তাঁরা বা অন্য কেউ "দীনের অংশ" বানান নি। অর্থাৎ কেউ বলেন নি যে, কেউ যদি আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা ছাড়াই বা বিভক্তিচিহ্ন ছাড়াই বিশুদ্ধভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত সুন্নাত পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করে তাহলে ব্যাকরণ বা বিভক্তিচিহ্ন বাদ দেওয়ার কারণে তার সাওয়াব কম হবে।

(৩) আমরা দেখেছি যে, সুন্নাতে নববীর ব্যাখ্যার ও সুন্নাতের আলোকে কোনো কিছু প্রবর্তন করার যে অধিকার সাহাবীগণের ছিল, তা অন্যদের নেই এবং থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তারাবীহের নিয়মিত জামা'আত বর্জন করেন বিশেষ কারণে। খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ বুঝেন যে, কারণটি তিরোহিত হওয়ার পরে এ মাসনূন কর্মটিকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিয়েছেন, গ্রন্থ দেখে কুরআন পাঠের ফযীলত বলেছেন, তবে ওহী নাযিলের ধারাবাহিকতা চলতে থাকায় চূড়ান্ত গ্রন্থায়ন করতে পারেন নি। তাঁর ওফাতের পরে সাহাবীগণ তা করেছেন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সময় দৌড়ে দৌড়ে তাওয়াফ করেছিলেন মুশরিকদের শক্তি প্রদর্শনের বিশেষ উদ্দেশ্যে। খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ বুঝেন যে, কারণটি তিরোহিত হওয়ার পরেও আমলটি অব্যাহত রাখাই সুন্নাত।

এভাবে সুন্নাতের সাথে ব্যাখ্যামূলক সংযোজন-বিয়োজন একমাত্র সাহাবীগণই করতে পারেন। সাহাবীগণের পরে আর কেউ কোনোভাবে কোনো কারণ বা অজুহাতে সুন্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রম কোনো কিছুকে দীনের অংশ বানাতে পারেন না। সাহাবীগণ সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু প্রচলন করেছেন যুক্তিতে নতুন কোনো কথা, কর্ম বা রীতি উদ্ভাবন করে তাকে দীনের অংশ বানানোর অধিকার কারো নেই। এরূপ করলে কুরআন ও হাদীস সাহাবীদের যে মর্যাদা ও বিশেষত্ব দিয়েছে তা নষ্ট করা হয় এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্যের অবমূল্যায়ন করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, তারাবীহ একটি কর্ম, বিশ্বাসের বিষয় নয়, তবে তা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কর্মগত বৈশিষ্ট্য। এছাড়া বিভিন্ন বিভ্রান্ত গোষ্ঠী তারাবীহকে বিদ'আত ও উমার (রা)-কে বিদ'আতী বলার কারণে ইমাম আযম (রাহ) বিষয়টিকে আকীদা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

১০. ইমামত ও রাষ্ট্র

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: **"সকল নেককার ও পাপী মুমিনের পিছনে সালাত আদায় বৈধ।"** এখানে তিনি ইসলামী আকীদার অন্যতম একটি বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি যে, ইসলামী আকীদার আলোচ্য বিষয় চারটি: (১) মহান আল্লাহ, (২) নুবুওয়াত, (৩) ইমামাত বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ ও (৪) আখিরাত। ইমাম আবূ হানীফা এখানে ইমামত প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন।

ইসলামে সালাতের ইমামত ও রাষ্ট্রীয় ইমামত বা রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এবং পরবর্তী কয়েক যুগে সর্বদা রাষ্ট্রপ্রধান বা তার নিযুক্ত আঞ্চলিক প্রধান, বিচারক বা কর্মকর্তাই সালাতের ইমামতি করতেন। জুমুআ ও ঈদের সালাতের জন্য রাষ্ট্রের ইমামের ইমামতি বা অনুমোদন শর্ত বলে গণ্য করেছেন অধিকাংশ ফকীহ। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের বিশ্বাস বর্ণনা করেছেন ইমাম আযম একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে। তা হলো, পাপী ও পুণ্যবান সকলের পিছনেই সালাত বৈধ। সালাতের ইমাম অর্থই রাষ্ট্রীয় ইমাম বা তার নিয়োজিত ব্যক্তি। সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতির জন্য সর্বোত্তম বা

সবচেয়ে মুত্তাকী ব্যক্তি হওয়া জরুরী নয়। যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতি গ্রহণ করে তবে তার অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও যথাসাধ্য সৎকাজে আদেশসহ রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য বহাল রাখতে হবে। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)–এর আকীদা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম তাহাবী (রাহ)। তিনি বলেন:

وَنَرَى الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ. وَلا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلا نَارًا، وَلا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلا بِشِرْكٍ وَلا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَلا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلاَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ. وَلا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، وَلا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلاحِ وَالْمُعَافَاةِ. وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلافَ وَالْفُرْقَةَ. وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. ... وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، لا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلا يَنْقُضُهُمَا.

"আমরা কেবলাপন্থী প্রত্যেক নেককার ও পাপী মুসলিমের পিছনে সালাত কায়েম করা এবং তাদের মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার সালাত আদায় করা বৈধ মনে করি। আমরা তাদের কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রদান করি না। তাদের কারো উপর কুফর, শিরক বা নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করি না যতক্ষণ না এ ধরণের কিছু তাদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিবে। তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দিই। ধর্মীয় বিধান মতে ফরয না হলে মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মাতের কোনো লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ আমরা বৈধ মনে করি না। আমাদের ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানগণ ও শাসকবর্গ অত্যাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করি না। আমরা তাদেরকে অভিশাপ প্রদান করি না এবং তাদের আনুগত্যও বর্জন করি না। আমরা তাদের আনুগত্যকে আল্লাহরই আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরয মনে করি যতক্ষণ না তারা কোনো পাপ কর্মের নির্দেশ দেয়। আর তাদের সংশোধন ও সংরক্ষণের জন্য দু'আ করি। আমরা সুন্নাত এবং জামা'আত (ঐক্য) অনুসরণ করি এবং বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য ও মতবিরোধিতা আমরা পরিহার করি। আমরা ন্যায়বিচারক ও দায়িত্ববান-আমানত আদায়কারী শাসকদের ভালবাসি এবং জালিম, দুর্নীতিবাজ বা দায়িত্বে খিয়ানতকারীদের ঘৃণা করি। মুসলিম শাসকের অধীনে- সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক- হজ্জ এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটিকে বাতিল বা ব্যাহত করতে পারে না।"[৪৭১]

এখানে ইমাম তাহাবী নেককার ও বদকারের ইমামতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক এবং বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জিহাদ ও হজ্জ দুটি ইবাদতকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পালনের কথা উল্লেখ করেছেন।

১০. ১. খারিজী ও শীয়া মতবাদ

আমরা দেখেছি যে, ইসলামের প্রথম দুটি ফিরকা- শীয়া ও খারিজী ফিরকা- উভয়ের উদ্ভব উন্মেষ ঘটেছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভক্তি ঘটে। শীয়াগণ দাবি করেন যে, ইমামাত একমাত্র "নিষ্পাপ" ব্যক্তির প্রাপ্য। এজন্য পাপীর ইমামত অবৈধ। পাপী ব্যক্তিকে অপসারণ করে সর্বোচ্চ মুত্তাকীকে- তাদের বিশ্বাসে তাদের ইমাম বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে- রাষ্ট্রীয় ইমামতে অধিষ্ঠিত করাকে তারা অন্যতম ফরয দায়িত্ব বলে গণ্য করেন।

খারিজীগণও এ বিষয়ে দুটি আকীদার উদ্ভাবন করে: (১) পাপী ব্যক্তির ইমামতের অবৈধতা এবং (২) পাপী ইমামের অপসারণের আবশ্যকতা। তাদের দাবি, পাপী ব্যক্তি কাফির, আর কাফির ব্যক্তি সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতি করতে পারে না। বরং মুমিনের জন্য ফরয যে, এরূপ ইমামের বিরুদ্ধে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের অংশ হিসেবে বিদ্রোহ করবে এবং জিহাদ করে তাকে অপসারণ করবে।

এ কারণে শীয়াগণ ও খারিজীগণ সর্বদা বিদ্রোহ ও রাষ্ট্র পরিবর্তন প্রচেষ্টায় লিপ্ত থেকেছেন। তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ছাড়া সকল রাষ্ট্রকে তাগূতী ও অনৈসলামিক রাষ্ট্র বলে গণ্য করেন। এ সকল দেশে তারা সালাতুল জুমুআ আদায় করেন না। সুন্নী ইমামদের পিছনে জামা'আত আদায় করেন না। এ ছাড়া এ সকল দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বা গোপন যুদ্ধ করে তাদেরকে উৎখাত করে নিজ আকীদার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তারা সচেষ্ট থাকেন। শীয়াগণ সাধারণত গোপন প্রচার, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে খারিজীগণ সাধারণত সরাসরি বিদ্রোহ ও যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম তাহাবীর বক্তব্যের আলোকে আমরা এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

১০. ২. সুন্নাতের আলোকে ইমাম ও জামাআত

জাহিলী যুগে আরবে কোনো রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছিল না। তারা কবীলা বা গোত্রের আনুগত্যের মধ্যে বাস করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথম সেখানে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতাবোধ, কবীলার আনুগত্য, রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যায়, পাপ বা জুলুমের কারণে যেন রাষ্ট্রীয় ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা বিঘ্ন না হয় সে জন্য তিনি বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন। এ সকল নির্দেশনা অনুধাবনের জন্য এ বিষয়ক কয়েকটি পরিভাষা আলোচনা করা প্রয়োজন। এ পরিভাষাগুলির অন্যতম: ইমাম, বাইআত ও

জামা'আত। এ পরিভাষাগুলোর অর্থ ও ব্যবহার আলোচনা করেছি **"ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ"** ও **"কুরআন-সুন্নাহ আলোকে ইসলামী আকীদা"** গ্রন্থে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইমাম (الإمام) শব্দের আভিধানিক অর্থ "নেতা" (Leader)। ইসলামী পরিভাষায় সালাতের জামাআতের ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদি অর্থে ইমাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তবে হাদীস শরীফ ও প্রথম শতাব্দীগুলির আকীদা ও ফিকহের পরিভাষায় ইমাম শব্দটি যখন উন্মুক্তভাবে ব্যবহৃত হয় বা "ইমামুল মুসলিমীন" মুসলিমগণের ইমাম বলা হয় তখন এর অর্থ রাষ্ট্রপ্রধান। হাদীসে, ফিকহে ও আকীদায় 'ইমাম' পরিভাষাটি একমাত্র এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তাকে "বাইআত" (البيعة) বলা হয়।

জামা'আত (الجماعة) অর্থ ঐক্য বা ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী, জনগণ বা সমাজ (community, society) অর্থে তা অধিক ব্যবহৃত হয়। এর বিপরীত শব্দ ইফতিরাক (الافتراق), অর্থাৎ বিভক্তি বা দলাদলি। ফিরকা (الفرقة) অর্থ দল বা গোষ্ঠী। হাদীসে "জামা'আত" বা "জামা'আতুল মুসলিমীন" বলতে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে বসবাসকারী ঐক্যবদ্ধ জনগণ বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বুঝানো হয়েছে।

নিষ্পাপ বা পাপমুক্ত রাষ্টপ্রধানের বাধ্যবাধকতা চিরন্তন সংঘাতের পথ খুলে দেয় এবং মুমিনকে অসাধ্য সাধনের পথে ধাবিত করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের ও রাষ্টের ইমামতির জন্য ধার্মিক, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগের উৎসাহ দিয়েছেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পাপী ইমামের পাপের প্রতিবাদের পাশাপাশি আনুগত্য বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ক অনেক হাদীস উপর্যুক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আলোচনা করেছি। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

মুআবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

"কোনো একজন ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) আনুগত্য-বিহীন অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[৪৭২]

আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি 'রাষ্ট্রীয় আনুগত্য' থেকে বের হয়ে এবং 'জামা'আত' বা ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[৪৭৩]

মু'আবিয়া (রা) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে রাষ্ট্র প্রধান পদে মনোনয়ন দান করেন এবং তার পক্ষে রাষ্ট্রের নাগরিকদের থেকে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ৬০ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকালের পরে ইয়াযিদ শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার শাসনামলে ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ তার জুলুম, ইমাম হুসাইনের শাহাদত ইত্যাদি কারণে বিদ্রোহ করেন। তাদের বিদ্রোহ ছিল যুক্তিসঙ্গত, একান্তই আল্লাহর ওয়াস্তে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না। সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) মদীনার বিদ্রোহীদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবন মুতি'র নিকট গমন করেন। তিনি তাঁকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন। ইবন উমার (রা) বলেন: আমি বসতে আসিনি। আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ (رواية ثانية: مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ) مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি 'তাআত' বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর পেশ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি 'বাই'আত' (রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার)-বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল (অন্য বর্ণনায়: যে ব্যক্তি ইমাম-বিহীনভাবে মৃত্যুবরণ করল) সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[৪৭৪]

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"কেউ তার শাসক-প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (মুসলিম সমাজ বা রাষ্টের ঐক্যের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করবে।"[৪৭৫]

এভাবে সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বহাল রাখা এবং ইসলামবিরোধী নয় এরূপ বিষয়ে সরকারের আনুগত্য করাই ইসলামের নির্দেশ। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا

"অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক-প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।)" সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।"[৪৭৬]

যদি কোনো নাগরিক তার সরকারের অন্যায় সমর্থন করেন বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুসরণ করেন তবে তিনি সরকারের পাপের ভাগী হবেন। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা, চাকরী, কর্ম বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কারণে কোনো নাগরিক পাপী হবে না। আউফ ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

"হুশিয়ার! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক বা প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছেন, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, তবে সে আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।"[৪৭৭]

আরো অনেক হাদীসে পক্ষপাতিত্ব, যুলুম ও পাপে লিপ্ত শাসক বা সরকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ শাসক বা সরকার কোনো ইসলাম বিরোধী নির্দেশ প্রদান করলে তা পালন করা যাবে না। আবার অন্যায় নির্দেশের কারণে বিদ্রোহ বা অবাধ্যতাও করা যাবে না। বরং রাষ্ট্রীয় সংহতি ও আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। তবে শাসক বা প্রশাসক সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলে বিদ্রোহ বা আনুগত্য পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও "তাকফীর" বিষয়ক ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে।[৪৭৮]

উল্লেখ্য যে, খারিজী ও শীয়াগণ "ইমাম", "জামআত" ইত্যাদি পরিভাষার বিকৃতি সাধন করেন। শিয়াগণ "ইমাম" শব্দটির অর্থ বিকৃত করে। সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণতান্ত্রিক। জনগণের পরামর্শের মাধ্যমে ইমাম, খলীফা বা শাসক নিয়োগ লাভ করবেন। সবচেয়ে যোগ্য বা মুত্তাকী হওয়াও আবশ্যক নয়। কিন্তু শীয়া বিশ্বাস অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক-যাজকতান্ত্রিক। রাষ্ট্রীয় ইমামত, খিলাফাত বা শাসকের পদ বংশগতভাবে নবী-বংশের পাওনা।

তারা দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওফাতের পরে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব আলী (রা) ও তাঁর বংশের নির্ধারিত কয়েক ব্যক্তিকে প্রদান করেন। কিন্তু আবু বকর, উমার, উসমান ও অন্যান্য সকল সাহাবী (ﷺ) মুরতাদ হয়ে (নাঊযু বিল্লাহ!) ষড়যন্ত্র করে তাঁদেরকে বঞ্চিত করেন। কাজেই আলী বংশের এ মানুষগুলিই প্রকৃত 'ইমাম'। তারা "ইমাম" পদবীকে রাষ্ট্রপ্রধানের বাইরে ১২ ইমাম বা ৭ ইমামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। তাদের ইমামগণ লুক্কায়িত থাকতেন। বিশেষ করে তাদের বিশ্বাস অনুসারে দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ আল-মাহদী কিশোর বয়সে ২৬৫ হিজরী সালের দিকে গায়েব হয়ে গিয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত গাইবে থেকেই বিশ্ব শাসন করছেন। কাজেই "ইমাম"-এর আনুগত্য বা বাইয়াত মুল বিষয় নয়, "পরিচয় জানা" মূল বিষয়। এজন্য তারা আনুগত্যের বদলে "পরিচয় জানা" মর্মে জাল হাদীস তৈরি করেন। এরূপ একটি জাল হাদীস:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি তার যুগের ইমামকে না জেনে মরল সে জাহিলী মৃত্যু মরল।"[৪৭৯]

পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে ইমামের পরিচয় লাভ নয়, আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, তবে যুগের ইমাম নয়, বরং রাষ্ট্রের ইমাম।

খারিজীগণ তাদের মতের বিরোধী সকল মুসলিমকে কাফির বলেন। এজন্য তারা তাদের 'দল'-কেই "জামা'আতুল মুসলিমীন" বলে দাবি করতেন। তাদের মধ্য থেকে কাউকে নেতা নির্বাচন করে তাকেই "ইমাম" বলে গণ্য করতেন। এভাবে তারা জামাআত শব্দটিকে 'ফিরকা' অর্থে এবং 'ইমাম' শব্দটিকে 'আমীর' অর্থে ব্যবহার করেন। ইসলামে 'জামা'আত' বা ঐক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং 'ফিরকা' ও 'তাফারুক', অর্থাৎ দল, বিভক্তি ও দলাদলি নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু খারিজীগণের ব্যবহারে ফিরকা বা দলকেই 'জামা'আত' বলা হতে থাকল। উপরন্তু অনেকে 'বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া' বা 'কোনো না কোনো দলে থাকা'-কে ফরয মনে করলেন এবং ফিরকার আমীরকেই 'ইমাম' বলতে লাগলেন। এভাবে ইসলাম নিষিদ্ধ 'দলাদলি'-কে তারা ফরয বানিয়ে ফেললেন। তাঁরা ইসলাম নিষিদ্ধ

একটি বিষয়কে 'দীন' বানালেন!

১০. ৩. ব্যক্তির পাপ-পুণ্য বনাম সমাজ ও রাষ্ট্রের পাপ-পুণ্য

এখানে আরো লক্ষণীয় সমাজ বা রাষ্ট্রের পাপের কারণে মুমিনের নিজ ইবাদত পালনে অবহেলা। অনেক সময় আবেগী মুসলিম মনে করেন, "নামায পড়ব কার পিছে? সবাই তো বিভিন্ন পাপ বা অপরাধে জড়িত", অথবা মনে করেন: "এত পাপ, জুলুম বা কুফরের মধ্যে থেকে জুমুআ, জামা'আত ইত্যাদি করে কি লাভ? অথবা আগে এ সকল পাপ, জুলুম ইত্যাদি দূর করি, এরপর জুমুআ-জামা'আত পালন করব।

এ আবেগ মুমিনকে ভুল পথে পরিচালিত করে। মুমিনের মূল দায়িত্ব নিজের জীবনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত অনুসারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালন করা। পাশাপাশি তিনি অন্যদেরকে সাধ্যমত দীন পালন ও প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দিবেন। অন্যের পাপের দায়ভার তার নয়। তার সাধ্যমত দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ, আপত্তি বা ঘৃণার পরেও সমাজের সকল মানুষ, অধিকাংশ মানুষ এবং সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমাম পাপে লিপ্ত থাকলে সে জন্য তিনি দায়ী হবেন না বা তার দীনদারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। পাপের প্রতি ঘৃণা ও আপত্তি-সহ পাপী সমাজে বাস করা, পাপী ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা বা পাপী শাসকের আনুগত্য করার অর্থ তার পাপের স্বীকৃতি দেওয়া নয় বা তার পাপের অংশী হওয়া নয়; বরং ঐক্য বা 'জামা'আত' রক্ষায় নিজের দীনী দায়িত্ব পালন করা। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর শুধু তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে থাক তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।"[৪৮০]

পাপী শাসক-প্রশাসকদের পিছনে সালাতের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

"তারা তোমাদের জন্য সালাত আদায় করবে। যদি তারা সঠিক করে তবে তোমরা সাওয়াব পাবে। আর তারা যদি অপরাধ করে তবে তোমরা সাওয়াব পাবে এবং তারা পাপী হবে।"[৪৮১]

৩৫ হিজরী সালে খলীফা উসমান (রা)-কে মদীনায় অবরুদ্ধ করে একদল বিদ্রোহী পাপাচারী এবং শেষে তারা তাঁকে নির্মমভাবে শহীদ করে। পাপিষ্ঠ বিদ্রোহীরা মসজিদে নববীর ইমামতি দখল করে। এরূপ ইমামের পিছনে সালাত আদায় বিষয়ে অবরুদ্ধ উসমান (রা)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন:

الصَّلاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ

"মানুষ যত কর্ম করে তার মধ্যে সালাত সবচেয়ে ভাল কর্ম। যখন মানুষ ভাল কর্ম করে তখন তাদের সাথে তুমিও ভাল কর্ম কর। আর যখন তারা অন্যায় করে তখন তুমি তাদের অন্যায় বর্জন কর।"[৪৮২]

রাষ্ট্রীয় পাপ ও ইসলাম বিরোধিতার প্রসার ঘটে উমাইয়া যুগে। সাহাবীগণ পাপের বিরোধিতার পাশাপাশি পাপী ইমামের পিছনে সালাত আদায় করতেন ও তাদের নেতৃত্বে জিহাদ ও অন্যান্য ইবাদত পালন করতেন। তারিক ইবন শিহাব বলেন:

أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

"প্রথম যে ব্যক্তি সালাতুল ঈদের খুতবা সালাতের আগে নিয়ে আসে সে মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তখন এক ব্যক্তি তার দিকে দাঁড়িয়ে বলে, খুতবার আগে সালাত। মারওয়ান বলেন: তৎকালীন নিয়ম পরিত্যক্ত হয়েছে। তখন আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এ ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: 'তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখে তবে সে যেন তা তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে যেন তার বক্তব্য দিয়ে তা পবিবর্তন করে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন (কামনা) করে, আর এ হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।"[৪৮৩]

এখানে অন্যায়ের প্রতিবাদের সমর্থন-সহ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) মারওয়ানের পিছনে সালাত আদায় করেছেন।

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ আইউব আনসারী (রা) ইয়াযিদ ইবন মুআবিয়ার নেতৃত্বে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন।[৪৮৪] অন্যান্য প্রসিদ্ধ

সাহাবীও উমাইয়া যুগে ইয়াযিদ ও অন্যান্য ফাসিক ও ইসলাম বিরোধী আইন-কানুন ও বিধিবিধানে লিপ্ত (খারিজী ও শীয়া বিচারে কাফির) শাসক ও আমীরদের অধীনে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন বা রাষ্ট্রীয় চাকরী ও দায়িত্ব পালন করেছেন। ইয়াযিদ ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদের সবচেয়ে কুখ্যাত প্রশাসক ছিলেন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ। আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) ও অন্যান্য সাহাবী হাজ্জাজের ইমামতিতে আরাফার মাঠে সালাত আদায় করতেন।[৪৮৫]

উমাইয়া প্রশাসক ওয়ালীদ ইবন উকবা মদপান করতেন। তিনি একদিন মাতাল অবস্থায় ফজরের সালাতে ইমামতি করেন। তার পিছনে আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) জামাআতে শরীক ছিলেন। ওয়ালীদ মাতাল অবস্থায় থাকার কারণে ফজরের সালাত চার রাকআত আদায় করেন এবং সালাম ফিরিয়ে বলেন: কম হলো কি? আরও লাগবে? তখন ইবন মাসঊদ (রা) ও মুসল্লীগণ বলেন: আজ সকালে তো আপনি বেশি বেশিই দিচ্ছেন (ইতোমধ্যেই দু রাকআত বেশি দিয়েছেন! আর লাগবে না!)।"[৪৮৬]

এখানে ইবন মাসঊদ (রা) ইমামের পাপ, মদপান ইত্যাদির কারণে বিদ্রোহ বা তার পিছনে সালাত পরিত্যাগ করে একাকী সালাতের মত প্রকাশ করেন নি। কারণ জুমুআ, সালাতের জামাআত ইত্যাদি ইসলামী সমাজের ঐক্য, সংহতি বা 'জামাআতের' মূল ভিত্তি। জামা'আত রক্ষা করা অন্যতম দীনী দায়িত্ব। অন্যের পাপের কারণে মুমিন নিজের দীনী দায়িত্ব বর্জন করতে পারেন না।

ইমাম বুখারী তাঁর আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে তাবিয়ী আব্দুল কারীম বাক্কা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, "আমি দশজন সাহাবীর সঙ্গ পেয়েছি যারা পাপী-জালিম শাসক-প্রশাসকদের পিছনে সালাত আদায় করতেন।"[৪৮৭]

১০. ৪. পাপীর পিছনে সালাতের বিধান

পাপী ইমামের পিছনে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি নিম্নরূপ:

(১) সালাতের ইমাম যদি রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসক বা রাষ্ট্রে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি হন তবে সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন শিরক-কুফর প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার পিছনে সালাত আদায় করতে হবে। তার পাপের প্রতি ঘৃণা, আপত্তি ও সাধ্যমত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ-সহ তার পিছনে সালাত আদায় রাষ্ট্রীয় জামা'আত বা ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য ইসলামের নির্দেশনা ও সাহাবীগণের সুন্নাত।

(২) যদি কোনো মসজিদের নিয়মিত নিযুক্ত ইমাম পাপী হন তবে তার নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পাপী হবেন। সাধারণ মুসল্লী যদি অন্য কোনো ভাল ইমামের পিছনে সালাত আদায়ের সুযোগ পান তাহলে ভাল, নইলে এরূপ পাপী ইমামের পিছনেই সালাত আদায় করতে হবে। নেককার ইমামের পিছনে সালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সুস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থহীন কুফর-শিরক না পাওয়া পর্যন্ত কোনো অজুহাতে জামা'আত ও জুমুআ পরিত্যাগ করা যাবে না। কোনোভাবেই 'জামা'আত' বা ঐক্য নষ্ট করা যাবে না। ঐক্য বজায় রেখে উত্তম ইমামের জন্য চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে হানাফী ফকহীগণ বলেছেন:

وَلَوْ صلى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ أو فَاسِقٍ فَهُوَ مُحْرِزٌ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ لا يَنَالُ مِثْلَ ما يَنَالُ خَلْفَ تَقِيٍّ

"যদি কেউ কোনো বিদ'আত-পন্থী বা ফাসিক-পাপাচারীর পিছনে সালাত আদায় করে তবে সে জামাআতের সাওয়াব লাভ করবে; তবে মুত্তাকী ইমামের পিছনে সালাত আদায়ের মত সাওয়াব পাবে না।"[৪৮৮]

(৩) যার ইমাম নিয়োগ দেওয়ার বা মসজিদ বাছাই করার সুযোগ আছে তাকে অবশ্যই সুন্নাতের নির্দেশনা অনুসারে মুত্তাকী, কারী ও আলিম ইমাম নিয়োগের বা তার পিছনে সালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

১০. ৫. ব্যক্তিগত ইবাদত বনাম রাষ্ট্রীয় ইবাদত

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান। কোনো বিধান ব্যক্তিগতভাবে পালনীয়, কোনো বিধান সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি রয়েছে। কুরআনে 'সালাত' প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার কুরআনে 'চোরের হাত কাটার', 'ব্যভিচারীর বেত্রাঘাতের' ও 'জিহাদ' বা 'কিতালের' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ইবাদতটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। অন্য কেউ পালন না করলেও মুমিনকে ব্যক্তিগভাবে পালন করতেই হবে। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশটি 'রাষ্ট্রীয়ভাবে' পালনীয়। কখনোই একজন মুমিন তা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত-ভাবে পালন করতে পারেন না। কোন্‌টি ব্যক্তিগত ও কোন্‌টি রাষ্ট্রীয় তা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কর্মধারা থেকে জানতে হবে।

১০. ৫. ১. সালাত ও সালাতের জামাআত

আমরা দেখছি যে, সালাতের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় দুটি দিক রয়েছে। সালাত ইসলামের অন্যতম রুকন। যে কোনো পরিস্থিতিতে ও যে কোনো স্থানে মুমিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরয আইন ইবাদত "সালাত" আদায় করা। আর সালাতের

একটি বিশেষ দিক "জামা'আত"। মুমিনের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত জামাআতে আদায় করা জরুরী। ফকীহগণের কেউ জামা'আত 'ফরয', কেউ 'ওয়াজিব' এবং কেউ 'ওয়াজিব পর্যায়ের সুন্নাত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে সকলেই একমত যে, বিশেষ ওজর ছাড়া 'জামা'আত' পরিত্যাগ করে একাকী সালাত আদায় করা কঠিন গোনাহের কাজ। আর জুমুআর সালাত ও ঈদের সালাত জামাআতে আদায় করা শর্ত।

সুন্নাতের নির্দেশনা অনুসারে জামাআতের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা, যোগ্য ইমাম নিয়োগ ইত্যাদি মুমিনের ব্যক্তিগত ফরয ইবাদত নয়, রাষ্ট্র বা সমাজের সামষ্টিক ফরয বা 'ফরয কিফায়া' ইবাদত। এক্ষেত্রে যাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে তারা অবহেলা করলে পাপী হবেন। ব্যক্তি মুমিন সাধ্যমত চেষ্টা, অন্যায়ের আপত্তি ও সত্যের দাওয়াত দিবেন। কিন্তু অন্যের পাপের কারণে বা অন্যের উপর রাগ করে নিজের 'জামা'আত' রক্ষার দায়িত্ব নষ্ট করে নিজে পাপে লিপ্ত হবেন না। সমাজের পাপের প্রতিবাদে নিজে 'জামাত তরকের' পাপে লিপ্ত হওয়া ইসলামের নির্দেশনা সাথে সাংঘর্ষিক।

১০. ৫. ২. হজ্জ, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর

সালাত ছাড়া আরো দুটি রাষ্ট্র-সংশ্লিষ্ট ইবাদতের কথা তাহাবী উল্লেখ করেছেন: হজ্জ ও জিহাদ। অন্যান্য আকীদাবিদ ও ফকীহ সালাতুল জুমুআ ও দু ঈদের কথাও উল্লেখ করেছেন। প্রসিদ্ধ কালামবিদ ইমাম আবুল হাসান আশআরী (৩২৪হি) বলেন:

ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر كما روى أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج

"আর আমাদের দীনের অন্যতম দিক যে, আমরা জুমুআর সালাত, ঈদগুলো এবং অন্যান্য সকল সালাত এবং জামাআত সকল নেককার ও বদকারের পিছনে আদায় করি। যেমনিভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের পিছনে সালাত আদায় করতেন।"[৪৮৯]

হজ্জ ইসলামের পাঁচ রুকনের শেষ রুকন। এটি মূলত ব্যক্তিগত ফরয ইবাদত। মুমিন যে কোনো অবস্থায় হজ্জ ফরয হলে তা আদায় করবেন। পাশাপাশি হজ্জের ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় বিষয়। হজ্জের তারিখ ঘোষণা, কার্যক্রম পরিচালনা, আরাফাত, মুযদালিফা, মিনায় ইমাম নিযুক্ত করা ইত্যাদি কর্ম অবশ্যই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাষ্ট্রপ্রধানের পাপ, অন্যায়, ইসলাম বিরোধী মতামত বা জুলুমের কারণে এক্ষেত্রে হজ্জ বন্ধ করা বা রাষ্ট্র ঘোষিত চাঁদ দেখাকে বাতিল করে নিজেদের ইচ্ছামত হজ্জ আদায় করা মুমিনের জন্য বৈধ নয়।

ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরেরও একই বিধান। হাদীস শরীফে 'চাঁদ দেখে সিয়াম ও ঈদুল ফিতরের' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, যে কেউ যেখানে ইচ্ছা চাঁদ দেখলেই ঈদ করা যাবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হলে বা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলেই শুধু ঈদ করা যাবে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সমাজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ঈদ পালন করতে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ

"যে দিন সকল মানুষ ঈদুল ফিত্‌র পালন করবে সে দিনই ঈদুল ফিত্‌র-এর দিন এবং যেদিন সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করবে সে দিনই ঈদুল আযহার দিন।"[৪৯০]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মাসরূক বলেন, আমি একবার আরাফার দিনে, অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করি। তিনি বলেন, মাসরূককে ছাতু খাওয়াও এবং তাতে মিষ্টি বেশি করে দাও। মাসরূক বলেন, আমি বললাম, আরাফার দিন হিসাবে আজ তো রোযা রাখা দরকার ছিল, তবে আমি একটিমাত্র কারণে রোযা রাখি নি, তা হলো, চাঁদ দেখার বিষয়ে মতভেদ থাকার কারণে আমার ভয় হচ্ছিল যে, আজ হয়ত চাঁদের দশ তারিখ বা কুরবানীর দিন হবে। তখন আয়েশা (রা) বলেন:

اَلنَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ الإِمَامُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ الإِمَامُ

যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান কুরবানীর দিন হিসাবে পালন করবেন সে দিনই কুরবানীর দিন। আর যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান ঈদুল ফিতর পালন করবে সে দিনই ঈদের দিন।"[৪৯১]

মুমিনের জন্য নিজ দেশের সরকার ও জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ঈদ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ। অন্য দেশের খবর তো দূরের কথা যদি কেউ নিজে চাঁদ দেখেন কিন্তু রাষ্ট্র তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করে তাহলে তিনিও একাকী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিপরীতে ঈদ করতে পারবেন না। সাহাবী-তাবিয়ীগণ বলেছেন যে, এক্ষেত্রে ভুল হলেও ঈদ, হজ্জ, কুরবানী সবই আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ভুলের জন্য মুমিন কখনোই দায়ী হবেন না।[৪৯২]

সরকারের পাপাচার বা ইসলাম বিরোধিতার অজুহাতে এ সকল ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করা শরীয়ত নিষিদ্ধ। কোনো মুসলিম দেশকে 'দারুল হারব' বা 'তাগূতী' রাষ্ট্র বলে গণ্য করা খারিজী ও শীয়াগণের পদ্ধতি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত শাসক বা সরকারের পাপ বা কুফরীর কারণে মুসলিমদের দেশকে কাফিরের দেশ বানান নি। ইয়াযীদের জুলম-পাপের রাষ্ট্র, মামূনের কুফরী মতবাদের রাষ্ট্র, আকবারের দীন ইলাহীর রাষ্ট্র ও অন্যান্য সকল মুসলিম রাষ্ট্রকেই তারা 'দারুল ইসলাম' হিসেবে গণ্য করেছেন এবং জুমুআ, জামা'আত, ঈদ, জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি সকল বিষয়ে এরূপ সকল দেশে দারুল ইসলামের আহকাম পালন করেছেন।

বর্তমানে 'সারা বিশ্বে একদিনে ঈদ' বিষয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে। তবে 'সকল দেশে একদিনে ঈদ' পালনের নামে 'একই দেশে একাধিক দিনে ঈদ' পালন নিঃসন্দেহে ইসলামী নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। বিষয়টি নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা ও মতবিনিময় অবশ্যই হতে পারে। রাষ্ট্র যদি ঐকমত্যের ভিত্তিতে অন্য কোনো দেশের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করে ঘোষণা দেয় তবে জনগণ তা অনুসরণ করবে। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ ইসলামকে সহজ-পালনীয় করেছেন। বর্তমানে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে বিশ্বের কোথাও চাঁদ উঠলে সকল দেশেই তা জানা সম্ভব। কিন্তু অতীতে তা ছিল না। আর দূরবর্তী এলাকার চাঁদের খবর নিতে কেউ চেষ্টা করেন নি। মদীনায় চাঁদ দেখার পরে -ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহায় রাতারাতি বা ৯ দিনের মধ্যে- দ্রুত দূরবর্তী অঞ্চলে সংবাদ প্রদানের চেষ্টা বা সর্বত্র একই দিনে ঈদ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার চেষ্টা রাসূলুল্লাহ ﷺ বা খুলাফায়ে রাশেদীন করেন নি। সাহাবীগণের যুগ থেকেই একাধিক দিবসে ঈদ হয়েছে।[৪৯৩] একাধিক দিনে ঈদ পালন বিষয়ক হাদীসটি উদ্ধৃত করে ইমাম তিরমিযী বলেন:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ

"আলিমগণের সিদ্ধান্ত এ হাদীসের উপরেই: প্রত্যেক দেশের মানুষ তাদের নিজেদের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে।"[৪৯৪]

বস্তুত, সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী আলিমগণ বিভিন্ন দেশে একাধিক দিনে ঈদ পালনকে ইসলামী নির্দেশনার বিরোধী বলে গণ্য করেন নি। পক্ষান্তরে একই রাষ্ট্রের মধ্যে বা একই ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) অধীনে একাধিক দিনে ঈদ পালনকে সকলেই নিষিদ্ধ, অবৈধ ও ইসলামী নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করেছেন।

১০. ৫. ৩. জিহাদ

'জিহাদ' অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম বা কষ্ট। নিয়মিত পরিপূর্ণ ওযু, জামাতে সালাত, হজ্জ, আল্লাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধি-মূলক কর্ম, হক্কের দাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতকে হাদীস শরীফে "জিহাদ" বা "শ্রেষ্ঠতম জিহাদ" বলা হয়েছে। তবে ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ অর্থ "মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ।" এ যুদ্ধেরই নাম কিতাল। পারিভাষিক ভাবে জিহাদ ও কিতাল একই বিষয়।[৪৯৫]

জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদ কুরবানি দেওয়া অত্যন্ত বড় ত্যাগ। এজন্য এ ইবাদতের পুরস্কারও অভাবনীয়। কুরআন ও হাদীসে জিহাদের অফুরন্ত পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং এ ইবাদত পালনের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের অর্থ জিহাদ যখন বৈধ বা জরুরী হবে তখন যে ব্যক্তি মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠে জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে তখন সে এ পুরস্কার লাভ করবে।

জিহাদের আগ্রহ মুমিনের হৃদয়ে থাকবে। জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের কুরবানীর প্রতি অনীহা ঈমানী দুর্বলতার প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

"যদি কেউ এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি এবং যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণের কোনো কথাও নিজের মনকে কখনো বলে নি, তবে সে ব্যক্তি মুনাফিকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করবে।"[৪৯৬]

আমরা দেখব যে, সাধারণভাবে জিহাদ ফরয কিফায়া এবং কখনো কখনো ফরয আইন। ফরয কিফায়া অবস্থায় যদি সকল মুসলিম তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয আইন অবস্থায় যদি মুসলিমগণ তা পরিত্যাগ করে তবে তা তাদের জাগতিক লাঞ্ছনা বয়ে আনবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"যখন তোমরা অবৈধ ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হবে, গবাদিপশুর লেজ ধারণ করবে, চাষাবাদেই তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তায়

জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, দীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত যা তিনি অপসারণ করবেন না।"[৪৯৭]

এ সকল ফযীলত ও নির্দেশনা বিষয়ক আয়াত ও হাদীসকে নিজেদের আবেগ অনুসারে ব্যাখ্যা করে খারিজীগণ জিহাদকে ফরয আইন বলে দাবি করেন। তারা ন্যায়ের আদেশ-অন্যায়ের নিষেধ এবং জিহাদের মধ্যে পার্থক্য করেন না। এমনকি তারা জিহাদকে ইসলামের ষষ্ঠ রুকন বা বড় ফরয বলে গণ্য করেন। তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ, দীন প্রতিষ্ঠা বা জিহাদের নামে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে আইন হাতে তুলে নিয়েছেন বা সশস্ত্র প্রতিরোধ, আক্রমণ, হত্যা ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়েছেন।[৪৯৮]

তাদের বিপরীতে শীয়াগণ "মাসূম (নিষ্পাপ) ইমাম-এর নেতৃত্ব ছাড়া জিহাদ হবে না" বলে দাবি করেন। তাদের বিশ্বাসে দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ আল-মাহদী (২৫৬-২৭৫ হি) ২৭৫ হিজরী সাল থেকে অদৃশ্য জগতে লুকিয়ে রয়েছেন। তিনিই ইমাম মাহদী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। তাঁর আবির্ভাবের পরে তাঁর নেতৃত্বে জিহাদ করতে হবে।[৪৯৯]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত জিহাদকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সামষ্টিক ফরয বা ফরয কিফায়া বলে গণ্য করেছেন। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে আদায় করতে পারেন। কিন্তু জিহাদ অবশ্যই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে হবে। খারিজী ও শীয়া মতের সাথে তাদের মৌলিক তিনটি পার্থক্য রয়েছে: (১) জিহাদ ফরয কিফায়া ইবাদত, (২) জিহাদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্ব জরুরী এবং (৩) রাষ্ট্রপ্রধানের মুত্তাকী বা নেককার হওয়া জরুরী নয়। আমরা তৃতীয় বিষয়টি ইতোপূর্বে জেনেছি। এখানে অন্য দুটি বিষয় পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

১০. ৫. ৪. জিহাদ ফরয কিফায়া

আমরা বলেছি যে, খারিজীগণ জিহাদকে ফরয আইন প্রমাণের জন্য জিহাদের ফযীলত ও নির্দেশ বিষয়ক সাধারণ আয়াত ও হাদীস পেশ করেন। উপরে কয়েকটি হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর এবং (যুদ্ধে) বেরিয়ে যাও দলে দলে অথবা বেরিয়ে যাও একত্রে।"[৫০০]

খারিজীগণ বলেন, এ সকল আয়াত ও হাদীসে মুমিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কারো অনুমতি বা নেতৃত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এতে প্রমাণ হয় যে, জিহাদ ফরয আইন, এর জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই।

তাঁরা বলেন: মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের উপর সিয়াম লিপিবদ্ধ করা হলো"[৫০১] এবং তিনিই বলেছেন: " তোমাদের উপর কিতাল (যুদ্ধ) লিপিবদ্ধ করা হলো"[৫০২]। কাজেই সিয়াম যেমন ফরয আইন তেমনি কিতাল বা যুদ্ধও ফরয আইন।

তাঁদের বিভ্রান্তির কারণ কুরআন-হাদীসের কিছু বক্তব্যকে সুন্নাতে নববীর সামগ্রিক আওতা থেকে বের করে অনুধাবনের চেষ্টা। কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান। প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি রয়েছে। তবে কোনো ইবাদতের শর্তাবলি কুরআনে একত্রে বা একস্থানে উল্লেখ করা হয় নি। এছাড়া অধিকাংশ ইবাদতের সকল শর্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক বিধান বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামগ্রিক জীবন ও এ সকল নির্দেশ পালনে তাঁর রীতি-পদ্ধতি থেকেই সেগুলোর শর্ত ও পদ্ধতি বুঝতে হবে। তা না হলে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

"সূর্য ঢলে পড়া থেকে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।"[৫০৩]

এ নির্দেশের উপর নির্ভর করে যদি কেউ সূর্যাস্তের সময় সালাতে রত হন তবে তিনি নিজে যতই দাবি করুন, মূলত তা ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীস শরীফে 'সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাত্রি পর্যন্ত' সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের বৈধ ও অবৈধ সময় চিহ্নিত করেছেন এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত

আদায় অবৈধ করেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে কুরআন কারীমের অর্থ বা ব্যাখ্যা করা আমাদেরকে ইবাদতের নামে পাপের মধ্যে লিপ্ত করে।

জিহাদ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসও অনুরূপ। কোথাও সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও এর স্তর ও বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে:

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ...

মুমিনদের মধ্যে যারা কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও (জিহাদ না করে) ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মুমিনকেই আল্লাহ কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ....।"[৫০৪]

এ আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, জিহাদ ফরয কিফায়া ইবাদত। কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদ পরিত্যাগ করে তবে সে পাপী হবে না। তবে যারা এ ইবাদত পালন করবেন তাঁরাই শুধু এর সাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করবেন।

খারিজীগণ সাধারণভাবে ধার্মিক ও সমাজের পাপাচারে ব্যথিত। তবে দ্রুত সব কিছু ভাল করে ফেলার আবেগ এবং বিরোধী মানুষদেরকে নির্মূল করার আক্রোশ একত্রিত হয়ে তাদেরকে অন্ধ করে ফেলে। তারা দুটি বিষয়ের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন: (১) যে কোনো অজুহাতে মুসলিমকে কাফির বলে প্রমাণ করা এবং (২) যে কোনো অজুহাতে জিহাদের নামে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সশস্ত্র আক্রমণ বৈধ করা। জিহাদ ফরয কিফায়া এবং জিহাদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যদি কোনো ফকীহের বক্তব্য তাদেরকে বলা হয় তবে তারা বলেন: আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর কথা ছাড়া কিছুই মানি না। আবার যখন তাদের মতের বাইরে কুরআন বা হাদীসের বক্তব্য তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন বলেন: অমুক বা তমুক আলিম এগুলোকে মানসূখ বা রহিত বলেছেন! আর এ পদ্ধতিতেই তারা উপরের আয়াতটিকেও মানসূখ বা রহিত বলে দাবি করেন।

কোনো কোনো আলিম মানসূখ শব্দটি ব্যাখ্যা ও সমন্বয় অর্থে ব্যবহার করতেন। যেমন এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সক্ষম ব্যক্তি জিহাদ না করলে কোনো সময়ে ও কোনো অবস্থাতেই কোনো অপরাধ হবে না। কিন্তু সূরা তাওবায় আল্লাহ জানিয়েছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান নির্দেশ দেওয়ার পরে জিহাদ না করা কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[৫০৫] এজন্য কোনো আলিম বলেছেন যে, তাওবার আয়াত দ্বারা মায়িদার আয়াত মানসূখ। অর্থাৎ একটি বিশেষ সময়ে ও বিশেষ অবস্থায় জিহাদ ফরয কিফায়া হওয়ার বিধানটি রহিত হয় এবং জিহাদ পরিত্যাগকারী পাপী হয়। এটি হলো রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশের অবস্থা। এরূপ স্বাভাবিক সমন্বয় ছাড়া কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান কোনো আয়াতকে রহিত বলে দাবি করার অর্থ মানুষের কথায় বা মানুষের মন-মর্জি অনুসারে ওহীকে বাতিল করা।

হাদীস শরীফে বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ ... فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ...

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর ঈমান আনবে, সালাত কায়েম করবে, রামাদানের সিয়াম পালন করবে আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করুক অথবা যে মাটিতে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেখাহেই বসে থাকুক। তখন সাহাবীগণ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি এ বিষয়টি মানুষদেরকে জানিয়ে দেব না? তখন তিনি বলেন: জান্নাতের মধ্যে ১০০টি মর্যাদার স্তর বিদ্যমান যেগুলোকে আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য তৈরি করেছেন... তোমরা যখন চাইবে তখন 'ফিরদাউস'-ই চাইবে...।"[৫০৬]

অর্থাৎ ফরয আইন ইবাদতগুলো পালনের পর মুমিনের উচিত কাফির দেশ থেকে হিজরত করে দারুল ইসলাম বা ইসলামের রাষ্ট্রে এসে রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে জিহাদে শরীক হওয়া। যদি তিনি হিজরত ও জিহাদে অংশ গ্রহণ না করেন তবে পাপী বলে গণ্য হবেন না। বরং ফরয আইন ইবাদতগুলো পালন করার কারণে মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাত প্রদান করবেন। কিন্তু তা হলো সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাত। জিহাদের মাধ্যমে মুমিন উচ্চতর মর্যাদার জান্নাত লাভ করেন। মুমিনের উচিত জিহাদের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ জান্নাতের বাসনা হৃদয়ে লালন করা ও আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করা।

এ অর্থে এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন:

إِنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ (يا رسول الله)؟ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ (وفي رواية: يُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ) وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

"একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বলেন: যে মুমিন নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। লোকটি বলে, এরপর সর্বোত্তম কে? তিনি বলেন: যে মুমিন মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বিজন উপত্যাকায় থেকে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: এভাবে নির্জনে একাকী সে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, মৃত্যু আগমন পর্যন্ত তার প্রতিপালকের ইবাদত করে) এবং মানুষের কোনো ক্ষতি করে না।"[৫০৭]

এভাবে জিহাদকারী সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ করলেন। এর বিপরীতে সমাজ ও জিহাদ পরিত্যাগ করে বিজনে নির্জনে একাকী বসবাস করে দীনের আরকান ও আহকাম পালনের কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি মর্যাদায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। তিনি জিহাদের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হলেন, তবে পাপী বলে গণ্য হলেন না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। তাদের প্রতিটি দল থেকে একাংশ বের হয় না কেন? যাতে তারা দীনের জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যেন তারা সতর্ক হয়।"[৫০৮]

এখানে আল্লাহ সকলকে অভিযানে না বেরিয়ে প্রত্যেক দল থেকে কিছু মানুষকে এ ইবাদত পালনের নির্দেশ দিলেন। ফরয আইন ইবাদতের ক্ষেত্রে এরূপ সুযোগ নেই। আমরা বলতে পারি না যে, মুমিনগণ সকলেই সালাত বা সিয়াম পালন করবে না, বরং কেউ তা পালন করবে এবং অন্যরা অন্য দায়িত্ব পালন করবে।

ফরয আইন ইবাদত পালনের জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। উপরন্তু কেউ নিষেধ করলে বা বাধা দিলেও মুমিনের দায়িত্ব সকল বাধা উপেক্ষা করে তা পালন করা। পক্ষান্তরে ফরয কিফায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণের অবকাশ আছে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতামাতার অনুমতি বা খিদমতের দায়িত্বের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا)

"একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি বলেন: তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? সে বলে: হ্যাঁ। তিনি বলেন: তোমার পিতামাতাকে নিয়ে তুমি জিহাদ কর। (অন্য বর্ণনায়: তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং সুন্দরভাবে তাঁদের খেদমত ও সাহচর্যে জীবন কাটাও।"[৫০৯]

অন্য হাদীসে আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন:

أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ: أَبَوَاىَ. قَالَ: أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا.

"একব্যক্তি ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট হিজরত করে আসে। তিনি তাকে বলেন: ইয়ামানে তোমার কেউ কি আছেন? লোকটি বলে: আমার পিতামাতা আছেন। তিনি বলেন: তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? লোকটি বলে: না। তিনি বলেন: তুমি তাদের কাছে ফিরে যেয়ে অনুমতি চাও। যদি তারা অনুমতি দেন তবে জিহাদ করবে। তা নাহলে তুমি তাদের খিদমত করবে।"[৫১০]

এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, জিহাদ ফরয কিফায়া। ফরয আইন হলে এরূপ বলা যায় না। আমরা বলতে পারি না যে,

পিতামাতা অনুমতি না দিলে সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি 'ফরয আইন' ইবাদত না করে তাদের খিদমত করতে হবে।

এজন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ফকীহগণ একমত যে, জিহাদ ফরয কিফায়া বা সামষ্টিক ফরয, কিছু মুসলিম তা পালন করলে অন্যদের ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে যারা পালন করবেন তারাই শুধু সাওয়াব লাভ করবেন, অন্যরা গোনাহ থেকে মুক্ত হবেন। তবে শত্রুবাহিনী যদি দেশ দখল করে নেয় অথবা রাষ্ট্রপ্রধান সকল নাগরিককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন তবে এ অবস্থায় জিহাদ ফরয আইনে পরিণত হয়। আল্লামা কুরতুবী বলেন:

الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين

"যে বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকলের উপর জিহাদ ফরয কিফায়া। যখন কিছু মানুষ তা পালন করবে তখন অন্য সকলের দায়িত্ব অপসারিত হবে। তবে যখন শত্রুগণ ইসলামী রাষ্ট্রে অবতরণ করে (দখল করে নেয়) তখন তা ফরয আইন হয়ে যায়।"[৫১১]

১০. ৫. ৫. জিহাদ পালনের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান পূর্বশর্ত

আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী বলেছেন: **"মুসলিম শাসকের অধীনে- সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক- হজ্জ্ব এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটিকে বাতিল বা ব্যাহত করতে পারে না।"** এ থেকে আমরা দেখছি যে, জিহাদ পালনের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের বিদ্যমানতা, অনুমোদন ও নেতৃত্ব পূর্বশত। এটি খারিজীগণের সাথে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌলিক পার্থক্য। জিহাদকে ফরয আইন গণ্য করার কারণে খারিজীগণ বলেন যে, এর জন্য নির্দিষ্ট কারো অনুমতি বা নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই। কয়েকজন মানুষ একত্রে কাউকে নেতা বানিয়ে জিহাদ করতে পারেন। এখানেও তারা কুরআন-হাদীসের সাধারণ বক্তব্য, উৎসাহ ও নির্দেশকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। আহলূস সুন্নাত যে সকল দলীল পেশ করেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ

"রাষ্টপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"[৫১২]

আমরা দেখেছি যে, হাদীস, ফিকহ ও আকীদার পরিভাষায় 'ইমাম' শব্দটি শুধু রাষ্ট্রপ্রধান অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এভাবে আমরা এ হাদীস থেকে কিতাল বা জিহাদের জন্য তিনটি শর্তের কথা জানতে পারছি: (১) রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা, (২) রাষ্ট্রপ্রধানের বিদ্যমানতা এবং (৩) রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্ব। কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশনা বিষয়টি নিশ্চিত করে। এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক) মুসলিমগণ যতদিন অমুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের অংশ হিসেবে বসবাস করেছেন ততদিন আল্লাহ জিহাদের অনুমতি দেন নি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যখন মুসলিমগণ পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তায় পরিণত হন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[৫১৩]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে মুসলিমগণ কোনো যুদ্ধ পরিচালনা করেন নি।

(গ) যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির গুরুত্ব জানা যায় আবূ বাসীর (রা)-এর ঘটনা থেকে। হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি চুক্তি ছিল মক্কা থেকে পলাতক মুসলিমদেরকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে হুদাইবিয়ার ময়দানেই আবূ জানদাল (রা) নামক একজন নির্যাতিত মুসলিম শৃঙ্খলিত অবস্থায় মক্কা থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্ত মোতাবেক তাঁকে মক্কাবাসীদের হাতে সমর্পন করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ এ বিষয়ে খুবই আবেগী হয়ে উঠেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এরপর আরেক নির্যাতিত মুসলিম আবূ বাসীর (রা) মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেও ফিরিয়ে দেন। এক পর্যায়ে আবূ বাসীর (রা), আবূ জানদাল (রা) ও আরো অনেক নির্যাতিত মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে সিরিয়ার পথে 'ঈস' নামক স্থানে সমবেত হন। মদীনা রাষ্ট্রের সাথে মক্কাবাসীদের সন্ধি থাকলেও এ নতুন জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সন্ধি ছিল না; বরং তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় তাঁরা সিরিয়াগামী কুরাইশ কাফিলাগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। মক্কাবাসীরা বুঝতে পারে যে, এদেরকে মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিক মেনে সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাই তাদের

জন্য নিরাপদ। তাদেরই অনুরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধিচুক্তির সংশ্লিষ্ট শর্তটি বাতিল করে তাঁদেরকে মদীনায় বসবাসের ব্যবস্থা করেন।[৫১৪]

এভাবে মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ বাসীর ও তাঁর সাথীদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেন নি। এজন্য তাঁরা মদীনা রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হন। এ থেকে আমরা দেখি যে, কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারীর জন্য সন্ধি, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্ত মান্য করা ফরয।

(২) কুরআন ও হাদীসে বারংবার 'উলুল আমর' বা শাসকদের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৫১৫] আর জিহাদ আনুগত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে আনুগত্যহীনতা মুসলিম জনপদকে গৃহযুদ্ধ বা পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত করতে পারে। যদি রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও আনুগত্যের বাইরে জিহাদ করার সুযোগ থাকে তবে নাগরিকগণ একে অপরের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবেন। কখনো একে অপরকে কাফির বলে, কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে পরস্পরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এজন্য প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন:

لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض

"রাষ্ট্রপ্রধানকে ঢাল বলা হয়েছে তার কারণ তিনি মুসলিমদেরকে শত্রুর ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন এবং মুসলিমদেরকে পারস্পরিক ক্ষতি থেকেও রক্ষা করেন।"[৫১৬]

(৩) জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু প্রাণহানি নয়, বরং জিহাদের উদ্দেশ্য যথাসাধ্য কম প্রাণহানির মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিজয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। শত্রুর শক্তি ও দুর্বলতা বিষয়ক তথ্যাদি রাষ্ট্র প্রধান যেভাবে সংগ্রহ করতে পারেন অন্য কেউ তা পারে না। ফলে তার তত্ত্বাবধানে জিহাদ কাঙ্ক্ষিত বিজয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। এজন্য প্রসিদ্ধ মালিকী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবী (৫৪৩ হি) বলেন:

أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ النَّاسَ بِالْجِهَادِ سَرَايَا مُتَفَرِّقَةً أَوْ مُجْتَمَعِينَ عَلَى الْأَمِيرِ، فَإِنْ خَرَجَتْ السَّرَايَا فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ؛ لِيَكُونَ مُتَحَسِّسًا إلَيْهِمْ وَعَضُدًا مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَرُبَّمَا احْتَاجُوا إلَى دَرْئِهِ .

"(হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা গ্রহণ কর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে যাও অথবা একযোগে বেরিয়ে যাও[৫১৭] আয়াতে) মহান আল্লাহ মানুষদেরকে বিভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে অথবা আমীরের (শাসকের) নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে জিহাদে গমন করলে আমীরের (শাসকের) অনুমতি ছাড়া বের হবে না। কারণ শাসক মুজাহিদদের খোঁজখবর রাখবেন এবং তাদেরকে পিছন থেকে সহায়তা করবেন। মুজাহিদগণ অনেক সময় শাসকের প্রতিরক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন।"[৫১৮]

ইমাম কুরতুবী (৬৭১ হি) একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন:

ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم، عضدا من ورائهم، وربما احتاجوا إلى درئه.

"রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনো বাহিনী যুদ্ধে বের হবে না। কারণ শাসক মুজাহিদদের খোঁজখবর রাখবেন এবং তাদেরকে পিছন থেকে সহায়তা করবেন। মুজাহিদগণ অনেক সময় শাসকের প্রতিরক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন।"[৫১৯]

প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ইবন কুদামা আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ (৬২০ হি) বলেন:

وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك

"জিহাদের বিষয়টি ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে অর্পিত এবং তার ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে তার আনুগত্য করা জনগণের জন্য জরুরী।"[৫২০]

ইবন কুদামা আকীদা বিষয়ক "লুমআতুল ই'তিকাদ' নামক গ্রন্থে বলেন:

ونرى الحج والجهاد ماضياً مع طاعة كل إمام براً كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة

"হজ্জ ও জিহাদ চালু থাকবে প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের সাথে; রাষ্ট্রপ্রধান নেককার হোক আর পাপাচারী হোক। তাদের পিছনে জুমুআর সালাত বৈধ।"[৫২১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, জিহাদের ঘোষণা, শুরু ও পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের। কোনো মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রয়োজনের সময় জিহাদ বর্জন করেন তবে তিনি এ পাপের দায়ভার বহন করবেন। নাগরিকদের দায়িত্ব সরকারকে তার দায়িত্ব পালনের দাওয়াত দেওয়া, দায়িত্বহীনতার প্রতিবাদ করা। কিন্তু কোনো অবস্থায় নাগরিকগণ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে জিহাদ ঘোষণা বা পরিচালনা করতে পারেন না।

ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক জিহাদ ঘোষণা ও শুরু করার পরে যুদ্ধরত শত্রু রাষ্টের উপর আক্রমণ করার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ফকীহ ইমামের অনুমতি শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে কোনো রাষ্ট্র বা জনপদে শত্রুসৈন্য প্রবেশ করলে বা তা দখল করলে দেশকে দখলদার মুক্ত করতে নারী-পুরুষ প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জিহাদ করা ফরয হয়ে যায়। এরূপ যুদ্ধকে জিহাদুদ দিফা (**جهاد الدفاع**) বা 'প্রতিরক্ষার জিহাদ' বলা হয়। এক্ষেত্রে নাগরিকগণ রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধ করবেন। এ সময়ে পিতামাতা বা স্বামীর অনুমতি গ্রহণেরও আবশ্যকতা থাকে না। এ প্রসঙ্গে ইবন কুদামা আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ হাম্বালী (৬২০ হি) রচিত "আল-মুকনি' গ্রন্থের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় সমকালীন প্রসিদ্ধ সৌদী ফকীহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ উসাইমীন বলেন:

لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلاّ على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلَبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً.

"রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত কোনো বাহিনীর জন্য জিহাদ বৈধ নয়, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন। কারণ কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান জিহাদ-কিতাল বিষয়ক নির্দেশগুলোর দায়ভার রাষ্ট্রপ্রধানদের উপরেই, সাধারণ মানুষেরা এ আদেশগুলো দ্বারা সম্বোধিত নয়। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের অনুসরণ করবেন। কাজেই রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য জিহাদ বা আক্রমণ বৈধ নয়। তবে প্রতিরক্ষার যুদ্ধ হলে ভিন্ন কথা। যদি শত্রুগণ কোনো জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করে এবং তারা ভয় পায় যে, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করলে শত্রু তাদের ক্ষতি করবে তবে এক্ষেত্রে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা নিশ্চিত হয়ে যায়।"[৫২২]

১০. ৫. ৬. কিতাল বনাম কতল

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জিহাদ সাময়িক আবেগ এবং কিছু ভাল ও খারাপ মানুষের রক্তপাত ছাড়া কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। তারপরও আবেগী মানুষেরা ভাবেন, যে কোনোভাবে কিছু খারাপ মানুষ মেরে ফেললে বোধহয় দুনিয়া ভাল হয়ে যাবে। তারা দেখেন যে, রাষ্ট্র তাদের আবেগ অনুসারে জিহাদের অনুমতি দিচ্ছে না। অথবা রাষ্ট্র নিজেই ভাল মানুষদের দমনে লিপ্ত। এক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব আল্লাহর নির্দেশমত সহনশীলতা ও মন্দের মুকাবিলায় ভাল দিয়ে দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া এবং এভাবে জিহাদ করার মত একটি রাষ্ট্র অর্জন করা। আবেগী মানুষের এত ধৈর্য থাকে না। আল্লাহর নির্দেশমত ইবাদত পালনের চেয়ে নিজের মর্জিমত ফলাফল অর্জনে তার আগ্রহ বেশি। তিনি মনে করেন, এভাবে মানুষদেরকে আল্লাহর পথে এনে পছন্দমত সমাজ ও রাষ্ট্র অর্জন একটি অসম্ভব ব্যাপার। এজন্য তিনি বিভিন্ন অজুহাতে অনুমোদবিহীন জিহাদ বৈধ করতে চেষ্টা করেন। এরূপ একটি অজুহাত কতল বা হত্যার বিধান।

ইসলামে হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হত্যাকারীকে শাস্তি দেন নি। কয়েকজন সাহাবী বর্ণিত মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, কারো জীবন, সম্পদ, পরিবার বা সম্ভ্রম আক্রান্ত হলে সে তা রক্ষার জন্য লড়তে পারবে। এজন্য তাৎক্ষণিক কারো অনুমতির প্রয়োজন তো নেইই, উপরন্তু এক্ষেত্রে সে নিহত হলে শহীদ বলে গণ্য হবে এবং আক্রমণকারী ডাকাত, লুটেরা বা সন্ত্রাসী নিহত হলে বিচারে হত্যাকারী শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এ অর্থের এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন: "একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বলে: হে আল্লাহর রাসূল, যদি কেউ আমার কাছে এসে আমার সম্পদ কেড়ে নিতে চায় তবে আপনার মত কী? তিনি বলেন: তুমি তাকে তোমার সম্পদ দিবে না। লোকটি বলে: যদি সে আমার সাথে লড়াই করে? তিনি বলেন: তাহলে তুমিও তার সাথে লড়বে। লোকটি বলে: যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি বলেন: তাহলে তুমি শহীদ হবে। লোকটি বলে: আর আমি যদি তাকে হত্যা করি? তিনি বলেন: সেক্ষেত্রে সে জাহান্নামী হবে।"[৫২৩]

এ অর্থের হাদীসগুলোর ভিত্তিতে ফকীহগণ নিশ্চিত করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে নিহত ডাকাত বা সন্ত্রাসীর রক্ত 'বাতিল'; অর্থাৎ হত্যাকারী শাস্তি পাবে না।

অন্য একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন: "এক অন্ধ ব্যক্তির একটি দাসী স্ত্রী ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে গালিগালাজ করত। লোকটি তাকে নিষেধ করত, কিন্তু মহিলা কিছুতেই নিবৃত হতো না। লোকটি তাকে ভয় দেখাত কিন্তু তাতে সে

ভীত হতো না। এক রাতে মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে গালিগালাজ ও ঘৃণ্য কথা বলতে শুরু করে। তখন অন্ধ লোকটি একটি ছুরি নিয়ে মহিলার পেটের উপর রাখে ও নিজের দেহ দিয়ে চেপে ধরে। এভাবে সে মহিলাকে হত্যা করে।... সকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে খুনের ঘটনা বলা হলে তিনি মানুষদেরকে সমবেত করে বলেন: আমি আল্লাহর নামে দাবি করছি, যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে তার উপর যদি আমার কোনো অধিকার থেকে থাকে তবে সে যেন উঠে দাঁড়ায়। তখন উক্ত অন্ধ ব্যক্তি উঠে মানুষের ভিতর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগিয়ে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে বসে। সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমিই তার হত্যাকারী। সে আপনাকে গালি দিত ও আপনার বিষয়ে ঘৃণ্য মন্তব্য করত। আমি তাকে নিষেধ করলেও নিবৃত হতো না এবং ধমক দিলেও ভয় পেত না। সে আমার জন্য মুক্তোর মত দুটি সন্তান জন্ম দিয়েছে। সে আমার সাথে সদয় ও প্রেমময় আচরণ করত। গতরাতে সে যখন আপনাকে গালি দিতে ও নোংরা কথা বলতে শুরু করে তখন আমি ছুরি নিয়ে তার পেটের উপর রাখি এবং নিজের দেহ দিয়ে চেপে ধরি। এভাবে আমি তাকে হত্যা করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ.

"তোমরা সাক্ষী থাক যে, এ মহিলার রক্ত বাতিল।"[৫২৪]

খারিজীগণ এ সকল হাদীস দিয়ে দাবি করেন যে, অন্ধ ব্যক্তি বা আক্রান্ত ব্যক্তি তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুমতি ছাড়াই কাফির বা পাপীকে হত্যা করল এবং কোনো শাস্তি পেল না। এতে প্রমাণ হলো যে, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়াও জিহাদ করা যায়!!

আবেগের অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হলে তারা বুঝতেন যে, কতল বা হত্যার হাদীসের সাথে কিতাল বা জিহাদের বিধানের সামান্যতম সম্পর্ক নেই। এ হাদীসগুলো আরো প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় বিচার ও অনুমোদনের বাইরে কেউ কাউকে হত্যা করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে। তবে যদি বিচারের কাঠগড়ায় প্রমাণ হয় যে, সে আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করেছে, অথবা নিহত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে গালিগালাজ করছিল এবং তাকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত হয় নি তবে সেক্ষেত্রে ইসলামী আইনে নিহত ব্যক্তির রক্ত বাতিল এবং হত্যাকারীর শাস্তি রহিত হবে।

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের নামে দল-গোষ্ঠী পরিচালিত জিহাদের ক্ষতির বিষয়ে "আল-ফিকহুল আবসাত"-এ ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য নিম্নরূপ:

قُلْتُ فَمَا تَقُوْلُ فِيمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَتَّبِعُهُ عَلَى ذَلِكَ نَاسٌ فَيَخْرُجُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، هَلْ تَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: وَلِمَ؟ وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى وَرَسُوْلُهُ بِالأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهَذَا فَرِيْضَةٌ وَاجِبَةٌ. فَقَالَ: هُوَ كَذَلِكَ، لَكِنْ مَا يُفْسِدُوْنَ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُوْنَ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَاسْتِحْلاَلِ الْمَحَارِمِ وَانْتِهَابِ الأَمْوَالِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} قُلْتُ فَنُقَاتِلُ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ نَعَمْ تَأْمُرُ وَتَنْهَي فَإِنْ قَبِلَ وَإِلاَّ قَاتَلْتَهُ فَتَكُوْنُ مَعَ الْفِئَةِ الْعَادِلَةِ وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ جَائِرًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (لاَ يَضُرُّكُمْ جَوْرُ مَنْ جَارَ وَلاَ عَدْلُ مَنْ عَدَلَ، لَكُمْ أَجْرُكُمْ وَعَلَيْهِ وِزْرُهُ)... فَقَاتِلْ أَهْلَ الْبَغْيِ بِالْبَغْيِ لاَ بِالْكُفْرِ وَكُنْ مَعَ الْفِئَةِ الْعَادِلَةِ وَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ، وَلاَ تَكُنْ مَعَ أَهْلِ الْبَغْيِ...

"আমি (আবূ মুতী) বললাম, কোনো মানুষ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে থাকেন। তখন কিছু মানুষ তার অনুগামী হয়। তখন তারা জামা'আতের (রাষ্ট্র ও সমাজের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এদের বিষয়ে আপনি কি বলেন? আপনি কি এরূপ কর্মের স্বীকৃতি দেন? ইমাম আবূ হানীফা বলেন: "না"। আমি বললাম, কেন? মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) তো ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এতো একটি জরুরী ফরয। তিনি বলেন: তা ঠিক; তবে তারা এভাবে ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়-ফাসাদ বেশি করে; কারণ তারা রক্তপাত করে, মানুষের ধন-সম্পদ ও সম্ভ্রম নষ্ট করার কঠিন হারামে নিপতিত হয়, ধনসম্পদ লুটপাট করে। মহান আল্লাহ বলেছেন: "মু'মিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করবে; আর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে যারা বিদ্রোহ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে...।" আমি বললাম: তাহলে কি আমি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করব? তিনি বলেন: হ্যাঁ। তুমি আদেশ ও নিষেধ করবে। যদি গ্রহণ করে তবে ভাল। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাহলে তুমি ন্যায়পন্থী দলের (রাষ্ট্র ও সমাজের) সাথে থাকবে, যদিও রাষ্ট্রপ্রধান জালিম হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: জালিমের জুলম ও ন্যায়পরায়ণের ইনসাফ কোনোটিই তোমাদের ক্ষতি করবে না। তোমরা তোমাদের পুরস্কার লাভ করবে এবং তারা তাদের শাস্তি পাবে।... কাজেই তুমি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বিদ্রোহের কারণে, কাফির হওয়ার কারণে নয়। আর ন্যায়পন্থী জনগোষ্ঠী (মূল সমাজ) ও জালিম শাসকের সাথে থাকবে, কিন্তু বিদ্রোহীদের সাথে থাকবে না।"[৫২৫]

এখানে ইমাম আবূ হানীফা রাষ্ট্রপ্রধান জালিম বা পাপী হলেও রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে অনিয়ন্ত্রিত জিহাদের ক্ষতির দিকটি তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি সাহাবীগণের ধারা অনুসরণ করেছেন। সাহাবীগণও

এরূপ অনিয়ন্ত্রিত জিহাদের ক্ষতিকর দিক আলোচনা করেছেন।

৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ মক্কা অবরোধ করে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-এর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাতে থাকেন। তৎকালীন যুবকদের অনেকেই ভাবতে থাকে যে, হাজ্জাজের বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মুসলিম বিশ্ব চিরতরে কাফির-ফাসিক ও জালিমদের পদানত হয়ে যাবে। অনেক যুবকই প্রবল আবেগে আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা)–এর পক্ষে জিহাদে যোগ দিতে থাকেন। এ সময়ে দু ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা)-এর নিকট এসে বলেন:

إِنَّ النَّاسَ ضُيِّعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي، وفي رواية: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللَّهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وفي لفظ: فَقَالا أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ

"মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী, আপনাকে বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে কিসে? তিনি বলেন, "আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন, তাই আমি যুদ্ধে অংশ নিচ্ছি না।" অন্য বর্ণনায় তারা বলেন: "কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ দিয়েছেন?" তখন তিনি বলেন, "ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লাহর হজ্জ।"[৫২৬] অন্য হাদীসে: "তারা বলে, আল্লাহ কি বলেন নি, 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'? তখন তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যেন ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয়।"[৫২৭]

এক খারিজী নেতা ইবন উমার (রা)-কে জিহাদ ছেড়ে হজ্জ-উমরা নিয়ে মেতে থাকার বিষয়ে প্রশ্ন করে। তিনি তাকে আরকানুল ইসলামের কথা বললে সে বলে:

يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ أَلا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) (قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ﷺ وَكَانَ الإِسْلامُ قَلِيلا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ حَتَّى كَثُرَ الإِسْلامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ

"হে আবূ আব্দুর রাহমান, আল্লাহ তাঁর কিতাবে কী বলেছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বলেছেন: 'মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর সীমলঙ্ঘন করলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।' (তিনি আরো বলেছেন): 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'[৫২৮]। তখন ইবনু উমার বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তা করেছিলাম। ইসলাম দুর্বল ও স্বল্প ছিল, ফলে মুসলিম ব্যক্তি তার দীনের কারণে ফিতনাগ্রস্থ হতেন। কাফিররা তাকে হত্যা করত অথবা তার উপর অত্যাচার করত। যখন ইসলাম বিস্তৃত হয়ে গেল তখন তো আর ফিতনা থাকল না।"[৫২৯]

জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রা) কয়েকজন খারিজী মুজাহিদকে ডেকে একত্রিত করে তাদেরকে ঈমানের দাবিদারকে হত্যা করার বিষয়ে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধের মাঠে একজন কাফির সৈনিক মুসলিম বাহিনীর অনেক সৈনিককে হত্যা করে। এক পর্যায়ে উসামা ইবনু যাইদ (রা) উক্ত কাফির সৈনিককে আক্রমণ করেন। তিনি যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। উসামা সে অবস্থাতেই তাকে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উসামাকে বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পরেও তুমি তাকে কেন হত্যা করলে? তিনি বলেন, লোকটি অনেক মুসলিমকে হত্যা করে। আমি যখন তরবারী উঠালাম সে তরবারীর ভয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি তার হৃদয় চিরে দেখে নিলে না কেন, সে ভয়ে বলেছে না স্বেচ্ছায় বলেছে! ... তিনি বারবারই বলতে লাগলেন, কেয়ামতের দিন যখন এ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে?[৫৩০]

সাহাবীগণের এ সকল বক্তব্যের মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(১) আরকানে ইসলাম ও এ জাতীয় ইবাদতই মুমিনের মূল দায়িত্ব। এগুলো 'উদ্দিষ্ট' ইবাদত (ইবাদতে মাকসূদা)। এগুলো পালন করাই মুমিন জীবনের উদ্দেশ্য। এগুলি পালনের গুরুত্ব কখনোই কমে না বা থামে না। পক্ষান্তরে 'জিহাদ' উদ্দিষ্ট ইবাদত (ইবাদতে মাকসূদা) নয়; বরং উদ্দিষ্ট ইবাদত পালনের অধিকার রক্ষার জন্যই জিহাদ। এ অধিকার বিদ্যমান থাকলে জিহাদের আবশ্যকতা থাকে না।

(২) জিহাদ করা আল্লাহর নির্দেশ এবং মানুষ হত্যা করা আল্লাহর নিষেধ। নিষেধের পাল্লাকে ভারী রাখতে হবে এবং হারামে নিপতিত হওয়ার ভয় থাকলে জিহাদ পরিত্যাগ করতে হবে।

(৩) কাফির রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র, নাগরিক ও দীনী দাওয়াতের স্বাধীনতা ও বিজয় সংরক্ষণই মূলত জিহাদ। মুসলিম ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা হত্যা জিহাদ নয়। যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' মুখে স্বীকার করে তাকে জিহাদের নামে হত্যা করা পারলৌকিক ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

(৪) ফিতনা দূরীকরণ জিহাদের উদ্দেশ্য। তবে ফিতনা দূরীকরণ বলতে সমাজের সকল অন্যায়, অনাচার, কুফর, শিরক ইত্যাদি দূর করা নয়, বরং মুমিনকে জোরপূর্বক কুফরে লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি দূরীকরণ বা দীনপালন ও দীনী দাওয়াতের স্বাধীনতা রক্ষা করা। এরূপ পরিস্থিতি ছাড়া জিহাদ মূলত ফিতনা দূর করে না, বরং ফিতনা সৃষ্টি করে। কারণ সকল সমাজেই অন্যায় ও জুলুম থাকে এবং সর্বদা ধর্মহীন ও পাপাচারীর সংখ্যা ও শক্তি ধার্মিক ও সৎ মানুষদের চেয়ে বহুগুণ বেশি হয়। যদি ধার্মিক মানুষেরা শান্তিপূর্ণ ও ধৈর্যপূর্ণ দাওয়াত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ না করে জিহাদ বা সশস্ত্র শাক্তি প্রয়োগ করেন তবে তা বহু মহাপাপ, হত্যা ও ফিতনার দরজা উন্মুক্ত করে। ইমাম মাহদী প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, দ্রুত অন্যায় দূর করে 'আদর্শ সমাজ' প্রতিষ্ঠার আবেগী চেষ্টা রক্তপাত ও বিভ্রান্তি ছাড়া কোনো ফল দেয় নি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:

হেদায়াত, কবর, অনুবাদ, আয়াতসমূহের মর্যাদা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আত্মীয়গণ, মিরাজ, কিয়ামতের আলামত ইত্যাদি

ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইবন সাবিত (রাহিমাহুল্লাহু) বলেন:

وَاللهُ تَعَالَي يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ فَضْلاً مِنْهُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ عَدْلاً مِنْهُ وَإِضْلاَلُهُ خُذْلاَنُهُ وَتَفْسِيْرُ الْخُذْلاَنِ أَنْ لاَ يُوَفِّقَ الْعَبْدَ عَلَي مَا يَرْضَاهُ عَنْهُ وَهُوَ عَدْلٌ مِنْهُ. وَكَذَا عُقُوْبَةُ الْمَخْذُوْلِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَلاَ يَجُوْزُ أَنْ نَقُوْلَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْلُبُ الإِيْمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَهْراً وَجَبْراً. وَلَكِنْ نَقُوْلُ: الْعَبْدُ يَدَعُ الإِيْمَانَ فَإِذَا تَرَكَهُ فَحِيْنَئِذٍ يَسْلُبُهُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ حَقٌّ كَائِنٌ فِيْ الْقَبْرِ، وَإِعَادَةُ الرُّوْحِ إِلَى جَسَدِ الْعَبْدِ فِيْ قَبْرِهِ حَقٌّ، وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ كُلِّهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى عَزَّ اسْمُهُ فَجَائِزٌ الْقَوْلُ بِهِ سِوَى الْيَدِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَيَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ "بُرُوئِ خُدَاي" عَزَّ وَجَلَّ بِلاَ تَشْبِيْهٍ وَلاَ كَيْفِيَّةٍ. وَلَيْسَ قُرْبُ اللهِ تَعَالَى وَلاَ بُعْدُهُ مِنْ طَرِيْقِ طُوْلِ الْمَسَافَةِ وَقِصَرِهَا، وَلَكِنْ (وَلاَ) عَلَى مَعْنَى الْكَرَامَةِ وَالْهَوَانِ، وَالْمُطِيْعُ قَرِيْبٌ مِنْهُ بِلاَ كَيْفٍ، وَالْعَاصِيْ بَعِيْدٌ مِنْهُ بِلاَ كَيْفٍ. وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ وَالإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى الْمُنَاجِيْ وَكَذَالِكَ جِوَارُهُ فِيْ الْجَنَّةِ، وَالْوُقُوْفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلاَ كَيْفِيَّةٍ.

وَالْقُرْآنُ مُنَزَّلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ الْمُصْحَفِ مَكْتُوْبٌ، وَآيَاتُ الْقُرْآنِ فِيْ مَعْنَى الْكَلاَمِ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِيْ الْفَضِيْلَةِ وَالْعَظَمَةِ، إِلاَّ أَنَّ لِبَعْضِهَا فَضِيْلَةَ الذِّكْرِ وَفَضِيْلَةَ الْمَذْكُوْرِ، مِثْلُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ؛ لأَنَّ الْمَذْكُوْرَ فِيْهَا جَلاَلُ اللهِ تَعَالَى وَعَظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ، فَاجْتَمَعَتْ فِيْهَا فَضِيْلَتَانِ: فَضِيْلَةُ الذِّكْرِ وَفَضِيْلَةُ الْمَذْكُوْرِ، وَلِبَعْضِهَا فَضِيْلَةُ الذِّكْرِ فَحَسْبٌ مِثْلُ قِصَّةِ الْكُفَّارِ، وَلَيْسَ لِلْمَذْكُوْرِ فِيْهَا فَضْلٌ وَهُمُ الْكُفَّارُ. وَكَذَالِكَ الأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِيْ الْعَظَمَةِ وَالْفَضْلِ لاَ تَفَاوُتَ بَيْنَهَا.

وَوَالِدَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَي عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ (وَفِيْ نُسْخَةٍ زِيْدَ) وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى الإِيْمَانِ وَأَبُوْ طَالِبٍ عَمُّهُ ﷺ وَأَبُوْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مَاتَ كَافِراً.

وَقَاسِمٌ وَطَاهِرٌ وَإِبْرَاهِيْمُ كَانُوْا بَنِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَفَاطِمَةُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُوْمٍ كُنَّ جَمِيْعاً بَنَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَرَضِيَ عَنْهُنَّ

وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَى الإِنْسَانِ شَيْءٌ مِنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ فِيْ الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ

عِنْدَ اللهِ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَجِدَ عَالِماً فَيَسْأَلُهُ، وَلاَ يَسَعُهُ تَأْخِيْرُ الطَّلَبِ، وَلاَ يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيْهِ، وَيَكْفُرُ إِنْ وَقَفَ.

وَخَبَرُ الْمِعْرَاجِ حَقٌّ. مَنْ رَدَّهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ . وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَائِرُ عَلاَمَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الأَخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ حَقٌّ كَائِنٌ وَاللهُ تَعَالَى يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

বঙ্গানুবাদঃ

আল্লাহ তা'আলা দয়া করে যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন। আর তিনি ন্যায়পরায়ণতা পূর্বক যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন। বিভ্রান্ত করার অর্থ সাহায্য পরিত্যাগ করা। সাহায্য পরিত্যাগের ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ সে বান্দাকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করেন না। বিষয়টি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ। অনুরূপভাবে যে পাপীকে তিনি পাপ ও অবাধ্যতার কারণে পরিত্যাগ করেছেন তার পাপের কারণে শাস্তি প্রদানও তাঁর ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ।

আমাদের জন্য এ কথা বলা বৈধ নয় যে, শয়তান জবরদস্তি করে বা জোর করে মুমিন বান্দার ঈমান কেড়ে নেয়। বরং আমরা বলিঃ বান্দা তার ঈমান পরিত্যাগ করে, তখন শয়তান তা তার থেকে ছিনিয়ে নেয়।

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরের মধ্যে হবে। কবরের মধ্যে বান্দার রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া সত্য। কবরের চাপ এবং কবরের আযাব সত্য, কাফিররা সকলেই এ শাস্তি ভোগ করবে এবং কোনো কোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে।

মহান আল্লাহর- মহিমান্বিত হোক তাঁর নাম- বিশেষণসমূহের বিষয়ে আলিমগণ ফার্সী ভাষায় যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা সবই বলা বৈধ, কেবলমাত্র ফার্সী ভাষায় ইয়াদ বা হাত বলা বাদে। ফার্সীতে 'বরোয়ে খোদা' -আয্যা ও জাল্লা- অর্থাৎ মহান আল্লাহর চেহারার ওসীলায়- এ কথা বলা যাবে, কোনোরূপ তুলনা ছাড়া এবং কোনোরূপ স্বরূপ সন্ধান ও প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়া। আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর দূরত্ব কোনো স্থানের দূরত্ব বা স্থানের নৈকট্য নয়। কিন্তু এর অর্থ সম্মান বা অসম্মান। (মোল্লা আলী কারীর বর্ণনাঃ সম্মান বা অসম্মানের অর্থেও নয়।) অনুগত বান্দা কোনো স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়াই আল্লাহর নিকটবর্তী। অবাধ্য বান্দা কোনো স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়াই আল্লাহ থেকে দূরবর্তী। নৈকট্য, দূরত্ব, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি প্রার্থনাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে জান্নাতে মহান আল্লাহর প্রতিবেশিত্ব বা নৈকট্য এবং মহান আল্লাহর সম্মুখে অবস্থান সবই স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়া।

কুরআন কারীম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ এবং তা মুসহাফের মধ্যে লিপিবদ্ধ। আল্লাহর কালাম হিসেবে সকল আয়াত মর্যাদা ও মহত্ত্বের দিক থেকে সমান। তবে কোনো কোনো আয়াতের দ্বিবিধ মর্যাদা রয়েছেঃ যিক্‌র-এর মর্যাদা এবং যিক্‌র-কৃতের মর্যাদা। যেমন আয়াতুল কুরসী। এর মধ্যে মহান আল্লাহর মহত্ত্ব, মর্যাদা ও বিশেষণ আলোচিত হয়েছে, এজন্য এর মধ্যে দ্বিবিধ মর্যাদা একত্রিত হয়েছেঃ যিক্‌র বা স্মরণের মর্যাদা এবং স্মরণকৃতের মর্যাদা। আর কোনো কোনো আয়াতের কেবল যিক্‌র-এর ফযীলত রয়েছে, যেমন কাফিরদের কাহিনী, এতে যাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কাফিরদের কোনো মর্যাদা নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহর নামসমূহ এবং বিশেষণসমূহ সবই সমমর্যাদার, এগুলোর মধ্যে মর্যাদাগত কোনো তারতম্য নেই।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেন। (কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছেঃ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেন।) তাঁর চাচা এবং আলী (রা)-এর পিতা আবু তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। কাসিম, তাহির ও ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ছিলেন। ফাতিমা, রুকাইয়া, যাইনাব ও উম্মু কুলসূম তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

যদি কোনো মানুষের কাছে 'ইলমুত তাওহীদ'-এর বা আকীদার খুঁটিনাটি বিষয়ের সুক্ষ্ম তথ্য অস্পষ্ট হয়ে পড়ে তবে তার দায়িত্ব এই যে, তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট যা সঠিক তাই আমার বিশ্বাস-এরূপ বিশ্বাস পোষণ করবে। এরপর যথাশীঘ্র সম্ভব কোনো আলিমকে জিজ্ঞাসা করে সঠিক তথ্য জেনে নিবে। সঠিক তথ্য জানার বিষয়ে অনুসন্ধান করতে দেরি করা তার জন্য বৈধ নয়। এরূপ বিষয়ে 'দাঁড়িয়ে থাকা' বা 'বিরত থাকা', অর্থাৎ 'জানিও না এবং জানবও না বলে থেমে থাকা', বা 'কিছুই জানি না কাজেই কিছুই বিশ্বাস করব না' এরূপ কথা বলা তার জন্য কোনো ওযর বলে গৃহীত হবে না। কেউ যদি এরূপ দাঁড়িয়ে থাকে বা বিরত থাকে তবে তা কুফরী বলে গণ্য হবে।

মি'রাজের সংবাদ সত্য। যে তা প্রত্যাখ্যান করে সে বিদ'আতী ও বিভ্রান্ত।

দাজ্জালের বহির্গমন, ইয়াজূজ ও মাজূজের বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে সূর্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং কিয়ামাতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যেভাবে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা ও টীকা

১. হেদায়াত ও গোমরাহি

উপরের বক্তব্যে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) প্রথমে হেদায়াত ও গোমরাহি বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

"আল্লাহ তা'আলা দয়া করে যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন। আর তিনি ন্যায়পরায়ণতা পূর্বক যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন। বিভ্রান্ত করার অর্থ সাহায্য পরিত্যাগ করা। সাহায্য পরিত্যাগের ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ সে বান্দাকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করেন না। বিষয়টি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ। অনুরূপভাবে যে পাপীকে তিনি পাপ ও অবাধ্যতার কারণে পরিত্যাগ করেছেন তার পাপের কারণে শাস্তি প্রদানও তাঁর ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ। আমাদের জন্য এ কথা বলা বৈধ নয় যে, শয়তান জবরদস্তি করে বা জোর করে মুমিন বান্দার ঈমান কেড়ে নেয়। বরং আমরা বলি: বান্দা তার ঈমান পরিত্যাগ করে, তখন শয়তান তা তার থেকে ছিনিয়ে নেয়।"

মহান আল্লাহ কুরআনে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন বা পথভ্রষ্ট করেন। এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে তাকদীর প্রসঙ্গে দেখেছি। এ অর্থে আরো কয়েকটি আয়াত:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার জাতির ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে বর্ণনা দেয়; অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[৫৩১]

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ

"আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে চান তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ-সংকুচিত করে দেন; যেন সে আকাশে-উর্ধ্বে আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ অকল্যাণ দেন তাদের উপর যারা ঈমান আনে না।"[৫৩২]

পাশাপাশি কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈমান আনয়ন বা সত্য গ্রহণ মানুষের নিজের ইচ্ছাধীন কর্ম। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"আর বল, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য; কাজেই যে ইচ্ছা করে সে ঈমান গ্রহণ করুক এবং যে ইচ্ছা করে সে কুফরী করুক।"[৫৩৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا

"নিশ্চয় এ এক উপদেশ; অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ গ্রহণ করুক।"[৫৩৪]

উপরের সকল আয়াতের সমন্বিত অর্থ ইমাম আবু হানীফা এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কথার সারমর্ম হলো, মানুষকে আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করে কি করবে তিনি তা জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে তার ইচ্ছা ও কর্মে বাধা দিতে পারেন বা তার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারেন। তিনি তাঁর কোনো বান্দার ইচ্ছা বা কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অতিরিক্ত তাওফীক কল্যাণের সহায়তা প্রদান করেন। আর এ অর্থেই তিনি বলেছেন: "যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তিনি হেদায়াত করেন।" তার হেদায়াত অর্থ তাঁর তাওফীক, যা তাঁর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত করুণা। পক্ষান্তরে যার ইচ্ছা ও কর্মে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন তাকে এরূপ তাওফীক বা মঙ্গলের সহায়তা প্রদান থেকে তিনি বিরত থাকেন; বরং তাকে তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন। তখন সে স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে বিপথগামী হয়। এ অর্থেই তিনি বলেছেন: "যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে পথভ্রষ্ট করেন।" কাউকে তার ইচ্ছা ও কর্মের কারণে অতিরিক্ত করুণা ও তাওফীক প্রদান থেকে বিরত থাকা ইনসাফের ব্যতিক্রম নয়। এরূপ ব্যক্তির ইচ্ছা ও কর্মের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়াও ইনসাফের ব্যতিক্রম নয়।

২. কবরের অবস্থা

এরপর ইমাম আযম কবর বিষয়ক আকীদার কয়েকটি দিক উল্লেখ করে বলেছেন: **মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরের মধ্যে হবে। কবরের মধ্যে বান্দার রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া সত্য। কবরের চাপ এবং কবরের আযাব সত্য, কাফিররা সকলেই এ শাস্তি ভোগ করবে এবং কোনো কোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে।"**

কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৃত্যুর পরে কিয়ামাতের আগে মধ্যবর্তী সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

"যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহজীবনে এবং পরজীবনে এবং যারা জালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"[৫৩৫]

এ থেকে জানা যায় যে, ইহজীবনের ন্যায় পরজীবনেও শাশ্বত বাণীর উপর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে পরকালীন জীবনের শুরুতে কবরে 'মুনকার-নাকীর' নামক মালাকদ্বয়ের প্রশ্নের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হবে।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

"যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং মালাকগণ হাত বাড়িয়ে বলবে: 'তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে।"[৫৩৬]

এ আয়াত থেকে মৃত্যুকালীন শাস্তি এবং মৃত্যুর পরেই- সেদিনেই- যে শাস্তি প্রদান করা হবে তার বিষয়ে জানা যায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরাউনের গোষ্ঠীকে। সকাল সন্ধ্যায় তাদের উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামাত ঘটবে সেদিন (বলা হবে:) ফিরাউনের গোষ্ঠীকে প্রবেশ করাও কঠিন শাস্তির মধ্যে।"[৫৩৭]

এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কিয়ামাতের পূর্বেও কাফিরগণকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে তাদের উপস্থিত করা হবে।

কিয়ামাত দিবসের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

"যে দিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোনো কাজে লাগবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। আর যালিমগণের জন্য রয়েছে এর পূর্বের বা নিম্নের শাস্তি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"[৫৩৮]

এ আয়াতও কিয়ামাতের পূর্বের শাস্তির কথা প্রমাণ করে। পাশাপাশি অসংখ্য হাদীসে মৃত্যুর সময়ের, মৃত্যুর পরের এ সকল শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদির বিষয়ে জানানো হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পরে তার 'রূহ' তাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তাকে 'মুনকার ও নাকীর' নামক ফিরিশতাগণ প্রশ্ন করবেন তার প্রতিপালক, তার দীন ও তার নবী সম্পর্কে। মুমিন ব্যক্তি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। মুনাফিক বা কাফির এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হবে। পাপী ও অবিশ্বাসীদেরকে কবরে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ভোগ করতে হবে, তন্মধ্যে রয়েছে 'কবরের চাপ'। কবরের মাটি চারিদিক থেকে কবরস্থ ব্যক্তিকে চাপ দেওয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে নেককার মুমিনগণ কবরে অবস্থানকালে শান্তি ও নিয়ামত ভোগ করবেন।

সাধারণভাবে এ অবস্থাকে 'কবরের' অবস্থা বলা হয়। তবে 'কবর' বলতে মৃত্যু ও কিয়ামাতের মধ্যবর্তী অবস্থাকেই বুঝানো হয়। কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে কবরস্থ না হলেও সে এ সকল শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে। কুরআনে বলা হয়েছে:

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

"যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর; যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করি নি। না, এ হওয়ার নয়। এ তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সম্মুখে 'বারযাখ' (প্রতিবন্ধক বা পৃথকীকরণ সময়কাল) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"[৫৩৯]

ইমাম আবূ হানীফা এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস সংক্ষেপে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন।

কবর আযাব প্রসঙ্গে তিনি 'আল-ফিকহুল আবসাত'-এ বলেন:

من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة لأنه أنكر قوله تعالى: "سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ"، "ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ"، يعني عذاب القبر وقوله تعالى: "وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ"، يعني في القبر

"যদি কেউ বলে: আমি কবরের আযাব জানি না তবে সে ধ্বংসগ্রস্ত জাহমীদের দলভুক্ত। কারণ, সে কুরআনের বক্তব্য অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ বলেন: "অচীরেই আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করব দু'বার" "এরপর তাদেরকে কঠিন আযাবের দিকে নেওয়া হবে"- অর্থাৎ কবরের আযাব। আল্লাহ আরো বলেছেন: "আর যালিমগণের জন্য রয়েছে এর পূর্বের শাস্তি..."[৫৪০], অর্থাৎ কবরের শাস্তি।"[৫৪১]

৩. আল্লাহর বিশেষণের অনুবাদ

এরপর ইমাম আযম বলেছেন: **"মহান আল্লাহর- মহিমান্বিত হোক তাঁর নাম- বিশেষণসমূহের বিষয়ে আলিমগণ ফার্সী ভাষায় যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা সবই বলা বৈধ, কেবলমাত্র ফার্সী ভাষায় ইয়াদ বা হাত বলা বাদে। ফার্সীতে 'বরোয়ে খোদা' -আয্যা ও জাল্লা- অর্থাৎ মহান আল্লাহর চেহারার ওসীলায়- এ কথা বলা যাবে, কোনোরূপ তুলনা ছাড়া এবং কোনোরূপ স্বরূপ সন্ধান ও প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়া।"**

আমরা জেনেছি যে, আল্লাহর বিশেষণসমূহ তুলনা ও স্বরূপ ব্যতিরেকে বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি। এখানে ইমাম আবূ হানীফা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় এ সকল বিশেষণের অনুবাদ করার মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। অন্য ভাষায় আরবী বিশেষণটির যে আভিধানিক প্রতিশব্দ রয়েছে তা ব্যবহার করা হবে এবং তুলনা ও স্বরূপ সন্ধান ছাড়া তা বিশ্বাস করতে হবে। যেমন ওয়াজহুল্লাহ (**وجه الله**) অর্থ 'রোয়ে খোদা': 'আল্লাহর চেহারা' বা 'মুখমণ্ডল' বলা হবে। মুমিন প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, 'চেহারা' বা 'মুখমণ্ডল' মহান আল্লাহর একটি বিশেষণ, এর স্বরূপ আমরা জানি না এবং তা কোনো সৃষ্টির কোনো বিশেষণের সাথে তুলনীয় নয়। অন্যান্য সকল বিশেষণই এরূপ। যেমন আইন অর্থ চক্ষু, কাদাম অর্থ পদ, গাযাব অর্থ ক্রোধ, রিদা অর্থ সন্তুষ্টি, ইসতিওয়া অর্থ অধিষ্ঠান, নুযূল অর্থ অবতরণ ইত্যাদি। তবে ইয়াদ বা হাত শব্দটির ফার্সী প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে ইমাম আযম আপত্তি করেছেন। মোল্লা আলী কারী বলেন: এ নিষেধের কারণ স্পষ্ট নয়। তবে সালফ সালিহীন সকলেই একমত যে, ইয়াদ (হস্ত) বিশেষণটি ব্যাখ্যাবিহীনভাবে গ্রহণ করতে হবে।[৫৪২]

৪. আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্ব

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এরপর বলেছেন: **"আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর দূরত্ব কোনো স্থানের দূরত্ব বা স্থানের নৈকট্য নয়। সম্মান বা অসম্মানের অর্থেও নয়। অনুগত বান্দা কোনো স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়াই আল্লাহর নিকটবর্তী। অবাধ্য বান্দা কোনো স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়াই আল্লাহ থেকে দূরবর্তী। নৈকট্য, দূরত্ব, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি প্রার্থনাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে জান্নাতে মহান আল্লাহর প্রতিবেশিত্ব বা নৈকট্য এবং মহান আল্লাহর সম্মুখে অবস্থান সবই স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়া।"**

মহান আল্লাহ বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বান্দার নিকটবর্তী, তিনি তার গলার ধমনী হতেও বেশি নিকটবর্তী, তিনি তার সাথে, তিনি নেককার বান্দাগণের নিকটবর্তী বা সাথে... ইত্যাদি। এগুলি সবই আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ। জাহমী ও মুতাযিলীগণ কখনো এ সকল বিশেষণের নানারূপ ব্যাখ্যা করেছে। কখনো এগুলির ভিত্তিতে মহান আল্লাহর আরশের উপর অধিষ্টিত হওয়ার বিশেষণ অস্বীকার করেছে। তাদের ধারণায় আল্লাহর নৈকট্য ও আরশের উপর অধিষ্ঠিত থাকার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। আসল বৈপরীত্য তাদের ধারণা ও চেতনায়; তারা মহান আল্লাহকে সৃষ্টির মত চিন্তা করে কল্পনা করেছে যে, তিনি একই সময়ে আরশে সমাসীন ও বান্দার নিকট হতে পারেন না। তারা ভাবতে পারে নি বা চায় নি যে, তিনি এরূপ মানবীয় সীমবদ্ধতার অনেক উর্ধ্বে। ইমাম আযম উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বিশেষণকেও একইভাবে কোনোরূপ তুলনা এবং স্বরূপসন্ধান ছাড়াই সরল অর্থে বিশ্বাস করতে হবে।

৫. কুরআনের আয়াতসমূহের মর্যাদার পার্থক্য

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এরপর কুরআনের আয়াতসমূহের মর্যাদার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন: **"কুরআন কারীম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ এবং তা মুসহাফের মধ্যে লিপিবদ্ধ। আল্লাহর কালাম হিসেবে সকল আয়াত মর্যাদা ও মহত্ত্বের দিক থেকে সমান। তবে কোনো কোনো আয়াতের দ্বিবিধ মর্যাদা রয়েছে: যিক্র-এর মর্যাদা এবং যিক্র-কৃতের মর্যাদা। যেমন আয়াতুল কুরসী। এর মধ্যে মহান আল্লাহর মহত্ত্ব, মর্যাদা ও বিশেষণ আলোচিত হয়েছে, এজন্য এর মধ্যে দ্বিবিধ মর্যাদা একত্রিত হয়েছে: যিক্র বা স্মরণের মর্যাদা এবং স্মরণকৃতের মর্যাদা। আর কোনো কোনো আয়াতের কেবল যিক্র-এর ফযীলত রয়েছে, যেমন কাফিরদের কাহিনী, এতে যাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কাফিরদের কোনো মর্যাদা নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহর নামসমূহ এবং বিশেষণসমূহ সবই সমমর্যাদার, এগুলির মধ্যে মর্যাদাগত কোনো তারতম্য নেই।"**

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের কিছু ফযীলত বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে অনেক

তথাকথিত "ধার্মিক" মানুষ অনেক জাল ও মিথ্যা কথাও ফযীলতের নামে প্রচার করেছেন।[৫৪৩] এ সকল বর্ণনা ফযীলত বিষয়ে এক প্রকারের বাড়াবাড়ির জন্ম দেয়। ফযীলতের আয়াত ও সূরাগুলোর বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপের কারণে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন ও অনুধাবনের সুন্নাহ নির্দেশিত ইবাদতে অবহেলা ও ত্রুটি হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এ বিষয়ক মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর কালাম হিসেবে সকল আয়াতের মর্যাদা সমান। কুরআনের মর্যাদা ও ফযীলতের মূল বিষয় এটিই। কাজেই মুমিনকে এ দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাশাপাশি কিছু আয়াতের অর্থগত বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সহীহ হাদীসে প্রমাণিত বিশেষ ফযীলতগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এরূপ অর্থগত মর্যাদার কথা তাতে বলা হয়েছে। আর এরূপ অর্থগত ফযীলত লাভ করতে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং পঠিত আয়াতে মহান আল্লাহর যে মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অনুভব করা প্রয়োজন। কাজেই এ বিষয়ে সহীহ সুন্নাতের নির্দেশনার মধ্যে অবস্থান জরুরী।

৬. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিজনবর্গ

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আত্মীয়-স্বজন বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা কুফুরের উপর মৃত্যুবরণ করেন। (কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেন।) তাঁর চাচা এবং আলী (রা)-এর পিতা আবু তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। কাসিম, তাহির ও ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ছিলেন। ফাতিমা, রুকাইয়া, যাইনাব ও উম্মু কুলসূম তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।"

আমরা ইমাম আযমের এ কথাগুলো পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৬. ১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা

৬. ১. ১. কী বলেছিলেন ইমাম আবূ হানীফা?

এ পরিচ্ছেদে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা, চাচা ও সন্তানদের বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে তিনটি বাক্য বিদ্যমান। তিনটি বাক্যই মৃত্যু প্রসঙ্গে। প্রথম বাক্যে তাঁর পিতামাতার মৃত্যু, দ্বিতীয় বাক্যে তাঁর মৃত্যু ও তৃতীয় বাক্যে তাঁর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বাক্যটি সকল পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যটি "আল-ফিকহুল আকবারের" কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে অবিদ্যমান।

"আল-ফিকহুল আকবার" গ্রন্থের প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যা দশম-একাদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি/১৬০৬ খৃ) প্রণীত "শারহুল ফিকহিল আকবার"। এ গ্রন্থের কোনো পাণ্ডুলিপিতে বাক্যদুটি বিদ্যমান এবং কোনো কোনোটিতে শুধু তৃতীয় বাক্যটি বিদ্যমান। থানবী প্রকাশনী, দেওবন্দ, ভারত থেকে প্রকাশিত 'শারহুল ফিকহিল আকবার' এ বাক্যগুলো এভাবেই বিদ্যমান। শাইখ মারওয়ান মুহাম্মাদ আশ-শা'আর (الشيخ مروان محمد الشعار)-এর সম্পাদনায় লেবাননের দারুন নাফাইস কর্তৃক প্রকাশিত "শারহুল ফিকহিল আকবার" গ্রন্থেও বাক্যগুলো বিদ্যমান। কিন্তু দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত, লেবানন প্রকাশিত 'শারহু ফিকহিল আকবার' পুস্তকে (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন) বাক্যটি নেই। অনুরূপভাবে কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি, পাকিস্তান হতে প্রকাশিত মোল্লা আলী ক্বারীর শারহুল ফিকহিল আকবারেও বাক্যটি নেই।

আল-ফিকহুল আকবারের পাণ্ডুলিপিগুলো প্রসিদ্ধ হানাফী আলিমগণ সংরক্ষণ ও অনুলিপি করেছেন। এখানে দুটি সম্ভাবনা বিদ্যমান: (ক) ইমাম আযম বাক্যগুলো লিখেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোনো কোনো লিপিকার হানাফী আলিম বাক্যগুলো অশোভনীয় হওয়ায় তা ফেলে দিয়েছেন। (খ) বাক্যগুলো তিনি লিখেন নি, পরবর্তী যুগের কোনো লিপিকার হানাফী আলিম অতিরিক্ত বাক্যগুলো সংযোজন করেছেন।

প্রথম সম্ভাবনাই স্বাভাবিক। পরবর্তী যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামাতার বিষয়ে এ বাক্য সংযোজন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা হানাফী আলিমদের ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এ বাক্যদুটোকে পরবর্তী যুগের অনেক হানাফী আলিমই অশোভনীয় বলে গণ্য করেছেন। কাজেই অপ্রাসঙ্গিক বা অশোভনীয় হিসেবে তা ফেলে দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমরা দেখব যে, মোল্লা আলী কারীর ব্যাখ্যার মধ্যে এ বিষয়ক আলোচনা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থের সাথে মুদ্রিত 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর কোনো কোনো মুদ্রণে এ বাক্যটি নেই। অর্থাৎ মুদ্রণ বা অনুলিপির সময় ইমাম আযমের বক্তব্য থেকে কথাটি ফেলে দেওয়া হয়েছে, যদিও ব্যাখ্যার মধ্যে তা বিদ্যমান। আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখব যে, ইসলামের প্রথম তিন-চার শতাব্দীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ যা বলেছেন পরবর্তী আলিমগণ সেগুলো সেভাবে বলা অশোভনীয় বলেই মনে করেছেন।

কোনো কোনো আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, হয়ত বক্তব্যটি নিম্নরূপ ছিল (**والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ماتا على الكفر**) "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামাতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেন নি"। পাণ্ডুলিপিকারের ভুলে (**ما**) শব্দটি পড়ে যাওয়ায় অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গিয়েছে। এটি একটি দূরবর্তী সম্ভাবনা। কারণ এক্ষেত্রে 'কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেন নি' না বলে 'ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন' বলাই ছিল স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য যে, মোল্লা আলী কারী এ বিষয়ে পৃথক একটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটির নাম (أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه السلام) অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতার বিষয়ে ইমাম আযম আবূ হানীফার আকীদার পক্ষে দলীলসমূহ"। এ গ্রন্থের শুরুতে তিনি বলেন:

"قَدْ قَالَ الإِمَامُ الأَعْظَمُ وَالْهُمَامُ الأَقْدَمُ فِيْ كِتَابِهِ الْمُعْتَبَرِ الْمُعَبَّرِ بِ(الْفِقْهِ الأَكْبَرِ) مَا نَصُّهُ: "وَوَالِدَا رَسُوْلِ اللهِ مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ". فَقَالَ شَارِحُهُ: هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ بِأَنَّ وَالِدَيْ رَسُوْلِ اللهِ مَاتَا عَلَى الإِيْمَانِ، وَعَلَى مَنْ قَال مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ (دَعَا) رَسُوْلُ اللهِ اللهَ لَهُمَا فَأَحْيَاهُمَا اللهُ وَأَسْلَمَا ثُمَّ مَاتَا عَلَى الإِيْمَانِ. فَأَقُوْلُ وَبِحَوْلِهِ أَصُوْلُ: إِنَّ هَذَا الْكَلاَمَ مِنْ حَضْرَةِ الإِمَامِ لاَ يُتَصَوَّرُ فِيْ هَذَا الْمَقَامِ لِتَحْصِيلِ الْمَرَامِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَطْعِيَّ الدِّرَايَةِ لاَ ظَنِّيَّ الرِّوَايَةِ لأَنَّهُ فِيْ بَابِ الاِعْتِقَادِ لاَ يُعْمَلُ بِالظَّنِّيَّاتِ وَلاَ يُكْتَفَى بِالآحَادِ مِنَ الأَحَادِيْثِ الْوَاهِيَاتِ وَالرِّوَايَاتِ الْوَهْمِيَّاتِ إِذْ مِنَ الْمُقَرَّرِ وَالْمُحَرَّرِ فِيْ الأَصْلِ الْمُعْتَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لأَحَدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْبَشَرِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلاَ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعُقُوْبَةِ إِلاَّ بِنَقْلٍ ثَبْتٍ بِنَصٍّ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ تَوَاتُرٍ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ إِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ بِالإِيْمَانِ الْمَقْرُوْنِ بِالْوَفَاةِ أَوْ بِالْكُفْرِ الْمُنْضَمِّ إِلَى آخِرِ الْحَيَاةِ. فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَنَسْتَدِلُّ عَلَى مَرَامِ الإِمَامِ بِحَسْبِ مَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ فِيْ هَذَا الْمَقَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الأَنَامِ".

"ইমাম আযম তাঁর "আল-ফিকহুল আকবার" নামক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা কুফুরের উপর মৃত্যুবরণ করেন।" ব্যাখ্যাকার বলেন: এ কথার দ্বারা তিনি দুটি মত খণ্ডন করেছেন: যারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মত এবং যারা বলেন যে, তাঁরা কুফরের উপর মৃত্যু বরণ করেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন, তখন আল্লাহ তাদের দুজনকে পুনর্জীবিত করেন এবং তাঁরা দুজন ইসলাম গ্রহণ করে ইসলাম-সহ মৃত্যুবরণ করেন- তাদের মত তিনি খণ্ডন করেছেন। এ বিষয়ে আমি আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীকে বলি যে, এ বিষয়ে হযরত ইমাম আযমের বক্তব্য বুঝতে হলে কোনো যন্নী বা "ধারণা" প্রদানকারী প্রমাণের উপর নির্ভর করা যাবে না; বরং কাতয়ী বা সুনিশ্চিত বিশ্বাস প্রদানকারী প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হবে। কারণ বিষয়টি আকীদা বা বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট, যে বিষয়ে "যন্নী" বা ধারণাজ্ঞাপক প্রমাণের উপর নির্ভর করা যায় না। আর এ বিষয়ে দুর্বল-অনির্ভরযোগ্য দু-চারটি হাদীস বা কাল্পনিক বর্ণনা যথেষ্ট নয়। কারণ নির্ভরযোগ্য মূলনীতিতে একথা নির্ধারণ ও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, কোনো মানুষের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে জান্নাতী বা শাস্তিপ্রাপ্ত (জাহান্নামী) বলে নিশ্চিত করা বৈধ নয়। কেবলমাত্র যদি কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট বক্তব্য, মুতাওয়াতির হাদীস বা উম্মাতের আলিমগণের ইজমা দ্বারা যদি সুনিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ব্যক্তি ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন, অথবা জীবনের শেষ মুহূর্তে কাফির থেকে কুফরসহ মৃত্যুবরণ করেছেন, তাহলেই কেবল তাকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে নিশ্চিত করা যায়। উপরের বিষয়টি বুঝার পরে আমি আমার জ্ঞান অনুসারে কুরআন হাদীস ও উম্মাতের ইমামগণের ইজমার আলোকে ইমাম আযমের বক্তব্য প্রমাণ করব।"[৫৪৪]

শারহুল ফিকহিল আকবার গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী বলেন:

هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ أَنَّهُمَا مَاتَا عَلَى الإِيْمَانِ أَوْ مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ أَحْيَاهُمُ اللهُ تَعَالَى فَمَاتَا فِيْ مَقَامِ الإِيْمَانِ. وَقَدْ أَفْرَدْتُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً وَدَفَعْتُ مَا ذَكَرَهُ السُّيُوْطِيُّ فِيْ رَسَائِلِهِ الثَّلاَثَةِ، فِيْ تَقْوِيَةِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِالأَدِلَّةِ الْجَامِعَةِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ. وَمِنْ غَرِيْبِ مَا وَقَعَ فِيْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ إِنْكَارُ بَعْضِ الْجَهَلَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا فِيْ بَسْطِ هَذَا الْكَلاَمِ بَلْ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ لاَئِقٍ بِمَقَامِ الإِمَامِ الأَعْظَمِ. وَهَذَا بِعَيْنِهِ كَمَا قَالَ الضَّالُّ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ: وَدِدْتُ أَنْ أَحُكَّ مِنَ الْمُصْحَفِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ... وَقَوْلِ الرَّافِضِيِّ الأَكْبَرِ إِنَّهُ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُصْحَفِ الَّذِيْ فِيْهِ نَعْتُ الصِّدِّيْقِ الأَكْبَرِ.

"এ কথা দ্বারা তাদের মত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা বলেন যে, তাঁরা উভয়ে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন, অথবা কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, পরে আল্লাহ তাঁদেরকে জীবিত করেন এবং তাঁরা ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেন। এ বিষয়ে আমি পৃথক একটি পুস্তিকা রচনা করেছি। তাতে আমি সুয়ূতীর তিনটি পুস্তিকার বক্তব্য খন্ডন করেছি। এ পুস্তিকায় আমি কুরআন, হাদীস, কিয়াস ও ইজমার বক্তব্য দিয়ে ইমাম আযমের এ মত জোরদার করেছি। এ সম্পর্কিত একটি মজার বিষয় হলো, কিছু অজ্ঞ হানাফী এ বিষয়ক আলোচনা আপত্তিকর বলে মনে করেন। বরং তারা বলে, এ ধরনের কথা বলা ইমাম আযমের মর্যাদার পরিপন্থী। তাদের এ কথা অবিকল (জাহমী মতের প্রতিষ্ঠাতা) বিভ্রান্ত জাহম ইবনু সাফওয়ানের কথার মত। সে বলত: "আমার মনে চায় আল্লাহর বাণী 'অতপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন' কথাটি আমি কুরআনের পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলে দিই।" অনুরূপভাবে তাদের কথা অবিকল সেই শ্রেষ্ঠ শীয়া-রাফিযীর কথার মত, যে বলে: যে কুরআনের মধ্যে সিদ্দীকে আকবারের প্রশংসা বিদ্যমান সে কুরআনের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" (অর্থাৎ জাহম যেমন মুর্খতা বশত বলত যে, 'আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন' কথাটি আল্লাহর মর্যাদার পরিপন্থী এবং

শীয়া-প্রবর যেমন মনে করেছে যে সিদ্দীকে আকবারের প্রশংসা কুরআনের মর্যাদার পরিপন্থী, তেমনি এ অজ্ঞ হানাফী ভেবেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা বিষয়ক আবূ হানীফার বক্তব্যটি তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী ।)[৫৪৫]

মোল্লা আলী কারীর এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্যের মধ্যে এ বাক্যটির বিদ্যমান থাকার বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন এবং তার ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যেও বাক্যটি বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত পরবর্তী কোনো কোনো প্রকাশক বাক্যটির বিষয়ে বিতর্কের কারণে বা বাক্যটি ইমাম আযমের মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করে তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

৬. ১. ২. পিতামাতা প্রসঙ্গ ও ইসলামী আকীদা

উপরের বাক্যটি ইমাম আবূ হানীফার লেখা হোক বা না হোক প্রসঙ্গটি ইসলামী আকীদার সাথে জড়িত। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আবূ তালিবের ওফাত প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকেই শীয়াগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামাতা ও তাঁর চাচা আবূ তালিবকে মুমিন হিসেবে বিশ্বাস করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন। মূলধারার তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনেক প্রসিদ্ধ ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা কাফির-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিভিন্ন হাদীস এরূপই প্রমাণ করে। আনাস (রা) বলেন:

إِنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ

"এক ব্যক্তি বলে: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা কোথায়? তিনি বলেন: জাহান্নামে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন: নিশ্চয়ই আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে।"[৫৪৬]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন:

زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ (يَوْمَ الْفَتْحِ) فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ (فَمَا رُئِيَ بَاكِيًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ) فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

(মক্কা বিজয়ের সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করেন। তখন তিনি এমনভাবে ক্রন্দন করেন যে তাঁর সাথীগণও ক্রন্দন করতে থাকেন (তাঁকে এত বেশি ক্রন্দন করতে আর কখনো দেখা যায় নি)। তিনি বলেন: আমি আমার রবের নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তারপর আমি তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম। তখন আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। তোমরা কবর যিয়ারত করবে; কারণ তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করায়।[৫৪৭]

ইমাম ইবন মাজাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ কাযবীনী (২৭৩ হি), ইমাম নাসায়ী আহমদ ইবন শুআইব (৩০৩ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ হাদীসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাতার মুশরিক হওয়ার প্রমাণ ও মুশরিকের কবর যিয়ারতের বৈধতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। এ হাদীস প্রসঙ্গে ইবন মাজাহ বলেন: "(باب ما جاء في زيارة قبور المشركين) মুশরিকদের কবর যিয়ারত বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের অনুচ্ছেদ"[৫৪৮] এবং নাসায়ী বলেন: (**باب زيارة قبر المشرك**) "মুশরিকের কবর যিয়ারতের অনুচ্ছেদ"।[৫৪৯] তৃতীয়-চতুর্থ শতক পর্যন্ত অনেকেই বিষয়টিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

"নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে এবং আপনি জাহান্নামীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন না।"[৫৫০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (৩১০ হি) তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবন কা'ব কুরাযী থেকে উদ্ধৃত করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

ليت شعري ما فعل أبواي؟ فنزلت

"আমার পিতামাতার কি অবস্থা তা যদি আমি জানতে পারতাম!'- তখন এ আয়াতটি নাযিল করা হয়।"

এরপর ইমাম তাবারী বলেন:

فإن ظن ظان أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح ، فإن في استحالة الشك من الرسول عليه السلام – في أن أهل الشرك من أهل الجحيم ، وأن أبويه كانا منهم، ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب، إن كان الخبر عنه صحيحا.

"যদি কোনো ধারণাকারী ধারণা করেন যে, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি সহীহ তবে তার এ ধারণা সঠিক হবে না। কারণ মুশরিকগণ যে জাহান্নামী এবং তাঁর পিতামাতা যে তাদের অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো সন্দেহ থাকা-ই অসম্ভব বিষয়। আর এটিই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ ইবন কাব যে কথা বলেছেন তা সঠিক নয়; যদিও তিনি এ কথা বলেছেন বলে প্রমাণিত হয়।[৫৫১]

ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (৬০৬ হি) এ মত সমর্থন করে বলেন:

هذه الرواية بعيدة لأنه ﷺ كان عالماً بكفرهم، وكان عالماً بأن الكافر معذب، فمع هذا العلم كيف يمكن أن يقول : ليت شعري ما فعل أبواي.

"এ বর্ণনাটি অগ্রহণযোগ্য। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাফির হওয়ার বিষয় জানতেন এবং কাফিররা যে শাস্তি পাবে তাও জানতেন। কাজেই এরূপ জ্ঞান থাকার পরেও কিভাবে তিনি বলবেন: আমার পিতামাতা কিরূপ আছেন তা যদি জানতাম!?"[৫৫২]

এ মতের বিপরীতে বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ অনেক আলিম মত প্রকাশ করছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন। ইবনু শাহীন উমার ইবনু আহমদ (৩৮৫ হি), খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি), ইবনু আসাকির (৫৭১হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা সকলেই একই সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন। আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, বিদায় হজ্জের সময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেদনার্ত ছিলেন। একসময় তিনি আনন্দিত চিত্তে আয়েশার (রা) নিকট আগমন করেন। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّي آمِنَةَ فَسَأَلْت اللهَ رَبِّي أَنْ يُحْيِيَهَا فَأَحْيَاهَا فَآمَنَتْ بِي أَوْ قَالَ فَآمَنَتْ وَرَدَّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

"আমি আমার আম্মা আমেনার কবরের নিকট গমন করি এবং আল্লাহর কাছে দুআ করি তাঁকে জীবিত করতে। তখন আল্লাহ তাঁকে জীবিত করেন, তিনি আমার উপর ঈমান আনয়ন করেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁকে ফিরিয়ে নেন।" কোনো কোনো বর্ণনায় পিতামাতার কথা বলা হয়েছে।

নবম-দশম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি) ও অন্যান্য আলিম এ হাদীসের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইবনুল জাওযী, মোল্লা আলী কারী, শাওকানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। ইবনু কাসীর বলেন: হাদীসটি মুনকার ও অত্যন্ত দুর্বল এবং হাদীসের রাবীগণ দুর্বল ও অজ্ঞাতপরিচয়। ইবনু আসাকিরও একই কথা বলেছেন। ইমাম সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি নিশ্চিতরূপেই দুর্বল। তিনি বলেন, মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি দুর্বল, কেউ কেউ একে জাল বলেছেন। তবে একে জাল না বলে দুর্বল বলা উচিত। ইমাম সুয়ূতীর মতে ফযীলত বা মর্যাদার বিষয় যেহেতু ঈমান-আকীদা ও হালাল-হারাম-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, এজন্য ফযীলত বিষয়ে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করা যায়। আর এ মূলনীতির ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতার ফযীলতে এ দুর্বল হাদীসটি গ্রহণ করা যায়।[৫৫৩]

এর বিপরীতে কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, আমল বা কর্মের ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করার পক্ষে অনেক আলিম মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ব্যক্তির ফযীলত বা মর্যাদার বিষয় যেহেতু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেহেতু এ বিষয়ে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করা যায় না। অনেক আলিম বলেন, হাদীসটি জাল না হলেও এরূপ দুর্বল হাদীস বুখারী-মুসলিম সংকলিত সহীহ হাদীসের বিপরীতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বোপরি কুরআন ও হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আযাব বা মৃত্যুর আগমনের পর ঈমান বা তাওবা অর্থহীন।[৫৫৪] আল্লাহ তাঁর হাবীবের পিতামাতাকে ক্ষমা করতে চাইলে তাঁর দুআর মাধ্যমেই করতে পারেন; মৃত্যুর মাধ্যমে আখিরাত প্রত্যক্ষ করার পরে ঈমান গ্রহণ এক্ষেত্রে অর্থহীন।[৫৫৫]

অন্য হাদীসে আলী (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَتْنِي أَبِي وَأُمِّي ، لَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ.

"আদম (আ) থেকে শুরু করে আমার পিতামাতা আমাকে জন্ম দেওয়া পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আমার জন্ম, কোনো অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে আমার জন্ম হয় নি। জাহিলী যুগের কোনো অবৈধতা- অশ্লীলতা আমাকে স্পর্শ করে নি।"[৫৫৬]

কেউ কেউ এ অর্থের হাদীস দ্বারা দাবি করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামাতা ও পূর্বপুরুষগণ কেউ কাফির ছিলেন না। ইমাম বাইহাকী ও অন্যান্য আলিম বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। বাইহাকী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামাতা ও পিতামহের জাহান্নামী হওয়ার অর্থে অনেকগুলো হাদীস উদ্ধৃত করেন। এরপর তিনি বলেন:

وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة؟ وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام.

وأمرهم لا يقدح في نسب رسول الله ﷺ؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد، ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام.

"তাঁর পিতা, মাতা ও পিতামহ মৃত্যু পর্যন্ত মূর্তিপূজা করেছেন এবং তাঁরা ঈসা (আ)-এর দীনও গ্রহণ করেন নি, কাজেই তাঁরা আখিরাতে জাহান্নামী হবেন না কেন? এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশের পবিত্রতার পরিপন্থী নয়; কারণ কাফিরদের বিবাহ বিশুদ্ধ। এজন্য তো কাফিরগণ যখন তাদের স্ত্রীদের সাথে একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নতুন করে বিবাহ পড়ানোর দরকার হয় না এবং স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারও কোনো বিধান নেই, যদি এরূপ বিবাহ ইসলামে বৈধ থাকে।"[৫৫৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামাতার বিষয়ে তৃতীয় একটি মত বিদ্যমান। এ মতানুসারে তাঁর পিতামাতা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও নবী-বিহীন যুগে মৃত্যুর কারণে তাঁরা শাস্তিযোগ্য নন। নিম্নের আয়াতগুলো তা প্রমাণ করে:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا

"রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি শাস্তি প্রদান করি না।"[৫৫৮]

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

"রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে; যেন রাসূলগণের পরে মানুষের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ অবশিষ্ট না থাকে।"[৫৫৯]

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى

"যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে তারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন না কেন? পাঠালে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগে আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম।'"[৫৬০]

এ সকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, "ফাতরাত" বা রাসূল-বিহীন যুগে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরূপ মানুষদেরকে কিয়ামাতে পরীক্ষা করে মুক্তি দেওয়া হবে। এজন্য অনেক আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

এ মতটি অত্যন্ত জোরালো। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতার কুফরের উপর মৃত্যু হওয়ার বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে সুনিশ্চিত। মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত হয়ে ঈমান গ্রহণের হাদীসটি সনদগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল। উপরন্তু অর্থের দিক থেকে মৃত্যুর পরে ঈমান আনার বিষয়টি কুরআন-হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। পক্ষান্তরে 'ফাতরাতে' বা 'রাসূল-বিহীন' যুগে মৃত্যুর কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে উপরে উল্লেখিত "আমার ও তোমার পিতা জাহান্নামে" হাদীসটি এ মতের সাথে সাংঘর্ষিক।

সপ্তম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম নববী (৬৭৬ হি) 'আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে'-হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর পিতামাতার কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণের নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে বলেন:

فِيهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْر فَهُوَ فِي النَّار، وَلا تَنْفَعهُ قَرَابَة الْمُقَرَّبِينَ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَة عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْعَرَب مِنْ عِبَادَة الأَوْثَان فَهُوَ مِنْ أَهْل النَّار، وَلَيْسَ هَذَا مُؤَاخَذَة قَبْل بُلُوغ الدَّعْوَة، فَإِنَّ هَؤُلاءِ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَة إِبْرَاهِيم وَغَيْره مِنْ الأَنْبِيَاء

"এ হাদীসে নির্দেশনা রয়েছে, যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামী। আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের আত্মীয়তা তার কোনো উপকার করবে না। এ হাদীসে আরো নির্দেশনা রয়েছে, আরবের মানুষগণ যেরূপ মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল সেরূপ কর্মের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি রাসূল-বিহীন 'ফাতরাতের' সময়ে মৃত্যুবরণ করেছে সে ব্যক্তিও জাহান্নামী। এরূপ ব্যক্তিদের জাহান্নামে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর পূর্বেই শাস্তি দেওয়া হলো। কারণ, এদের কাছে ইবরাহীম (আ) ও অন্যান্য নবীর দাওয়াত পৌঁছেছিল।"[৫৬১]

আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপূরী (১৩৪৬ হি) বলেন:

قَدْ بَالَغَ السُّيُوْطِيُّ فِيْ إِثْبَاتِ إِيْمَانِ أَبَوَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ الْقَارِي: الجمهور عَلَى أَنَّ وَالِدَيْهِ ﷺ مَاتَا كَافِرَيْنِ. وَهَذَا الْحَدِيْثُ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيْ حَقِّهِمَا... فَعَلَى تَقْدِيْرِ صِحَّتِهِ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ مُعَارِضاً لِحَدِيْثِ مُسْلِمٍ مَعَ أَنَّ الْحُفَّاظَ طَعَنُوْا فِيْهِ وَمَنَعُوْا جَوَازَهُ بِأَنَّ إِيْمَانَ الْيَأْسِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ إِجْمَاعاً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَبِأَنَّ الإِيْمَانَ الْمَطْلُوْبَ مِنَ الْمُكَلَّفِ إِنَّمَا هُوَ الإِيْمَانُ الْغَيْبِيُّ... وَهَذَا الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ صَرِيْحٌ أَيْضاً فِيْ رَدِّ مَا تَشَبَّثَ بِهِ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ أَهْلِ الْفَتْرَةِ وَلاَ عَذَابَ عَلَيْهِمْ

"সুয়ূতী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতা-মাতার ঈমানের বিষয়টি প্রমাণে অতি-চেষ্টা করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী বলেছেন: অধিকাংশ আলিম একমত যে, তাঁরা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এ ব্যাপারে এ হাদিসটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ দলিল। ... (পুনর্জীবিত করার) হাদিসটি সহীহ বলে মেনে নিলেও মুসলিম শরীফের (আমার ও তোমার পিতা জাহান্নামে) হাদীসটির বিপরীতে দাঁড় করানো যায় না। সর্বোপরি প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ (পুনরুজ্জীবিত করার) এ হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তাঁরা এ ঘটনার সম্ভাবনাও অস্বীকার করেছেন। কারণ মুসলিম উম্মাহর ইজমা যে, নৈরাশ্যের পরে ঈমান- অর্থাৎ মৃত্যুর আগমনের পরে ঈমান- গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন ও হাদীসে তা সুস্পষ্ট বলা হয়েছে। এছাড়া ঈমান তো গাইবী বিষয়ের উপরই হয়ে থাকে। মৃত্যুর পরে তো সব গাইবী বিষয় প্রত্যক্ষ হয়ে যায়; এরপর তো আর ঈমান বিল-গাইব থাকে না। ... (আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে) হাদিসটি সুস্পষ্টভাবে তাদের বক্তব্যও প্রত্যাখ্যান করে যারা দাবী করে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা "ফাতরাত" বা রাসূল-বিহীন যুগে থাকার কারণে তাদের শাস্তি হবে না।"[৫৬২]

এভাবে ইমাম নববী ও অন্যান্য আলিম এ হাদীসের উপর নির্ভর করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতার ফাতরাত'-বাসী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে, আরবের মুশরিকগণ "রাসূল-বিহীন" ছিলেন না; বরং ইবরাহীম (আ)–এর দাওয়াত তাদের নিকট পৌঁছেছিল। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর বিশুদ্ধ দাওয়াত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগের অনেক আগেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তাঁর নুবুওয়াতের অব্যবহিত পূর্বের যুগের মানুষদেরকে রাসূল-বিহীন বলে গণ্য করাই কুরআন, সুন্নাহ, ইতিহাস ও যুক্তির দিক থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

তবে আলোচ্য হাদীসটি বাহ্যত এ মতটির সাথে সাংঘর্ষিক। এ হাদীসটির অর্থ হতে পারে যে "আমার ও তোমার পিতা রাসূল-বিহীন যুগের অধিবাসীদের পরীক্ষা পর্যন্ত জাহান্নামী হওয়ার বিধানের মধ্যে"- এ অর্থের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতাকে রাসূল-বিহীন যুগের অধিবাসী হিসেবে আখিরাতের আযাব-মুক্ত বলে গণ্য করার মতটিই অগ্রগণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতার বিষয়ে চতুর্থ মত হলো এ বিষয়ে মত প্রকাশ থেকে বিরত থাকা। সঠিক জ্ঞান তো মহান আল্লাহরই নিকটে।

৬. ২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাত

আমরা দেখেছি, কোনো কোনো পাণ্ডুলিপির ভাষ্য অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন: " **রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেন।**"

এ বিষয়টি সন্দেহাতীত মহাসত্য এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা মতভেদ নেই। কাজেই বিষয়টি আকীদা বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখের আবশ্যকতা কী? এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী বলেন: "এ বাক্যটি ব্যাখ্যাকারের মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই। এ বিষয়টি এত সুস্পষ্ট যে এর কোনো ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুমহান মর্যাদার প্রেক্ষাপটে এ কথা উল্লেখের কোনো প্রয়োজনও নেই। যদি ধরে নেওয়া হয় যে কথাটি মূলতই ইমাম আযম লিখেছেন, তবে এ কথার অর্থ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং অন্যান্য নবী-রাসূল নুবুওয়াতের মর্যাদার কারণে 'মাসূম' এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুফর থেকে সংরক্ষিত। কাজেই তাঁদের বিষয়ে আমাদের আকীদা পোষণ করতে হবে যে, তাঁরা ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যান্য আউলিয়া, উলামা বা আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের কারো বিষয়ে এরূপ নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না যে, তারা ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের থেকে যদি অলৌকিক কারামতাদি প্রকাশিত হয়, তাদের পরিপূর্ণ কামালাত ও বেলায়াত প্রমাণিত হয় বা সকল প্রকারের নেক আমলে তাদের লিপ্ত থাকা নিশ্চিত জানা যায়, তবুও তাদের কারো বিষয়ে এরূপ নিশ্চিত হওয়া যায় না।... ।"[৫৬৩]

৬. ৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচার ওফাত

আমরা আগেই বলেছি, শীয়াগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামাতা, চাচা, দাদা ও পূর্বপুরুষদের মুমিন বলে দাবি করেন। বিশেষত তাঁর চাচা ও আলী (রা)-এর পিতা আবূ তালিবকে মুমিন বলে প্রমাণ করতে তারা অগণিত বইপুস্তক রচনা করেছেন। আবূ তালিবকে কাফির প্রমাণ করার চেষ্টাকে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তাঁর সাথে চরমতম বেয়াদবী বলে দাবি করেছেন। এ বিষয়ক আলোচনার আগে নিম্নের বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পাঠককে অনুরোধ করছি।

(ক) আকীদার উৎস বিষয়ে আমরা দেখেছি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণ এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত কুরআন ও সহীহ হাদীসকে আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের আবেগ ও পছন্দ-অপছন্দকে এর ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। পক্ষান্তরে শীয়াগণ তাদের পণ্ডিতগণের মত, ব্যাখ্যা ও আবেগকেই আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এর আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন।

(খ) শীয়া ধর্মমতের মূল বিষয় রাজনৈতিক অপপ্রচারের ধর্মীয়করণ। রাজনৈতিক মতভেদ, সংঘর্ষ, ইত্যাদি মানব ইতিহাসের চিরপরিচিত চিত্র এবং মানবীয় প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানবীয় প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো যে, এরূপ সংঘর্ষে লিপ্তগণ নিজের স্বার্থে ধর্মের ব্যবহারের চেষ্টা করেন, ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্য করেন। কিন্তু নিজ ধর্মকে সচেতনভাবে বিকৃত করতে চেষ্টা করেন না। বরং

প্রত্যেকেই নিজ অবস্থানকে ধর্মীয়ভাবে সঠিক বলে দাবি করেন। ইহূদী, খৃস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ অগণিত যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ, শতবর্ষের যুদ্ধ ইত্যাদি সবই এ কথাই প্রমাণ করে।

শীয়াগণ রাজনৈতিক সংঘর্ষকে ধর্মীয়করণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি যেমন নিজেদের নেতৃবৃন্দকে দেবতা ও অন্যদেরকে জাতির শত্রু, স্বাধীনাতার শত্রু, ধর্মের শত্রু ইত্যাদি আখ্যায়িত করেন, যে কোনোভাবে অপরপক্ষের চরিত্রহননে সচেষ্ট থাকেন এবং এজন্য সকল প্রকার গালগল্প বানান ঠিক তেমনিভাবে শীয়াগণ রাজনৈতিক ক্ষমতাগ্রহণের জন্য যাদের নাম ব্যবহার করতেন তাদেরকে দেবতা এবং বিরোধীদেরকে দানব হিসেবে চিত্রিত করতে সকল প্রকার অপপ্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

(গ) মানুষের মর্যাদার দুটি দিক রয়েছে: (১) মানুষের নিজের সচেতন ইচ্ছাধীন কর্মের মাধ্যমে অর্জিত মর্যাদা এবং (২) মানুষের রক্ত, বংশ, জন্ম, পরিবার ইত্যাদি ইচ্ছাবহির্ভুত-কর্মবহির্ভুত বিষয় নির্ভর মর্যাদা। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসারে সাহাবী-তাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত প্রথম বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিষয়টি একেবারে অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শীয়াগণ একেবারেই বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বংশ, রক্ত, বর্ণ, পরিবার ইত্যাদি বিষয়কে মানুষের মর্যাদার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কর্ম, তাকওয়া ইত্যাদিকে একেবারেই অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। নবী-বংশের বা আলী-বংশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের মূল আলোচ্য বিষয় তাদের অলৌকিক জন্ম, নূর দ্বারা সৃষ্টি, পবিত্র বংশধারা ইত্যাদি। আর বংশধারার পবিত্রতা প্রমাণের জন্য তারা তাঁদের সকলকে ঈমানদার প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এজন্য আমরা দেখি যে, তাঁরা আবূ তালিব, আব্দুল মুত্তালিব ও অন্যান্যদেরকে মুমিন, মুসলিম ও আল্লাহর প্রিয়তম ও পবিত্রতম হিসেবে প্রচার করেছেন। পাশাপাশি আবূ বকর, উমর, উসমান, তালহা, যুবাইর, সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস, আবূ হুরাইরা, আনাস ও অন্যান্য সকল মুহাজির-আনসার সাহাবী (ﷺ)-কে কাফির, মুরতাদ ও ইসলামের অন্যতম শত্রু হিসেবে বিশ্বাস করাকে ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি বলে গণ্য করেছেন।

উপরের মূলনীতির ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ আবূ তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলে বিশ্বাস করেছেন। কারণ সাহাবীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত অনেকগুলো হাদীস বিষয়টি প্রমাণ করে। ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আব্দুর রায্যাক সানআনীর সূত্রে মা'মার থেকে যুহরী থেকে সায়ীদ ইবনুল মুসাইবি থেকে সাহাবী মুসাইয়িব (রা) থেকে, তিনি বলেন:

إِنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَيْ عَمِّ قُلْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ فَنَزَلَتْ: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَنَزَلَتْ: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ.

"যখন আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার নিকট প্রবেশ করেন। তখন তার নিকট আবূ জাহল উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: চাচা, আপনি বলুন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'; এ বাক্যটি দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য দাবি-দাওয়া পেশ করব। তখন আবূ জাহল এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া বলল: হে আবূ তালিব, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম অপছন্দ করবেন? উক্ত দু ব্যক্তি এভাবে অনবরত তাকে বুঝাতে থাকলেন। ফলশ্রুতিতে আবূ তালিব সর্বশেষ কথটি তাদেরকে বললেন: 'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই'। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তখন নাযিল হয়[৫৬৪]: "নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা আত্মীয় হয়, তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।" আরো নাযিল হয়[৫৬৫]: "তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হেদায়াত করতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন..।"[৫৬৬]

আরেকটি হাদীস ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস নবী-বংশের প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু নাওফাল ইবন আব্দুল মুত্তালিব হাশিমী (৮৪ হি) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব (রা) তাঁকে বলেন: আপনি আপনার চাচার কী উপকার করেছেন? তিনি তো আপনাকে ঘিরে রাখতেন, হেফাযত করতেন এবং আপনার জন্যই অন্যদের উপর ক্রুদ্ধ হতেন? তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ ، وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"তিনি সামান্য গোড়ালি পরিমাণ আগুনের মধ্যে রয়েছেন। আমি না হলে তিনি আগুনের (জাহান্নামের) তলদেশে থাকতেন।"[৫৬৭]

অন্য হাদীসে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবন খাব্বাব আনসারী (১০০ হি)-এর সূত্রে উদ্ধৃত

করেছেন, আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তাঁর চাচা আবূ তালিবের বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন:

لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ

"সম্ভবত আমার শাফাআত কিয়ামতে তার উপকার করবে; ফলে তিনি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সামান্য আগুনের মধ্যে থাকবেন, তাতেই তাঁর মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে।"[৫৬৮]

আবূ দাউদ, নাসায়ী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস কর্তৃক সহীহ সনদে সংকলিত হাদীসে তাবিয়ী নাজিয়া ইবন কা'ব বলেন, আলী (রা) বলেন:

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে বললাম, আপনার চাচা পথভ্রষ্ট শাইখ মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং তোমার পিতাকে কবরস্থ কর।"[৫৬৯]

এ সকল হাদীসের আলোকে সাহাবী, তাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত-এর ইমামগণ আবূ তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলে মেনে নিয়েছেন। এ বিষয়টিকে তাঁরা নবী-বংশের, আলী-বংশের বা আলী (রা)-এর প্রতি বেয়াদবী বা অবমাননা বলে কোনোভাবে মনে করেন নি। এ আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম আযম লিখেছেন: **"তাঁর চাচা এবং আলী (রা)-এর পিতা আবু তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।"**

পক্ষান্তরে শীয়াগণ আবূ তালিবকে মুমিন হিসেবে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। এ অর্থে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ, আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণের নামে অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। আলী (রা)–এর খুতবা হিসেবে সংকলিত 'নাহজুল বালাগা' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ৭ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শীয়া-মুতাযিলী পণ্ডিত ইবন আবিল হাদীদ আব্দুল হামীদ ইবন হিবাতুল্লাহ (৬৫৬ হি) বলেন:

وروى أن رجلا من رجال الشيعة وهو إبان بن محمود كتب إلى على بن موسى الرضا عليه السلام جعلت فداك إنى قد شككت في إسلام أبى طالب فكتب إليه (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) الاية، وبعدها إنك إن لم تقر بإيمان أبى طالب كان مصيرك إلى النار

"বর্ণিত আছে যে, আবান ইবন মাহমূদ নামক একজন শীয়া নেতা (শীয়া মতবাদের অষ্টম ইমাম, ইমাম) আলী রিদা ইবন মূসা কাযিম (২০৩ হি)-কে পত্র লিখেন যে, আমি আপনার জন্য কুরবানি হই! আবূ তালিবের ঈমান গ্রহণের বিষয়ে আমার মনে আমি সন্দেহ অনুভব করি। তখন আলী রিদা কুরআনের নিম্নের আয়াত লিখেন: "কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর ওটা কত মন্দ আবাস!" (সূরা নিসা: ১১৫ আয়াত)। এরপর তিনি লিখেন: তুমি যদি আবূ তালিবের ঈমানের স্বীকৃতি না দাও তবে তোমাকে জাহান্নামেই যেতে হবে।"[৫৭০]

শীয়া পণ্ডিতগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা, চাচা আবূ তালিব, দাদা আব্দুল মুত্তালিব ও সকল পূর্বপুরুষকে ঈমানদার দাবি করার জন্য অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। আবূ তালিবের বিষয়ে তাদের লেখালেখি সবচেয়ে বেশি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতার বিষয়ে তাদের লেখালেখির তুলনায় আলী (রা)-এর পিতার বিষয়ে তাঁদের লেখালেখি অনেক অনেক বেশি। এ বিষয়ক বইয়ের মধ্যে রয়েছে: আল্লামা শাইখ আব্দুল হুসাইন আমীনী নাজাফীর লেখা: "ঈমান আবী তালিব (আ) ও সীরাতুহূ", আয়াতুল্লাহ শাইখ নাসির মাকারিম শীরাযী রচিত 'ঈমান আবী তালিব", শাইখ আব্দুল্লাহ খানবাযী রচিত 'আবূ তালিব মুমিন কুরাইশ' ইত্যাদি। এ সকল পুস্তকে উদ্ধৃত 'হাদীস' বা 'দলীল-প্রমাণগুলো' আলোচনা অর্থহীন; কারণ এগুলোর কোনো সনদ তারা উল্লেখ করেন না এবং সনদ যাচাইয়ের কোনো উপায়ও আমাদের নেই। তাঁদের কয়েকটি যুক্তি নিম্নরূপ:

(ক) তাঁরা দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর বংশ, আলী (রা) ও তাঁর বংশের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও মূলধারার ইমামগণ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃত এ সকল হাদীস জালিয়াতি করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবন আবিল হাদীস বলেন:

أما حديث الضحضاح من النار، فإنما يرويه الناس كلهم عن رجل واحد ، وهو المغيرة بن شعبة ، وبغضه لبنى هاشم وعلى الخصوص لعلى عليه السلام مشهور معلوم ، وقصته وفسقه أمر غير خاف .

"আবূ তালিব পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সামান্য আগুনের মধ্যে অবস্থান করবেন বলে যে হাদীসটি প্রচলিত সে হাদীসটি দুনিয়ার সকল মানুষ একজন মাত্র মানুষ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন: মুগীরা ইবন শুবা। আর হাশিমী বংশ (নবী-বংশ), বিশেষত

আলী (আ)-এর প্রতি তাঁর শত্রুতা-বিদ্বেষ অতি প্রসিদ্ধ এবং তাঁর কাহিনী ও পাপাচারের বিষয়ও কারো অজানা নয়।"[৫৭১]

আমরা দেখেছি যে, 'গোড়ালি পর্যন্ত আগুনে থাকার' হাদীসগুলো মুহাদ্দিসগণ মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন নি, বরং বিভিন্ন সহীহ সনদে আব্বাস (রা) ও আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আমরা বলেছি যে, দুজন সৎ মানুষের মধ্যে বিরোধিতা স্বাভাবিক। তবে একারণে কাউকে মিথ্যাচারে অভিযুক্ত করা যায় না। আলী (রা)-এর সাথে শত্রুতার কারণে অন্য কোনো সাহাবী মিথ্যা বলবেন এরূপ ধারণা করার অর্থ রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে একজন ব্যর্থ নবী বলে দাবি করা (নাউযু বিল্লাহ!)। কিন্তু শীয়াগণ এভাবে সাধারণ মানুষদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন।

সর্বোপরি, শীয়াগণের এ মতের বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারীরা যদি এরূপ বিদ্বেষ পোষণ করেই থাকতেন তবে হামযা, আব্বাস, আলী (রা) ও নবী বংশের অন্যান্যদের মর্যাদায় এত হাদীস তাঁরা কেন বর্ণনা করলেন? পিতামাতা, চাচা ও দাদা যদি সত্যই ইসলাম গ্রহণ করতেন তবে তাঁদের গল্প ও মর্যাদার কথা কি আরো বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করতো না?

(খ) শীয়াগণ প্রশ্ন করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামাতা, চাচা, দাদা ও তাঁর বংশের অন্যান্যদেরকে জাহান্নামী বানিয়ে আপনাদের কী লাভ? আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বিষয়টিকে কুরআন ও হাদীসের কাছে আত্মসমর্পণ হিসেবে গণ্য করেন। তাঁরা বলেন: কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যগুলো মেনে নিলে আপনাদের কী ক্ষতি? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়জনদের প্রতি আবেগ ও ভালবাসা কোনো মুমিনেরই কম নেই। কিন্তু বিভিন্ন সহীহ হাদীস প্রমাণ করছে যে, তাঁরা ঈমান গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর বিপরীতে একটিও সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস পাওয়া যাচ্ছে না। এজন্য মুমিনকে আবেগ বিসর্জন দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনার কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা ও চাচার কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার মতটিকে শীয়াগণ তাঁর সাথে চরম বেয়াদবি বলে গণ্য করেছেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরবর্তী যুগের যে সকল আলিম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতার ঈমান গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তাঁরাও এরূপ যুক্তি দিয়েছেন। এ যুক্তি গ্রহণ করলে প্রসিদ্ধ ইমাম ও আলিমগণের অনেককেই বেয়াদব বলে গণ্য করতে হয়। তবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত আদব ও বেয়াদবির ক্ষেত্রেও কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণকেই সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করেছেন। তাঁদের মতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল মত ও বক্তব্য নির্বিচারে গ্রহণ করাই মূলত আদব এবং তাঁর কোনো বক্তব্য, মত বা শিক্ষা অমান্য করাই তাঁর সাথে বেয়াদবি। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সম্মুখে অগ্রবর্তী হয়ো না।"[৫৭২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৫৭৩]

এজন্য মনের আবেগ যেদিকেই ধাবিত হোক না কেন দীনের সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে। আর এটিই দীনের আদব।

৬. ৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পুত্রগণ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পুত্রগণের নাম ও সংখ্যার বিষয়ে ঐতিহাসিকদের কিছু মতভেদ আছে। কাসিম এবং ইবরাহীম-এ দু পুত্রের কথা অনেক সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এদের বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক একমত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ও সীরাত লেখক তাইয়িব, তাহির, আব্দুল্লাহ, মুতাইয়াব ও মুতাহ্হার নামে আরো ৫ পুত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে তাইয়িব ও তাহিরের নাম প্রসিদ্ধ। এ সকল বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানদের সংখ্যা ৭ পুত্র ও ৪ কন্যা মোট ১১ জন।

ইবরাহীম ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সন্তানের মাতা খাদীজাতুল কুবরা (রা)। কাসিম, তাহির ও অন্যান্য পুত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং শিশু বয়সেই মৃত্যু বরণ করেন। প্রথম পুত্র কাসিম নুবওয়াতের পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। দু বছর বা তার কম বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। কাসিমের নাম অনুসারে আরবীয় নিয়মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'আবুল কাসিম' অর্থাৎ 'কাসিমের আব্বা' কুনিয়াত বা উপনামে ডাকা হতো। অন্যান্য পুত্রের জন্ম ও ওফাত সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাসী-স্ত্রী মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে মদীনায় তাঁর কনিষ্ট পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৮ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭ বা ১৮ মাস বয়সে ১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন।

৬. ৫. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কন্যাগণ

হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্যের আলোকে ঐতিহাসিকগণ একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ৪ কন্যা ছিলেন: যাইনাব (রা), রুকাইয়া

(রা), উম্মু কুলসূম (রা) ও ফাতিমা (রা)। তাঁরা নুবুওয়াতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন, নুবুওয়াতের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেন এবং মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা যাইনাব (রা)। তিনি নবুওয়াতের বছর দশেক আগে জন্মগ্রহণ করেন। খালাত ভাই "আবুল আস ইবনুর রাবীয়"-এর সাথে মক্কায় তাঁর বিবাহ হয়। যাইনাব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর স্বামী আবুল আস কাফির অবস্থায় মক্কায় থেকে যান। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মদীনায় যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উভয়ে মদীনায় দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখেন। যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ৮ হিজরী সালে- প্রায় ৩৩ বৎসর বয়সে- মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্বামী আবুল আস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পরের বৎসর ১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

যায়নাব (রা) আলী নামে এক পুত্র এবং উমামা নামে এক কন্যা জন্মদান করেন। পুত্র আলী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় মক্কা বিজয়ের পরে ইন্তেকাল করেন। মক্কা বিজয়ের সময় আলী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উটের পিঠে তাঁর পিছনে বসে ছিলেন। কন্যা উমামাকেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত আদর করতেন। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি উমামাকে কাঁধে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। সাজদার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং সাজদা থেকে উঠলে আবার ঘাড়ে নিতেন। ফাতিমার (রা) ওফাতের পরে আলী (রা) উমামাকে বিবাহ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দ্বিতীয়া কন্যা রুকাইয়া (রা)। নুবুওয়াতের ৭ বৎসর পূর্বে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মক্কায় আবূ লাহাবের পুত্র উতবার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। যখন সূরা আবূ লাহাব নাযিল হয় তখন ক্রুদ্ধ আবূ লাহাবের নির্দেশে উতবা তাঁকে তালাক দেন। এরপর উসমান (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। উসমানের সাথে তিনি ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। এরপর তিনি মদীনায় হিজরত করেন। দ্বিতীয় হিজরী সালে বদর যুদ্ধের সময়ে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরে ছিলেন। তাঁর অসুস্থতার কারণেই উসমান বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২২/২৩ বৎসর। রুকাইয়ার গর্ভে উসমান (রা)-এর আব্দুল্লাহ নামে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বছর ছয়েক বা তার কম বয়সে এ পুত্র মৃত্যুবরণ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তৃতীয়া কন্যা উম্মু কুলসূম (রা)। নবুওয়াতের কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মক্কায় আবূ লাহাবের অন্য পুত্র উতাইবার সাথে তার বিবাহ হয় এবং দাম্পত্য জীবন শুরুর আগেই উতাইবা তাঁকে পরিত্যাগ করে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হিজরত করেন। রুকাইয়া (রা)–এর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু কুলসূমকে উসমান (রা)–এর সাথে বিবাহ দেন। ৩ হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসে উসমানের সাথে তাঁর বিবাহ হয় বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। ৯ হিজরী সালে প্রায় ২৭/২৮ বৎসর বয়সে মদীনায় তাঁর ওফাত হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কনিষ্ঠা কন্যা ফাতিমা (রা)। তিনি নুবুওয়াতের কয়েক বৎসর আগে বা নুবুওয়াত লাভের পরের বৎসর জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পরে দ্বিতীয় (অথবা তৃতীয়) হিজরী সালে আলী (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। হাসান, হুসাইন ও মুহসিন নামে তিন পুত্র ও যাইনাব, উম্মু কুলসূম ও রুকাইয়া নামে তিন কন্যা সন্তান তাঁরা লাভ করেন। মুহসিন জন্মসময়ে মৃত্যুবরণ করেন। হাসান, হুসাইন, উম্মু কুলসূম ও যাইনাব পরিণত বয়সে বিবাহশাদি করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধর বলতে তাঁদের সন্তানদেরকেই বুঝানো হয়। ১১শ হিজরী সালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের ৬ মাস পরে ২৪/২৫ বৎসর বয়সে ফাতিমা (রা) ইন্তেকাল করেন।[৫৭৪]

৭. তাওহীদের অজানা বিষয়ে করণীয়

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: **"যদি কোনো মানুষের কাছে 'ইলমুত তাওহীদ' বা আকীদার খুঁটিনাটি বিষয়ের সুক্ষ্ম তথ্য অস্পষ্ট হয়ে পড়ে তবে তার দায়িত্ব এই যে, তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট যা সঠিক তাই আমার বিশ্বাস-এরূপ বিশ্বাস পোষণ করবে। এরপর যথাশীঘ্র সম্ভব কোনো আলিমকে জিজ্ঞাসা করে সঠিক তথ্য জেনে নিবে। সঠিক তথ্য জানার বিষয়ে অনুসন্ধান করতে দেরি করা তার জন্য বৈধ নয়। এরূপ বিষয়ে 'দাঁড়িয়ে থাকা' বা 'বিরত থাকা', অর্থাৎ 'জানিও না এবং জানবও না বলে থেমে থাকা', বা 'কিছুই জানি না কাজেই কিছুই বিশ্বাস করব না' এরূপ কথা বলা তার জন্য কোনো ওযর বলে গৃহীত হবে না। কেউ যদি এরূপ দাঁড়িয়ে থাকে বা বিরত থাকে তবে তা কুফরী বলে গণ্য হবে।"**

আমরা দেখেছি যে, প্রথম যুগে ইলমুল আকীদাকে "ইলমুত তাওহীদ" বলে আখ্যায়িত করা হতো। শিরক-কুফর থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তাওহীদের ইলম বিশদভাবে অর্জন করা মুমিনের জীবনের প্রধান ফরয দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

"কাজেই জান (জ্ঞানার্জন করা) যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই।"[৫৭৫]

তাহলে "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই"- তাওহীদুল ইবাদাতের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা মুমিনের জীবনের প্রথম ও প্রধান ফরয দায়িত্ব। স্বভাবতই এ জ্ঞান অর্জন করতে হবে 'ওহী' অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাঠ ও অনুধাবনের মাধ্যমে। তাওহীদের মৌলিক কোনো বিষয় কোনো মুমিনের অজানা থাকতে পারে না। তবে খুঁটিনাটি সুক্ষ্ম কোনো বিষয় হয়ত কারো অজানা থাকতে পারে। উপরের বক্তব্য এরূপ বিষয়ে মুমিনের করণীয় উল্লেখ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)।

আকীদার খুঁটিনাটি সুক্ষ্ম কোনো বিষয় মুমিনের অজানা থাকলে "আল্লাহর কাছে যেটি সঠিক আমি তাই বিশ্বাস করি" বলে দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করতে হবে। অনুমান বা অজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তর্ক-বিতর্কে না জড়িয়ে কুরআন-হাদীস নির্দেশিত সত্য সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার প্রেরণা-সহ মুমিন ঘোষণা দিবেন যে, এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে যা সঠিক তাই আমার বিশ্বাস।

পাশাপাশি কুরআন-হাদীস এ বিষয়ে কী বলে তা জানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। প্রাজ্ঞ আলিমগণের কাছে প্রশ্ন করে বা তাঁদের লেখা পাঠ করে সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জানার বিষয়ে অবহেলা অমার্জনীয় অপরাধ। কারণ তা দুটো বিষয় নির্দেশ করে: (১) বিশুদ্ধ ঈমানী জ্ঞান অর্জনে অবজ্ঞা এবং (২) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঈমানের অনুপস্থিতি। এ বিষয়দুটো কুফর-এর নামান্তর।

তাওহীদের বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনে অবহেলার আরেকটি দিক কুরআন-সুন্নাহের নির্দেশনা অনুসন্ধান ও গ্রহণ না করে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), তাঁর সাথীগণ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী বলেন:

وَلا نَخُوضُ فِي اللَّهِ، وَلا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ، وَلا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ.

"আমরা আল্লাহর বিষয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হই না। আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে বিতর্ক করি না, এবং আমরা কুরআন নিয়ে তর্ক-ঝগড়া করি না।"[৫৭৬]

বস্তুত তাওহীদ ও আকীদার ভিত্তি ওহীর জ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা বলেছেন তাই বলা, তাঁরা যা বলেন নি তা না বলা এবং ওহীর অতিরিক্ত কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা বা সমালোচনায় লিপ্ত না হওয়া আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূল বৈশিষ্ট্য।

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসারে মুমিনের দায়িত্ব জ্ঞান সন্ধান করা। জ্ঞান সন্ধানে মুমিনের নিজের কোনো পছন্দ-অপছন্দ থাকে না। তিনি ওহী ও সত্য অনুসন্ধান করেন এবং সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি আলোচনা করেন কিন্তু বিতর্ক করেন না। আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। আলোচনাকারী নিজের জ্ঞানের অপূর্ণতার বিষয়ে সচেতন। তিনি সত্য জানতে চান। তিনি প্রশ্ন করেন। উত্তরে তার তৃপ্তি না হলে পুনরায় প্রশ্ন করেন, আলোচনা করেন বা অন্যান্য আলিমের সাথে আলোচনা করেন। সকল ক্ষেত্রে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ওহীর নির্দেশনা সঠিকভাবে জানা।

পক্ষান্তরে বিতর্ককারী নিজের জ্ঞান বা মতকে চূড়ান্ত সত্য বলে গণ্য করে তাকে বিজয়ী করতে ও বিপক্ষের মতকে বাতিল প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। বিতর্কের মধ্যে "নফসানিয়্যাত" বা প্রবৃতির অনুসরণ ও আত্মগরিমা থাকে, আল্লাহর জন্য সত্য অনুসন্ধানের প্রেরণা থাকে না। বিতর্কে পরাজিত হলেও মানুষ সত্য গ্রহণ করে না, বরং পরাজয়কে অস্বীকারের জন্য বা পরাজয়ের গ্লানি মুছার জন্য চেষ্টা করে। দীন নিয়ে বিতর্ক বিভ্রান্ত ও বিদআতী গোষ্ঠীগুলোর বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে 'আহলুস সুন্নাত' আন্তরিক ভালবাসা ও সত্যসন্ধানের আগ্রহ-সহ আলোচনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلا أُوتُوا الْجَدَلَ

"কোনো জাতি হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ তা হলো তারা ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হয়।"[৫৭৭]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِيْ وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ أَعْلاَهَا

"নিজের মত ভুল বুঝতে পেরে যে বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যার আচরণ সুন্দর তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে।"[৫৭৮]

৮. মিরাজ

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) মিরাজ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন: **"মি'রাজের সংবাদ সত্য। যে তা প্রত্যাখ্যান করে সে বিদ'আতী ও বিভ্রান্ত।"**

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূল ﷺ-কে যত মুজিযা দিয়েছেন সেগুলোর অন্যতম ইসরা ও মি'রাজ। "ইসরা" অর্থ 'নৈশ-ভ্রমণ' বা 'রাত্রিকালে ভ্রমণ করানো'। আর 'মি'রাজ' অর্থ 'ঊর্ধ্বারোহণ' বা 'ঊর্ধারোহণের যন্ত্র'। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক রাত্রিতে মক্কার 'আল-মাসজিদুল হারাম' থেকে ফিলিস্তিনের 'আল-মাসজিদুল আকসা' পর্যন্ত নিয়ে যান। এরপর সেখান থেকে ঊর্ধ্বে ৭ আসমান ভেদ করে তাঁর নৈকট্যে নিয়ে যান। 'আল-মাসজিদুল হারাম' থেকে আল-মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে "ইসরা" এবং সেখান থেকে উর্ধ্বে গমনকে মি'রাজ বলা হয়। সাধারণভাবে 'ইসরা' ও 'মি'রাজ' উভয় বিষয়কে একত্রে "মি'রাজ" বলা হয়।

৮. ১. কুরআন মাজীদে ইসরা ও মিরাজ

মিরাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের অত্যতম ঘটনা। কুরআনে একাধিক স্থানে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। 'ইসরা' প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

"পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য।"[৫৭৯]

এ আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে 'ইসরা' ও 'মিরাজ'-এ গমন করেন। কারণ 'বান্দা' বলতে আত্মা ও দেহের সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়। কুরআনে বান্দা বলতে 'দেহ ও আত্মা' সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়েছে, শুধু আত্মাকে 'বান্দা' বলা হয় নি।[৫৮০]

"মি'রাজ" প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেনঃ

أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

"সে (মুহাম্মাদ ﷺ) যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহা-র (প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের) নিকট। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া। যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল।"[৫৮১]

এ আয়াতও প্রমাণ করে যে, তিনি সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আল্লাহর মহান এ সকল নিদর্শন দেখেছিলেন। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মূলধারার আলিমগণ একমত। তবে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট তিনি কাকে দেখেছিলেন? মহান আল্লাহকে? না জিবরাঈল (আ)-কে? এ বিষয়ে সাহাবীগণের যুগ থেকে মতভেদ রয়েছে। সূরা নাজমের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অন্তর দিয়ে দুবার তাঁর রব্বকে দেখেছিলেন। এ মতের অনুসারী সাহাবী-তাবিয়ীগণ বলেছেন যে, মহান আল্লাহ মূসা (আ)–কে তাঁর সাথে কথা বলার মুজিযা দিয়েছিলেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-তে তাঁর দর্শনের মুজিযা দিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে আয়েশা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বলেছেন যে, তিনি আল্লাহকে দেখেন নি, জিবরাঈলকে (আ) দেখেছিলেন। ইমাম বুখারী সংকলিত হাদীসে প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মাসরূক বলেনঃ "আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলেন, হে আবূ আয়েশা (মাসরূক), তিনটি কথার যে কোনো একটি কথা যদি কেউ বলে তবে সে আল্লাহ নামে জঘন্য মিথা বলার অপরাধে অপরাধী হবে। আমি বললামঃ সে কথাগুলো কী কী? তিনি বলেন, যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর প্রতিপালককে (আল্লাহকে) দেখেছিলেন তবে সে আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যচারী বলে গণ্য হবে। মাসরূক বলেন, আমি তখন হেলান দিয়ে ছিলাম। তাঁর কথায় আমি উঠে বসলাম এবং বললামঃ হে মুমিনগণের মাতা, আপনি আমাকে একটু কথা বলতে দিন, আমার আগেই আপনার বক্তব্য শেষ করবেন না। আল্লাহ কি বলেন নি[৫৮২]: "সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছিল", "নিশ্চয় তাকে সে আরেকবার দেখেছিল"?

আয়েশা (রা) বলেনঃ এ উম্মাতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেনঃ "এ হলো জিবরীলের কথা। আল্লাহ তাঁকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন আমি দুবার ছাড়া আর কখনো তাঁকে তাঁর সে প্রকৃত আকৃতিতে দেখি নি। আমি দেখলাম তিনি আকাশ থেকে নেমে আসছেন। তাঁর আকৃতির বিশালত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।" আয়েশা বলেনঃ তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি[৫৮৩]: "তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত"? তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি[৫৮৪]: "কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ করবেন যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করবে, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়"?"[৫৮৫]

৮. ২. মিরাজের তারিখ

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা বিস্তারিতভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থে প্রায় ৪০ জন সাহাবী সহীহ বা যয়ীফ সনদে মিরাজের ঘটনার বিভিন্ন দিক ছোট বা বড় আকারে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীসে মিরাজের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে একটি কথাও বর্ণিত হয় নি। ফলে তারিখের

বিষয়ে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মি'রাজ একবার না একাধিকবার সংঘঠিত হয়েছে, কোন্ বৎসর হয়েছে, কোন্ মাসে হয়েছে, কোন্ তারিখে হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২০টি মত রয়েছে। কারো মতে যুলকাদ মাসে, কারো মতে রবিউস সানী মাসে, কারো মতে রজব মাসের এক তারিখে, কারো মতে রজব মাসের প্রথম শুক্রবারে বা রজব মাসের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। ইমাম নববী, ইবনুল আসীর, ইবন হাজার আসকালানী ও অন্যান্য অনেকেই বলেছেন যে, রবিউল আউয়াল মাসে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে আবার তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন এ মাসের ১২ তারিখে এবং কেউ বলেছেন এ মাসের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল।[৫৮৬]

৮. ৩. মিরাজের বিবরণ

এ সকল হাদীসে বর্ণিত ইসরা ও মিরাজের সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা ঘরের নিকট শুয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আ) কয়েকজন ফিরিশতা সহ তথায় আগমন করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষের উপরিভাগ থেকে পেট পর্যন্ত কেটে তাঁর হৃৎপিণ্ড বের করেন, তা ধৌত করেন এবং বক্ষকে ঈমান, হিকমাত ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিপূর্ণ করেন এবং তাঁর হৃৎপিণ্ডকে পুনরায় বক্ষের মধ্যে স্থাপন করেন। এরপর "বুরাক" নামে আলোর গতি সম্পন্ন একটি বাহন তাঁর নিকট আনয়ন করা হয়। তিনি এ বাহনে বাইতুল মাকদিস বা জেরুজালেমে গমন করেন। মহান আল্লাহ তথায় পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলকে সমবেত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামতিতে তাঁরা তথায় দু রাক'আত সালাত আদায় করেন। এরপর "মি'রাজ" বা "ঊর্ধ্বারোহণ যন্ত্র" আনয়ন করা হয়। তিনি মি'রাজে উঠে ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং একে একে সাত আসমান অতিক্রম করেন। বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নবী-রাসূলের সাথে তাঁর সাক্ষাত, সালাম ও দুআ বিনিময় হয়। এরপর তিনি সৃষ্টিজগতের শেষ প্রান্ত "সিদরাতুল মুনতাহা" গমন করেন। তথা থেকে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম ও মহান আল্লাহর অন্যান্য মহান সৃষ্টি পরিদর্শন করেন ও তাঁর মহান সান্নিধ্য লাভ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর উম্মাতের জন্য দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সালাতের বিধান প্রদান করেন। পরে তা সংক্ষিপ্ত করে ৫ ওয়াক্তের বিধান দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। মিরাজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের সময় এবং জান্নাত-জাহান্নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিভিন্ন পাপ ও পুণ্যের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও পুরস্কার দেখানো হয়।[৫৮৭]

মুতাযিলা ও অন্যান্য কতিপয় ফিরকা বিজ্ঞান বা যুক্তির নামে 'মিরাজ' অস্বীকার করেছে বা ব্যাখ্যা করেছে। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি এ বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত সকল বিষয় সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা। এগুলিকে অবিশ্বাস করা বা ব্যাখ্যার নামে সরল অর্থ অস্বীকার করা বিভ্রান্তি। যেহেতু ইসরা বা নৈশভ্রমণের কথা কুরআন কারীমে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সেহেতু তা অস্বীকার করা কুফর বলে গণ্য। আর মিরাজ বা ঊর্ধ্বভ্রমণের বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলি অস্বীকার করলে তাকে বিভ্রান্ত ও বিদআতী বলে গণ্য করা হবে, কাফির বলে গণ্য করা হবে না। হানাফী ফকীহগণ বলেছেন:

وَمَنْ أَنْكَرَ الْمِعْرَاجَ يُنْظَرُ إِنْ أَنْكَرَ الإِسْرَاءَ من مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمِعْرَاجَ من بَيْتِ الْمَقْدِسِ لا يَكْفُرُ

"যদি কেউ মি'রাজ অস্বীকার করে তবে দেখতে হবে সে কী অস্বীকার করছে। সে যদি মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত নৈশযাত্রা বা ইসরা অস্বীকার করে তবে সে কাফির। আর যদি বাইতুল মাকদিস থেকে মিরাজ বা ঊর্ধ্বগমন অস্বীকার করে তবে কাফির হবে না।"[৫৮৮]

এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য আমরা দেখেছি। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلا، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى"

"মি'রাজের ঘটনা সত্য। নবী (ﷺ)-কে রাত্রে ভ্রমণ করানো হয়েছে। তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে উঠানো হয়, পরে ঊর্ধ্ব জগতের যেখানে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছিল সেখানে নেওয়া হয়। তথায়, আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা ছিল তা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন এবং তাঁর প্রতি যে বার্তা দেওয়ার ছিল তা প্রদান করেন। "যা সে দেখেছে সে বিষয়ে অন্তর মিথ্যা বলে নি[৫৮৯]।"[৫৯০]

৮. ৪. মিরাজ বিষয়ক জাল ও ভিত্তিহীন ধারণা

ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মি'রাজ বিষয়েও দ্বিবিধ বিভ্রান্তি বিদ্যমান। একদিকে খারিজী, মু'তাযিলী ও সমমনা গোষ্ঠীগুলো যুক্তি, বিজ্ঞান বা দর্শনের নামে কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসে উল্লেখিত ও বর্ণিত ঘটনাবলি অস্বীকার করেছে এবং ব্যাখ্যার নামে প্রকাশ্য অর্থ বাতিল করেছে। অপরদিকে শীয়াগণ এবং সুন্নী সমাজের শীয়া প্রভাবিত অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এ বিষয়ে অনেক জাল ও বানোয়াট কাহিনী প্রচার করেছে। তারা এ বিষয়ক কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসে বিধৃত বিষয়গুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন না। বরং তাদের প্রচারিত জাল ও বানোয়াট কাহিনীগুলোকেই "মিরাজ"-এর মূল বিষয় বলে বিশ্বাস ও প্রচার করে।

জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে আমরা মিরাজ বিষয়ক অনেক জাল হাদীস দেখতে পাই। মিরাজের রাত্রিতে জান্নাতের সকল স্থানে ফাতিমা (রা), আলী (রা) ও তাঁর পরিবারের 'পাক পাঞ্জাতনের' নাম দেখা, তাদের ইমামতের সাক্ষ্য দেখা ইত্যাদি বিষয় এ

সকল হাদীসের প্রতিপাদ্য। এ জাতীয় কিছু জাল হাদীস রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আরশে আরোহণ কেন্দ্রিক।

কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আল্লাহর মহান নিদর্শনাবলির দর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে আরশে গমনের কথা উল্লেখ করা হয় নি। সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজের রাত্রিতে আরশে গমন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয় নি। রাফরাফে চড়া, আরশে গমন করা ইত্যাদি কোনো কথা সিহাহ সিত্তা, মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কোনো হাদীস-গ্রন্থে সংকলিত কোনো হাদীসে নেই। ৫/৬ শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থগুলোতেও এ বিয়য়ে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। দশম হিজরী শতাব্দী ও পরবর্তী যুগে সংকলিত সীরাতুন্নবী বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে রাফরাফ-এ আরোহণ, আরশে গমন ইত্যাদি ঘটনা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী যারকানী (১১২২ হি) 'আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের ব্যাখ্যা 'শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে আল্লামা রাযী কাযবীনীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

لَمْ يَرِدْ فِيْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ وَلاَ حَسَنٍ وَلاَ ضَعِيْفٍ أَنَّهُ جَاوَزَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، بَلْ ذُكِرَ فِيْهَا أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مُسْتَوًى سَمِعَ فِيْهِ صَرِيْفَ الأَقْلاَمِ فَقَطْ. وَمَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَأَنَّى لَهُ بِهِ! وَلَمْ يَرِدْ فِيْ خَبَرٍ ثَابِتٍ وَلاَ ضَعِيْفٍ أَنَّهُ رَقِىَ الْعَرْشَ. وَافْتِرَاءُ بَعْضِهِمْ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ.

"কোনো একটি সহীহ, হাসান অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন। বরং বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তথায় এমন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যে, কলমের খসখস শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। যিনি দাবি করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন তাকে তার দাবীর পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। আর কিভাবে তিনি তা করবেন! একটি সহীহ অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, তিনি আরশে আরোহণ করেছিলেন। কেউ কেউ জালিয়াতি-মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। তাদের এরূপ মিথ্যাচারের প্রতি দৃকপাত করা যায় না।"[৫৯১]

মিরাজ বিষয়ক এ জাতীয় জাল ও বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জুতা পায়ে আরশে আরোহণের গল্প, মিরাজের রাত্রিতে "আত-তাহিয়্যাতু" লাভ, মুহূর্তের মধ্যে মি'রাজের সকল ঘটনা সংঘটিত হওয়া ইত্যাদি।[৫৯২]

৯. কিয়ামাতের আলামাত

সর্বশেষ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) কিয়ামতের কয়েকটি 'আলামাত কুবরা' বা 'বড় চিহ্ন' উল্লেখ করে বলেন: **"দাজ্জালের বহির্গমন, ইয়াজূজ ও মাজূজের বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে সূর্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং কিয়ামাতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যেভাবে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"**

৯. ১. কিয়ামাতের সময় ও আলামত

কিয়ামাত (القيامة) শব্দটি (قام) ক্রিয়া থেকে গৃহীত। এর অর্থ দাঁড়ানো বা উত্থিত হওয়া। ইসলামী পরিভাষায় মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানকে কিয়ামাত বলা হয়। সাধারণত মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানকে একত্রে 'কিয়ামত' বলা হয়। অনেক সময় সামগ্রিকভাবে পরকালীন জীবনকে 'কিয়ামাত' বা 'কিয়ামত দিবস' বলা হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, আখিরাত ও কিয়ামাতের বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম বিষয়। কিয়ামাতে বিশ্বাসের অন্যতম দিক যে এর সময় বা ক্ষণ আল্লাহ তাঁর কোনো সৃষ্টিকে জানান নি। কুরআনে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গাইবের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে।"[৫৯৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন:

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا اللَّهُ ثُمَّ تَلا النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...الآيَةَ

"প্রশ্নকারীর চেয়ে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি এ বিষয়ে বেশি জানে না। আমি তোমাকে কিয়ামাতের আলামত বলব। যখন দাসী তার প্রভুকে জন্ম দেবে এবং যখন অবলা উটের রাখালগণ সুউচ্চ ইমারত-অট্টালিকা নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে। কিয়ামাতের জ্ঞান পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন[৫৯৪]: "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামাতের জ্ঞান...."[৫৯৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, কিয়ামাতের সময় আল্লাহ মানুষকে জানান নি, তবে কিয়ামাতের বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে:

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

"তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামাতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে! কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?"[৫৯৬]

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলিমগণ কিছু বিষয়কে 'আলামাত সুগরা' (العلامات الصغرى) অর্থাৎ 'ক্ষুদ্রতর 'আলামত' এবং কিছু বিষয়কে 'আলামাত কুবরা' (العلامات الكبرى) অর্থাৎ 'বৃহত্তর 'আলামত' বা 'বিশেষ আলামত' বলে উল্লেখ করেছেন।

৯. ২. আলামাত সুগরা

আমরা দেখলাম যে, কিয়ামাতের পূর্বাভাসসমূহ প্রকাশিত হয়েছে বলে কুরআনে বলা হয়েছে। এ সকল পূর্বাভাসের অন্যতম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন। সাহল ইবনু সাদ আস সায়িদী (রা) বলেন:

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্রিত করে বলেন: "আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামাতের সাথে এভাবে পাশাপাশি।"[৫৯৭]

উপরের আলামতগুলো ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে কিয়ামাতের আরো অনেক পূর্বাভাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামাতের পূর্বে আরব উপদ্বীপে নদনদী প্রবাহিত হবে এবং ক্ষেত-খামার ছড়িয়ে পড়বে। মক্কার বাড়িঘরগুলো মক্কার পাহাড়গুলো ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠে যাবে, মক্কার মাটির নিচে সুড়ঙ্গগুলো একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত হবে, পাহাড়গুলো স্থানচ্যুত হবে। ইরাকের ফুরাত নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশিত হবে, যে জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত হবে, অল্প সময়ে মানুষ অনেক সময়ের কাজ করবে, অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। তবে মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে, পাপ, অনাচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, মিথ্যা ও ভণ্ড নবীগণের আবির্ভাব ঘটবে, হত্যা, সন্ত্রাস, ও বৃহৎ পরিসরের যুদ্ধ হতে থাকবে। এ সকল 'আলামাত' বা পূর্বভাস প্রকাশের এক পর্যায়ে 'বৃহৎ আলামতগুলো' প্রকাশিত হবে।[৫৯৮]

৯. ৩. আলামাতে কুবরা

হুযাইফা ইবনু আসীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতের মাঠে (বিদায় হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন। আমরা তাঁর থেকে নিচু স্থানে অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা কি আলোচনা করছ? আমরা বললাম: কিয়ামাতের আলোচনা করছি। তিনি বলেন:

إِنَّ السَّاعَةَ لا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ...

"দশটি আয়াত বা নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামাত হবে না: (১) পূর্ব দিকে ভূমিধ্বস (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া), (২) পশ্চিমদিকে ভূমিধ্বস, (৩) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস, (৪) ধুম্র, (৫) দাজ্জাল, (৬) ভূমির প্রাণী, (৭) ইয়াজুজ-মাজুজ, (৮) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৯) এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেওয়া এবং (১০) মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আ)-এর অবতরণ।"[৫৯৯]

এ সকল আলামতের বিস্তারিত বর্ণনায় অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত। কুরআন কারীমে কোনো আলামতের বিষয়ে ইঙ্গিত বা উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ

"যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি যমিন হতে বের করব এক জীব যা তাদের সাথে কথা বলবে, এ জন্য যে মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।"[৬০০]

কুরআনের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের পর সকল কিতাবী তাঁর বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও ঈমান লাভ করবেন। আল্লাহ বলেন:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ

مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

"আর 'আমরা আল্লাহর রাসূল মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' তাদের (ইহূদীদের) এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করে নি। বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামাতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।"[৬০১]

ইয়াজুজ মাজুজের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

"এমন কি যখন য়া'জুজ ও মা'জুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হলে সহসা কাফিরদিগের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালঙ্ঘনকারীই ছিলাম'।"[৬০২]

৯. ৪. কিয়ামতের আলামাত: মুমিনের করণীয়

আকীদার অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কিয়ামতের আলামত বিষয়ে মুমিনের দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যগুলো সরল অর্থে বিশ্বাস করা। এগুলোর ব্যাখ্যা ও প্রকৃতি জানা আমাদের দায়িত্ব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়ক ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন ও অন্তহীন বিতর্ক সৃষ্টি করে। যেমন: হাদীসে যে ভূমিধ্বসের কথা বলা হয়েছে তা কি তুরস্কের ভূমিকম্প? ইরানের ভূমিকম্প? জাপানের সুনামি? না তা ভবিষ্যতে ঘটবে? কবে ঘটবে? অথবা: ইয়াজূজ-মাজূজ কারা, তারা কি তাতার? চেঙ্গিশ খানের বাহিনী? চীন জাতি? অন্য কোনো জাতি? কোথায় তারা থাকে? তারা বের হয়েছে না বের হবে? অথবা: দাজ্জাল কে? ইস্রায়েল রাষ্ট্র? আমেরিকা? দাজ্জাল কি বের হয়েছে? না ভবিষ্যতে হবে? কখন তার আবির্ভাব ঘটবে? কিয়ামতের আলামত বিষয়ক এ জাতীয় প্রশ্ন বা গবেষণার নামে সময় ধ্বংস করে দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিনের কোনোই লাভ হয় না, তবে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। ইবাদত, দাওয়াত, উপার্জন, আল্লাহর হক্ক, বান্দার হক্ক ইত্যাদি জরুরী কর্ম ফাঁকি দিতে মুমিনকে এরূপ অকারণ বিতর্কে লিপ্ত করে শয়তান।

মুমিনের দায়িত্ব সাধারণভাবে বিশ্বাস করা যে, কিয়ামতের আগে এ সকল আলামত দেখা যাবে। এ সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে সবই সত্য। যখন তা ঘটবে তখন মুমিনগণ জানবেন যে কিয়ামত ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে। এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আল্লাহই জানেন। এর ব্যাখ্যা জানার দায়িত্ব মুমিনকে দেওয়া হয় নি। মুমিনের দায়িত্ব দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে লাগার মত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা করা। কুরআন-হাদীস অনুসন্ধান করে মানুষের প্রায়োগিক জীবনের সমাধান দেওয়ার জন্য গবেষণা করতে নির্দেশ দেয় ইসলাম। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সকল মানব-কল্যাণ বিষয়ক গবেষণার নির্দেশ দেয় ইসলাম। এ সকল বিষয়ে গবেষণা-অনুসন্ধান মানুষকে একটি নিশ্চিত ফলাফল লাভের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু গাইবী বিষয় নিয়ে গবেষণার নামে অকারণ বিতর্ক কোনো ফলাফল দেয় না। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) ইয়াজূজ-মাজূজ বা দাজ্জাল বলতে কী বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে হাজার বছর এভাবে গবেষণা নামের প্রলাপ-বিলাপ ও বিতর্ক করেও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না।[৬০৩]

ইমাম আবূ হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বিষয়ে কেবলমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। এটিই আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি। শুধু সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা, দুর্বল ও জাল বর্ণনা বর্জন করা এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলি অপব্যাখ্যা না করে সরল অর্থে বিশ্বাস করা।

৯. ৫. ইমাম মাহদী

উপরের হাদীসে কিয়ামতের দশটি পূর্বভাসের মধ্যে 'ইমাম মাহদী'-র বিষয় উল্লেখ করা হয় নি। ইমাম আবূ হানীফাও কিয়ামতের আলামতের মধ্যে বিষয়টি উল্লেখ করেন নি। তবে বিভিন্ন হাদীসে কিয়ামতের পূর্বে 'ইমাম মাহদী'র আবির্ভাবের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে বিষয়টিকে ঈসা মাসীহের অবতরণ ও দাজ্জালের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে, হাদীস, ফিকহ ও আকীদার পরিভাষায় 'ইমাম' শব্দটি 'খলীফা' বা 'রাষ্ট্রপ্রধান' শব্দের সমার্থক। মাহদী অর্থ 'হেদায়াত-প্রাপ্ত'। এজন্য পারিভাষিকভাবে 'ইমাম মাহদী' অর্থ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত-প্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান'।

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর পরের খলীফাগণকে 'খুলাফা রাশিদীন মাহদিয়্যীন' বা 'মাহদী রাশিদ খলীফা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ থেকে আমরা জানি যে, খুলাফায়ে রাশিদীন সকলেই 'মাহদী' বা 'হেদায়াতপ্রাপ্ত' ছিলেন। তবে শেষ যুগে

আরো একজন 'মাহদী রাষ্ট্রপ্রধান' ক্ষমতাগ্রহণ করবেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মাহদীর কথা উল্লেখ করে কোনো হাদীস সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমে নেই। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ক হাদীসগুলো সংকলিত। এ বিষয়ে কিছু সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক যয়ীফ হাদীস বিদ্যমান এবং অগণিত জাল হাদীস এ বিষয়ে প্রচারিত হয়েছে। এখানে এ বিষয়ক কয়েকটি গ্রহণযোগ্য হাদীস উল্লেখ করছি।

প্রথম হাদীস: আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّى أو مِنْ أَهْلِ بَيْتِى (يَمْلِكَ الْعَرَبَ/ يلي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى) يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِى يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا.

"দুনিয়ার যদি একটি দিনও বাকি থাকে তবে আল্লাহ সে দিনটিকে দীর্ঘায়িত করে আমার বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যার নাম ও পিতার নাম আমার নাম ও আমার পিতার নামের মতই হবে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করবেন, আরবদের উপর রাজত্ব গ্রহণ করবেন জুলুম পূর্ণ পৃথিবীকে ইনসাফে পূর্ণ করবেন।" হাদীসটি সহীহ।[৬০৪]

দ্বিতীয় হাদীস: আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الْمَهْدِىُّ مِنِّى أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الأَنْفِ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ

"মাহদী আমার (বংশধর) থেকে, তার কপাল চুলমুক্ত (মাথার সম্মুখভাগে চুল থাকবে না) এবং নাক চিকন। সে অত্যাচারে পরিপূর্ণ দুনিয়াকে ন্যায়পরায়ণতায় পূর্ণ করবে। সে সাত (অন্য বর্ণনায়: নয়) বছর রাজত্ব করবে।" হাদীসটি সহীহ।[৬০৫]

তৃতীয় হাদীস: উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

يَكُونُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ -صلى الله عليه وسلم- وَيُلْقِى الإِسْلاَمُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ/ تِسْعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

"একজন খলীফার মৃত্যুর সময় মতভেদ হবে। তখন মদীনার একজন মানুষ পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে। তখন মক্কার কিছু মানুষ তার কাছে এসে তাকে বের করে আনবে। তার অনিচ্ছা ও অপছন্দ সত্ত্বেও তারা হাজার আসওয়াদ ও মাকাম ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তার বাইয়াত করবে। সিরিয়া থেকে একটি বাহিনী তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হবে। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বাইদা নামক স্থানে এ বাহিনী ভূমিধ্বসে ধ্বংস হবে। যখন মানুষেরা তা দেখবে তখন সিরিয়া থেকে আবদালগণ এবং ইরাক থেকে দলেদলে মানুষ এসে হাজার আসওয়াদ ও মাকাম ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। এরপর কুরাইশ বংশ থেকে একব্যক্তি তার (মাহদীর) বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, যার মাতুল হবে কালব বংশের। এ ব্যক্তি একটি বাহিনী তার (মাহদীর) বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে। কিন্তু মাহদীর বাহিনী কালব গোত্রের বাহিনীকে পরাজিত করবে। কালব গোত্রের গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বণ্টনে যে উপস্থিত থাকবে না সে দুর্ভাগা। তখন সে (মাহদী) সম্পদ বণ্টন করবে এবং মানুষদের মধ্যে তাদের নবীর (ﷺ) সুন্নাত অনুসারে কর্ম করবে। আর পৃথিবীর বুকে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সে সাত (অন্য বর্ণনায়: নয়) বৎসর এভাবে থাকবে। এরপর সে মৃত্যুবরণ করবে এবং মুসলিমগণ তার সালাতুল জানাযা আদায় করবে।"

হাদীসটির বিশুদ্ধতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান এবং সহীহ পর্যায়ের বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে শাইখ আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬০৬]

চতুর্থ হাদীস: আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسْعٌ فَتَنْعَمُ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتَى أُكُلَهَا وَلَا تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي فَيَقُولُ خُذْ

"আমার উম্মাতের মধ্যে মাহদী আসবে। কম হলে সাত (বছর), না হলে নয় (বছর)। তখন আমার উম্মাতের মধ্যে নিয়ামত সর্বজনীন হবে। তারা এমনভবে প্রাচুর্য ও নিয়ামত ভোগ করবে যা তারা ইতোপূর্বে কখনোই ভোগ করে নি। উম্মাতকে সকল প্রাচুর্য দেওয়া হবে এবং মাহদী তাদেরকে না দিয়ে কিছুই সঞ্চিত করে রাখবে না। তখন সম্পদ হবে অফুরন্ত। কোনো ব্যক্তি যদি বলে, হে মাহদী, আমাকে প্রদান করুন তবে মাহদী বলবে: তুমি নিয়ে যাও।" হাদীসটি হাসান।[৬০৭]

পঞ্চম হাদীস: উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ

"মাহদী আমার বংশের, ফাতিমার বংশধর থেকে।" হাদীসটি সহীহ।[৬০৮]

ষষ্ঠ হাদীস: সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ

"তোমাদের সংরক্ষিত সম্পদ নিয়ে তিন ব্যক্তি লড়াই করবে, তিনজনই খলীফার সন্তান। তাদের তিনজনের একজনও তা অধিকার করতে পারবে না। এরপর পূর্ব দিক থেকে কাল পতাকাসমূহের উদয় হবে, তখন তারা তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে যেভাবে ইতোপূর্বে কেউ করে নি। এরপর তিনি কিছু বললেন, যা আমি মনে রাখতে পারি নি। এরপর বলেন: যখন তোমরা তা দেখবে তখন তার বাইয়াত করবে। বরফের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও বাইয়াত করবে; কারণ সেই আল্লাহর খলীফা মাহদী।" ইমাম বাযযার, হাকিম নাইসাপূরী, যাহাবী, বূসীরী, সুয়ূতী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আলবানী হাদীসটি শেষ বাক্যটিকে যয়ীফ বলেছেন।[৬০৯]

বুখারী ও মুসলিম সংকলিত কয়েকটি হাদীস ইমাম মাহদী প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য করেছেন আলিমগণ। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

"তোমরা কি জান তোমাদের কী অবস্থা হবে যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা যখন তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন আর তখন তোমাদের 'ইমাম' হবেন তোমাদেরই মধ্যকার একজন।"[৬১০]

অন্য হাদীসে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ - فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ لاَ. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ.

"আমার উম্মাতের কিছু মানুষ হক্কের উপরে বিজয়ী থেকে লড়াই করে চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। তিনি বলেন: অতঃপর মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ) অবতরণ করবেন তখন তাদের আমীর বলবে: আসুন আমাদের জন্য ইমাম হয়ে সালাত আদায় করুন। তিনি বলবেন: না, আপনারা একে অপরের উপর আমীর, এটি এ উম্মাতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মাননা।"[৬১১]

এ সকল হাদীসের আলোকে আলিমগণ বলেন যে, ইমাম মাহদীর সময়েই ঈসা (আ) অবতরণ করবেন এবং তাঁরই ইমামতিতে তিনি সালাত আদায় করবেন।

উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো জানতে পারি:

(ক) 'ইমাম মাহদী' বলতে একজন হেদায়াতপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান বুঝানো হয়েছে। যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে বিশ্বে প্রাচুর্য, শান্তি, ইনসাফ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

(খ) তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশধর এবং ৭ বা ৯ বৎসর রাজত্ব করবেন।

(গ) তার রাজত্বকালেই ঈসা (আ) অবতরণ করবেন।

(ঘ) তার ইমামত, খিলাফত বা শাসন আরবদেশ কেন্দ্রিক হবে।

(ঙ) তার ক্ষমতাগ্রহণের পূর্বে ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ হবে। বাইতুল্লাহর পাশে তার বাইয়াত হবে। সিরিয়া, ইরাক ও পূর্বদিক থেকে তার পক্ষে যোদ্ধারা আসবে।

(চ) এ রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতাগ্রহণ, বাইয়াত ইত্যাদি বিষয়ে মুমিনের কোনো দায়িত্ব নেই। এগুলো ঘটবে বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জানিয়েছেন। তবে যখন তার বিরোধী সৈন্যবাহিনী ভূমিধ্বসে ধ্বংস হবে, সিরিয়া, ইরাক ও পূর্ব দিকের সেনাবাহিনী তাঁর বাহিনীতে যোগ দিবে এবং সামগ্রিকভাবে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে বা মুসলিম উম্মাহ তাঁকে স্বীকার করে নিবে, তখন মুমিনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর বাইয়াত করা। এজন্য ইমাম মাহদী প্রসঙ্গে ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলেন:

لو مر ببابك فلا تبايعه حتى يجتمع الناس عليه

যদি তিনি তোমার দরজা দিয়ে গমন করেন তবুও তুমি তাঁর বাইয়াত করবে না; যতক্ষণ না সকল মানুষ তাঁর বিষয়ে একমত হয়।[৬১২]

৯. ৬. ইমাম মাহদী দাবিদারগণ

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখি যে, যুগে যুগে অনেক মানুষ নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করেছেন এবং দ্রুত জুলুম-অনাচার দূর করে ইনসাফপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবেগে অথবা স্বপ্ন ও কাশফের গল্পে অনেকেই তার ভক্ত হয়ে গিয়েছেন। সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে। অকারণে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেন বা রক্ত দিয়েছেন। ইতিহাসের বইগুলো ঘাটলে এরূপ কয়েক হাজার প্রসিদ্ধ 'ইমাম মাহদী'-র পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে অল্প কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি।

(১) মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান হাসানী: আন- নাফসুস যাকিয়্যাহ (৯৩-১৪৫ হি)। তিনি আলী-বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, আবিদ ও বীর ছিলেন। আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আগে নবী-বংশের খিলাফতের নামে আব্বাসী নেতৃবৃন্দ তাঁর হাতেই বাইয়াত করেন। কিন্তু ১৩২ হিজরীতে উমাইয়াগণের পতনের পর আব্বাসীগণ ক্ষমতা দখল করেন। দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা মানসূর (১৩৬-১৫৮ হি) তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করেন। তিনি লুকিয়ে থাকার কারণে খলীফার বাহিনী তাঁর পিতা ও আত্মীয়-স্বজনকে গ্রেফতার করে এবং নির্যাতন করে হত্যা করেন। এ পর্যায়ে তিনি বিদ্রোহ করেন। মদীনা, বসরা ও অন্যান্য স্থানে তাঁকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আব্বাসী সেনাবাহিনী ১৪৫ হিজরীতে তাকে পরাজিত ও হত্যা করতে সক্ষম হয়। তৎকালীন অনেক নেককার বুজুর্গ তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিম তাকে ইমাম মাহদী বলে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁর বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন।[৬১৩]

(২) তৃতীয় আব্বাসী খলীফা মাহদী (জন্ম: ১২৭, খিলাফাত: ১৫৮-১৬৯ হি)। তিনি দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা আবূ জাফর মানসূরের পুত্র। মনসূরের মূল নাম আব্দুল্লাহ। তিনি পুত্রের নাম রাখেন মুহাম্মাদ। মানসূরের মৃত্যুর পর মাহদী খলীফা হন। তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করতেন। তার এ দাবীর পক্ষে কিছু দুর্বল হাদীসও বিদ্যমান, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী আব্বাসের বংশধর হবেন।[৬১৪]

(৩) হুসাইন ইবন যাকরাওয়াইহি ইবন মাহরাওয়াইহি (২৯১ হি)। তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করেন। তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন দেশ দখল করে লুটপাট ও গণহত্যা চালান। সর্বশেষ আব্বাসী খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ নিজের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে এই ইমাম মাহদীর বাহিনীকে পরাজিত করেন ও তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।[৬১৫]

(৪) উবাইদুল্লাহ ইবন মাইমূন কাদ্দাহ (২৫৯-৩২২ হি)। তৃতীয় হিজরী শতকের শেষ প্রান্তে ২৯৬ হিজরী সালে তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে প্রচার করেন। কাইরোয়ানে ২৯৭ হিজরীতে তাঁর অনুসারীরা ইমাম মাহদী ও ইমামে যামান হিসেবে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। দ্রুত তারা মরক্কোয় তাদের 'ফাতিমী' রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৫৮ হিজরীতে তার বংশধর মিসর দখল করেন। প্রায় দুই শতাব্দী পর ৫৬৭ হিজরী সালে সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে মিসরের ফাতিমী শীয়া মাহদী রাজত্বের পতন ঘটে।[৬১৬]

(৫) হুসাইন ইবন মানসূর হাল্লাজ (৩০৯ হি)। তিনি সূফী ও দার্শনিক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নিজেকে আল্লাহর মধ্যে ফানাপ্রাপ্ত ও বাকা প্রাপ্ত ওলী, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, নতুন শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইমাম মাহদী ইত্যাদি দাবি করেন। তাঁর অনুসারীরা তাঁর বহু অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার করে। ৩০৯ হি. সালে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। তবে তাঁর অনুসারীরা বিশ্বাস করতেন যে, তিনি নিহত হন নি, বরং তাঁর একজন শত্রুকে তার আকৃতি প্রদান করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।[৬১৭]

(৬) আল-মুয়িয্য ইবনুল মানসূর: মাআদ ইবন ইসমাঈল ইবন উবাইদুল্লাহ ফাতিমী (৩৬৫ হি)। পূর্বোক্ত উবাইদুল্লাহ ইবন মাইমূন-এর পৌত্র। তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী হিসেবে দাবি করেন। তিনি কয়েক দিন নির্জনে থাকেন এবং দাবি করেন যে, তিনি এ সময়ে আরশে আল্লাহর সাথে ছিলেন। তার অনুসারীরা তার অগণিত কারামত প্রচার করতেন। এভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার গভীর প্রভাব পড়ে। তিনি ক্রমান্বয়ে মিসর দখল করে কাইরো শহর প্রতিষ্ঠা করেন।[৬১৮]

(৭) বালিয়া (৪৮৪ হি)। এ ব্যক্তি শয়তান-সাধক ও জ্যোতিষী (astrologer) ছিল। মানুষদেরকে অনেক ভেল্কি দেখিয়ে ৪৮৩ হি. সালে দাবি করে যে, সেই ইমাম মাহদী। তাকে যে অবিশ্বাস করবে সে কাফির। সাধারণ মানুষেরা অনেকেই তাকে বিশ্বাস করে তার দলে যোগ দেয়। সে বসরা অঞ্চলে অনেক শহর ও গ্রাম দখল করে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ বছরেরই শেষ প্রান্তে সে ধৃত ও নিহত হয়।[৬১৯]

(৮) মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন তাওমারত (৪৮৫-৫২৪ হি)। ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শুরুতে মরোক্কোয় তিনি আলিম, আবিদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নিজেকে আলীর বংশধর ও ইমাম মাহদী বলে দাবি ও প্রচার করেন। দ্রুত তাঁর অনুসারী বাড়তে থাকে। মরোক্কোর শাসক ইবন তাশফীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 'বিশুদ্ধ' ইসলামী রাষ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। রাষ্ট্র দখলের আগেই তার মৃত্যু হয়। তার সাথী ও খলীফা আব্দুল মুমিন মরক্কোর শাসনক্ষমতা দখল করে নতুন রাজবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[৬২০]

(৯) আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাশিম মুলাস্সাম (৬৫৮-৭৪০ হি)। মিসরে ফকীহ, আবিদ, সূফী ও ওলী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একপর্যায়ে ৬৮৯ সালে তিনি নিজেকে মাহদী হিসেবে দাবি করেন। তিনি তার কারামত ও হাল সম্পর্কে আল্লাহর নামে শপথ করে অনেক দাবি-দাওয়া করেন। তিনি দাবি করেন যে, তিনি মহান আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেন ও তাঁর সাথে কথা বলেন, তাকে মহান আল্লাহর কাছে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি তাকে মাহদী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়া অনেক দাবি-দাওয়া তিনি ও তার অনুসারীরা করেন। তাকে কয়েকবার কারারুদ্ধ করা হয়।

(১০) শাইখ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ সালজামাসী, ইবন মহাল্লী (৯৬৭-১০২২ হি)। মরক্কোর সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ও সূফী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ফিকহে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এরপর তিনি তাসাউফের বিভিন্ন তরীকায় অনুশীলন করে কাশফ-কারামত সম্পন্ন সূফী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার কারামত ও ইবাদতের প্রসিদ্ধির কারণে দলেদলে মানুষ তার ভক্ত হয়ে যায়। তিনি সমাজে প্রচলিত অন্যায়, জুলুম ও পাপাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করেন। তিনি পাপী ও জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করেন। মরোক্কোর তৎকালীন শাসকের বাহিনীকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি সালজামাসা শহর অধিকার করেন এবং তথায় তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ১০২২ হিজরীতে এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মরক্কো শহরের প্রাচীরে তার ও তার কয়েকজন ঘনিষ্ট ভক্তের কর্তিত মাথা প্রায় ১২ বৎসর ঝুলানো ছিল। তার অনুসারীরা বিশ্বাস করতেন যে, তিনি নিহত হন নি, বরং তিনি লুকিয়ে রয়েছেন এবং যথাসময়ে প্রকাশিত হবেন। পরবর্তী কয়েকশত বৎসর পর্যন্ত অনেক মানুষ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতেন।[৬২১]

(১১) মুহাম্মাদ আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (১২৫৯-১৩০২হি/১৮৮৫খৃ)। সুদানের সুপ্রসিদ্ধ সূফী ও ইমাম মাহদী। সুদানের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর প্রভাব সুদূর প্রসারী। ফিকহ ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জনের পর তিনি তাসাউফের অনুশীলন, ইবাদত-বন্দেগি এবং শিক্ষা প্রচারে মনোনিবেশে করেন। ক্রমান্বয়ে তার ভক্ত-মুরীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিনি শাসকদের অনাচার থেকে দেশকে পবিত্র করার দাওয়াত দিতে থাকেন। ১২৯৮ হি/১৮৮১ খৃস্টাব্দে তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী বলে দাবি করেন। সুদানের আলিমদের পত্র লিখে তাকে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানান। তিনি 'দরবেশ' উপাধিতে আখ্যায়িত তাঁর অনুসারীদেরকে সুদানের সকল অঞ্চলে জিহাদের দাওয়াত দিতে প্রেরণ করেন। মিসর-সুদানের সরকারী বাহিনী ও বৃটিশ বাহিনী অনেকবার মাহদীর বাহিনীকে নির্মূল করতে চেষ্টা করে। কিন্তু মূলত এ সকল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। সমগ্র সুদান মাহদীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তবে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলাভিষিক্ত ও অনুসারীরা তাদের রাজত্ব সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। তবে অল্প সময়েই তারা পরাজিত হন এবং সুদান ও মিসর বৃটিশের অধীনে চলে যায়।[৬২২]

(১২) আলী মুহাম্মাদ ইবন মিরযা রিদা শীরাযী (১২৬৬ হি/ ১৮৫০খৃ)। বাবিয়্যা বাহায়ী মতবাদের মূল প্রতিষ্ঠাতা। ইরানের শীরায প্রদেশে তার জন্ম। সংসার ত্যাগ, সাধনা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্রে অবস্থান ইত্যাদি দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নিজেকে প্রথমে 'আল-বাব' অর্থাৎ দরজা উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। এরপর তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করেন। স্বভাবতই অনেক মানুষ তার অনুসারী ও ভক্ত হয়ে যায়। সর্বশেষ তিনি সকল ধর্মের সমন্বয়ে নতুন এক ধর্মের উদ্ভাবন করেন। তার এ নতুন ধর্ম সমাজে অনেক হানাহানি সৃষ্টি করে। ১৮৫০ খৃস্টাব্দে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।[৬২৩]

(১৩) মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৪০-১৯০৮খৃ)। কাদিয়ানী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। সে প্রথম দিকে সূফী দরবেশ ও কাশফ-কারামতের অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের পক্ষে হিন্দু ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে বক্তব্য ও বইপত্র লিখে বৃটিশ শাসিত মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। হিন্দু ও খৃস্টানদের প্রতিবাদের নামে ১৮৮০ সালে বারাহীন আহমাদিয়া নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে। গ্রন্থটি মূলত তার নিজের কাশফ ও কারামতের দাবি-দাওয়ায় পরিপূর্ণ। ক্রমান্বয়ে তার দাবি-দাওয়া বাড়তে থাকে। ১৩০২ হিজর সালে (১৮৮৫খৃ) সে নিজেকে চতুর্দশ হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে। ১৮৯১ সালে সে নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করে। এরপর নিজেকে ঈসা মাসীহ বলে দাবী করে। এরপর নিজেকে ওহী-প্রাপ্ত ছায়া নবী বলে দাবি করে। সর্বশেষ ১৯০১ সালে সে নিজেকে তিন লক্ষ মুজিযা প্রাপ্ত পূর্ণ নবী বলে দাবি করে। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়।[৬২৪]

(১৪) মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ কাহতানী (১৪০০ হি/১৯৭৯ খৃ)। ১৪০০ হিজরী সালের প্রথম দিনে (১৯/১১/৭৯) এ মাহদীর আবির্ভাব। জুহাইমান উতাইবী নামক একজন সৌদি ধার্মিক যুবক সমাজের অন্যায় অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ আলিমগণ তাকে ভালবাসতেন। ক্রমান্বয়ে জুহাইমানের আন্দোলনে অনেক শিক্ষিত ও ধার্মিক যুবক অংশ গ্রহণ করেন। একপর্যায়ে জুহাইমানের একজন আত্মীয় মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ কাহতানীকে তিনি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হিসেবে ঘোষণা করেন। কাহতানী নিজে এবং তার অনেক অনুসারী স্বপ্নে দেখতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং কাহতানীকে 'ইমাম মাহদী' বলে জানাচ্ছেন। এভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে তারা সুনিশ্চিত হন যে কাহতানীই ইমাম মাহদী। যেহেতু কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কাবা শরীফের পাশে হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে মাহদীর বাইয়াত হবে, এজন্য তারা ১৪০০ হিজরীর প্রথম দিনে এ বাইয়াত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। অনেকগুলো লাশের কফিনের মধ্যে অস্ত্র ভরে ১/১/১৪০০ (১৯/১১/৭৯) ফজরের সময় তারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। সালাতের পর তারা মসজিদ অবরোধ করেন এবং ইমাম ও মুসল্লীদেরকে ইমাম মাহদীর বাইয়াত গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। সৌদি

সরকারী বাহিনী দীর্ঘ ১৫ দিন প্রাণান্ত প্রচেষ্টার পর অবরুদ্ধ মাসাজিদুল হারাম মুক্ত করেন। ইমাম মাহদী ও তার অনেক অনুচর নিহত হয়। এছাড়া অনেক হাজী ও মুসল্লীও উভয় পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে নিহত হন।

(১৫) হুসাইন ইবন মূসা হুসাইন আল-লুহাইদী। বর্তমান যুগের 'ইমাম মাহদীগণের' একজন। তিনি কুয়েতের অধিবাসী। যুবক বয়সে পাপাচারের পথে ছিলেন। এরপর তিনি ইবাদত-বন্দেগি ও নির্জনতার মধ্যে বাস করতে থাকেন। সমাজের অবক্ষয়ের অজুহাতে মসজিদে সালাত আদায় বর্জন করেন। একপর্যায়ে তিনি দাবি করেন যে তিনি ইমাম মাহদী, তার কাছে আল্লাহর ওহী ও ইলহাম আসে। নষ্ট সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ে অনেক কথা তিনি বলেন। ফলে অনেকেই তার ভক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা দেখেছি যে, সহীহ হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে, প্রতিশ্রুত মাহদীর নাম ও পিতার নাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর মতই হবে। এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, লুহাইদী মাহদী নয়। এজন্য এর ব্যাখ্যায় লুহাইদী প্রচার করে যে, এ সকল হাদীসে মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর পুনরাগমনের কথা বলা হয়েছে। তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে আসবেন। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে তার অনেক ভক্ত অনুসারী বিদ্যমান। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের আলিমগণ তার বিভ্রান্তিগুলো প্রকাশ করে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৯. ৭. বিভ্রান্তির কারণ ও প্রতিকার

ইতিহাসে এ জাতীয় শত শত 'ইমাম মাহদী'-র সন্ধান পাওয়া যায় যাদের মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলিম বিভ্রান্ত হয়েছেন, হত্যাকারী বা নিহত হয়েছেন এবং অনেকে ঈমানহারা হয়েছেন। মাহদী দাবিদার ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে অনেক ভণ্ড ও প্রতারক থাকলেও তাদের মধ্যে অনেক আলিম, আবিদ ও নেককার মানুষও ছিলেন। তাদের বিভ্রান্তির পিছনে তিনটি মৌলিক কারণ কার্যকর বলে আমরা দেখি:

(১) সমাজ পরিবর্তনের অন্ধ আবেগ। সকল সমাজেই পাপ ও জুলুম বিদ্যমান। পাপাচারী, জালিম ও ধর্মহীনদের সংখ্যা সবসময়ই ধার্মিকদের চেয়ে বহুগুণ বেশি। আবেগী ধার্মিক মানুষ, বিশেষত যুবক, এ সকল অন্যায় দূর করে 'আদর্শ' সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। স্বাভাবিকভাবে ইলম প্রসার ও দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন 'কষ্টকর', 'দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ' ও 'অসম্ভব' বলে মনে হয়। এজন্য 'জিহাদ' বা 'ইমাম মাহদী' বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয় বলে গণ্য করেন অধিকাংশ আবেগী ধার্মিক মানুষ। ফলে এ জাতীয় কোনো কথা শুনলে বাছবিচার না করেই শরীক হয়ে যান তারা।

অষ্টম-নবম শতকের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবন খালদূন আব্দুর রাহমান ইবন মুহাম্মাদ (৭৩২-৮০৮ হি) মাহদীর প্রত্যাশায় শীয়া ও সূফীগণের বিভিন্ন মত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মাহদীর ধারণার সাথে মুজাদ্দিদের ধারণা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। সকলেই অপেক্ষা করেন, এই তো মুজাদ্দিদ বা মাহদী এসে ধর্ম, দেশ, জাতি ও সমাজকে ভাল করে ফেলবেন।[৬২৫] এগুলো সবই পলায়নী মনোবৃত্তির প্রকাশ। ফলাফলের চিন্তা না করে দীন পালন ও প্রচারের দায়িত্ব সাধ্যমত আঞ্জাম দেওয়াই মুমিনের কাজ। দুনিয়ায় ফলাফল যা-ই হোক না কেন এরূপ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মুমিন আখিরাতের অফুরন্ত নিয়ামত ও মর্যাদা লাভ করেন। মাহদী বা মুজাদ্দিদ অনুসন্ধান বা অনুসরণের নামে মুমিন মূলত নিজের এ দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়ান।

(২) স্বপ্ন-কাশফের উপর নির্ভর করা। মাহদী দাবিদার অধিকাংশ ব্যক্তি ও তার অনুসারীগণ আল্লাহর কসম করে দাবি করেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) উক্ত ব্যক্তিকে মাহদী বলে স্বপ্নে বা কাশফ-ইলহামের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বপ্নে দেখার কথা শুনলেই মুমিন দুর্বল হয়ে পড়েন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, শয়তান তাঁর আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না; তাঁর নাম ধরে জালিয়াতি করতে পারে না- তা তিনি বলেন নি। স্বপ্নে যদি তাঁকে হুবহু দুনিয়ার আকৃতিতে দেখা যায় তবেই তাঁকে দেখা বলে গণ্য হবে। তারপরও স্বপ্নের বক্তব্য অনুধাবন ও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। এছাড়া স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় শয়তান নিজেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাবি করে মিথ্যা বলতে পারে। বস্তুত, মুসলিমদের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ স্বপ্ন, ইলহাম ইত্যাদিকে দীনের দলীল হিসেবে গণ্য করা।

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, শেষ যুগে একজন ন্যায়পরায়ণ সুপথপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম বিশ্ব শাসন করবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করার প্রমাণ কী? যদি কারো নাম, পিতার নাম, বংশ, আকৃতি, বাইতুল্লাহর পাশে বাইয়াত গ্রহণ ইত্যাদি সব মিলে যায় তারপরও তাকে 'মাহদী' বলে বিশ্বাস করার কোনোরূপ দলীল নেই। কারণ মাহদীর মধ্যে এ সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে, কিন্তু এ সকল বৈশিষ্ট্য থাকলেই তিনি মাহদী নন।

কোনো হাদীসে কোনোভাবে বলা হয় নি যে, মহান আল্লাহ কাউকে মাহদী বা মুজাদ্দিদ হিসেবে গ্রহণ করলে তাকে বিষয়টি জানিয়ে দিবেন। কাজেই যিনি নিজেকে মাহদী বা মুজাদ্দিদ বলে দাবি করেন তিনি নিঃসন্দেহে মিথ্যাচারী প্রতারক বা প্রতারিত। তিনি কিভাবে জানলেন যে, তিনি মাহদী বা মুজাদ্দিদ? একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই কারো বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্ত জানা যায়। নবীগণ ওহীর মাধ্যমে তাঁদের নুবুওয়াতের কথা জেনেছেন। এ সকল দাবিদার কিভাবে তাদের বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্ত জানলেন?

সাধারণত তারা ওহীর দাবি করেন না; কারণ তাতে মুসলিম সমাজে তারা ভণ্ড নবী বলে গণ্য হবেন। এজন্য তারা স্বপ্ন বা কাশফের মাধ্যমে তা জানার দাবি করেন। সরলপ্রাণ মুসলিমগণ এতে প্রতারিত হন। অথচ স্বপ্ন বা কাশফের মাধ্যমে কারো মাহদী বা মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করা আর ওহীর লাভের দাবি একই। কারণ যে ব্যক্তি তার স্বপ্ন বা কাশফের বিষয়কে নিজের বা অন্যের বিশ্বাসের বিষয় বানিয়ে নিয়েছেন তিনি নিঃসন্দেহে তার স্বপ্ন বা কাশফকে নবীদের স্বপ্নের মত ওহীর সম-পর্যায়ের বলে দাবি করেছেন। অনুরূপভাবে কারো মাহদী বা মুজাদ্দিদ হওয়ার স্বপ্ন-কাশফ নির্ভর দাবি বিশ্বাস করার অর্থ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে কাউকে ওহীপ্রাপ্ত বলে বিশ্বাস করা।

মাহদী ও অন্য সকল বিষয়ে মুমিন শুধু কুরআন ও হাদীসের কথায় বিশ্বাস করেন। মাহদী ও কিয়ামতের আলামত বিষয়ক

হাদীসগুলো বর্ণনামূলক। ভূমিধ্বস হবে, পাহাড় স্থানচ্যুত হবে... অন্যান্য বিষয়ের মত মাহদীর রাজত্বও আসবে। কিয়ামতের কোনো আলামত ঘটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব মুমিনের নয়। অন্যান্য আলামতের মত এ ক্ষেত্রেও ঘটে যাওয়ার পরে মুমিন বলবেন যে, আলামতটি প্রকাশ পেয়েছে। যখন কোনো শাসকের বিষয়ে হাদীসে নির্দেশিত সকল আলামত প্রকাশিত হবে এবং মুসলিমগণ তাকে মাহদী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নিবেন তখনই মুমিন তাকে মেনে নিবেন।

মুমিনের হয়ত মনে হতে পারে যে, মাহদীকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। চিন্তাটি ভিত্তিহীন। যদি কেউ নিজেকে মাহদী বলে দাবি করেন তবে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে তিনি মিথ্যাবাদী। আর যদি দাবি-দাওয়া ছাড়াই কারো মধ্যে মাহদীর অনেকগুলো আলামত প্রকাশ পায় তবে তার থেকে সতর্কতার সাথে দূরে থাকতে হবে, অবশিষ্ট আলামতগুলো প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত। কারণ তিনি যদি সত্যিকার মাহদী হন তবে আল্লাহই ভূমিধ্বস ও অন্যান্য অলৌকিক সাহায্যের মাধ্যমে তাকে রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছে দেবেন। সকল আলামত প্রকাশ পাওয়ার পরে অর্থাৎ চূড়ান্ত বিজয় ও সকল দেশের মুসলিমগণ তাকে মেনে নেওয়ার পরেই শুধু মুমিনের দায়িত্ব তার বাইয়াত করা।

(৩) **ব্যাখ্যার নামে ওহীর সরল অর্থ পরিত্যাগ**। আকীদার অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মাহদী বিষয়েও ওহীর অপব্যাখ্যা বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ। উপরে আলোচিত মাহদীগণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, নাম, পিতার নাম, বংশ, আকৃতি, বাইয়াতের স্থান, রাজত্বলাভ, জুলুম দূর করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আলামতগুলোর অধিকাংশ বা কোনোটিই পাওয়া যায় না। তারপরও হাজার হাজার মুসলিম তাদের দাবি নির্বিচারে বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হয়েছেন ও হচ্ছেন। হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্যগুলো তারা নানান ব্যাখ্যা করে বাতিল করছেন। কারো বিষয়ে একবার সুধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে তার সকল দাবিই ভক্তরা নানা অজুহাতে মেনে নেয়। এজন্য প্রতারকগণ প্রথমে ইবাদত-বন্দেগি, দরবেশি, নির্লোভতা, কাশফ-কারামত ইত্যাদি দেখিয়ে মানুষদের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। এরপর নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করে। ফলে তাদের ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিও ভক্তগণ নির্বিচারে বিশ্বাস করেন। ঈমানী দুর্বলতার কারণেই প্রতারকগণ সফল হয়। আমরা দেখেছি, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য দাবি যে, আমরা তাঁর কথা ছাড়া আর কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করব না। প্রত্যেকের প্রতিটি কথা সুন্নাত দিয়ে যাচাই করব। আর এটিই মুমিনের রক্ষাকবজ।

৯. ৮. দাজ্জাল

দাজ্জাল অর্থ প্রতারক। ইসলামী পরিভাষায় কিয়ামতের পূর্বে যে মহা প্রতারকের আবির্ভাব হবে তাকে 'মাসীহ দাজ্জাল' বলা হয়। যে নিজেকে 'ঈশ্বর' বা 'ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব' বলে দাবি করবে এবং তার ঈশ্বরত্ব প্রমাণের জন্য বহু অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখাবে। অনেক মানুষ তাকে বিশ্বাস করে ঈমানহারা হবে। দাজ্জাল বিষয়ক হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

(১) আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন:

ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنِّى لأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ... وَلَكِنِّى أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ)... দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: আমি তোমাদেরকে তার বিষয়ে সতর্ক করছি। প্রত্যেক নবীই তাঁর জাতিকে দাজ্জালের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। .... তবে পূর্ববর্তী কোনো নবী তাঁর জাতিকে যে কথা বলেন নি আমি তোমাদেরকে সে কথা বলছি। তোমরা জেনে রাখ যে, দাজ্জাল কানা (একটি চক্ষু নষ্ট) আর আল্লাহ কানা নন।"[৬২৬]

(২) আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِى يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ.

"আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের বিষয়ে একটি কথা বলব যা কোনো নবী তাঁর জাতিকে বলেন নি; তা হলো যে, দাজ্জাল কানা। আর সে তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের নমুনা নিয়ে আসবে। যাকে সে জান্নাত বলবে সেটিই জাহান্নাম।"[৬২৭]

(৩) আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন,

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: يَأْتِى الدَّجَّالُ– وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ– بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِى بِالْمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ، هُوَ خَيْرُ النَّاسِ– أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ– فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ ، الَّذِى حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ ، هَلْ تَشُكُّونَ فِى الأَمْرِ فَيَقُولُونَ لاَ. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّى الْيَوْمَ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَقْتُلُهُ فَلاَ أُسَلَّطُ عَلَيْهِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদেরকে দাজ্জালের বিষয়ে দীর্ঘ কথা বললেন। তাঁর কথার মধ্যে তিনি বলেন: দাজ্জালের জন্য মদীনার মধ্যে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। এজন্য সে মদীনার পার্শ্ববর্তী মরুপ্রান্তরে আগমন করবে। তখন এক ব্যক্তি (মদীনা থেকে) বেরিয়ে তার কাছে গমন করবে, যে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষ বা শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই

সেই দাজ্জাল যার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাঁর হাদীসের মধ্যে জানিয়েছেন। তখন দাজ্জাল (উপস্থিত অনুসারীদেরকে) বলবে: আমি যদি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করি তবে কি তোমরা আমার (ঈশ্বরত্বের) বিষয়ে সন্দেহ করবে? তারা বলবে: না। তখন দাজ্জাল সে ব্যক্তিকে হত্যা করবে তারপর জীবিত করবে। তখন সে ব্যক্তি বলবে: আল্লাহর কসম, তোমার (দাজ্জাল হওয়ার) বিষয়ে আমি পূর্বের চেয়ে এখন আরো বেশি সুনিশ্চিত হলাম। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে কিন্তু সে তার উপর আর কর্তৃত্ব পাবে না (সে তার কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না)।"[৬২৮]

(৪) আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ

"যত নবী প্রেরিত হয়েছেন সকলেই কানা মিথ্যাবাদীর বিষয়ে তার উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। তোমরা সতর্ক থাকবে। সে কানা আর তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। আর তার দু চোখের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফির' লেখা থাকবে।"[৬২৯]

(৫) নাওয়াস ইবন সামআন (রা) বলেন:

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِى طَائِفَةِ النَّخْلِ ... إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّى أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالاً يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِى الأَرْضِ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ: لاَ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِى الأَرْضِ قَالَ: كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِى عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِى الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَىْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِى كُنُوزَكِ. فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِىَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِى الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّى قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِى لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِى إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ. وَيُحْصَرُ نَبِىُّ اللَّهُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِىُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِى رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِىُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ فَلاَ يَجِدُونَ فِى الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِىُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ أَنْبِتِى ثَمَرَتَكِ وَرُدِّى بَرَكَتَكِ.

فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِى الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِى الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِى الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ».

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন সকালে দাজ্জালের কথা বললেন। তিনি উচ্চস্বরে ও নিম্নস্বরে এমন গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে আমাদের মনে হলো দাজ্জাল খেজুরের বাগানের মধ্যে উপস্থিত.... তিনি আমাদের বলেন: আমি তোমাদের মাঝে থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জালের আবির্ভাব হয় তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমিই তার সাথে বিতর্ক করব। আর যদি এমন অবস্থায় সে আসে যখন আমি তোমাদের মাঝে নেই তবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের পক্ষ হয়ে বিতর্ক করবে। আর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ আমার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) থাকবেন। দাজ্জাল কোঁকড়ানো চুল ফোলা চোখ একজন যুবক। আমি যেন তাকে 'আব্দুল উয্যা ইবন কাতান' নামক লোকটির সাথে তুলনা করছি। তোমাদের কেউ যদি তাকে পায় তবে সে যেন তার কাছে সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে বহির্ভূত হবে এবং ডানে-বামে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা সুদৃঢ় থাকবে।

আমরা বললাম: সে কতদিন পৃথিবীতে থাকবে? তিনি বলেন: ৪০ দিন। প্রথম দিন এক বছরের মত। দ্বিতীয় দিন এক মাসের মত। তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের মত। আর অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের সাধারণ দিনের মত। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এক বছরের মত যে দিন সে দিনে কি এক দিনের সালাত আদায় করলেই চলবে? তিনি বলেন: না, তোমরা সালাতের জন্য সময় হিসাব করে নিবে। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল: পৃথিবীতে তার দ্রুততা কিরূপ? তিনি বলেন: ঝড়-তাড়িত মেঘের মত। সে এক জাতির নিকট এসে তাদেরকে দাওয়াত দিবে। তখন তারা তার উপর ঈমান আনবে এবং তার ডাকে সাড়া দিবে। তখন তার নির্দেশে আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হবে, যমিনে ফল-ফসল জন্ম নেবে, তাদের পালিত পশুগুলোর আকৃতি ও দুধ সবই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর সে অন্য একটি জনগোষ্ঠীর নিকট গমন করবে এবং তাদেরকে দাওয়াত দিবে। তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের নিকট থেকে ফিরে যাবে, কিন্তু তাদের যমিনগুলো অনুর্বর ফসলহীন হয়ে যাবে এবং তাদের হাতে তাদের সম্পদের কিছুই থাকবে না। সে পতিত ভূমি দিয়ে গমন করার সময় তাকে বলবে: তোমার সম্পদ-ভাণ্ডার বের কর। তখন মৌমাছিরা যেমন রাণী মাছির পিছে পিছে চলে তেমনি খনিজ সম্পদগুলো তার পিছে পিছে চলবে। এরপর সে একজন যৌবনে পূর্ণ যুবককে ডেকে তাকে তরবারি দ্বরা দুখণ্ড করবে এবং তীর নিক্ষেপের দূরত্বে ছুড়ে ফেলবে। এরপর তাকে ডাকবে। তখন সে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার দিকে এগিয়ে আসবে।

সে যখন এসব করবে তখন আল্লাহ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশকের পূর্ব দিকে সাদা মিনারার উপর অবতরণ করবেন। তাঁর পরিধানে থাকবে দুটি রঙিন কাপড়। তিনি তাঁর হাত দুটি দুজন ফিরিশতার পাঁখার উপর রেখে অবতরণ করবেন। তিনি মাথা নিচু করলে ফোঁটা ফোঁটা (ঘাম) পড়বে। আবার যখন মাথা উচু করবেন তখন মুক্তোর মত (ঘাম) পড়বে। যে কোনো কাফির তাঁর নিশ্বাস পেলেই মৃত্যুবরণ করবে। আর তাঁর দৃষ্টি যতদূর যাবে তাঁর নিশ্বাসও ততদূর যাবে। তিনি দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন এবং 'বাব লুদ্দ' নামক স্থানে তাকে পেয়ে তাকে বধ করবেন। এরপর আল্লাহ যাদেরকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করেছেন এমন মানুষদের নিকট তিনি আগমন করবেন। তিনি তাদের মুখমণ্ডল মুছে দিবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদার বিষয়ে কথা বলবেন।

এ অবস্থায় আল্লাহ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-কে ওহী করবেন যে, আমি আমার এমন একদল বান্দাকে বের করে দিয়েছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই। কাজেই আমার বান্দাদেরকে নিয়ে পাহাড়ে চলে যাও। তখন আল্লাহ ইয়াজূজ -মাজূজকে প্রেরণ করবেন। সকল জনপদ দিয়ে তারা চলতে থাকবে। তাদের মধ্য থেকে যারা প্রথমে বের হবে তারা তাবারিয়া হ্রদে পৌছে হ্রদের সব পানি পান করবে। সব শেষে যারা সে পথ দিয়ে যাবে তারা বলবে: এখানে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ থাকবেন। এমনকি একটি ষাড়ের মাথা তাদের কাছে ১০০ স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সাথীরা আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজুজদের ঘাড়ে এক জাতীয় কীট প্রেরণ করবেন ফলে তারা সকলেই একযোগে মহামারিতে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সাথীরা পৃথিবীতে নেবে আসবেন। কিন্ত পৃথিবীর এক বিঘত জমিও তাদের পঁচাগলা লাশ থেকে মুক্ত পাবেন না। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সাথীর আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। এরপর আল্লাহ সর্বব্যাপী বৃষ্টি দান করবেন যা বাড়িঘর ও তাঁবুসহ পুরো পৃথিবী ধুয়ে আয়নার মত চকচকে করবে। এরপর যমিনকে বলা হবে: তোমার ফল-ফসল উৎপন্ন কর এবং তোমার বরকত বের কর। তখন একটি বেদানা একদল মানুষেরা ভক্ষণ করবে এবং তার খোসার ছায়া পেতে পারবে। আল্লাহ সম্পদে বরকত প্রদান করবেন। এমনকি একটি উটের দুধ একদল মানুষের চাহিদা মেটাবে, একটি গরুর দুধ একটি গোত্রের চাহিদা মেটাবে, একটি মেষ একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। এ অবস্থা চলতে থাকবে। এমন সময়ে আল্লাহ একটি পবিত্র বায়ুপ্রবাহ প্রেরণ করবেন যা মানুষদের বগলের নিচে ধরবে এবং সকল মুমিন-মুসলিম ব্যক্তির প্রাণ গ্রহণ করবে। এরপর শুধু খারাপ মানুষগুলোই জীবিত থাকবে। তারা দুনিয়াতে গর্দভের মত অশ্লীলতায় মেতে উঠবে। এদের সময়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৬৩০]

দাজ্জাল বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত। এ বিষয়ক হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, দুটি বিভ্রান্তির উপর এ ফিতনার ভিত্তি: (১) অলৌকিকত্ব বা কারামত দেখে কাউকে 'অলৌকিক ব্যক্তিত্ব' বা 'ওলী' বলে বিশ্বাস করা এবং (২) ওলী বা কোনো মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বরিক শক্তি থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করা। আমরা দেখেছি যে, মুশরিক জাতিগুলোর শিরকের মূল কারণ এ দুটো বিষয়। অবতারত্ব, ফানা, বাকা ইত্যাদি অজুহাতে তারা মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহ, তাঁর কোনো ক্ষমতা বা বিশেষণ মিশ্রিত বা প্রকাশিত হতে পারে বলে বিশ্বাস করেন। তাওহীদ বিষয়ক অজ্ঞতার কারণে বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এ দুটি বিশ্বাস ব্যাপক। বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রায়ই নতুন নতুন 'ওলী বাবা' প্রকাশিত হন। কারামতের গল্প শুনে লক্ষলক্ষ মুসলিম এদেরকে 'অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ওলী' বলে বিশ্বাস করেন। সাজদা, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা ইত্যাদি ইবাদতে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করেন। এ সকল 'ক্ষুদ্র দাজ্জালের' ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে, ঝড়-বৃষ্টি, ধন-সম্পদ, জীবন-মৃত্যু সবই তাদের বাবা বা গুরুর ইচ্ছাধীন। এ সকল 'ক্ষুদ্র দাজ্জাল' মহা দাজ্জালকে গ্রহণ করার প্রেক্ষাপট তৈরি করছে। যারা ছোট দাজ্জালদেরকে 'কারামতের গল্প' শুনেই মেনে নিচ্ছেন, স্বভাবতই 'কানা দাজ্জাল'-এর মহা 'কারামত' দেখে তাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিবেন। এমনকি যারা ছোট দাজ্জালদের বিশ্বাস করে নি তারাও কানা দাজ্জালের মহা 'কারামত' দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। শুধু তাওহীদ ও রিসালাতের গভীর ঈমান এবং মহান আল্লাহর তাওফীক ও রহমতই মুমিনকে এ ফিতনা থেকে রক্ষা করবে।

মহান আল্লাহ বান্দাদের পরীক্ষার জন্য দাজ্জালকে কিছু ক্ষমতা প্রদানের সাথে সাথে তার অক্ষমতা প্রকাশিত রাখবেন। সে নিজের নষ্ট চক্ষুটি ভাল করতে সক্ষম হবে না। যেন সচেতন মুমিন বুঝতে পারেন যে, সে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সৃষ্টি মাত্র। কিন্তু ঈমানের গভীরতা না থাকলে

এ সীমাবদ্ধতা মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় অথবা ভক্তিভরে তা ব্যাখ্যা করে। যেমন বর্তমানের ক্ষুদ্র দাজ্জালদের ভক্তগণ তাদের গুরুদের অক্ষমতা ব্যাখ্যা করে।

অতীত ও বর্তমানে বিভিন্ন বিভ্রান্ত দল দাজ্জাল বিষয়ক হাদীসগুলোকে রূপক অর্থে গ্রহণ করে নানা প্রকার উদ্ভট ব্যাখ্যা করেছে। তারা দাজ্জাল বলতে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (৭৬৭ হি) বলেন: "কাযী ইয়ায (৫৪৪ হি) বলেন: "মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস দাজ্জালের বিষয়ে যে সকল হাদীস উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো হক্কপন্থীদের দলীল। তারা দাজ্জালের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, দাজ্জাল বলতে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন এবং যাকে তাঁর ক্ষমতাধীন কিছু বিষয়ের ক্ষমতা প্রদান করবেন।... ঈসা (আ) তাকে হত্যা করবেন। এটিই আহলুস সুন্নাত এবং সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ ও গবেষকের মত। খারিজীগণ, জাহমীগণ এবং মুতাযিলীদের কেউ কেউ দাজ্জালের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন.... ।"[৬৩১]

মুমিনের দায়িত্ব সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসগুলো সরল ও বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা অনুসারে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সংরক্ষণের জন্য দুআ করা। বিভিন্ন হাদীসে তিনি দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআ শিখিয়েছেন এবং সূরা কাহ্ফ-এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ ও পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ক কয়েকটি দুআ **'রাহে বেলায়াত'** গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

৯. ৯. ঈসা (আ)-এর অবতরণ

কিয়ামতের বড় আলামতগুলোর অন্যতম ঈসা (আ)-এর অবতরণ। এ বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনা আমরা দেখেছি। কুরআনের পাশাপাশি বহুসংখ্যক সাহাবীর সূত্রে মুতাওয়াতির হাদীসে তাঁর অবতরণের বিষয়টি প্রমাণিত। উপরে আমরা এ অর্থে চারটি হাদীস দেখেছি। অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, অচিরেই তোমাদের মাঝে মরিয়মের পুত্র ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ ভাঙবেন, শূকর বধ করবেন, জিযিয়া তুলে দিবেন এবং সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে। এমনকি কেউ সম্পদ গ্রহণ করবে না, এমনকি একটি সাজদার মূল্য দুনিয়া ও তার সব সম্পদের চেয়ে বেশি বলে গণ্য হবে।"[৬৩২]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلاً مَرْبُوعاً إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الإِسْلاَمِ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ وَتَقَعُ الأَمَنَةُ عَلَى الأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الأُسُودُ مَعَ الإِبِلِ وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لاَ تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

"নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাইদের মত; তাঁদের মাতৃগণ পৃথক হলেও তাঁদের দীন একই। মরিয়মের পুত্র ঈসার বিষয়ে আমারই অধিকার বেশি; কারণ তাঁর ও আমার মাঝে কোনো নবী নেই। তিনি অবতরণ করবেন। যখন তোমরা তাঁকে দেখবে তাঁকে চিনবে: তিনি মধ্যমাকৃতির লালচে-শুভ্র মানুষ। তাঁর পরিধানে হালকা হলুদ রঙের দুটি কাপড় থাকবে। (পরিচ্ছন্নতার কারণে) তাঁর মাথায় পানি স্পর্শ না করলেও মনে হয় যে তা থেকে পানি পড়ছে। তিনি ক্রুশ ভাঙবেন, শূকর বধ করবেন, জিযিয়া অপসারণ করবেন, সকল মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকবেন। তাঁর সময়ে ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বিলুপ্ত হবে। তাঁর সময়েই মাসীহ দাজ্জালকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন। এরপর পৃথিবীতে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনকি উটের সাথে সিংহ, গরুর সাথে বাঘ ও মেষের সাথে চিতা চরবে। শিশুরা সাপ নিয়ে খেলবে কিন্তু সাপ তাদের ক্ষতি করবে না। তিনি চল্লিশ বৎসর অবস্থান করবেন। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমগণ তাঁর জানাযা আদায় করবে।[৬৩৩]

আরো অনেক হাদীস এ বিষয় বর্ণিত। মুমিনের দায়িত্ব এ বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা সরল অর্থে বিশ্বাস করা। কিয়ামতের আলামতগুলো বর্ণনামূলক। এগুলো ঘটবে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন। ঘটার পরে বিশ্বাস করা ছাড়া মুমিনের অন্য কোনো দায়িত্ব নেই। ঈসা (আ) বিষয়ক সকল ভবিষ্যদ্বাণী যখন প্রকাশিত হবে, তখন সে যুগের মুমিনগণ বলবেন, আল-হামদু লিল্লাহ, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, কোনো আলামত পরিপূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার আগে তা নিয়ে গবেষণা-বিতর্ক বা বিশ্বাস বিভ্রান্তির দরজা উন্মুক্ত করে।

৯. ১০. ঈসা (আ) হওয়ার দাবিদার

উম্মাতের মধ্যে মেহেদী হওয়ার দাবিদার শত শত হলেও নিজেকে ঈসা ইবন মরিয়ম বলে দাবি করার মত পাগল পূর্বে পাওয়া যায় নি। কারণ সকল হাদীসেই বলা হয়েছে যে, তিনি মরিয়মের বেটা ঈসা। কাজেই অন্য কোনো ব্যক্তি একেবারে বদ্ধ পাগল না হলে নিজেকে মরিয়মের বেটা বলে দাবি করতে পারে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে মরিয়মের বেটা ঈসা বলে দাবি করে।

ইবন মাজাহ অত্যন্ত দুর্বল সনদের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

لاَ الْمَهْدِيُّ إِلاَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

"ঈসা ইবন মরিয়ম ভিন্ন মাহদী নেই।"[৬৩৪]

হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ জানাদী অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি এবং হাদীসটির সনদে বিভিন্ন অসঙ্গতি বিদ্যমান। মুহাদ্দিসগণ একমত যে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। অনেকে হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[৬৩৫] এ হাদীসটি সহীহ হলে এর দ্বারা মাহদীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেত, কিন্তু কোনোভাবেই মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-এর অবতরণ অস্বীকার করা যেত না। কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায় ঠিক বিপরীত করেছে। গোলাম আহমদ প্রথমে নিজেকে ওলী, এরপর মুজাদ্দিদ, এরপর মাহদী, এরপর ঈসা এবং সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ নবী বলে দাবি করে। এ জাল হাদীসে বলা হয়েছে 'ঈসা (আ) ভিন্ন পৃথক কোনো মাহদী নেই।' আর সে এ জাল হাদীসটির জাল অর্থ করে সে বলে "মাহদী ছাড়া পৃথক কোনো ঈসা নেই।' এরপর সে ও তার অনুসারীরা এ জাল অর্থটিকেই 'ঈমান' এর মূল বানিয়েছে।

সর্বোপরি, কাদিয়ানীর সকল দাবি-দাওয়াই সন্দেহাতীতভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত। সে রাজত্ব লাভ করে নি, ৪০ বৎসর রাজত্ব করে নি, ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে নি... মাহদী বা ঈসা (আ) কারো কোনো আলামতই তার মধ্যে পাওয়া যায় নি। তবুও লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে মাহদী ও ঈসা নামে বিশ্বাস করছে!

খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের পরিসমাপ্তির ঘোষণা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অন্যতম মুজিযা। ইহূদী জাতির ইতিহাসে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পূর্বে নুবুওয়াতের ধারা তাদের মধ্যে অব্যাহত ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে বিগত দেড় হাজার বৎসরে তাদের মধ্যে একজনও নবী আসেন নি। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে না মানলেও বাস্তবে মেনে নিয়েছে যে, নুবুওয়াতের ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ মুসলিম নামধারীদের মধ্যে গোলাম আহমদকে নবী বলে বিশ্বাস করা মানুষ পাওয়া যায়!!

৯. ১১. ঈসায়ী প্রচারকদের প্রতারণা

এর বিপরীতে খৃস্টান মিশনারিগণ ঈসা (আ)-এর অবতরণ বিষয়ে মুসলিমদের বিশ্বাস বিকৃত করে প্রতারণামূলকভাবে মুসলিমদেরকে খৃস্টান বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। সরলপ্রাণ মুসিলমদেরকে তারা বলেন: যেহেতু ঈসা মাসীহ আবার আসবেন, কাজেই এখনই আমাদের সকলের দায়িত্ব তার ধর্ম গ্রহণ করে প্রস্তুতি গ্রহণ করা!

বস্তুত বিগত দেড় হাজার বছরে খৃস্টান মিশনারিগণ মুসলিমদেরকে ধর্মান্তর করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এজন্য গত শতকের শেষ দিকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মুসলিমদেরকে মুসলিম সেজে ধর্মান্তর করার। তারা তাদের গ্রন্থগুলো ইসলামী পরিভাষায় রূপান্তর করেছেন এবং মুসলিমদের মধ্যে বলে বেড়াচ্ছেন যে, তারা খৃস্টান নন; তারা ঈসায়ী মুসলমান, তারা কুরআন, ইঞ্জিল, তাওরাত, যাবুর সবই মানেন, তাঁরা মুহাম্মাদ (ﷺ) ও ঈসা (আ) উভয়কেই মানেন...। এ জাতীয় অগণিত মিথ্যাচারের পাশাপাশি তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করে দাবি করেন যে, এ সকল আয়াত তাদের ধর্ম সঠিক বলে প্রমাণ করে। তাদের এ সকল প্রতারণার স্বরূপ জানতে আমার লেখা "**কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম**" পুস্তিকাটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। এখানে ঈসা মাসীহের অবতরণ বিষয়ক বিভ্রান্তি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব।

প্রচলিত ইঞ্জিলে বারবার বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ) তাঁর ভক্তদের জীবদ্দশাতেই কিয়ামত ঘটার ও তাঁর পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রতিশ্রুত শতভাগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফ নামক পুস্তকের নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতি দেখুন:

(১) "কেননা মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণের (angels) সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসিবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যাহারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে আপনার রাজ্যে আসিতে না দেখিবে।" মথি ১৬/২৭-২৮।

(২) "আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমেই সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না। কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।" ১ থিষলনীকীয় ৪/১৫-১৭।

(৩) "দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব না (মরিব না), কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব; এক মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে হইবে; কেননা তূরী (সিঙ্গা) বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে,

এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব।" ১ করিন্থীয় ১৫/৫১-৫২।

(৪) "আর তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এ গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না (লিখিও না); কেননা সময় (কিয়ামত) সন্নিকট। যে অধর্মচারী, সে ইহার পরেও অধর্মাচরণ করুক এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক; এবং যে ধার্মিক, সে ইহার পরেও ধর্মাচরণ করুক; এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিত্রকৃত হউক।" (প্রকাশিত বাক্য/ প্রকাশিত কালাম ২২/১০-১১)

খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফ ঈসা (আ)-কে অত্যন্ত অবমানাকরভাবে চিত্রিত করেছে। যেমন, তিনি মানুষদেরকে গালি দিতেন (মথি ১৬/২৩, ২৩/১৩-৩৩), অন্য বংশ বা ধর্মের মানুষদের শূকর ও কুকুর বলতেন (মথি ৭/৬; ১৫/২২-২৮, মার্ক ৭/২৫-২৯), পূর্ববর্তী নবীদেরকে চোর-ডাকাত বলতেন (যোহন ১০/৭-৮), নিরপরাধ মানুষদেরকে অভিশাপ দিতেন (মথি ২৩/৩৫-৩৬), অকারণে হত্যা করতেন (মথি ২১/১৮-২১, মার্ক ৫/১০-১৪; ১১/১২-২২), অবিশ্বাসীদেরকে নির্বিচারে ধরে ধরে জবাই করার নির্দেশ দিতেন (লূক ১৯/২৭), মিথ্যা বলতেন (মথি ১৬/২৭-২৮: ১৯/২৮: মার্ক ২/২৫-২৬, ১১/২৩, ১৬/১৭-১৮: লূক ১৮/২৯-৩০, যোহন ৩/১৩), মদ পান করে মাতাল হতেন (লূক ৭/৩৪-৫০, যোহন ১৩/৪-৫), বেশ্যা মেয়েদেরকে তাঁকে স্পর্শ করতে ও চুম্বন করতে দিতেন (লূক ৭/৩৪-৫০, ৮/১-৩, যোহন ১১/১-৫), নিজের মায়ের সাথে ভয়ঙ্কর বেয়াদবি করেছেন, (মথি ১২/৪৬-৫০; মার্ক ৩/৩১-৩৫; লূক ৮/১৯-২১, যোহন ২/৪, ১৯/২৬), তিনি অত্যন্ত ভীত ও কাপরুষ ছিলেন (মথি ২৬/৩৬-৪৬, ২৭/৩৮-৫১; লূক ২২/৪১-৪৬, মার্ক ১৫/২৭-৩৮)। সাধু পল ও তাঁর অনুসারীরা ঈসা (আ)-কে 'মালউন' বা অভিশপ্ত বলে দাবি করেছেন। (গালাতীয় ১০-১৩)। (নাঊযু বিল্লাহ!)

খৃস্টান প্রচারককে বলুন, আপনারা ঈসা (আ)-এর অনুসারী নন, আপনারা সাধু পলের অনুসারী। আপনার ঈসা (আ)-কে অপমানিত করেছেন এবং তাঁর নাম ভাঙ্গিয়ে শিরক-কুফর প্রচার করেছেন। তিনি অবতরণ করে প্রথমে আপনাদের মত মিথ্যচারীদেরকেই ধ্বংস করবেন। কাজেই তাঁর বিষয়ে সাধুপলের মিথ্যা ধর্ম পরিত্যাগ করে কুরআনের বিশুদ্ধ বিশ্বাস গ্রহণ করে তাঁর পুনরাগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

শেষ কথা:

ইমাম আবূ হানীফা (রা) তাঁর 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের শেষ বাক্যে বলেছেন: **"মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"**

বাহ্যত তিনি বুঝাচ্ছেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকীদা বর্ণনা করাই আমাদের দায়িত্ব। কাউকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। রাব্বুল আলামীনের কাছে হেদায়াত ও তাওফীক প্রার্থনাই মুমিনের দায়িত্ব। সূরা ফাতিহাতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ দুআ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহান আল্লাহর কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করে দুআ শিখিয়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সালাতের শুরুতে নিম্নের দুআটি পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

"হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনার বান্দারা যে সকল বিষয় নিয়ে মতভেদ করত তাদের মধ্যে সে বিষয়ে আপনিই ফয়সালা প্রদান করবেন। যে সকল বিষয়ে সত্য বা হক্ক নির্ধারণে মতভেদ হয়েছে সে সকল বিষয়ে আপনি আপনার অনুমতিতে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আপনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সিরাতুল মুস্তাকিমে পরিচালিত করেন।"[৬৩৬]

আমরা এ দুআর মাধ্যমেই 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শেষ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর পরিজন ও সাহবীগণের উপর। প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত।